শরদিন্দু অম্নিবাস

শরদিন্দু অম্নিবাস

দ শ ম খ ণ্ড

উপন্যাস নাটক

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

নিবেদন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে শরদিন্দু অম্নিবাস নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

লেখকের গোয়েন্দা কাহিনী, ঐতিহাসিক উপন্যাস, কিশোরদের জন্য লেখা গল্প, লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলির সমুদয় ছোট গল্প এবং কয়েকটি উপন্যাস, নাটক ও চিত্রনাট্য যথাক্রমে শরদিন্দু অম্নিবাস প্রথম—নবম খণ্ডে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

দশম খণ্ডে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচটি গ্রন্থ সংকলিত হল—ঝিমঝিম, বহু যুগের ওপার হতে, রাজদ্রোহী ও দাদার কীর্তি (উপন্যাস), এবং বন্ধু (নাটক)।

—প্রকাশক

সূচী

রিমঝিম

সতেরই শ্রাবণ।

আজ আমার জন্মদিন। জীবনের পঁচিশটা বছর কাটিয়ে ছাব্বিশ বছরে পা দিলুম। শতাব্দীর সিকি ভাগ কেটে গেল। কী পেলুম? কী দিলুম?

বাইরে ঘনঘোর বর্ষা নেমেছে। ঝর্‌ঝর্‌ ঝম্‌ঝম্‌ একটানা বৃষ্টি। রাত্রি এখন দশটা, এরই মধ্যে কলকাতা শহর নিঝুম হয়ে পড়েছে। রাস্তায় লোক নেই, গাড়ি চলাচল নেই, কেবল রাস্তার ধারের আলোগুলো নিজের নিজের মাথার চারপাশে জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার জন্মদিনে প্রতি বছর বৃষ্টি হয়। ভরা শ্রাবণ মাসে যার জন্ম তার জন্মদিনে বৃষ্টি হলে আশ্চর্য কিছু নেই। কিন্তু আমার জীবনে এমন একটা জন্মদিন আসেনি যেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়েনি। বাবা বলতেন, আমি যেদিন জন্মেছিলুম সেদিনও নাকি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়েছিল। মা আমার নাম দিয়েছিলেন—বাদল। যতদিন বেঁচে ছিলেন আমাকে 'বাদল' বলেই ডাকতেন। আমার মা! তিনি আজ কোথায়! আর আমার বাবা—তিনিও চলে গেছেন। আমাকে আর 'বাদল' বলে ডাকবার কেউ নেই। এখন আমি মিস্‌ প্রিয়ংবদা ভৌমিক।

কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সে প্রিয়ংবদা ভৌমিক ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেছে কেন? যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, অনেক দেখেছেন, অনেক কাজ করেছেন, তাঁরা নিজের জীবনচরিত বা ডায়েরি লিখলে শোভা পায়। কিন্তু প্রিয়ংবদা ভৌমিক সামান্য একজন নার্স, সে ডায়েরি লেখে কোন্‌ স্পর্ধায়? কী আছে তার জীবনে? রোগীর শুশ্রূষা করা তার জীবিকা; রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো, টেম্পারেচার নেওয়া, রাত জেগে পাহারা দেওয়া, এই তার কাজ। তবে সে ডায়েরি লেখে কেন?

এর উত্তর খুব জোরালো নয়, তবু একটা উত্তর আছে। আমি কাজের সময় মন দিয়ে কাজ করি, মনটা কাজেই লিপ্ত থাকে। কিন্তু কাজ যখন থাকে না তখন মনটাকে নিয়ে কী করব ভেবে পাই না। আমার বন্ধু শুক্লাও আমার মতন নার্স; আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি। কিন্তু দুজনের একসঙ্গে ছুটি পাওয়া ঘটে ওঠে না। তাছাড়া তার—তার মনের যাহোক একটা আশ্রয় আছে; আমার কিছুই নেই। দৈবাৎ যখন দুজনে একত্র হতে পারি তখন খুব গল্প করি। কিন্তু সে কতটুকু? বেশীর ভাগ সময় মনটা খালি পড়ে থাকে। তাই ঠিক করেছি ডায়েরি লিখব। নাই বা পড়ল কেউ; আমি নিজের মনের সঙ্গে কথা বলব। তবু তো একটা কিছু করা হবে।

ডায়েরির আরম্ভে নিজের জীবনের গোড়ার কথাগুলো লিখে রাখি। আমি কে সেটাও তো নিজেকে জানিয়ে রাখা দরকার।

জন্মেছিলুম পূর্ববঙ্গে; জীবনের প্রথম ষোলটা বছর সেখানেই কেটেছে। বাবা ছিলেন কবিরাজ, খুব পসার ছিল। মা মারা যান যখন আমার বয়স পাঁচ বছর। বাবা আর বিয়ে করেননি। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান; বাবা আমাকে নিজের হাতে মানুষ করেছিলেন। লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করেছিলুম।

ম্যাট্রিক পাস করবার কিছুদিন পরে হঠাৎ আমরা কলকাতায় চলে এলুম। তখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয়নি। কিন্তু বাবা বুঝতে পেরেছিলেন প্রচণ্ড দুর্যোগ আসছে। তিনি বাড়ি-ঘর বিক্রি করে সঞ্চিত টাকাকড়ি নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। তার কয়েকমাস পরেই দুরন্ত কালবোশেখী ঝড়ের মতন মহাদুর্যোগ এসে পড়ল; দেশ দুভাগ হবার সূত্রপাত হল। সেই সময় এই কলকাতার রাস্তাঘাটে যে বর্বরতা দেখেছি তা ভোলবার নয়।

বাবা এখানে এসে আবার কবিরাজী ব্যবসা খুলে বসেছিলেন, কিন্তু আর পসার হল না। পুঁজি ভেঙে সংসার চলতে লাগল। বাবা ভারি বিচক্ষণ ছিলেন, দূরদর্শী ছিলেন, তিনি আমাকে কলেজে ভর্তি করলেন না, বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পুঁজি ফুরোবার আগে যদি আমার একটা সদ্গতি করতে পারেন তাহলে তাঁর একলার জীবন কোনোরকমে কেটে যাবে।

যোগ্য ঘর-বর কিন্তু জুটল না। আমি সুন্দরী না হতে পারি, কিন্তু একেবারে স্যাওড়াগাছের পেত্নীও নই। রঙ্ ফরসা, মুখ চোখ গড়ন কোনোটাই নিন্দের নয়। তাছাড়া বাবা টাকা খরচ করতে রাজী ছিলেন। তবু আমাকে বিয়ে করতে কেউ এগিয়ে এল না। তার কারণ, আমার একটা মারাত্মক দোষ ছিল; আমি পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা মেয়ে। তখনকার দিনে পূর্ববঙ্গ থেকে যে-মেয়ে পালিয়ে এসেছে তার দৈহিক শুচিতা সম্বন্ধে সকলের মনেই সন্দেহ। আমি যে দাঙ্গা আরম্ভ হবার আগেই পালিয়ে এসে-ছিলাম, এ কথায় কোনও বরকর্তাই কান দিলেন না।

কলকাতায় আসার পর বাবার শরীর আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করেছিল। ছিলেন রোজগেরে মানুষ, এখানে এসে রোজগার নেই। তার ওপর আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কলকাতার জলহাওয়াও তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে অসুখে পড়েন, আমি সেবা-শুশ্রূষা করি। তিনি সেরে ওঠেন, আবার কিছুদিন পরে অসুখে পড়েন। এই ভাবে বছর দেড়েক কেটে গেল।

একদিন বাবা অম্বলের ব্যথা নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমি পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম। তিনি একবার বালিশ থেকে মাথা তুলে আমার পানে তাকালেন, আস্তে আস্তে বললেন, 'তুই বেশ সেবা করতে পারিস। নার্সের কাজ শিখবি?' এই বলে যেন একটু লজ্জিতভাবে আবার বালিশে মাথা রাখলেন।

বুঝতে পারলুম, রোগের মধ্যেও তিনি আমার কথাই ভাবছেন। হয়ত রোগের মধ্যে নিজের মৃত্যু-চিন্তা মনে এসেছে; ভাবছেন তিনি যদি হঠাৎ মারা যান তখন আমার কী গতি হবে। তাঁর মেয়ে নার্স হবে এ চিন্তা তাঁর কাছে সুখের নয়। কিন্তু উপায় কী? ভাল ঘরে-বরে যখন বিয়ে দিতে পারলেন না তখন একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে তো, যাতে আমি ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে পারি।

তাঁর প্রশ্নে আমার চোখে জল এল। কান্না চেপে বললুম, 'হ্যাঁ বাবা, শিখব। সেবা করতে আমার খুব ভাল লাগে।'

বাবা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেই ভাল। সেরে উঠি, তারপর চেষ্টা করব।' একটু থেমে আবার বললেন, 'নার্সের কাজ খুব ভাল কাজ। মানুষের সেবা, রুগ্ন মানুষের সেবা; এর তুল্য কাজ আছে!' কিন্তু তাঁর কথায় খুব জোর পৌঁছল না।

মাসখানেক পরে প্রোবেশনার নার্স হয়ে নার্সদের কোয়ার্টারে উঠে এলুম। তিন বছরের কোর্স, তিন বছর পরে পাকা নার্স হয়ে বেরুব। নার্সদের হস্টেলে একটি ঘর পেলুম। আমাদের ওপর নিয়মের খুব কড়াকড়ি, সব কাজ কাঁটা ধরে হয়। কাজের সময় ছাড়া নার্সরা ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে পারে না। হপ্তায় এক বেলা ছুটি। আমি ছুটির এক বেলা বাড়ি যেতুম, বাবার কাছে তিন-চার ঘণ্টা থেকে আবার হস্টেলে ফিরে আসতুম।

হস্টেলে শুক্লার সঙ্গে ভাব হল। সে আমার চেয়ে এক বছরের সীনিয়র। দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়, কিন্তু মুখখানি ভারি মিষ্টি আর মমতা-ভরা। এত মমতা নিয়েও জন্মেছিল পোড়ারমুখী, নিজের জীবনটা ভাসিয়ে দিলে।

হস্টেলে অনেক প্রোবেশনার মেয়ে ছিল, একজন টিউটর সিস্টার ছিলেন। আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে দাঁড়াল শুক্লা। লিখতে লজ্জা করে, কিন্তু এমন সময় এল যখন আমার মনে শুক্লা আমার বাবার চেয়েও বেশী জায়গা জুড়ে বসল। কেন এমন হয় কে জানে! হয়ত যৌবনে মানুষ চায় সমবয়সী মানুষের সঙ্গ। বুড়োরাও কি তাই চায়?

কী জানি! বাবাকে লক্ষ্য করেছি তাঁর কোনও সমবয়স্ক বন্ধু ছিল না; দু-চারজন পরিচিত লোক ছিল। সারা হপ্তা তিনি আমার পথ চেয়ে থাকতেন; যেন আমার জন্যই বেঁচে ছিলেন। তাঁর ভালবাসার কথা যখন ভাবি, নিজেকে বড় অকৃতজ্ঞ আর হৃদয়হীন মনে হয়। তাঁর স্নেহের কী প্রতিদান দিয়েছি আমি?

দিন কাটছে। হস্টেলে থাকি, ক্লাসে লেকচার শুনি, হাসপাতালে কাজ শিখি। রাত্তিরে যখন হস্টেলের আলো নিভে যায় তখন শুক্লা চুপিচুপি আমার ঘরে আসে, নয়ত আমি শুক্লার ঘরে যাই। দু'জনে মুখোমুখি বিছানায় শুয়ে ফিস্‌ফিস্ করে গল্প করি। কি মাথামুণ্ডু গল্প করি তা জানি না। কোনও দিন গল্প করতে করতে রাত বারোটা বেজে যায়।

হাসপাতালে যখন কাজ করতে যাই, অনেক ছাত্র এবং ডাক্তারের সঙ্গে কাজ করতে হয়। তাছাড়া রোগী ত আছেই। রোগীরা বেশীর ভাগ গরীব বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কী অবস্থায় পড়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তাই ভেবে আমার বড় কষ্ট হত। ডাক্তারেরা বেশীর ভাগই তাড়াহুড়ো করে রোগী দেখে চলে যেতেন। ছাত্রেরা বেশ মন দিয়ে দেখত; কিন্তু তাদেরও ছিল নির্লিপ্ত ভাব। তারা যেন রোগটাকেই দেখত, রোগীকে দেখত না।

ছাত্রেরা ইউনিফর্ম-পরা নার্সদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে, কিন্তু নার্সদের যেন মানুষ বলে লক্ষ্য করে না। আমরা যেন কলের পুতুল। দু'একজন লক্ষ্য করে। তাদের চোখ ভোমরার মতন এক নার্সের মুখ থেকে আর-এক নার্সের মুখে ঘুরে বেড়ায়, মধুর সন্ধান করে। এরা যেন কলার ব্যাপারী, রথের মেলায় কলা বেচতে এসেছে। রথ দেখা কলা বেচা দুই কাজ একসঙ্গে করে।

একটি ছাত্র ছিল, তার নাম মন্মথ কর। পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, শুনেছিলুম ব্রিলিয়ান্ট্ ছেলে। লম্বা মানানসই গড়নের চেহারা, চট্‌পটে স্বভাব; অন্য ছেলের যে-কথা বুঝতে দশ মিনিট সময় লাগত, সে তা এক মিনিটে বুঝে নিত। তার চোখের দৃষ্টি ছিল আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে একটু হাসত।

আমার তখন যে বয়স সে-বয়সের মেয়েরা মনে মনে কল্পনার জাল বুনতে আরম্ভ করে। মন্মথ কর ভাল ছাত্র, তার চেহারা ভাল; সে আমার মতন একজন প্রোবেশনার নার্সের পানে চেয়ে মুখ টিপে হাসে কেন? আমার মন আমাকে তার পানে টানতে থাকে। তার ওপর চোখ পড়লে শরীরের রক্ত চনমন করে ওঠে; চোখ তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, আবার নিজের অজান্তেই তার দিকে ফিরে চায়। কিন্তু সবই চুপি-চুপি, মনে মনে। দরকারের কথা ছাড়া ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার হুকুম নেই; এমন কী তাদের পানে চেয়ে হাসলেও সেটা অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। একবার আমাদের দলের একটি মেয়ে একজন ছাত্রের সঙ্গে হেসে কথা বলেছিল, সিস্টার নীলিমাদিদি দেখতে পেয়েছিলেন। নীলিমাদিদি ভীষণ কড়াপ্রকৃতির স্ত্রীলোক। তখন মেয়েটিকে কিছু বললেন না, কিন্তু কাজ সারা হবার পর তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে যা বলেছিলেন তা আমরা পরে শুনে-ছিলুম। বলেছিলেন, 'ছাত্রদের মন ভোলাবার জন্যে তোমরা এখানে আসনি। ওসব বেহায়া-পনা চলবে না। মনে রেখো একথা যেন দ্বিতীয়বার বলতে না হয়।'

আমরা সবাই নীলিমাদিদিকে যমের মতন ভয় করতুম। তাঁর কাছে বকুনি খায়নি এমন মেয়ে ছিল না। একদিন আমিও বকুনি খেলুম।

হাসি মস্করা বেহায়াপনার জন্যে নয়, কাজে ভুল করেছিলুম। দোষ আমারই। কিন্তু নীলিমাদিদি এমন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলেন যে, মনে হয় তার চেয়ে দু' ঘা মারাও ভাল।

বকুনি খাবার পর হাসপাতালের পিছন দিকে নিরিবিলি একটা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলুম। চোখ ফেটে জল আসছিল। মন্মথ করের সামনে না বকলে কি চলত না? এমন সময় পিছনে শব্দ শুনে ফিরে দেখি—মন্মথ কর। আমার কাছে এসে দাঁড়াল, চট করে

একবার চারদিকে চেয়ে নিয়ে খাটো গলায় বলল, 'সিস্টার নীলিমাকে ধরে মার দিতে হয়।'

আমিও ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকালুম। কেউ যদি দেখে ফেলে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছি, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না; নীলিমাদিদি জানতে পারবেন, আবার আমার মুণ্ডুপাত হবে।

সে তেমনি খাটো গলায় বলল, 'আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। কত নার্স ত রয়েছে, আপনি তাদের মত নয়।' এই কথা বলতে বলতে তার উজ্জ্বল চোখ দুটি হেসে উঠল।

আমার মনের মধ্যে ভীষণ টানাটানি চলছে। একদিকে ইচ্ছে হচ্ছে পালিয়ে যাই, অন্যদিকে ইচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনি।

'আপনার নাম কী নার্স?'

'প্রিয়ংবদা'—এইটুকু বলে আমি ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলুম।

কিন্তু মনটা সারাদিন নেশায় টলমল করতে রইল। তখন জানতুম না সেটা কিসের নেশা। শরীর ,যখন যৌবনের ডাকে আস্তে আস্তে জেগে উঠতে থাকে তখন তার একটা নেশা থাকে, ঘুম ভাঙার নেশা। এসব তখন কিছুই জানতুম না। কীই বা জানতুম তখন! সে আজ আট-নয় বছর আগেকার কথা। কী ন্যাকা যে ছিলুম ভাবলে হাসি পায়।

তারপর থেকে যখনই ওর সঙ্গে দেখা হয়, ও মুখ টিপে হাসে, মনে হয় সে হাসিটা আরও ঘনিষ্ঠ, যেন ওর আর আমার মধ্যে একটা গোপন সম্বন্ধ হয়েছে। আড়ালে-আবডালে দেখা হয়ে গেলে চট করে দুটো কথা কয়ে নেয়—'কেমন আছেন?'...'দু'দিন দেখা পাইনি'—এই ধরনের কথা।

এই ভাবে দু-তিন মাস চলল। একদিন একটু বেশীক্ষণ কথা বলবার সুযোগ ঘটে গেল। দুপুরবেলা আমি দোতলার একটা ওয়ার্ডে কাজ সেরে বেরুচ্ছি, দেখি ও সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলুম।

'কাল ত আপনার বিকেলবেলা ছুটি?'

আমার গলা দিয়ে ধরা-ধরা আওয়াজ বেরুল, 'হ্যাঁ।'

'চলুন না, আমার সঙ্গে চা খাবেন।'

'অ্যাঁ—কোথায়?'

'কোন একটা সাহেবী হোটেলে। আমি চারটের সময় এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু—ছুটির দিনে আমি বাবাকে দেখতে যাই।'

'ও! আপনার বাবা বুঝি কলকাতাতেই থাকেন? তা বেশ ত। আমার সঙ্গে চা খেয়ে আপনি বাবার কাছে চলে যাবেন। ঘণ্টাখানেক দেরি যদি হয়ই তাতে ক্ষতি কী?'

আমি কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না। এতক্ষণে আমরা সিঁড়ির নীচে পৌঁছেছি। ও বলল, 'তাহলে ঠিক রইল। কাল চারটের সময় আমি আপনার হস্টেলের বাইরে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকব। কেমন?' মুখ টিপে হেসে সে চলে গেল।

সারাদিন ওই কথাই মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। আগে কখনও একজন পুরুষের সঙ্গে হোটেলে গিয়ে চা খাইনি। এই চা-খাওয়ার অনুষ্ঠানের মধ্যে কত অজানা অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে। ভয়-ভয় করছে, আবার সেই নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ পাবার জন্যে মনটা ছটফট করছে।

রাত্তিরে আলো নিভে যাবার পর শুক্লা এল আমার ঘরে। শুক্লার কাছে আমি কোন কথাই লুকোই না, কিন্তু কেন জানি না, এ-কথাটা তাকে বলতে পারলুম না, সঙ্কোচ হল, লজ্জা হল; এ যেন আমার একান্ত গোপনীয় কথা, কাউকে বলবার অধিকার নেই। চায়ের নেমন্তন্নর কথা মনে মনেই রাখলুম।

পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আজেবাজে গল্প হতে লাগল। নীলিমাদিদির মেজাজ

আজকাল এমন হয়েছে যে কাছে যেতে ভয় করে।...হার্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর লালমোহন সরকার কয়েক দিন হাসপাতালে আসেননি, তাঁর নিজেরই হার্ট অ্যাটাক্ হয়েছিল।...তুই মেটার্নিটি শিখবি?...না ভাই, তার চেয়ে চাইল্ড নার্সিং...আজ মেটার্নিটি ওয়ার্ডে কী মজা হয়েছিল জানিস?—

হঠাৎ শুক্লা বলল, 'হ্যাঁরে, মন্মথ কর তোর দিকে চেয়ে মুচকে হাসে কেন বল্ দেখি?'

কিছুক্ষণের জন্যে কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেলুম। শেষে বললুম, 'তুই দেখেছিস?'

শুক্লা বলল, 'দেখিনি আবার! আরও অনেকে হয়ত দেখেছে। কী ব্যাপার বল্।'

তখন আর উপায় রইল না, শুক্লাকে বললুম। চায়ের নেমন্তন্নর কথাও শোনালুম। শুনে শুক্লা বিছানায় উঠে বসল, চাপা গলায় তর্জন করে বলল, 'খবরদার প্রিয়া, ওর ফাঁদে পা দিসনি। সাংঘাতিক ছোঁড়া ওটা, যাকে বলে উল্ফ্—তাই।'

আমি বললুম, 'উল্ফ্! সে কাকে বলে? উল্ফ্ মানে ত নেক্ড়ে বাঘ!'

শুক্লা বলল, 'মানুষের মধ্যেও নেক্ড়ে বাঘ আছে। তারা কাঁচা বয়সের মেয়েদের ধরে ধরে খায়। মন্মথ কর হচ্ছে সেই নেক্ড়ে।'

বললুম, 'যাঃ! তুই ঠাট্টা করছিস। কী করে জানলি তুই?'

শুক্লা বলল, 'আমাকেও ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। লেখাপড়ায় যেমন ভাল ছেলে, বজ্জাতিবুদ্ধিতেও তেমনি পাকা। আমাকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসত, তারপর একদিন আড়ালে পেয়ে বলল, তোমাকে বড় ভাল লাগে। নার্স ত অনেক আছে, কিন্তু তুমি তাদের মত নও। কিছুদিন পরেই চায়ের নেমন্তন্ন।'

সবই মিলে যাচ্ছে। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল; তবু বললুম, 'ওর মতলব খারাপ তা বুঝলি কী করে?'

'নমিতা বলেছিল। নমিতাকে তুই দেখিসনি, তুই আসবার আগেই সে নার্স হয়ে বেরিয়ে গেছে। দেখতে ভাল ছিল, মনে ছিল প্রেমের খিদে। মন্মথ-নেক্ড়ে প্রায় তাকে মুখে পুরেছিল, নেহাৎ কপাল জোর তাই বেঁচে গেল।'

চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলুম, তারপর আবার শুয়ে পড়লুম। মনটা যেন আঁতকে উঠে অসাড় হয়ে গেছে। এত বড় ধাক্কা জীবনে খাইনি। মনে হল যেন ফুল-বাগানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা লতা-পাতায় মুখ ঢাকা কুঁয়োয় পড়ে যাচ্ছিলুম।

শুক্লাও আমার পাশে শুলো: 'কী ভাবছিস?'

বললুম, 'কিছু না। আচ্ছা শুক্লা, তোর কখনও কারুর সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে?'

এবার শুক্লা একটু চুপ করে রইল, শেষে বলল, 'কী জানি! ভালবাসা কাকে বলে?'

ভালবাসা কাকে বলে! কথাটা কখনও ভেবে দেখিনি। গল্পে উপন্যাসে পড়েছি, দুটি মানুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হল, দু'জনের দু'জনকে ভাল লাগল। এই কি ভালবাসা? না, আর কিছু আছে?

বললুম, 'তুই বল না ভালবাসা কাকে বলে।'

সে আস্তে আস্তে বলল, 'জানিনে ভাই। ভালবাসার কতখানি চোখের নেশা কতখানি মনের মিল, কতটা স্বার্থপরতা কতটা আত্মদান, বুঝতে পারি না। যাঁরা বড় বড় প্রেমের গল্প লেখেন, কবিতা লেখেন, তাঁরাও জানেন কি না সন্দেহ। হয়ত আগাগোড়াই জৈব বৃত্তি।'

শুক্লা বিছানা থেকে নামবার উপক্রম করল: 'যাই ভাই, অনেক রাত হয়ে গেছে। ঘুম পাচ্ছে।'

আমি তার আঁচল টেনে বললুম, 'কাউকে ভালবাসিস কি না বললি না ত।'

সে বলল, 'ভালবাসা কী তাই জানি না। কি করে বলব?'

বললুম, 'তাহলে আছে কেউ একজন! কে রে শুক্লা?'

সে একটু থেমে বলল, 'আজ নয়, আর-একদিন বলব। তুই নেক্ড়ে বাঘের সঙ্গে চা

খেতে যাবি না ত?'

'না, যাব না। কিন্তু গেলেই বা কী ক্ষতি হত? আমার মন যদি শক্ত থাকে, ও কী করতে পারে?'

'তুই বুঝিস না। চড়ুই পাখি ভাবে, আমি উড়তে পারি, অজগর উড়তে পারে না, ও আমার কী করতে পারে? তারপর যখন অজগরের সম্মোহন দৃষ্টির সামনে পড়ে যায় তখন আর নড়তে পারে না।—আচ্ছা এবার ঘুমো, নইলে সকালে উঠতে পারবি না।'

শুক্লা নিঃশব্দে চলে গেল। আমি একলা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম—নেক্‌ড়ে বাঘ ...অজগর সাপ...সংসারে কত ভয়ঙ্কর জন্তুই না আছে! ভাবলে ভয় করে।

পরদিন থেকে মন্মথ করের সঙ্গে আর চোখাচোখি হয়নি। সে আসছে দেখলেই মনে হত—নেক্‌ড়ে বাঘ! অজগর সাপ। শুক্লা এমন ভয় আমার মনে ঢুকিয়ে গিয়েছিল, সে-ভয় আজ পর্যন্ত যায়নি। কোন পুরুষ হেসে কথা কইলেই মনে প্রশ্ন জাগে—অজগর, না নেক্‌ড়ে বাঘ?

শুক্লা কিন্তু একজনকে ভালবেসেছিল। অনেকদিন আমাকে তার নাম বলেনি। যেদিন বলল, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

দুটো বছর কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল। প্রতি হপ্তায় বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি; কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার মনের যে পরিবর্তন হচ্ছে তা বুঝতে পারিনি। প্রথম প্রথম মন পড়ে থাকত বাড়ির দিকে; এক হপ্তা পরে বাবাকে দেখব এই আশায় মন উৎসুক হয়ে থাকত। কিন্তু ক্রমে বাড়ির দিকে টান কমে যেতে লাগল, হস্টেল এবং হাসপাতালের পরিবেশ আমার মনকে টেনে নিল। তখন হপ্তায় হপ্তায় বাড়ি যাওয়া একটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল! বাবার শরীর যে ক্রমে আরও খারাপ হচ্ছে তা লক্ষ্য করেছিলুম কি? করেছিলুম বই কি। কিন্তু মনে কোন আশঙ্কা জাগেনি। বাবা কি বুঝতে পেরেছিলেন, আমার মন তাঁকে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে? হয়ত বুঝেছিলেন, হয়ত মনে দুঃখ পেয়েছিলেন; কিন্তু কোনদিন একটি কথাও বলেননি। আজ সে-কথা ভেবে চোখে জল আসে; তিনি ত আমার জন্যেই বেঁচে ছিলেন, আমি কেন আমার সমস্ত মন তাঁকে দিতে পারলুম না? কেন আমার মন অবশে তাঁর কাছ থেকে সরে গেল? আমার মন তখন বড় হাল্কা ছিল, শ্যাওলার মতন জলের ওপর ভেসে বেড়াত। হয়ত সব ছেলে মেয়েরই ও-বয়সে অমন হয়, জীবনে নিত্য-নতুনের আবির্ভাব পুরনোকে ভুলিয়ে দেয়।

শুক্লার তিন বছরের কোর্স শেষ হল, সে পাস করে ডিপ্লোমা পেল। ইচ্ছে করলেই সে স্টাফ নার্স হয়ে থাকতে পারত। কিন্তু সে থাকল না। স্বাধীনভাবে প্র্যাক্‌টিস করবে। আমার তখনও এক বছর বাকী। শুক্লা চলে গেলে আমার এই এক বছর কী করে কাটবে?

যেদিন শুক্লা হস্টেল ছেড়ে চলে গেল তার আগের রাত্রে আমি তার ঘরে গেলুম। তার গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলুম। সেও একটু কাঁদল, তারপর চোখ মুছে বলল, 'ভাবিসনি। এক বছর কাটুক না, তোকেও টেনে নিয়ে যাব। তোকে ছেড়ে আমি একলা থাকব ভেবেছিস!'

সে-রাত্রে কথায় কথায় শুক্লা তার মনের অন্তরতম কথাটি বলল, ডক্টর নিরঞ্জন দাসের কথা। স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। আমি ভেবেছিলুম ছাত্রদের কারুর সঙ্গে শুক্লার ভালবাসা হয়েছে; ডক্টর দাসের কথা একবারও মনে আসেনি।

ডক্টর নিরঞ্জন দাস ছিলেন আমাদের 'গাইনকোলজি'র প্রফেসর। হপ্তায় একদিন আমাদের পড়াতেন, তাছাড়া নিয়মিত হাসপাতালে আসতেন। নামজাদা ডাক্তার, বিপুল প্র্যাক্‌টিস। বয়স বোধ হয় চল্লিশের আশেপাশে কিন্তু দেখলে মনে হত ত্রিশের বেশী নয়। চেহারাতে যেমন ছেলেমানুষি ছিল, স্বভাবেও তেমনই; সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ-তামাশা করতেন। তবু মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি তাঁর চোখের মধ্যে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি লুকিয়ে আছে! তখন তাঁকে বড় ক্লান্ত নিষ্প্রাণ দেখাত।

আমরা সবাই নির্বিচারে তাঁকে ভালবাসতুম। সবাই ভালবাসতুম বলেই বোধ হয় শুক্লার ভালবাসা চোখে পড়ত না। যাকে সবাই ভালবাসে তাকে যে একজন বিশেষভাবে ভালবাসতে পারে একথা কারুর মনে আসে না।

ডক্টর দাস বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী জীবিতা। এইটেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

তাঁর কথা বলতে বলতে শুক্লার গলা ভারী হয়ে বুজে এল, সে ঘন ঘন আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

পঁচিশ বছর বয়সে ডক্টর দাস বিয়ে করেছিলেন। সুন্দরী বউ, বড় ঘরের মেয়ে। কিছুদিন ঘর করবার পর বউয়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। অত্যন্ত মুখরা সে, কথায় কথায় অন্যের ছলছুতো ধরা তার অভ্যেস. ঝগড়ার একটা সুযোগ পেলে আর রক্ষে নেই, চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করবে। সবচেয়ে মারাত্মক তার হিংসে। স্বামীর প্রতি কিছুমাত্র স্নেহ নেই, কিন্তু নিজের অধিকার-বোধ আছে ষোল আনা। স্বামী যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে হেসে কথা বলেন অমনি তেলে-বেগুনে জ্বলে যায়, দশজনের সামনে কেলেঙ্কারি-কাণ্ড বাধিয়ে বসে। স্বামী গাইনকোলজিস্ট. স্ত্রী-রোগের চিকিৎসা করেন, এটা তাঁর চরিত্রহীনতার লক্ষণ, এই নিয়ে অষ্টপ্রহর খিটিমিটি চেঁচামেচি।

ডক্টর দাসের সংসারে ছিলেন তাঁর বিধবা মা; আর এক পুরনো ঝি, যে তাঁকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। বউয়ের রকমসকম দেখে ঝি প্রথমে গেল. তারপর মা কাশীবাস করতে গেলেন। সংসারে রইলেন ডক্টর দাস আর তাঁর খাণ্ডার বউ।

ডক্টর দাসের অসীম ধৈর্য। তিনি যদি কড়াপ্রকৃতির মানুষ হতেন তাহলে বোধ হয় তাঁর এত দুর্দশা হত না। কিন্তু তিনি শান্তশিষ্ট মানুষ। ক্রমে ক্রমে স্ত্রীর অত্যাচার যত বাড়তে লাগল ডক্টর দাসের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ততই কমে আসতে লাগল। সারাদিন নিজের ডিস্পেন্সারিতে থাকতেন, কাজকর্ম করতেন, কেবল রাত্রে বাড়িতে শুতে যেতেন। তাও বাড়ির আবহাওয়া যখন বেশী গরম থাকত তখন ডিস্পেন্সারিতেই রাত কাটাতেন, বাড়ি যেতেন না। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে! তিনি বাড়ি না গেলে স্ত্রী ডিস্পেন্সারিতে এসে হাঙ্গামা বাধাতেন; কম্পাউণ্ডারদের নানারকম বিশ্রী প্রশ্ন করতেন; কেলেঙ্কারির একশেষ হত। ডক্টর দাসের সহকর্মীদের মধ্যে এই নিয়ে হাসাহাসি চলত। তবে একটা উপকার হয়েছিল। সারাক্ষণ ডিস্পেন্সারিতে থাকার জন্য ডক্টর দাসের প্র্যাকটিস্ খুব শিগ্‌গির জমে উঠেছিল। স্ত্রীরোগের চিকিৎসক বলে তাঁর নামডাক শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিল।

ডক্টর নিরঞ্জন দাসের বিবাহিত জীবনের প্রথম বারো-তেরো বছর এইভাবে কেটেছিল। রুগী হাসপাতাল লেকচার-রুম ডিস্পেন্সারি; ঘর-সংসার কেবল নামে। তপস্বীর জীবন।

শুক্লা যখন প্রথম প্রোবেশনার হয়ে এসেছিল তখন সেও অন্য সকলের মতন ডক্টর দাসের মধুর স্বভাবের কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু শুক্লার মনটা বড় মরমী, দু-চার দিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে, বাইরে ডক্টর দাস যতই হাসি-তামাশা নিয়ে থাকুন, অন্তরে তিনি বড় দুঃখী। শুক্লার সমস্ত মন তাঁর দিকে ঢলে পড়ল।

কিন্তু শুক্লার সবই মনে মনে। বাইরে কেউ কিছু বুঝতে পারল না. এমন কী ডক্টর দাসও না।

কিছুদিন পরে একটি ব্যাপার ঘটল।

পুরুষমানুষ মনের মতন কাজ পেলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়। ডক্টর দাসকে সামলাবার কেউ নেই। দিনরাত খেটে খেটে আর নাওয়া-খাওয়ার অনিয়ম করে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল; একদিন লেকচার দিতে দিতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অন্য ডাক্তারেরা তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন. রোগ কিছু নেই. কিন্তু ক্লান্তি আর অবসাদে জীবনীশক্তি কমে গিয়েছে; কিছুদিন হাসপাতালের কড়া নিয়মে থাকা দরকার। হাসপাতালের প্রাইভেট ওয়ার্ডে একটি কেবিনে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। একজন ডাক্তার-বন্ধু

বললেন, 'তোমার বাড়িতে খবর পাঠাব?' তিনি ম্লান হেসে বললেন, 'পাঠাও।'

ডক্টর দাসের সেবা করবার জন্যে নার্সদের মধ্যে কাড়াকাড়ি। যারা তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছে তারা ত আছেই, যারা হয়নি তারাও ছুটি পেলে তাঁকে এসে দেখে যায়। ডাক্তারেরা তাঁর ঘরে উঁকি না-মেরে কেউ চলে যান না।

ডক্টর দাসের পরিচর্যার জন্যে যারা নিযুক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে শুক্লা একজন। দুপুরবেলা তার পালা। তাঁকে ঠিক সময়ে খাওয়ানো, টনিক দেওয়া, খবরের কাগজ পড়ে শোনানো, গল্প করা, এই সব তার কাজ। দুপুরবেলা হাসপাতাল কিছুক্ষণের জন্যে ঝিমিয়ে পড়ে; তখন ডক্টর দাস বিছানায় বসেন, শুক্লাকে নানান প্রশ্ন করেন: তোমার বাড়িতে কে কে আছে?...কেউ নেই. মা বাবা মারা গেছেন।...কেউ নেই? তোমার খরচ জোগায় কে?...বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তাছাড়া যা হাতখরচ পাই তাতেই চলে যায়। প্রোবেশনার নার্সের আর খরচ কী? এবার শুয়ে থাকুন, খাবার পর একটু বিশ্রাম করতে হয়। আপনারাই বলেন।

তিন-চার দিন যেতে না-যেতেই দুজনের মনে এক নতুন উপলব্ধি জেগে উঠল। এতদিন ডক্টর দাসের কাছে শুক্লা ছিল একশো মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে; এখন সে বিশিষ্ট একটি মেয়ে, এখন সে শুক্লা। মরমী শুক্লা, দরদী শুক্লা, শুধু নার্স নয়। শুক্লার মন আগে থেকেই উন্মুখ হয়েছিল, এখন ডক্টর দাসের মন তার কাছে এসে দাঁড়াল। যেন মনের সঙ্গে মনের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল। বন্ধনহীন গ্রন্থি।

ডক্টর দাসের শরীর বেশ তাড়াতাড়ি সেরে উঠলে লাগল; কিন্তু শরীর সারবার সঙ্গে সঙ্গে মনও বিষণ্ণ হতে লাগল। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়েছেন, কিন্তু একবারও দেখতে আসেননি। দিন ছয়-সাত কেটে যাবার পর একদিন দুপুরবেলা ডক্টর দাস শুক্লার হাত ধরে করুণ হেসে বললেন, 'শুক্লা, তুমি জান না, আমার জীবন একটা মস্ত ট্র্যাজেডি।'

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শুক্লার বুক কান্নায় ভরে উঠল, সে বলল, 'জানি। কিন্তু কী নিয়ে ট্র্যাজেডি তা জানি না।'

ডক্টর দাস শুক্লার হাত ধরে খাটের পাশে বসালেন। নিজে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আস্তে আস্তে নিজের দাম্পত্যজীবনের কাহিনী বললেন।

তারপরই বিচ্ছিরি কাণ্ড।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, হঠাৎ যেন ঝড়ের ধাক্কায় খুলে গেল। দুদ্দাড় শব্দে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর দাসের স্ত্রী। রণচণ্ডী মূর্তি। মুখ দিয়ে যে-সব কথা বেরুচ্ছে তা ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে বেরোয় না, অন্তত বেরুনো উচিত নয়। মুহূর্তে মধ্যে দোরের কাছে লোক জমে গেল; ডোম মেথর ঝাড়ুদারনী, সবাই ছুটে এসে দোরের কাছে ভিড় করে দাঁড়াল।

শুক্লা থ হয়ে গিয়েছিল; তারপর রাগে তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। সে উঠে গিয়ে দোরের কাছে দাঁড়াল, আঙুল দেখিয়ে বলল, 'বেরিয়ে যান এখান থেকে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান। এটা রুগীর ঘর, মেছোহাটা নয়।'

মিসেস দাস চোখ রাঙিয়ে অসভ্য অশ্লীল কথা বলতে আরম্ভ করলেন। শুক্লা তখন একজন মেথরকে ডেকে বলল, 'রামদীন, এঁকে বাইরে নিয়ে যাও।'

রামদীন ঝাড়ু হাতে এগিয়ে এল। মিসেস দাস তখন বেগতিক দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডক্টর দাস এতক্ষণ চোখ বুজে বিছানায় বসে ছিলেন, এবার চোখ খুলে শুক্লার দিকে তাকালেন। তাঁর চাউনির মানে—দেখলে ত আমার স্ত্রীকে!

কয়েকদিন পরে ডক্টর দাস সেরে উঠে আবার কাজকর্ম আরম্ভ করলেন। শুক্লার সঙ্গে তাঁর একটি নিভৃত সম্পর্কের সূত্রপাত হল। কিন্তু তাদের চোখে চোখে কখন কী কথা হত, কখন নির্জনে দেখা হত, কেউ জানতে পারল না।

আজ হস্টেলে শুক্লার শেষ রাত্রি। কাল সে চলে যাবে। ডক্টর দাস তার জন্যে সমস্ত

ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ভাল পাড়ায় একটি ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়েছে। শুক্লা সেইখানে থাকবে, আর স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস্ করবে। ডক্টর দাসের অগাধ পসার, অগাধ প্রভাব, শুক্লাকে একদিনও বসে থাকতে হবে না।

রাত্রি বারোটা বোধ হয় বেজে গেছে। পাশাপাশি শুয়ে ভাবছি, ভালবাসার স্বরূপ কী রকম? যে ভালবেসেছে সে মনে মনে কী ভাবে? ডক্টর দাস শুক্লার চেয়ে বয়সে অনেক বড়; ভালবাসা কি বয়সের বিচার করে না? তবে কিসের বিচার করে? কী চায়? কী পায়?

একটা কথা মনে এল। শুক্লাকে জিগ্যেস করলুম, 'ডক্টর দাস তোকে বিয়ে করবেন ত?'

শুক্লা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'উনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, আমি রাজী হইনি।'

'তুই রাজী হোসনি!'

'না। এক বউ থাকতে আবার বিয়ে করলে ওঁর বদনাম হত, প্র্যাকটিসের ক্ষতি হত। বিয়ের দরকার কী ভাই! ভালবাসাই ত বিয়ে।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু নেই প্রিয়া। যদি কোন দিন সত্যিসত্যি ভালবাসিস, বুঝবি ওতে কিন্তু নেই।'

'নিজের কথা ভাবলি না?'

'ভেবেছি। এই ত আমার গর্ব। আমি যা পেয়েছি তা কটা মেয়ে পায়?'

'কী পেয়েছিস?'

'ভালবাসা। একটি মানুষের মন।'

পরদিন শুক্লা চলে গেল। কয়েকদিন পরে আমি চুপিচুপি তার বাসা দেখতে গেলুম। কী সুন্দর বাসাটি! দোতলায় বড় বড় তিনটি ঘর, সামনে বারান্দা। একটি ঘর আফিসের মতন সাজানো, টেলিফোন আছে, দ্বিতীয় ঘরটি শুক্লার শোবার ঘর; তৃতীয় ঘরটি এক-রকম খালিই পড়ে আছে, আমি এসে থাকব। শুক্লা জিগ্যেস করল, 'কেমন?'

আমি তার গলা জড়িয়ে বললুম, 'আমার আর তর্ সইছে না, ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি চলে আসি।'

শুক্লা বলল, 'আমিও পথ চেয়ে আছি। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

দুজনে বিছানার পাশে বসলুম, প্রশ্ন করলুম, 'ডক্টর দাস আসেন?'

শুক্লার মুখখানি নববধূর মতন টুকটুকে হয়ে উঠল; সে ঘাড় নেড়ে একটু হাসল। বললুম, 'কেমন লাগছে?'

তার চোখ দুটি স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল; আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়!'

শুক্লা গান গাইতে পারে। তখন পর্যন্ত জানতুম না, তারপর অনেকবার শুনেছি। ভারি মিষ্টি গলা।

সেদিন চলে এলুম। তারপর সুবিধে পেলেই গিয়েছি। শুক্লা বলেছিল একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তা গেল বটে, কিন্তু আমার অতীতকে একেবারে নির্মূল করে দিয়ে গেল। বছর শেষ না-হতেই বাবা মারা গেলেন।

বাবার মৃত্যু বড় আশ্চর্য। যেন আমার ডিপ্লোমা পাবার অপেক্ষায় তিনি বেঁচে ছিলেন। যেদিন ডিপ্লোমা পেলুম তার দু'দিন পরে তিনি হার্ট ফেল করে মারা গেলেন। শরীর ভিতরে ভিতরে জীর্ণ হয়ে পড়েছিল, কেবল মনের জোরে বেঁচে ছিলেন।

বাবার কথা ভাবি। বাপ নিজের ছেলে মেয়েকে যত ভালবাসে, ছেলেমেয়েরা বাপকে তত ভালবাসতে পারে না কেন? প্রকৃতির নিয়ম! এ রকম নিয়মের মানে কী? স্নেহ শুধু নিম্নগামী না হয়ে ঊর্ধ্বগামী হলে কী দোষ হত? বুঝতে পারি না।...আমি যদি শৈশবে পিতৃহীন হতুম তাহলে কি ভাল হত? কিংবা বাবা যদি আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে ভাল হত? বুঝতে পারি না। মৃত্যুকালে তাঁর হাতে মাত্র সাতশো টাকা ছিল; বেশীদিন বেঁচে থাকলে হয়ত অর্থকষ্টে পড়তেন। আমি রোজগার করে তাঁকে

খাওয়াব সে-ভাগ্য কি করেছি? মেয়ে খালি নিতেই পারে, দিতে পারে না।

শুক্লার বাসায় এসে উঠলুম। এই বাসা। এখানে পাঁচ বছর কেটেছে। একটা ঘরে শুক্লা থাকে, একটা ঘরে আমি; অফিস-ঘরটা ভাগের। একটি ছোট্ট রান্নাঘর আছে, তাতে যার যেদিন ছুটি সে রান্না করে, দুজনে মিলে খাই। যেদিন দু'জনেরই কাজ থাকে সেদিন সামনের হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খাই। একটা শুকো ঝি দিনের বেলা কাজ করে দিয়ে যায়। কী সুখে আছি আমরা তা বলতে পারি না। এই ছোট্ট বাসাটি আমাদের স্বর্গ।

কাজের দিক দিয়েও সুবিধে হল। আগে শুক্লা একলা সব কাজ সামলাতে পারত না, এখন দু'জনে মিলে সামলে নিই।

ডক্টর দাস মাঝে মাঝে আসেন। রোজ আসেন না, হপ্তায় একদিন কি দু'দিন। একটু রাত করে আসেন। আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন; রাত শেষ হবার আগেই চলে যান। নিজের জন্যে তাঁর ভাবনা নেই, কিন্তু পাছে শুক্লার বদনাম হয় তাই সতর্কভাবে যাওয়া-আসা করেন। তাঁর স্ত্রী জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।

আমার সঙ্গে এ বাসায় যেদিন তাঁর প্রথম দেখা হল তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'প্রিয়ংবদা, তুমি এসেছ খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু দেখো, শুক্লার মত কেলেঙ্কারি করো না, যাকে ভালবাসবে তাকে বিয়ে করো।'

আমি ও-কথার উত্তর না দিয়ে বললুম, 'আমি কিন্তু আপনাকে জামাইবাবু বলে ডাকব।'

তিনি আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আর আমি তোমাকে কী বলে ডাকব? —প্রিয়া?'

'আপনার প্রিয়া ত ওই'—এই বলে আমি শুক্লাকে দেখালুম। শুক্লা পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিল।

তিনি বললেন, 'তাহলে তোমাকে সখী বলব। তুমি যেমন শুক্লার সখী তেমনি আমারও সখী।'

সেই থেকে তিনি আমাকে 'সখী' বলে ডাকেন।

পুরনো কথা লিখতে লিখতে অনেক পথে-বিপথে ঘুরে বেড়ালুম, এবার ফিরে আসি। আজ আমার জন্মদিন। বাইরে অবিশ্রাম ধারাবর্ষণ চলেছে। লিখতে লিখতে মন বসে গিয়েছিল, এদিকে রাত্রি এগারোটা। শুক্লা আটটা বাজতে-না-বাজতেই বেরিয়েছে, তার আজ সমস্ত রাত কাজ; সেই ভোরবেলা ফিরবে। বাসায় আমি একা।

শুক্লা আজ আমার জন্মদিনে একটি চমৎকার জিনিস উপহার দিয়েছে। একটি আয়না, চার ফুট লম্বা, আড়াই ফুট চওড়া। দু'জনে মিলে আমার শোবার ঘরে টাঙিয়েছি, তার মাথায় ইলেকট্রিক বাল্ব, নীচে আমার কাপড়চোপড় রাখার ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের মাথায় প্রসাধনের তেল ক্রীম স্নো'র শিশি সাজিয়েছি। কী সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘরের শ্রী ফিরে গেছে।

ডক্টর দাস পাঠিয়েছেন প্রকাণ্ড একটি কেক। আমরা আজ এ-বেলা রান্না করিনি, কেক খেয়েই পেট ভরিয়েছি। আজ ডক্টর দাস আসবেন না, তিনি জানেন শুক্লা কাজে বেরিয়েছে। কাল বোধ হয় আসবেন। তখন তাঁকে আমার জন্মদিনের কেক খাওয়াব।

শুক্লা বেরিয়ে যাবার পর আমি ডায়েরি লিখতে বসেছি। এখন এগারোটা বেজে গেছে। অনেক রাত হল—

কিড়িং কিড়িং—। পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। এত রাত্রে কার দরকার হল!

১৮ই শ্রাবণ।

কাল রাত্তিরে সে কী কাণ্ড!

অফিস-ঘরে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলুম, নিজের টেলিফোন নম্বর দিয়ে বললুম, 'কাকে চাই?'

হেঁড়ে গলায় উত্তর এল, 'প্রিয়দম্বা ভৌমিককে চাই।'

রাগে গা জ্বলে গেল। কি রকম অসভ্য! আমার নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে জানে না। বললুম, 'প্রিয়দম্বা নয়, প্রিয়ংবদা। আমিই মিস্ ভৌমিক। কী চাই বলুন?"

হেঁড়ে গলা বলল, 'আমার বাচ্চা মেয়ের ভয়ানক অসুখ, তাকে রাত জেগে দেখা-শোনা করবার কেউ নেই। আপনাকে আসতে হবে।'

রাত দুপুরে ডাক আসা আমাদের পক্ষে কিছু নতুন নয়। কিন্তু আজ মনটা কেমন বেঁকে বসল। তবু এক কথায় যাব না বলা চলে না। বললুম, 'আপনি কে? কোথা থেকে বলছেন?'

'আমি শঙ্খনাথ ঘোষ। ১১৭ বেলেঘাটা নিউ অ্যাভিনিউ থেকে বলছি।'

'রাত্তিরে কাজ করলে আমার ফী পঞ্চাশ টাকা।'

'দেব পঞ্চাশ টাকা।'

'কিন্তু এই বৃষ্টিতে যাব কী করে? এত রাত্রে ট্যাক্সিও পাওয়া যাবে না।'

'আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসুন।'

গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্য লোক। আমি যেতে পারব কি না, বাড়িতে আছি কি না, না-জেনেই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে! কিন্তু এখন আর এড়াবার উপায় নেই। টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে গেলুম।

শোবার ঘরে নার্সের ইউনিফর্ম পরতে পরতে ভীষণ রাগ হতে লাগল। বড়মানুষ নিয়েই আমাদের কাজ; যারা গরিব তারা ত আর রোগীর সেবার জন্য নার্স ডাকতে পারে না, নিজেরাই যতটুকু পারে সেবা-শুশ্রূষা করে। কিন্তু এই বড়মানুষগুলো যেন কী রকম, ওদের চালচলন ভাবভঙ্গী সব আলাদা; দু'চক্ষে দেখতে পারি না। যাঁরা বনেদী বড়মানুষ তাঁরা ভদ্র ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু মুরুব্বীয়ানায় অনুগ্রহের ভাব; টাকাকড়ি সম্বন্ধে ভারি চালাক, এ'দের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা আদায় করা কঠিন কাজ। আর যাঁরা ভুঁইফোড় বড়মানুষ তাঁরা দু'হাতে টাকা ছড়াতে ভালবাসেন, কিন্তু ব্যবহার একেবারে চাষার মতন। মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জানেন না; ভাবেন টাকা দিলেই যথেষ্ট, ভদ্রতার দরকার নেই। এই শঙ্খনাথ ঘোষটি বোধ হয় ভুঁইফোঁড় বড়মানুষ। প্রিয়দম্বা! কী কথার ছিরি! লেখাপড়া শিখেছেন বোধ হয় পাঠশালা পর্যন্ত। অথচ টাকা আছে।

ভোঁ ভোঁ। রাস্তায় দোরের সামনে মোটর-হর্নের আওয়াজ শুনে বুঝলুম মোটর এসেছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সদর-দরজায় তালা লাগিয়ে বেরুতে হল, বাসায় কেউ থাকবে না। শুক্লার কাছে আলাদা চাবি আছে, সে যদি আমার আগে ফেরে কোন অসুবিধে হবে না।

নীচে নেমে দেখলুম প্রকাণ্ড জাহাজের মতন একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল, আমি টুক করে গাড়িতে উঠে পড়লুম; তবু মাথা মুখ বৃষ্টিতে ভিজে গেল। বাবা, কী বৃষ্টি! আমার জন্মদিন বেশ জানান্ দিচ্ছে।

গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে ড্রাইভার জিগ্যেস করল, 'আপনি মিস্ ভৌমিক?'

'হ্যাঁ।'

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। ঝাপ্সা নির্জন রাস্তা দিয়ে কোথায় চলেছি বোঝা যায় না। যেন স্বপ্নের মধ্যে কোন্ এক রহস্যময় অভিযানে চলেছি, জেগে উঠে দেখব ডায়েরি লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

পাঁচ মিনিট পরে গাড়ি লোহার ফটক পার হয়ে ছাদ-ঢাকা গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একজন ফিটফাট উর্দিপরা চাকর বেরিয়ে এল, গাড়ির দোর খুলে বলল, 'আসুন মিস্।'

আমি নামলুম। চাকরটা ড্রাইভারকে ফিসফিস করে কী বলল, তারপর তাড়াতাড়ি

ফিরে এসে বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন, দোতলায় যেতে হবে।' ড্রাইভার মোটর ঘুরিয়ে আবার বেরিয়ে গেল।

আমি চাকরের সঙ্গে যেতে যেতে নীচের তলার কয়েকটা ঘর দেখতে পেলুম; সব ঘরেই উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। একটা ঘর ড্রয়িং-রুমের মতন সাজানো। কিন্তু কোথাও লোকজন নেই। বাড়িটা চমৎকার, ঝকঝকে নতুন। মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ভাবলুম, ভুঁইফোঁড় বড়মানুষই বটে; বোধ হয় যুদ্ধের বাজারে ধান-চালের ব্যবসা করে লাখপতি।

ওপরতলাটা আলোয় আলো, যেন বিয়ে-বাড়ি। কিন্তু মানুষ নেই। চাকর আমাকে নিয়ে একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড ঘর, নার্শারির মতন সাজানো; শিশুর ছোট্ট খাট, দোলনা; নানা রকম ছোট-বড় খেলনা ঘরের চারিধারে ছড়ানো রয়েছে। দুটো বড় বড় বাল্‌ব জ্বলছে। একটি ঘাগরা-পরা ঝি-জাতীয় স্ত্রীলোক দোরের পাশে উবু হয়ে বসে আছে। আর, একজন পুরুষ একটি শিশুকে বুকে নিয়ে পায়চারি করছেন।

চাকর দরজার কাছ থেকে নিচু গলায় বলল, 'বাবু, নার্স এসেছেন।'

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। ঘন ভুরুর নীচে থেকে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইল। তারপর চোখ দুটো আমার মুখ থেকে নেমে দোরের পাশে ঝিয়ের ওপর পড়ল। 'কলাবতী!' ঝি তখনই উঠে গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াল—'খুকিকে শুইয়ে দাও। দেখো, ওর ঘুম না ভেঙে যায়।'

ঝি অতি সন্তর্পণে শিশুকে কোলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল; শিশু একটু উসখুস করল, কিন্তু জাগল না। তখন ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। তামাটে ফরসা রঙ, দোহারা গড়ন, কিন্তু ভুঁড়ি নেই; মুখখানা যেন পেটাই-করা লোহা দিয়ে তৈরি। একটু রুক্ষ-রুক্ষ ভাব। মেয়েকে নিশ্চয় খুব ভালবাসেন, নিজেই তাকে বুকে করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু ওঁর স্ত্রী কোথায়? তবে কি বিপত্নীক?

লোকটির প্রতি মনে একটু সহানুভূতি জাগতে শুরু করেছিল, কথা শুনে সহানুভূতি উবে গেল। যেন বেশ আশ্চর্য হয়েছেন এমনিভাবে বললেন, 'তুমি নার্স? প্রিয়দম্বা ভৌমিক?'

অপরিচিত মহিলাকে আপনি বলতে হয় তাও ইনি জানেন না। তার ওপর প্রিয়দম্বা! দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, 'প্রিয়দম্বা নয়—প্রিয়ংবদা।'

তিনি বললেন, 'ও একই কথা। তুমি নার্স। রুগীর সেবা করতে জান?'

'ডিপ্লোমা দেখবেন?'

'দরকার নেই। ডাক্তার যখন রেকমেন্ড করেছে তখন জান নিশ্চয়। আমার ধারণা ছিল নার্সদের বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশ হয়।—সে যাক, আমার মেয়ের বড় অসুখ, রাত্তিরে তার দেখাশোনা করবার লোক নেই। যতদিন দরকার তোমাকেই রাত্তিরে থাকতে হবে।'

প্রশ্ন করলুম, 'রোগটা কী?'

'মেনিঞ্জাইটিস্।'

'কোন ডাক্তার দেখছেন?'

'দেখেছে অনেক ডাক্তারই। চার্জে আছে আমার ফ্যামিলি ডাক্তার। সে আজ রাত্রি দশটা পর্যন্ত এখানে ছিল। এস, তাকে ফোন করতে হবে। সে তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি পাশের ঘরে গেলেন, আমি সঙ্গে গেলুম। এ ঘরে টেলিফোন আছে; তিনি টেলিফোন তুলে নিয়ে নম্বর ডায়েল করলেন, বললেন, 'হ্যালো ডাক্তার, নার্স এসেছে, তাকে কী বলতে চান বলুন।' এই বলে টেলিফোন আমার হাতে দিলেন।

ডাক্তারের কথা শুনলুম। রোগ এখন পড়তির দিকে; ভয়ের অবস্থা কেটে গেছে। তবে নজর রাখতে হবে। কী কী করতে হবে আমাকে জানালেন, তারপর স্নিগ্ধস্বরে বললেন,

'কাল সকালে দেখা হবে। গুড্ নাইট্ নার্স।'

'গুড্ নাইট্ ডক্টর।'

ডাক্তারের নাম জানতে পারলুম না, টেলিফোনে গলা শুনেও চেনা গেল না। বোধ হয় জামাইবাবুর কোন বন্ধু; নইলে আমাকে রেকমেণ্ড করবেন কেন!

পাশের ঘরে ফিরে গিয়ে রুগীর চার্জ নিলুম। রাত্রি তখন ঠিক বারোটা। শঙ্খনাথবাবুকে বললুম, 'আপনার আর এখানে থাকবার দরকার নেই। তবে বাচ্চার মা যদি মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতে চান ত দেখে যেতে পারেন।' বাচ্চার মা সম্বন্ধে মনে একটু কৌতূহল হয়েছিল।

শঙ্খনাথবাবুর মুখের চেহারা বদলে গেল, গলার আওয়াজ কর্কশ হয়ে উঠল। তাঁর গলা স্বভাবতই মোটা, তার সঙ্গে রাগ মিশে গলার আওয়াজ বাঘের চাপা গর্জনের মতন শোনাল। তিনি বললেন, 'ওর মা! সে ত নাচতে গিয়েছে।'

আমি ভুরু তুলে চেয়ে রইলুম। তিনি বললেন, 'নাচ জান না? একজন পুরুষকে জাপটে ধরে ধেই-ধেই নাচ। আজ বিলিতী হোটেলে পার্টি আছে, আমার বউ না-গিয়ে থাকতে পারে? মেয়ের অসুখ, তাতে কী? নাচবার এত বড় সুযোগ কি ছাড়া যায়?'

আমি লজ্জিত হয়ে পড়লুম। ঘরের কেচ্ছা যে শঙ্খনাথবাবু একজন অপরিচিতার কাছে এত সহজে প্রকাশ করবেন তা আশা করিনি। খুব রাগ হয়েছে বলেই বোধ হয় মনের কথা চেপে রাখতে পারেননি। কুণ্ঠিত হয়ে বললুম, 'তিনি নিশ্চয় এখনি ফিরবেন।'

'বলে গিয়েছিল দশটার মধ্যে ফিরবে, বারোটা বেজে গেছে। দুত্তোর!' বলে তিনি একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমার মনে আবার সহানুভূতি এল। স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল নেই; এ যেন ডক্টর দাসের দাম্পত্যজীবনের উল্টো পিঠ। জিগ্যেস করলুম, 'আপনি বুঝি পার্টিতে যান না?'

শঙ্খনাথবাবু চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন: 'আমি পার্টিতে যাব! কী বলছ তুমি প্রিয়দম্বা? আমি মুখ্খু অসভ্য, নাচতে জানি না, ব্রিজ খেলতে জানি না, ছুরি-কাঁটা ধরে ডিনার খেতে জানি না—আমি পার্টিতে যাব! লোক হাসবে না! আমার স্ত্রী সমাজে মুখ দেখাবে কী করে? তাছাড়া মেয়েটাকে দেখবার একটা লোক চাই ত। আজ তিন রাত্তির ঘুমুইনি।' তিনি ক্লান্তভাবে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন।

কেন জানি না আমার রাগ হল। বললুম, 'আগে নার্সের ব্যবস্থা করেননি কেন? তাহলে ত তিন রাত্তির জেগে থাকতে হত না!'

তিনি দুই হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, আমি গরিবের ছেলে, গরিবি চালে মানুষ হয়েছি। বাড়িতে কারুর অসুখ হলে মা-খুড়ি বাপ-খুড়োরাই সেবা করে। এখন আমার টাকা হয়েছে, কিন্তু নার্স রেখে তার ঘাড়ে সেবার ভার তুলে দেওয়া যায় একথা মনেই আসেনি। আজ ডাক্তার বলল তাই খেয়াল হল।'

লোকটি মুখ্খু এবং অসভ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু স্পষ্টবক্তা। নিজের সম্বন্ধেও স্পষ্ট কথা বলতে সংকোচ নেই। আমি বললুম, 'আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে। কোনও চিন্তা নেই, আমি এখানে রইলুম।'

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'আমি আর কোথায় যাব, এই ঘরেই শুয়ে থাকি।—কলাবতী!'

পশ্চিমা ঝি-টা আবার গিয়ে দোরের কাছে বসে ছিল, উঠে এসে কাছে দাঁড়াল। থ্যাব্ড়া-থ্যাব্ড়া মুখ, নাকে নোলকের আংটি; বয়স আন্দাজ তিরিশ। শঙ্খনাথবাবু তাকে বললেন, 'তুমিও তিন রাত্তির জেগে আছ, যাও ঘুমোও গিয়ে। আর শিউসেবককে বলে দিও মাল্কিনী না ফেরা পর্যন্ত যেন জেগে থাকে।'

'জি'—কলাবতী চলে গেল।

এই সময় বিছানায় বাচ্চা একটু উসখুস করল। আমি গিয়ে চেয়ার টেনে বিছানার পাশে বসলুম; তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বর আছে; কিন্তু বেশী নয়। আমি গায়ে হাত রাখতেই সে আবার শান্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল।

তার মুখের পানে চেয়ে রইলুম। বয়স বছর দেড়েকের বেশী নয়; মুখখানি যেন গোলাপফুল ফুটে আছে। এত অসুখেও চোখ ফেরানো যায় না। শঙ্খনাথবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি তাঁর পানে চোখ তুলে চাইতে দেখলুম তিনি সপ্রশ্ন চোখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম—ঠিক আছে।

তিনি গিয়ে দূরের একটা জানলা খুললেন, আবার তখনই বন্ধ করে দিলেন। বাইরে বৃষ্টি চলেছে, বিরাম নেই বিশ্রাম নেই।

জানলার কাছে একটা গদি-মোড়া ডিভান ছিল, শঙ্খনাথবাবু তাতে বসলেন, আমাকে লক্ষ্য করে চাপা গলায় বললেন, 'পাশের ঘরে চায়ের সরঞ্জাম আছে, যদি রাত্তিরে খেতে চাও—'

আমি নিঃশব্দে হাত তুলে তাঁকে আশ্বাস দিলুম দরকার হলে খাব। তিনি তখন ডিভানের উপর লম্বা হয়ে শুলেন।

আধ ঘণ্টা শিশুর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি...মেনিঞ্জাইটিস্। কঠিন রোগ, কিন্তু এখন রোগ বশে এসেছে; শিশু সেরে উঠবে। শুধু নজর রাখা দরকার, এতটুকু ত্রুটি না হয়।...এই শিশুর মা—কী রকম মা? আধুনিকা অনেক দেখেছি, আমিও ত আধুনিকা। কিন্তু নিজের রুগ্ন সন্তানকে বাড়িতে ফেলে নেচে বেড়াতে কাউকে দেখিনি। হয়ত এটা আধুনিকতার দোষ নয়, ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষ। কিন্তু মেয়ের মায়ের দোষ যতই থাক, নিশ্চয় অপূর্ব সুন্দরী।' মেয়ে এত রূপ বাপের কাছ থেকে পায়নি। বাপের চেহারা ত গুণ্ডার মতন।

ঘাড় ফিরিয়ে শঙ্খনাথবাবুর দিকে চাইলুম। তিনি কনুইয়ে ভর দিয়ে করতলে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছেন, দৃষ্টি আমার ওপর। কিন্তু দৃষ্টিতে আপত্তিকর কিছু নেই, কেবল নির্বাক কৌতূহল। আমার মতন জীব তিনি জীবনে দেখেননি, তাই নিষ্পলক চেয়ে আছেন। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হবার পরও তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন না, একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

মুখের পানে একদৃষ্টে কেউ চেয়ে থাকলে অস্বস্তি হয় না? আমি উঠে গিয়ে ডিভানের কাছে দাঁড়ালুম; তিনি উঠে বসলেন। বললুম, 'আমি যখন চার্জ নিয়েছি তখন আপনার জেগে থাকার মানে হয় না। আপনি ঘুমবার চেষ্টা করুন না।'

তিনি বললেন, 'ঘুমবার চেষ্টা! আমাকে চেষ্টা করতে হয় না, চোখ বুজে শুলেই ঘুমতে পারি। আজ ইচ্ছে করে জেগে আছি।—পিউ এখন কেমন আছে?'

'পিউ! খুকীর নাম বুঝি পিউ?'

'হ্যাঁ। কেমন আছে?'

'ভালই আছে' বলে আমি আবার গিয়ে বসলুম।

পিউ! পাপিয়ার ডাক। ছোট্ট একটি পাখির মিষ্টি একটু কাকলি। এই মেয়েটি পাখি নয়, পাখির কূজন। যে নাম রেখেছে তার রসবোধ আছে। শঙ্খনাথবাবু নিশ্চয় নয়।

পিউ একটু উসখুস করল। তাকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিলুম। সে আবার শান্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল।

একটা বেজে গেছে। বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ ঝম্ ঝম্ শব্দ যেন একটু মন্দা হয়ে আসছে। মনে হল নীচে গাড়ি-বারান্দায় একটা মোটর এসে থামল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, শঙ্খনাথবাবু উঠে বসেছেন। তাঁর চোখে গনগনে আগুন, চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরে ওপরের বারান্দায় মেয়েলী জুতোর খুট্‌খুট্‌ শব্দ শুনতে পেলুম, আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। আমার ঘাড় আপনিই সেই দিকে ঘুরে গেল, দোরের পানে চেয়ে রইলুম।

দোরের সামনে এসে দাঁড়াল একটি মূর্তি। আরব্য উপন্যাসের হুরী-পরীদের দেখিনি, কিন্তু তারা এত সুন্দর কখনই ছিল না। মনে হল মেঘে-ঢাকা আকাশ থেকে এক ঝলক বিদ্যুৎ দরজার ফ্রেমের মাঝখানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিপছিপে লম্বা ধরনের গড়ন, দুধে-আলতা রঙ; মুখখানি কুঁদে কাটা। পরনে খুব ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ি, তার চেয়ে একটু গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজ; সবার ওপরে একরাশ হীরে আর পান্নার গয়না শিশিরবিন্দুর মতন ঝলমল করছে।—কিন্তু ওর রূপের বর্ণনা আর লিখতে পারি না; নিজেরই হিংসে হয়।

দরজার সামনে এসে প্রথমেই তার চোখ পড়েছিল আমার ওপর। সে আমাকে একনজর ভাল করে দেখে নিল। তার নরম রাঙা ঠোঁটে একটু মিষ্টি হাসি খেলে গেল।

হাসিটি কিন্তু স্থায়ী হল না। শঙ্খনাথবাবু পাগলা হাতির মতন তার সামনে ছুটে এলেন, চাপা গর্জনে বললেন, 'দশটা বেজেছে?'

একটি আঙুল ঠোঁটের ওপর রেখে পরী বলল, 'চুপ! পিউ জেগে উঠবে।

শঙ্খনাথবাবু ভেংচি কাটার স্বরে বললেন, 'পিউ জেগে উঠবে! এতক্ষণ পিউয়ের কথা মনে ছিল না?'

পরীর মুখখানি ব্যথায় ভরে উঠল, সে করুণ সুরে বলল, 'মনে ছিল না! সারাক্ষণ কেবল পিউয়ের কথাই ভেবেছি। কিন্তু আসব কী করে? যা বিষ্টি, সাপের মুখ ছিঁড়ে যায়।'

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'যখন বেরিয়েছিলে তখন বিষ্টি কিছু কম ছিল না। বেরুলে কেন? একটা দিন না-নাচলে কি চলত না?'

পরী চকিত আড়চোখে আমার পানে তাকাল। বাইরের লোকের সামনে দাম্পত্য কলহ বাঞ্ছনীয় নয়। সে স্বামীর কথার উত্তর না-দিয়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল। পিউয়ের খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। মেয়ের পানে একবার তাকাল কি তাকাল না, আমার পানে চেয়ে নরম হেসে বলল, 'আপনি বুঝি নার্স? বাঁচলুম। পিউয়ের জন্যে আর ভাবনা নেই।'

শঙ্খনাথবাবু স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি গলার মধ্যে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করলেন। বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলেন—পিউয়ের জন্যে ভেবে ভেবে তোমার ত ঘুম হচ্ছে না। কিন্তু তিনি কোনও কথা বলবার আগেই পরী আবার ঠোঁটে আঙুল রেখে তাঁকে থামিয়ে দিল। ফিসফিস করে বলল, 'চুপ! তোমার গলার আওয়াজে পিউ চমকে উঠবে।

আমি কব্জির ঘড়ি দেখে বললুম, 'আপনারা বিশ্রাম করুন গিয়ে। আমাকে এবার ইঞ্জেকশন দিতে হবে।'

'ইঞ্জেকশন!' পরী ত্রস্ত হয়ে উঠল,—'চল আমরা যাই।' এই বলে সে আর দাঁড়াল না, দোরের দিকে পা বাড়াল।

শঙ্খনাথবাবু একটু ইতস্তত করলেন, বললেন, 'আমি থাকব?'

'না, দরকার নেই' বলে আমি ব্যাগ তুলে নিলুম। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলুম, আগে আগে পরী এবং পিছন পিছন দৈত্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইঞ্জেকশন তৈরি করতে করতে পরীর কথাই মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে করতে লাগল। হয়ত আমুদে আহ্লাদে মেয়ে; নিজের সংসারে আমোদ-আহ্লাদের সুযোগ কম, তাই বাইরের দিকে মন পড়ে থাকে। মেয়েকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার নামে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল। হয়ত শরীরের কষ্ট দেখতে পারে না। অনেক লোক আছে যারা রক্ত দেখলে ভির্মি যায়। আমি নিজেই বা কী ছিলুম? প্রথম যেদিন হাসপাতালে মড়া দেখি সেদিন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম। এখন অবশ্য সবই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

পরী ত আর নার্স নয়, সে এসব দেখতে পারে না। কিন্তু কথাবার্তা চালচলন খুব মিষ্টি। আর কী রূপ! শঙ্খনাথবাবুকে ভাগ্যবান বলতে হবে। এমন বউ সকলেব ভাগ্যে জোটে না।

ইঞ্জেকশন দিলুম। পিউ একটু নড়েচড়ে কাঁদবার উপক্রম করল, সুন্দর মুখখানি কুঁচকে উঠল; কিন্তু সে কাঁদল না। চোখ মেলে কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে রইল, তারপর ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আজ রাত্রে আমার আর কোনও কাজ নেই। শুধু পিউয়ের মুখের পানে চেয়ে বসে থাকা।

বৃষ্টি বোধ হয় থেমে গেছে; বাইরে আর সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে থেকে দুটি গলার আওয়াজ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। একটি স্বর মোটা এবং অস্পষ্ট, অন্য স্বর মিহি এবং স্পষ্ট। বোধ হয় শোবার ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা হচ্ছে—

'..তুমি বুঝতে পারছ না কেন, ইচ্ছে করলেই কি পার্টি ছেড়ে চলে আসা যায়? আমি ত চলেই আসছিলুম, কিন্তু সবাই পথ আগলে দাঁড়াল, বলল, এত বিষ্টিতে যেতে দেব না। গাড়িও ছিল না—' তারপর কিছুক্ষণ মোটা গলার আফসানি.. তারপর আবার মিহি গলা—'সমাজে থাকতে গেলে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হয়...বোরকা মুড়ি দিয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকার দিন কি আর আছে? লোকে হাসবে যে। তুমি মেলামেশা করতে ভালবাস না, তাই আমাকেই করতে হয়। লৌকিকতা না রাখলে চলবে কেন?'..

এইভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কথা-কাটাকাটি চলল, তারপর আস্তে আস্তে সব ঝিমিয়ে পড়ল। বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, আমি বসে বসে ভাবছি...দাম্পত্য কলহ ..বাবা বলতেন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া...ওরা ঝগড়া-ঝাঁটি করে এক বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে .ওদের মধ্যে ভাল কে? মন্দ কে? হয়ত মানুষ হিসেবে দু'জনেই ভাল, কিন্তু বিপরীত ধাতের মানুষ। স্বামী উগ্র রুক্ষ অশিক্ষিত; স্ত্রী আধুনিকা প্রগতিশীলা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এরা মানুষ হয়েছে; কেউ কারুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। এমনি ভাবে ঝগড়া করে আর এক বিছানায় শুয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেবে...

আমি নার্স, জেগে জেগে ঘুমিয়ে নিতে পারি। রুগীর বিছানার পাশে চোখ চেয়ে বসে আছি। রুগী ঘুমুচ্ছে, আমার কোন কাজ নেই। সোজা বসে আছি চোখ মেলে, কিন্তু মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে; জেগেও নেই, আবার ঘুমুচ্ছিও না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। যারা রাত জেগে সেবা করে তাদের মন এইভাবে বিশ্রাম করে নেয়।

খস্‌খস্‌ শব্দে দোরের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলুম শঙ্খনাথবাবু দু'হাতে দু'পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢুকছেন। ঘড়ি দেখলুম, তিনটে বেজে গেছে।

আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, এক পেয়ালা চা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

চায়ের পেয়ালা নিলুম। তিনি মেয়ের দিকে একবার চোখ বেঁকিয়ে ভ্রু তুলে আমার পানে চাইলেন। আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম—ভাল আছে।

তিনি তখন একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিজের পেয়ালায় চুমুক দিলেন। আমিও উঠে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম। পেয়ালা ঠোঁটে ঠেকাতেই মনটা খুশি হয়ে উঠল। শেষ রাত্রে অপ্রত্যাশিত গরম চা বড় মিষ্টি লাগে।

নিচু গলায় বললুম, 'আপনি চা তৈরি করলেন?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আর কে করবে? আমার গিন্নী? তিনি ঘুমুচ্ছেন, বেলা দশটার আগে বিছানা ছাড়বেন না।'

গিন্নীর প্রসঙ্গ বাড়তে দেওয়া উচিত নয়, তাই প্রশ্ন করলুম, 'আপনি ঘুমুলেন না কেন?'

তাঁর মুখখানা বিরাগে ভরে উঠল,—'ঘুমুতে ইচ্ছে হল না। আর কতটুকুই বা রাত্রি আছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ভোর হয়ে যাবে।'

চা খাওয়া শেষ হলে শঙ্খনাথবাবু পেয়ালা দুটো পাশের ঘরে রাখতে গেলেন, আমি আবার পিউয়ের বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। শঙ্খনাথবাবু ফিরে এসে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আমি বসে বসে অনুভব করলুম, তাঁর চোখ থেকে থেকে আমার দিকে ফিরছে। আমার সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময় আর কৌতূহল এখনও কাটেনি।

তারপর ক্রমে ফরসা হল, জানলার কাচের ভিতর দিয়ে দিনের আলো দেখা গেল। বৃষ্টি থেমেছে কিন্তু মেঘ কাটেনি।

বাড়ি জেগে উঠল। প্রথমে ঘরে এল কলাবতী, তারপর শিউসেবক। কলাবতী পিউয়ের খাটের পাশে মেঝের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসল, তারপর পিউয়ের পানে হাত বাড়াল। আমি অবাক হয়ে বললুম, 'এ কী?'

কলাবতী হেসে বলল, 'বাচ্চা দুধ খাবে।'

বললুম, 'দুধ! কোথায় দুধ?'

কলাবতী নিজের বুকের ওপর হাত রেখে বলল, 'এইখানে।'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম। কলাবতী আমার মুখের ভাব দেখে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল।

শঙ্খনাথবাবু কলাবতীর পিছনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কী হয়েছে?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'ঝি বলছে পিউ নাকি—'

উনি বললেন, 'কলাবতীর দুধ খায়? হ্যাঁ, জন্মে পর্যন্ত পিউ কলাবতীর দুধ খায়। ওর মা ত ওকে দুধ দেয়নি। ফিগার খারাপ হয়ে যাবে যে!'

আমার মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠল, কোন্ দিকে তাকাব ভেবে পেলুম না। শেষে বললুম, 'ডাক্তারের আপত্তি নেই?'

'না। আপত্তি হবে কিসের জন্যে?'

'না না, তা বলছি না, কিন্তু—'

ইতিমধ্যে কলাবতী পিউকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম। কী যে এদের মতিগতি কিছুই বুঝি না। এরকম ব্যাপারে আমার অভ্যাস নেই। কিন্তু ডাক্তার যখন অনুমতি দিয়েছেন তখন আর বলবার কী আছে?

শিউসেবক খাটো গলায় বলল, 'নার্স সাহেব, পাশের ঘরে চা দেওয়া হয়েছে, আপনি মুখ ধোবেন কি?'

সাদা টাইল বাঁধানো ঝকঝকে বাথরুমে গেলুম, তারপর ডাইনিং রুমে গিয়ে চা খেতে বসলুম। প্রকাণ্ড ঘর, মাঝখানে লম্বা টেবিল, তার এক পাশে খাবার দেওয়া হয়েছে। শুধু চা নয়, টোস্ট, ডিম, এক গেলাস গরম দুধ। শঙ্খনাথবাবু টেবিলের পাশে বসেছেন, তাঁর সামনে কেবল এক গেলাস দুধ।

আমি খেতে আরম্ভ করলুম, বললুম, 'নার্সকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ানোর কিন্তু নিয়ম নেই।'

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'নিয়মকানুন আমি জানি না। বলেছি ত আমি চাষা মনিষ্যি, যা মনে আসে তাই করি।'

আমি খেতে লাগলুম, তিনি মাঝে মাঝে দুধের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে আমার খাওয়া দেখতে লাগলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথা বলে চললেন। ছাড়া ছাড়া কথা। তা থেকে তাঁর পারিবারিক পরিস্থিতির কিছু খবর পেলুম। কলাবতী হচ্ছে শিউসেবকের বউ। ওরা চার-পাঁচ বছর ওঁর বাড়িতে চাকরি করছে। ওরা পশ্চিমা পাহাড়ী জাতের লোক, বোধ হয় গাড়োয়ালী; শঙ্খনাথবাবুর অত্যন্ত অনুগত, ওঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারে।...শঙ্খনাথবাবুর স্ত্রীর নাম সলিলা; রিটায়ার-করা সিভিলিয়ানের মেয়ে। বছর তিনেক আগে বিয়ে হয়েছে। কী দেখে সলিলা শঙ্খনাথবাবুকে বিয়ে করেছিল জানি না; বোধ হয় টাকা দেখে।...পিউ

তাঁদের একমাত্র সন্তান। জন্মাবধি ঝিয়ের কোলেই মানুষ। কলাবতীরও একটি বছর দেড়েকের ছেলে আছে।

বেলা আটটার সময় ডাক্তার এলেন।

ডাক্তারকে দেখে চমকে উঠলুম: মন্মথ কর। তেমনই ধারালো মুখ, তেমনই ফিটফাট চেহারা। পরনে শার্ক-স্কিনের সুট্। দেখে মনে হয় প্র্যাক্‌টিস্ বেশ ভালই চলছে। মুচ্‌কি হেসে বললেন, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন দেখছি।'

তাঁকে প্রথম দেখে চমকে উঠেছিলাম বটে, কিন্তু নেকড়ে বাঘ আর অজগর সাপের ভয় আমার কেটে গেছে। বললুম, 'হ্যাঁ, কাল টেলিফোনে গলা শুনে চিনতে পারিনি। আপনি ভাল আছেন?'

হেসে বললেন, 'চলছে একরকম! আপনি ত আলাদা বাসা নিয়ে প্র্যাক্‌টিস করছেন, টেলিফোন ডিরেক্টরিতে দেখলাম। সঙ্গে আর কে থাকেন?'

বললুম, 'শুক্লা। আমার বন্ধু শুক্লা। আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি।'

তিনি ভাবতে ভাবতে বললেন, 'শুক্লা—তিনিও কি নার্স?'

'হ্যাঁ। তাকে আপনার মনে নেই। দেখলে হয়ত চিনতে পারবেন।—আসুন, আপনার পেশেন্টের কাছে নিয়ে যাই। পেশেন্ট ভাল আছে।'

ডাক্তারকে পিউয়ের ঘরে নিয়ে গেলুম; শঙ্খনাথবাবুও সঙ্গে এলেন। কলাবতী পিউকে আবার শুইয়ে দিয়ে খাটের পাশে মেঝেয় বসে আছে। পিউ জেগে উঠেছে, চুপটি করে শুয়ে পিটপিট করে চাইছে।

ডাক্তার পিউকে পরীক্ষা করলেন, তার রিফ্লেক্স্ দেখলেন। আমি ডাক্তার দেখে দেখে পেকে গেছি, কোন্ ডাক্তার কী ভাবে রোগী পরীক্ষা করেন তা থেকে বোঝা যায় তিনি কী রকম ডাক্তার। দেখলুম বয়সে তরুণ হলেও ইনি বিচক্ষণ ডাক্তার। এঁর পরীক্ষা করার ভঙ্গিতে বেশ একটি সতর্ক আত্মপ্রত্যয় আছে, অথচ আড়ম্বর নেই।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার বললেন, 'বাঃ! খুকী ত সেরে গেছে। আর দু-চার দিন ভাল ভাবে নার্স করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'আর ইঞ্জেকশন দিতে হবে না?'

ডাক্তার বললেন, 'না, ওরাল্ ওষুধেই কাজ চলবে।'

তিনি ওষুধ পথ্য এবং পরিচর্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন; যাবার সময় আমার পানে একটু মুচ্‌কি হেসে গেলেন।

আমি শঙ্খনাথবাবুকে বললুম, 'আমিও এবার যাই।'

উনি বললেন, 'আচ্ছা। দিনের বেলাটা আমি সামলে নেব। তুমি কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি এসো প্রিয়দম্বা। আমি ঠিক ন'টার সময় গাড়ি পাঠাব।'

'আমাকে কি আর দরকার হবে?'

'হবে।' তিনি পকেট থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার করে আমার হাতে দিলেন।

'আচ্ছা, আসব।'

নীচে গাড়ি-বারান্দায় মোটর দাঁড়িয়ে ছিল; আমি নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। শিউসেবক গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেলাম করল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করল।

যেতে যেতে দেখলুম আকাশ এখনও পরিষ্কার হয়নি; পাতলা ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘের মধ্যে দিয়ে পান্‌সে রোদ দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল আজ সকালে পিউয়ের মাকে একবারও দেখিনি। তিনি বোধ হয় এখনও ঘুমুচ্ছেন। মাঝরাত্তির পর্যন্ত নাচলে সকালবেলা ঘুম ভাঙবে কী করে? মানুষের শরীর ত! অথচ শঙ্খনাথবাবু না-ঘুমিয়ে দিব্যি রাত কাটিয়ে দিলেন। লোহার শরীর বোধ হয়।

বাসায় এসে দেখলুম শুক্লা আগেই ফিরেছে, নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে। ঝি বোধ হয় ডাকাডাকি করে চলে গেছে। আমি নিজের ঘরে গিয়ে নার্সের কাপড়চোপড় ছাড়লুম, তারপর স্নান করে শুয়ে পড়লুম।

ঘুম ভাঙল বেলা তখন দুটো। শুক্লা বিছানার পাশে বসে কাঁধ ধরে নাড়া দিচ্ছে, আমি চোখ মেলতেই জিগ্যেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলি কাল রাত্রে?'

বিছানায় উঠে বসে শুক্লাকে সব বললুম। শুনে শুক্লা শঙ্খনাথবাবুর পারিবারিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে কিছু বলল না, ডাক্তার সম্বন্ধে বলল, 'নেকড়ে বাঘ এখনও তোর আশা ছাড়েনি। সাবধান থাকিস।'

বললুম 'দূর! সে বয়স আর নেই।'

শুক্লা বলল, 'কিছু বলা যায় না। পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।—নে ওঠ্। রান্না করেছি খাবি চল্।'

শুক্লার জীবন যে-পথেই চলুক, মনটা তার গোঁড়া।

দু'জনে খেতে বসলুম। আজ রাত্রে শুক্লার কাজ নেই, সে বাড়িতেই থাকবে। বোধ হয় ডক্টর দাস আসবেন, শুক্লার মুখ দেখে যেন মনে হচ্ছে।

খাওয়া সেরে ডায়েরি লিখতে বসেছি। রাত্রি ন'টায় গাড়ি আসবে।

১৯ শ্রাবণ।

ঠিক ন'টার সময় গাড়ি এল। রাত্তিরের খাওয়া সেরে নার্সের সাজপোশাক পরে তৈরি ছিলুম, গাড়িতে উঠে বসলুম।

গাড়ি যখন শঙ্খনাথবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন দেখলুম, তাঁর স্ত্রী সলিলা সেজেগুজে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে; বোধহয় গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ সাজ-পোশাক একেবারে অন্য রকম, আগাগোড়া সাদা। সাদা সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ, গলায় মুক্তোর কণ্ঠী, পায়ে সাদা হাই-হিল্ জুতো; হাতে চুড়িবালা নেই, কেবল আঙুলে একটি মুন-স্টোনের আংটি, চুলে এক থোলো শ্বেতকরবী। সব মিলিয়ে যেন একটি ফুলন্ত রজনী-গন্ধার ছড়। আমি গাড়ি থেকে নামতেই সে আমার পানে একটু মিষ্টি হাসির সুগন্ধ বিলিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ি পাক খেয়ে বেরিয়ে গেল। আজও নাচের পার্টি নাকি?

শিউসেবক বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, হাসিমুখে বলল, 'আসুন মিস্। পিউরানী আজ ভাল আছে, দুপুরবেলা খেলা করেছে।'

শিউসেবকের সঙ্গে ওপরে চললুম। সে পরিষ্কার বাংলা বলে। কলাবতী কিন্তু বাংলা বলতে পারে না।

পিউয়ের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। ঘরের মাঝখানে দুর্বাসা মুনির ভঙ্গিতে বুকে হাত বেঁধে শঙ্খনাথবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, চোখ দিয়ে আগুনের ফুল্‌কি বেরুচ্ছে। আমাকে দেখেই তিনি ফেটে পড়লেন,—'আমার বউ আজও পার্টিতে গেছে, বুঝেছ? কর্নেল হড়্‌বড়্ সিংয়ের বাড়িতে পার্টি। খাঁটি পাঞ্জাবী কর্নেল, তার ছেলের নাম লেফ্‌টেন্যান্ট লট্‌পট্ সিং। এই লট্‌পট্ সিংয়ের সঙ্গে আমার বউয়ের ভারি ভাব। ভারি স্মার্ট ছোকরা লট্‌পট্ সিং, এক টানে এক বোতল হুইস্কি সাবাড় করে দিতে পারে। আরও অনেক গুণ আছে। বুঝলে? কলকাতার যত উচ্চশ্রেণীর যুবক-যুবতী আছে, সব আজ সেখানে গিয়ে জুটেছে। আমার বউ সেখানে না গিয়ে থাকতে পারে!'

আমার মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল। বললুম, 'আপনার যখন ইচ্ছে নয় তখন স্ত্রীকে পাঠালেন কেন?'

তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আমি পাঠিয়েছি! তুমি কী বলছ প্রিয়দম্বা! সভ্যসমাজের প্রগতিশীলা মহিলাদের তুমি চেন না। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জেনানা

ওরা, ওরা কি স্বামীর অনুমতির তোয়াক্কা রাখে! ওরা নিজের ইচ্ছেয় চলে, নিজের খুশিতে নাচে, নিজের গরজে মিষ্টি কথা বলে। মিষ্টি কথায় কাজ না হয় স্পষ্ট কথা আছে। কে কার কড়ি ধারে!'

ব্যাপার বুঝতে দেরি হল না। স্বামীর নিষেধ উপেক্ষা করে সলিলা পার্টিতে গিয়েছে। কিন্তু শঙ্খনাথবাবুর কথায় সায়-উত্তর দিলে কথা বেড়েই যাবে, তাঁর রাগও বাড়বে। আমি আর কোনও কথা না বলে পিউয়ের খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

পিউ জেগে আছে, কিন্তু চুপটি করে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল; চোখ দুটি হাসিতে ভরে উঠল। তারপর সে আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল।

আমার বুকের মধ্যে যেন সব ওলটপালট হয়ে গেল। আমি তাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলুম। ফুলের মতন হাল্কা মেয়েটা, আমার কাঁধে মাথা রেখে চুপটি করে রইল।

শঙ্খনাথবাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেছে। বিগলিত স্বরে বললেন, 'পিউ একেবারে সেরে গেছে—না?'

বললুম, 'হ্যাঁ।'

'আর কোনও ভয় নেই?'

'না।'

তিনি একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি এসেছিলে তাই পিউ এত শিগ্গির সেরে উঠল। তুমি ভারি পরমন্ত প্রিয়দম্বা।'

আমি পিউকে নিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করলুম। মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে ডাকলুম, 'পিউ!'

পিউ ঘুমোয়নি, পাখির মতন সরু গলায় বলল, 'উঁ?'

আমি তাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলুম। সে আবার একটু হাসল। হাসিটি একেবারে মায়ের হাসি বসানো। আমি তার খাটের পাশে বসে বললুম, 'পিউ, তোমার খিদে পেয়েছে?'

পিউ ঘাড় নেড়ে বলল, 'হুঁ!'

'তাহলে তোমার জন্যে দুধ তৈরি করে আনি? বোতলে দুধ খাবে ত?'

পিউয়ের চোখ আমার মুখ থেকে নেমে দোরের কাছে গিয়ে স্থির হল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম কলাবতী দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

বুঝতে বাকী রইল না পিউ কী খেতে চায়। তবু বললুম, 'বোতলে দুধ খাবে না? খুব মিষ্টি দুধ, আমি তৈরি করে দেব—অ্যাঁ?'

পিউয়ের চোখ কিন্তু কলাবতীর ওপর থেকে নড়ল না। তার ঠোঁট দুটি একটু একটু ফুলতে লাগল, তারপর সে পরিষ্কার মিহি গলায় বলল, 'দুধ খাব না, কলা খাব।'

আমি চোখ তুলে শঙ্খনাথবাবুর পানে চাইলুম, তিনি হা-হা করে হেসে বললেন, 'কলা খাব মানে বুঝলে না? বোতলের দুধ খাবে না, কলাবতীর দুধ খাবে।'

তখন আর উপায় কী! আমি উঠে গিয়ে চেয়ারে বসলুম, কলাবতী এসে পিউকে খাওয়াতে লাগল। শঙ্খনাথবাবু একটা চেয়ার টেনে আমার কাছে বসলেন, বললেন, 'তোমার ইচ্ছে নয় পিউ কলাবতীর দুধ খায়—কেমন?'

আমি বললুম, 'দশ মাস বয়সের পর আর দরকার হয় না। ছাড়িয়ে দেওয়াই ত ভাল।'

তিনি বললেন, 'তুমি যখন বলছ তখন নিশ্চয় ঠিক কথা। চেষ্টা করব। কিন্তু পিউ বড় কান্নাকাটি করবে।'

বললুম, 'এখন থাক। একেবারে সেরে উঠুক।'

তিনি বললেন, 'সেই ভাল। তুমি খাওয়া-দাওয়া করে এসেছ ত? যদি না খেয়ে এসে থাক—'

'আমি খেয়ে এসেছি।'

তিনি উসখুস করলেন; মনে হল তিনি যেন আমাকে কোন প্রশ্ন করতে চান। হঠাৎ বললেন, 'কী দিয়ে ভাত খেলে?'

সভ্যসমাজে এ প্রশ্ন চলে না। কিন্তু আমার রাগ হল না, বরং হাসি এল। বললুম, 'মুগের ডাল, কুচো চিংড়ির চচ্চড়ি, ইলিশ মাছের ঝোল আর ডিম ভাতে।'

শঙ্খনাথবাবু হেসে উঠলেন। প্রাণখোলা সরল হাসি, তাতে বড়মানুষির অবজ্ঞা নেই। তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে একটু করুণ সুরে বললেন, 'আমিও আগে ওই খেতাম। কিন্তু এখন আর ও হবার জো নেই। আজকাল বাবুর্চির রান্না খেতে হয়। হরদম কালিয়া পোলাও, মটন মুর্গি, একেবারে মোগলাই ব্যাপার।'

নিশ্বাস ফেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আমি খেতে যাচ্ছি। তুমি আসবে না? একটা কাটলেট? একটু পুডিং?'

'না।'

তিনি চলে গেলেন।

পিউ কলাবতীর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। আমি খাটের পাশে চেয়ার টেনে বসলুম, কলাবতীকে বললুম, 'তোমাকে আজ আর দরকার নেই, তুমি যাও।' সে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

রাত্রিটা একরকম ঠান্ডাভাবেই কাটল।

খাওয়া শেষ করে শঙ্খনাথবাবু ঘরে এলেন, প্রকান্ড একটা হাই তুললেন। আমি বললুম, 'আপনি আবার এ ঘরে কেন? যান, শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

তিনি বললেন, 'আমাকে দরকার হবে না?'

'না।'

'আচ্ছা। যদি কিছু দরকার হয় এই বোতাম টিপো, তা হলেই শিউসেবক আসবে।' বলে দোরের পাশে বোতাম দেখালেন।

'শিউসেবক বাড়িতেই থাকে?'

'হ্যাঁ। নীচের তলায় পিছন দিকে চাকরদের থাকবার জায়গা। শিউসেবক, কলাবতী, বাবুর্চি, আরও দুটো চাকর, সবাই সেখানে থাকে। আমি যাই, ঘুমে চোখ ভরে আসছে।'

তিনি খাটের ওপর ঝুঁকে পিউয়ের মুখখানি একবার দেখলেন, তারপর আর-একটা হাই তুলে চলে গেলেন।

ঘণ্টাদেড়েক আর কোন সাড়াশব্দ নেই। পিউ নিঃশব্দে নিশ্বাস ফেলছে। কী অদ্ভুত সুন্দর মেয়েটা, হঠাৎ যেন বিশ্বাস হয় না...আমাকে ত চেনে না, অথচ কেমন স্বচ্ছন্দে আমার কোলে এল। যেন কতকালের চেনা। ওকে কোলে নিয়ে আমারও মনে হল যেন ও একান্তই আপনার; বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। কত বাচ্চাকেই ত নার্স করেছি, কিন্তু এমন কখনও মনে হয়নি। জাদু জানে মেয়েটা।

কিন্তু ওর মা এমন ধিঙ্গী কেন? ঘরে মন বসে না! এমন যার বাড়ি-ঘর, এমন যার মেয়ে, তার ঘরে মন বসে না!...পিউও কি বড় হয়ে মায়ের মতন ধিঙ্গী হবে? আশ্চর্য কী, যা দেখবে তাই ত শিখবে। কী জানি বাপু, ভাবতেও খারাপ লাগে।...

দরজার বাইরে খুব মৃদু আওয়াজ পেয়ে সেইদিকে চোখ ফেরালুম। পিউয়ের মা চোরের মতন পা টিপে টিপে দোরের সামনে দিয়ে চলে গেল। মেয়ের ঘরে এল না, ঘরের দিকে একবার তাকাল না। ঘড়িতে দেখলুম পৌনে বারোটা। যাক, আজ তবু সকাল সকাল পার্টি থেকে ফিরেছে।

শঙ্খনাথবাবু নিশ্চয় ঘুমিয়েছেন, কারণ গন্ডগোল চেঁচামেচি কিছু হল না। অনেকক্ষণ কান পেতে রইলুম, কিছু শুনতে পেলুম না।

বসে আছি, কিছু করবার নেই। একখানা বই আনলে ভাল হত, তবু খানিকটা সময়

কাটত। শঙ্খনাথবাবুর বাড়িতে বোধ হয় বইয়ের পাট নেই! কে পড়বে? শঙ্খনাথবাবু সম্ভবত খবরের কাগজ ছাড়া আর-কিছু পড়েন না। আর সলিলা—সে বই পড়ে সময় নষ্ট করবে? এ ধরনের মেয়েরা বই পড়ে না।

রাত্রে আমার আর কোনও কাজ নেই। পিউয়ের যদি ঘুম ভাঙে, সে যদি খেতে চায়, তাকে দুধ তৈরি করে খেতে দেব। পাশের ঘরে সব ব্যবস্থা আছে। একবার গিয়ে দেখে এলে হয়, সব ঠিক আছে কি না! যদি না থাকে শিউসেবককে ডাকতে হবে বোতাম টিপে।

পিউ নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। পা টিপে-টিপে উঠে গেলুম। পাশের ঘরটা বোধ হয় আসলে গেস্ট-রুম, এখন সেখানে পিউয়ের খাবার সরঞ্জাম রাখা হয়েছে। টিনের দুধ, গ্লুকোজের কৌটো, দুধ খাওয়ানোর বোতল, ইলেকট্রিক স্টোভ—সবই মজুত আছে। শিউসেবককে ডাকবার দরকার হবে না।

ফিরে এসে বসলুম। পিউয়ের গায়ে আস্তে আস্তে হাত রাখলুম। মেয়েটা যেন মাখনের দলা; ইচ্ছে করে দু'হাতে চট্‌কাই, তারপর বুকে চেপে ধরে চুমু খাই।...কিন্তু রোগীর প্রতি নার্সের এ-রকম মনোভাব ভাল নয়। নার্স প্রিয়ংবদা ভৌমিক, পরের সোনা কানে দিও না!

'তুমি ভারি পয়মন্ত'—শঙ্খনাথবাবু আমাকে বলেছিলেন। কথাটা ঘুরে-ফিরে মনে আসছে। পয়মন্ত! কী জানি। অবশ্য আজ পর্যন্ত আমার হাতে একটিও রোগীর মৃত্যু হয়নি। তাকেই কি পয়মন্ত বলে?...শঙ্খনাথবাবু যতই অসভ্য আর অশিক্ষিত হোন, তাঁর মন ভাল। সরল সহজ মানুষ। মেয়েকে কী ভালই বাসেন! স্ত্রীকেও হয়ত ভালবাসেন। কিন্তু—

রাত্রি সাড়ে তিনটে। শঙ্খনাথবাবু দু' পেয়ালা চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বললুম, 'আপনার ঘুম হয়ে গেল?'

তিনি পাশে এসে দাঁড়ালেন,—'খুব ঘুমিয়েছি। আমার পাঁচ-ছ ঘণ্টার বেশী ঘুম দরকার হয় না।'

আমি উঠে তাঁর হাত থেকে চা নিলুম। পিউয়ের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলুম। নিচু গলায় কথা হতে লাগল।

তিনি বললেন, 'চা কেমন হয়েছে?'

বললুম, 'ভাল।'

'সঙ্গে কিছু খাবে? দুটো বিস্কুট?'

'না।'

'পিউ রাত্তিরে জেগেছিল?'

'না। একবার নড়েওনি।'

'আর বোধ হয় ভয়ের কিছু নেই।'

'না।'

'আজ থেকে আবার আমাকে কাজে বেরুতে হবে। সাত দিন কাজের কথা ভাবতে পারিনি।'

ভাবলুম তিনি যদি আমাকে 'কি দিয়ে ভাত খেলে' জিগ্যেস করতে পারেন, আমিই বা জিগ্যেস করব না কেন—'কী কাজ করেন?'

জিগ্যেস করলুম। তিনি অশিষ্ট প্রশ্ন লক্ষ্যই করলেন না, বললেন, 'ঠিকেদারি। ইট আর কাঠের ব্যবসা।'

আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ইট আর কাঠের ব্যবসায় কত টাকা রোজগার করেন শঙ্খনাথবাবু!

তিনি বললেন, 'আজ থেকে বেরুতেই হবে। নিজের কাজ নিজে না দেখলে পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খায়।'

আমি বললুম, 'আজ থেকে আমাকেও দরকার হবে না।'

তিনি চোখ বিস্ফারিত করে আমার পানে চেয়ে রইলেন,—'দরকার হবে না! তুমি না এলে রাত্তিরে পিউকে দেখবে কে?'

বললুম, 'যে এতদিন দেখেছে সে দেখবে। কলাবতী দেখবে। পিউ ত এখন সেরে গেছে।'

'সেরে গেলেও কলাবতীর হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না।'

'তাহলে আপনি মেয়ের জন্যে গভর্নেস্ রাখুন।'

'গভর্নেস্! না প্রিয়দম্বা, ওসব সাহেবী কাণ্ডকারখানা আর নয়, এমনিতেই সাহেবিয়ানার ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আমি একজন ভালগোছের ঝিয়ের তল্লাশ করছি। যতদিন না পাই, তুমি এসো। লক্ষ্মীটি। তুমি না এলে রাত্তিরে আমি ঘুমতে পারব না।' শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর বড় করুণ শোনাল। যে-পুরুষ স্ত্রীর ওপর নির্ভর করতে পারে না তার অবস্থা সত্যিই শোচনীয়।

একটু হেসে বললুম, 'মিছিমিছি পঞ্চাশ টাকা রোজ খরচ করবেন?'

তিনি অবহেলাভরে বললেন, 'করলেমই বা। আমি বছরে সওয়া লাখ দেড় লাখ টাকা রোজগার করি। ও আমার গায়ে লাগে না।'

সওয়া লাখ—দেড় লাখ। ইটকাঠের ব্যবসায়! আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি আমার হাত থেকে খালি পেয়ালা নিয়ে সাগ্রহে বললেন, 'তাহলে রাজী? যতদিন ভাল ঝি না পাই ততদিন আসবে?'

'আসব।'

শঙ্খনাথবাবু আহ্লাদে আটখানা হয়ে পেয়ালা রাখতে চলে গেলেন। আমি আবার গিয়ে বসলুম। এই মেয়েটাকেই আমার ভয়। জাদু জানে ও, আমাকে মোহের জালে জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করছে।

ছোট ছেলেমেয়ে কার না ভাল লাগে? বিশেষত যদি পিউয়ের মতন সুন্দর হয়। কিন্তু এ তা নয়। পিউকে দেখে অবধি আমার মনের মধ্যে কী একটা ঘটতে আরম্ভ করেছে।...পঁচিশ বছর বয়সে এ সব কেন? যা হবার নয় তার জন্যে লোভ কেন? প্রিয়ংবদা ভৌমিক, সাবধান! পরের সোনা দিও না কানে—

বেলা আটটার সময় ডাক্তার এলেন। পিউকে পরীক্ষা করে বললেন, 'আর ওষুধ খাওয়াবার দরকার নেই। যে শিশিটা চলছে সেটা শেষ হলেই বন্ধ করে দেবেন। কাল থেকে আমারও আর আসবার দরকার নেই।'

শঙ্খনাথবাবু বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন, বললেন, 'ধন্যবাদ ডাক্তার। প্রিয়দম্বাকে আমি আরও কয়েকদিন আসতে বলেছি।'

ডাক্তার মুচকি হেসে আমার পানে তাকালেন,—'বেশ ত।' তাঁর হাসির আড়ালে একটা গোপন প্রশ্ন রয়েছে মনে হল।

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'তাহলে চল প্রিয়দম্বা, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি কাজে চলে যাব।'

ডাক্তার বললেন, 'আচ্ছা, আমি তাহলে চলি।'

ডাক্তার মুচকি হেসে চলে গেলেন। আমি পিউয়ের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। পিউ জেগে আছে; আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দুহাত বাড়িয়ে দিল। আমি তাকে কোলে তুলে নিলুম। সে একটু আদুরে আদুরে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'কলা খাব।' যেন আমার অনুমতি চাইছে।

আমি হেসে উঠলুম, 'কলা খাবে ত আমার কাছে এসেছ কেন? যাও কলার কাছে।'

কলাবতী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে হাত বাড়াল। পিউ কিন্তু তখনই তার কাছে গেল না; আমার গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুক্ করে একটু শব্দ করল। বোধ হয় অনুমতির জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাল।

শঙ্খনাথবাবু হা-হা করে হেসে উঠলেন। আমার চোখে কিন্তু জল এল। আমি তার গালে তাড়াতাড়ি একটি চুমু খেয়ে তাকে কলাবতীর কোলে দিলুম। শঙ্খনাথবাবু তখনও হেসেই চলেছেন।

এতে হাসির কী আছে এত? একটু বিরক্ত হয়েই বললুম, 'চলুন এবার।'

'চল।'

মোটরে আসতে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল।

আমরা দু'জনেই মোটরের পিছনের সীটে বসেছিলুম; তিনি এক কোণে, আমি অন্য কোণে। তিনি আমাকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে একটু অনুনয়ের সুরে বললেন, 'প্রিয়দম্বা তুমি রাগ করেছ?'

আমি রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইলুম। রাগ অবশ্য আমি করিনি, কার ওপরেই বা রাগ করব? কিন্তু মনটা কেমন যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। ডাক্তারের সামনে আমাকে 'প্রিয়দম্বা' বলে না ডাকলেই কি চলত না? তারপর, পিউ যদি আমাকে চুমু খেয়েই থাকে তাতে হাসির কী আছে! কী রকম যেন সব!

শঙ্খনাথবাবু আবার বললেন, 'তুমি রাগ করো না প্রিয়দম্বা। পিউয়ের ওই স্বভাব, যাকে ওর ভাল লাগে তাকেই চুমু খায়।'

কী উল্টো-বোঝা মানুষ! আমি যেন ওই জন্যেই রাগ করেছি। বললুম, 'পিউ একরত্তি মেয়ে, ও যাই করুক দোষ হয় না। কিন্তু আপনি ত ছেলেমানুষ নন, আপনি অমন করেন কেন?'

তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়ল,—'আমি কী করেছি?'

এইবার সত্যিসত্যি আমার মাথায় রাগ চড়ে গেল। বললুম, 'আপনি আমায় 'প্রিয়দম্বা' বলেন কেন? মিস্ ভৌমিক বলতে পারেন না?'

তিনি হেসে উঠলেন, 'এই জন্যে রাগ? কিন্তু মিস্ ভৌমিক বলব কেন? ওসব বিলিতি ঢঙ আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া মিস্ ভৌমিক বললেই মনে হয় পঞ্চাশ বছরের বুড়ী। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে নাম ধরে ডাকাই ত ভাল।'

রাগ আরও বেড়ে গেল, বললুম, 'আমি মোটেই ছেলেমানুষ নই, পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় হতে পারেন, কিন্তু আমাকে 'তুমি' বলে ডাকবার অধিকার আপনার নেই।'

তিনি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, বললেন, 'তবে কী বলে ডাকব?'

'আপনি বলবেন। আমি আপনাকে 'আপনি' বলি, আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন কেন?'

'কিন্তু—কিন্তু—কমবয়সী মেয়েকে আপনি বলব কী করে? ভদ্রসমাজে বলে শুনেছি; ষাট বছরের বুড়ো আঠারো বছরের মেয়েকে 'আপনি' বলে। কিন্তু আমার যে অভ্যেস নেই।'

'তবে অভ্যেস করুন। ভদ্রসমাজে থাকতে গেলে ভদ্র ব্যবহার অভ্যেস করতে হয়।'

তিনি কিছুক্ষণ ঘাড় গুঁজে চুপ করে রইলেন, ভাবলুম খোঁচা খেয়ে আহত হয়েছেন। তারপরই তিনি মুখ তুলে বললেন, 'আচ্ছা, এক কাজ কর না। আমি তোমাকে 'তুমি' বলি, তুমিও আমাকে 'তুমি' বল। তাহলে ত আর কোনও গোল থাকবে না। কেমন, বলবে?'

তখনও আমার রাগ পড়েনি, বললুম, 'বলবই ত।'

তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ বেশ। লোকে শুনলে মনে করবে আমি তোমার পিসে-মেসো গোছের আত্মীয়। কেউ কিছু মনে করবে না।'

গাড়ি এসে আমার বাসার সামনে থামল। আমি নামবার উপক্রম করছি তিনি আমার হাতে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'ঠিক ন'টার সময় গাড়ি আসবে। তৈরি থেকো।'

আমি নেমে পড়লুম। তিনি গলা বাড়িয়ে বাসাটা এক নজরে দেখে নিলেন। তারপর

গাড়ি চলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আমার আর রাগ রইল না, মনটা হঠাৎ যেন হেসে লুটিয়ে পড়ল। কী ছেলেমানুষিই করলুম!

শুক্লা বোধ হয় ওপরের বারান্দা থেকে গাড়ি আসতে দেখেছিল, সিঁড়ির দরজা খুলে দিল। তার মুখ দেখে থমকে গেলুম। মুখ শুকনো, চোখ ছলছল করছে। মুখে হাসি টেনে এনে বলল, 'এত দেরি হল যে? সকালবেলা কিছু খেয়েছিস?'

বললুম, 'খেয়েছি। জামাইবাবু এসেছিলেন?'

সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। আয়, চা তৈরি করে তোর পথ চেয়ে আছি।'

দুজনে বসবার ঘরে গেলুম। শুক্লা এক প্লেট নিমকি ভেজে চা ভিজিয়ে টি-পটে টি-কোজি ঢাকা দিয়ে রেখেছে। আমি নিমকি নিলুম না, এক পেয়ালা চা ঢেলে নিয়ে শুক্লার সামনে বসলুম, বললুম, 'এবার বল্ কী হয়েছে।'

শুক্লা আর আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করল না, কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'ভাই, দুর্ভাবনায় কাল সারা রাত্তির ঘুমুতে পারিনি।'

শুক্লা তখন আস্তে আস্তে সব বলল। কাল রাত্রে ডক্টর দাস আন্দাজ পৌনে এগারোটার সময় এসেছিলেন। খাওয়াদাওয়া সবে সারা হয়েছে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। শুক্লা টেলিফোন ধরল। অচেনা পুরুষের গলায় কে তাকে প্রশ্ন করল, 'ডক্টর দাস আছেন?'

শুক্লা একেবারে কাঠ হয়ে গেল। কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বলল, 'কে ডক্টর দাস?'

টেলিফোনে উত্তর এল, 'ডক্টর নিরঞ্জন দাস, গাইনকোলজিস্ট্।'

শুক্লা ইতিমধ্যে একটু সামলে নিয়েছে, বলল, 'তিনি ত এখানে নেই। আপনি কে?'

টেলিফোনে একটু হাসির আওয়াজ এল। তারপর আর সাড়াশব্দ নেই, যে ফোন করছিল সে ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

শুক্লা ডক্টর দাসকে বলল। শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। বলে গেলেন, 'কেউ জানতে পেরেছে। হয়ত খোঁজ নিতে আসবে।'

তিনি চলে যাবার পর শুক্লা সারারাত প্রায় জেগেই কাটিয়েছে। কিন্তু কেউ আসেনি, টেলিফোনও করেনি।

যে লোকটা টেলিফোন করেছিল তার গলার স্বর আর কথা বলবার ভঙ্গী থেকে তাকে ভদ্রশ্রেণীর লোক বলে মনে হয়। কে লোকটা? হয়ত ডক্টর দাসের কোন গুপ্তশত্রু জানতে পেরেছে তিনি রাত্রে এখানে আসেন। কিন্তু টেলিফোন করার মানে কী? তার যদি শত্রুতা করাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে এখানে টেলিফোন না করে ডক্টর দাসের স্ত্রীকে টেলিফোন করলেই ত পারত। হয়ত এখানে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল, তারপর ডক্টর দাসের স্ত্রীকে খবর দিয়েছে। এখন সেই রণরঙ্গিণী মহিলাটি যদি এখানে এসে উপস্থিত হন তাহলেই চরম।

কিন্তু কিছু করবার নেই, চুপটি করে দুর্যোগের প্রতীক্ষা করতে হবে। উঃ, কী ছোটলোক এই মানুষ জাতটা! তাদের সংসর্গে এক দন্ড শান্তি নেই। এর চেয়ে বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে বনে বাস করা ভাল।

শুক্লা ম্লান হেসে বলল, 'ভেবে আর লাভ কী, যা হবার তাই হবে। তুই যা, স্নান করে একটু ঘুমিয়ে নে।'

মনটা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে কিছু ভাল লাগছিল না। চায়ের পেয়ালা রেখে উঠে দাঁড়ালুম। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। শুক্লা টেলিফোনের কাছে ছিল, সে যন্ত্রটি তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যালো—'। তারপরই তার চোখ দুটো দপ করে উঠল। কিছুক্ষণ কথা শুনে সে নিঃশব্দে টেলিফোন আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, অর্থাৎ আমার কল্। কিন্তু তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে রইল।

টেলিফোন কানের কাছে ধরতেই আওয়াজ এল—'মিস্ ভৌমিক? আমার গলা বোধ

হয় চিনতে পারছেন না? ডক্টর কর—মন্মথ কর।'

'ওঃ' বলে আর কিছু বলতে পারলুম না, মুখে কথা জোগালো না। হঠাৎ বুক ঢিবঢিব করে উঠল। ভেবেছিলুম নেকড়ে বাঘ আর অজগর সাপের ভয় কেটে গেছে। কাটেনি এখনও।

ডক্টর কর সরল কণ্ঠে বললেন, 'শঙ্খনাথবাবুর বাড়িতে আপনার সঙ্গে ভাল করে কথা বলার সুযোগ হল না, মিস্ ভৌমিক। শঙ্খনাথবাবু লোকটি বেশ ভাল, টাকাকড়ির ব্যাপারে মুক্তহস্ত। আপনি প্রাপ্য টাকা পাচ্ছেন ত? আমিই আপনাকে এন্‌গেজ্ করিয়েছিলাম, আমার এ বিষয়ে একটা দায়িত্ব আছে; তাই জিগ্যেস করছি।'

বললুম, 'হ্যাঁ, টাকা পাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ।'

তিনি বললেন, 'না না, ধন্যবাদ কিসের। আপনাকে সেই ছাত্রাবস্থা থেকে চিনি, এ ত আমার কর্তব্য। কিন্তু ও-কথা থাক। মিস্ ভৌমিক, মনে আছে, অনেক দিন আগে আমি আপনাকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলাম? আপনি তখন নেমন্তন্ন রক্ষে করেননি। বাট্ ইট্স্ নেভার টু লেট টু মেন্ড্। আসুন না একদিন একসঙ্গে চা খাওয়া যাক। কী বলেন? আপনিও আর ছেলেমানুষ নয়, আমিও একজন দায়িত্বশীল ডাক্তার। সুতরাং কেউ কিছু মনে করবে না।'

আমি তোতলা হয়ে গেলুম,—'তা—তা—নেমন্তন্নর জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এখন ত আমার ছুটি নেই ডক্টর—মানে—সারা রাত জাগতে হয়—'

ডক্টর কর শান্তস্বরে বললেন, 'বেশ ত, তাড়া নেই। আপনার যখন ছুটি থাকবে তখন হবে। দু-চার দিন পরে আবার আমি ফোন করব। আপনি যাঁর সঙ্গে থাকেন তিনি বুঝি আপনার বান্ধবী? কী নাম বলেছিলেন মনে পড়ছে না।'

'শুক্লা সেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তিনিও ত নার্স। বিবাহিতা কি?'

আমার গলা শুকিয়ে গেল। বললুম, 'না।'

তিনি বললেন, 'তাঁকেও আপনার সঙ্গে নেমন্তন্ন করতাম। কিন্তু জানেন ত—টু ইজ্ কম্পানি, থ্রী ইজ্ এ ক্রাউড। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। নমস্কার।'

ফোন রেখে দিলুম। শুক্লা এতক্ষণ একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে ছিল, প্রশ্ন করল, 'মন্মথ কর?'

আমি ঘাড় নাড়লুম। সে আবার প্রশ্ন করল, 'চায়ের নেমন্তন্ন?'

আমি আবার ঘাড় নেড়ে বললুম, 'তুই ফোন তুলে অমন চমকে উঠেছিলি কেন?'

সে খানিক আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে শুকনো মুখে বলল, 'আজ মন্মথ করের গলা শুনে মনে হল কাল রাত্রে যে ফোনে কথা বলেছিল তারই গলা।'

২০ শ্রাবণ।

কাল ডায়েরি লেখা শেষ হল না।

শুক্লার সঙ্গে ওই কথা নিয়ে তোলাপাড়া করতে করতে বেলা বেড়ে গেল, তখন একেবারে নাওয়া-খাওয়া সেরে শুতে গেলুম। শুক্লার আজ দুপুরে কাজ, সে বেরিয়ে গেল। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, কাল যে ফোন করেছিল সে যদি মন্মথ কর হয় তবে তার মতলব কী? ব্ল্যাকমেল?...

ঘুমিয়ে উঠে ডায়েরি লিখতে বসেছিলুম, লেখা শেষ হবার আগেই দেখি আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলুম। ঠিক ন'টার সময় গাড়ি এল।

গিয়ে দেখি, পিউয়ের ঘরে শঙ্খনাথবাবু আছেন, দোরের পাশে কলাবতী হাঁটু উঁচু করে বসে আছে; পিউ বিছানায় বসে পুতুল নিয়ে খেলা করছে। আমাকে দেখে শঙ্খনাথ-

বাবু বললেন, 'দেখ একবার কাণ্ড। পিউ এখনও ঘুমোয়নি।'

জিগ্যেস করলুম, 'খেয়েছে?'

কলাবতী দাঁত বার করে ঘাড় নাড়ল। আমি তখন পিউয়ের কাছে গিয়ে একটু ধমকের স্বরে বললুম, 'পিউ, তুমি এখনও ঘুমোওনি?'

পিউ আমার পানে মুখ তুলে মিষ্টিমিষ্টি দুষ্টু-দুষ্টু হাসি হাসল, কচি দাঁতগুলি ঝিকমিক করে উঠল। তার এই হাসি দেখে বুঝলুম তার মনের ওপর থেকে রোগের ছায়া সরে গেছে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে।

তারপর সে পুতুল ফেলে আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল।

কোলে তুলে নিলুম। সে আমার গলা জড়িয়ে কাঁধে মাথা রাখল।...মেয়েটাকে কোলে নিলে বুক জুড়িয়ে যায়।

তাকে নিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করবার পর বিছানায় শুইয়ে দিলুম। সে তখনও জেগে আছে, কিন্তু চোখ দুটো ঘুমে ভরে উঠেছে। পাখির মতন মৃদু কূজন করে বলল, 'ঘুমুই?'

'ঘুমোও' বলে আমি তার গায়ে হাত রাখলুম।

আশ্চর্য, এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি বিছানার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শঙ্খনাথবাবুর দিকে চাইলুম; তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'পিউ তোমার জন্যেই জেগে ছিল।'

এই সময় দোরের কাছে এক অপরূপ মূর্তির আবির্ভাব হল। পিউয়ের মা যে আজ বাড়িতেই আছে তা জানতুম না। দেখলুম আটপৌরে ঘরোয়া পোশাকেও তাকে কম মানায়নি। সাদাসিধে ঢিলেঢালা সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ, তার ওপর একটি জাপানী কিমোনো, পায়ে লাল মখমলের স্লিপার, চুলগুলি একটু শিথিল। গায়ে গয়না নেই, কেবল গলার কণ্ঠিতে কাঁইবিচির মতন একটি চুনি ধক্‌ধক্ করছে।

এত রূপ! শুক্লার মুখে গান শুনেছি—ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়। এ যেন তাই। কিন্তু গুণ কি একটিও নেই?

শঙ্খনাথবাবুর পানে আড়চোখে তাকালুম। তিনিও সলিলার পানে চেয়ে আছেন; তাঁর চোখে আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটা দ্বন্দ্ব চলছে। তৃষ্ণা আর বিতৃষ্ণা একসঙ্গে। কী অদ্ভুত এদের সম্পর্ক।

'আমার কাজ আছে—নীচে যাচ্ছি'—এই বলে শঙ্খনাথবাবু চলে গেলেন। সলিলা তাঁর পানে একবার তাকালও না।

আজ সে বেড়াতে বেরোয়নি কেন কে জানে। হয়ত নেচে নেচে হাঁপিয়ে পড়েছে, একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

শঙ্খনাথবাবু বেরিয়ে যাবার পর সলিলা পিউয়ের খাটের পাশে এসে দাঁড়াল, হাসি-হাসি মুখে পিউয়ের পানে একবার তাকিয়ে বলল, 'পিউ ঘুমিয়েছে?'

বললুম, 'হ্যাঁ, এই ঘুমোল।'

সলিলা আমার পানে প্রশংসা-ভরা চোখে চাইল, একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, 'কী সুন্দর আপনার জীবন! শিশুর সেবা!' তার কথাগুলি মুখে মিলিয়ে গেল।

শুধু শিশু নয়, দরকার হলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও সেবা করে থাকি—একথা আর বললুম না। এবং আমার কর্মজীবনে সুন্দর যদি কিছু থাকে তা সম্পূর্ণ আকস্মিক, একথা বলেও কোন লাভ নেই। বললুম, 'সুন্দর কি না জানি না, কিন্তু আমার ভাল লাগে।'

সলিলার চোখের প্রশংসা আরও গাঢ় হল, সে বলল, 'আপনাকে হিংসে হয়।'

মনে মনে আশ্চর্য হলুম। সলিলা আমাকে হিংসে করে! কিন্তু আসল কথাটা কী? আমার মতন সামান্য নার্সের কাছে লক্ষপতির স্ত্রী সলিলা কী চায়? হয়ত কিছুই চায়

না, কথা কইবার একজন লোক চায়। কিংবা—অপরিচিতের কাছে, নিজেকে ভাল মেয়ে প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছে মেয়েদের স্বাভাবিক ধর্ম. হয়ত সলিলা সেই চেষ্টাই করছে।

সে বলল, 'আচ্ছা, আপনার সত্যিকার নামটি কী বলুন ত? শঙ্খ-ডার্লিং কী একটা অদ্ভুত কথা বলে—'

বললুম, 'প্রিয়দম্বা। আমার সত্যিকার নাম প্রিয়ংবদা।'

সে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল—'প্রিয়ংবদাকে প্রিয়দম্বা বলে! পুওর শঙ্খ, হাউ ফানি হি ইজ্!'

মনে মনে ভাবলুম, ফানি বইকি. ভীষণ ফানি। কিন্তু তার চেয়েও ফানি, তুমি স্বামীকে শঙ্খ-ডার্লিং বল।

জিগ্যেস করলুম. 'মাফ করবেন. আপনি কি বিলেতে মানুষ হয়েছেন?'

সলিলা মুখখানি করুণ করে বলল. 'বিলেত যাওয়া আর হল কই! এত যাবার ইচ্ছে, কিন্তু শঙ্খর মত নেই! হ্যাজব্যান্ডস্ আর ফানি. ডোণ্ট্ ইউ থিঙ্ক?'

হেসে বললুম, 'জানি না। আমার বিয়ে হয়নি।'

এই সময় কলাবতীর ওপর চোখ পড়ল। সে দোরের পাশে হাঁটু তুলে বসে সলিলার পানে তাকিয়ে আছে। একটা দাসীর চোখে গৃহস্বামিনীর প্রতি এতখানি ঘৃণা আর অবজ্ঞা আমি আগে দেখিনি, দেখলে চমকে উঠতে হয়।

সলিলার কিন্তু সেদিকে নজর ছিল না, সে বলল, 'বিয়ে হয়নি! হাউ লাকি ইউ আর। আসুন না আমার ঘরে, খানিক বসে গল্প করা যাক।'

বললুম, 'কিন্তু পিউ—'

'কলাবতী ততক্ষণ পিউকে দেখবে।'

পিউ ঘুমুচ্ছে, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে হাসি-গল্প করলে সে জেগে উঠতে পারে। বললুম, 'চলুন।'

কলাবতীকে ডেকে বললুম, 'তুমি পিউয়ের কাছে একটু থাক, আমি আসছি।'

'আসুন' বলে সলিলা এগিয়ে চলল, আমি পিছু পিছু গেলুম। দেখাই যাক না ওর মনে আরও কী আছে।

সলিলা আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। বারান্দার শেষ প্রান্তে ঘরটি, মৃদু নৈশ দীপ জ্বলছে। ঘুম-নগরের রাজকুমারী যে-ঘরে শুয়ে ঘুমুতেন, এ যেন সেই ঘর। সলিলা সুইচ টিপে কয়েকটা উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দিল, ঘরটি ঝলমল করে উঠল।

চৌকশ ঘর, লম্বায় চওড়ায় বোধহয় বিশ ফুট। ঝকঝকে নতুন আসবাব দিয়ে সাজান। প্রত্যেক দেয়ালে বড় বড় আয়না, তা ছাড়া একটি অপূর্ব ড্রেসিং-টেবিল। ঘরের মাঝখানে খাট। কিন্তু জোড়া-খাট নয়, একজনের শোবার মতন খাট। বিছানায় পুরু সিল্কের বেড্-কভার পাতা।

ঘরের দু'পাশে দুটি পর্দা-ঢাকা দোর। ঘর দুটিতে কী আছে দেখতে পেলুম না; একটি বোধহয় বাথরুম, অন্যটি হয়ত শঙ্খনাথবাবুর শোবার ঘর।

ড্রেসিং-টেবিলের কাছে কয়েকটি গদিমোড়া উঁচু তাকিয়ার মতন আসন রয়েছে; সলিলা একটিতে আমাকে বসতে বলল, আর একটিতে নিজে বসে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় নিজের মুখ একবার দেখে নিল; হাসিমুখে বলল, 'এটা আমার শোবার ঘর।'

তা না বললেও চলত। তবু এটা শঙ্খনাথবাবুরও শোবার ঘর কি না তাই জানবার জন্যে মন উসখুস করছে। কিন্তু জিগ্যেস করা ত যায় না।

বললুম, 'সুন্দর আপনার ঘরটি।'

সে তৃপ্তি-ভরা চোখে একবার ঘরের চারিদিকে তাকাল, বলল, 'মনের মতন করে সাজাতে কী কম খরচ হয়েছে! দশটি হাজার টাকা।'

তা হবে। আমি কেমন করে জানব! বললুম, 'টাকা থাকলে ভাল বাড়ি করা যায়,

সাধ মিটিয়ে বাড়ি সাজান যায়।'

কথাটা সলিলার বোধহয় খুব মনঃপূত হল না, সে একটু বিমনা হয়ে বলল, 'তা হয়ত যায়। কিন্তু সব সাধ কী টাকায় মেটে?'

খুবই উচ্চাঙ্গের কথা। কিন্তু সলিলার কোন্ সাধটা মেটেনি জানবার জন্যে ভুরু তুলে তার পানে চাইলুম। সে বলল, 'টাকায় কি স্বাধীনতার সাধ মেটে? ধরুন না কেন আপনি। আপনার স্বাধীনতা আছে, যখন যা ইচ্ছে করতে পারেন। সবাই কি তা পারে?'

ও, ব্যথা তবে ওইখানে। স্বাধীনতার অভাব। স্বামীর টাকায় বড়মানুষি করব, কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় চলব! যখন যা ইচ্ছে করতে পারাটাই স্বাধীনতা। বললুম, 'আমার স্বাধীনতা আছে বটে কিন্তু যখন যা ইচ্ছে করতে পারি না। তার জন্যে টাকা চাই। ভগবান বোধহয় সকলের সব সাধ মেটাতে ভালবাসেন না।'

আমার দিকে একটা বাঁকা কটাক্ষ হেনে সে আয়নার দিকে চোখ ফেরাল, তাচ্ছিল্য-ভরে বলল, 'যাকগে ওসব কথা, মন খারাপ করে লাভ কি? আমার চুলগুলো কি বিশ্রী হয়ে আছে!'

সে উঠে গিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার মুখোমুখি বসল, চুলগুলোকে আরও একটু আল্‌গা করে দিয়ে হাল্কাভাবে বুরুশ চালাতে লাগল। চুল খুব লম্বা নয়, কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা; কিন্তু রেশমের মতন নরম আর উজ্জ্বল।

আমি বসে বসে তার চুলের প্রসাধন দেখতে লাগলুম। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর নানা জাতের নানা রঙের শিশি-বোতল কৌটো সাজান; তেল সেণ্ট্ ক্রীম পাউডার, আরও কত কী। যা কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু একটি জিনিস সেখানে নেই; পিউ কিংবা শঙ্খনাথ-বাবুর ফটোগ্রাফ নেই। ঘরে কোথাও স্বামী বা মেয়ের ছবি নেই; ঘরে স্বামীর বা মেয়ের ছবি রাখেনি সলিলা। কী জানি, যারা সর্বদা চোখের সামনে রয়েছে তাদের ছবি দরকার নেই বলেই বোধহয় রাখেনি। শুনেছি ড্রেসিং-টেবিলে প্রিয়জনের ছবি রাখা বিলাতী রীতি।

আর-একটি জিনিস নেই। সিঁদুরকৌটো। আগেও লক্ষ্য করেছিলুম সলিলা সিঁথিতে সিঁদুর পরে না। টেবিলে গালে মাখবার রুজ আছে, ঠোঁটে লাগাবাব সোনা-বাঁধানো লিপস্টিক আছে; কিন্তু সিঁদুরকৌটো নেই। ওদের প্রগতিশীল সমাজে সিঁদুর পরা বোধহয় ঘোর কুসংস্কার।

চুল বুরুশ করা শেষ হলে সলিলা টেবিল থেকে একটি সেণ্টের শিশি তুলে নিয়ে তার কাচের ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকলো, তারপর আয়নার ভিতর দিয়ে আমার পানে চেয়ে বলল, 'দেখি আপনার রুমাল!'

ভাগ্যে হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে একটা পাট-না-ভাঙা রুমাল ছিল, বার করে দিলুম। সলিলা সেটাতে এসেন্সের ছিটে দিয়ে বলল, 'এবার শুঁকে দেখুন। কেমন গন্ধ?'

সত্যি কী গন্ধ! অতি মৃদু গন্ধ, কিন্তু নেশা লেগে যায়; মনে হয় বসন্তের সমস্ত ফুল ওই শিশির মধ্যে তাদের মধু ঢেলে দিয়েছে। বললুম, 'অপূর্ব গন্ধ।'

সলিলা হেসে আমার দিকে ফিরল, শিশিটি দুই আঙুলে তুলে ধরে বলল, 'কত দাম জানেন? এই শিশিটির দাম আড়াই শো টাকা।'

হবেও বা। কিন্তু দাম শুনে গন্ধের মাধুর্য যেন কমে গেল। সলিলা মৃদু হেসে বলল, 'আমার একটি বন্ধু উপহার দিয়েছে।'

বন্ধু! নিশ্চয় পুরুষ-বন্ধু। মেয়ে-বন্ধু এত দামী জিনিস উপহার দেবে না; অন্তত ওদের সমাজের মেয়ে দেবে না। আমি হেসে ঘাড় নাড়লুম। শঙ্খনাথবাবুর মনের ভাব কতকটা যেন বুঝতে পারছি।

সলিলা হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, আপনি ত স্বাধীন, আপনার নিশ্চয় অনেক বন্ধু আছে?'

স্বাধীনতার সঙ্গে বন্ধুর নিশ্চয় গাঢ় সম্পর্ক আছে। আমি সাবধানে প্রশ্ন করলুম, 'কোন্ বন্ধুর কথা বলছেন? পুরুষ-বন্ধু? না মেয়ে-বন্ধু? আমার একটি বান্ধবী আছে।

তার নাম শুক্লা—'

'না, না, পুরুষ-বন্ধু। মানে ইয়ং মেন—'

আমি দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললুম, 'ও-রকম বন্ধু আমার একটিও নেই।'

অবাক হয়ে সলিলা বলল, 'একটিও না?'

'একটিও না। তবে একজন পরম বন্ধু আছেন, তাঁর বয়স কিন্তু চল্লিশের ওপর। তিনি কোনদিন আমাকে চায়ের নেমন্তন্ন পর্যন্ত করেননি, সিনেমা দেখতেও নিয়ে যাননি।'

সলিলা চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল, বোধহয় বিশ্বাস করল না।—'কিন্তু—শুনেছি —নার্সদের সঙ্গে ইয়ং ডক্টরদের ভাব-সাব থাকে—আপনি ত দেখতে শুনতে ভালই—' কথাটা ঠিক রুচিসম্মত হল না ভেবেই সে বোধহয় থেমে গেল।

'একজন ইয়ং ডক্টর ভাব-সাব করবার চেষ্টা করেছিলেন, এখনও করছেন; কিন্তু সুবিধে করতে পারছেন না।—আচ্ছা, এবার পিউয়ের কাছেই যাই। আপনার বোধহয় ঘুমুবার সময় হল।' বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

সলিলাও উঠল। বলল, 'না না, তার এখনও ঢের দেরি। আসুন, আমার ড্রেসিং-রুম দেখবেন না?'

নিরুপায় হয়ে বললুম, 'চলুন দেখি।'

সলিলার স্বাধীনতার সাধ মেটেনি বলেই বোধহয় আমাকে তার ঐশ্বর্য দেখিয়ে বড়-মানুষির সাধ মেটাতে চায়। যার সারা অঙ্গে এত রূপ তার মন এত খেলো কেন? সেখানে কি এতটুকু লাবণ্য থাকতে নেই?

পর্দা সরিয়ে সলিলা আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটি শোবার ঘরের চেয়ে ছোট। দেয়ালের গায়ে সারি সারি ওয়ার্ড্রোব, সবগুলির কপাটে আয়না লাগান। একটা দেয়ালে লম্বা তাকের ওপর প্রায় তিরিশ জোড়া জুতো। কত রঙের কত ঢঙের জুতো; লাল সাদা নীল সোনালী; কোনটা হাই-হিল, কোনটা হিললেস, কোনটা নাচের পাম্প। জুতোর বাহার দেখেই চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

তারপর সলিলা একে একে ওয়ার্ড্রোবগুলি খুলে খুলে আমাকে দেখাতে লাগল। কোনটিতে শাড়ি ব্লাউজ, কোনটিতে শালোয়ার পায়জামা ওড়না; অন্তর্বাস বহির্বাস, কাঁচুলি ব্রাসেয়ার, আরও কত কী। বলে শেষ করা যায় না।

মুগ্ধ হয়ে দেখছি, তবু মনটা ছটফট করছে। পরের ঐশ্বর্য দেখে আমার কী লাভ? এসব জামাকাপড় পোশাক পরিচ্ছদ আমি ত কোনদিন কিনতে পারব না। এসব জিনিস আমার কাছে আকাশের চাঁদের চেয়েও দুষ্প্রাপ্য।

আয়নার ওপর ছায়া পড়ল। শঙ্খনাথবাবু দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। সলিলাও তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, চট করে ওয়ার্ড্রোবের কপাট বন্ধ করে বলল, 'চলুন চলুন, দেখা হয়েছে। কী-ইবা দেখবার আছে, সামান্য দু-চারটে কাপড়—' বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শঙ্খনাথবাবু বিরক্তিভরা মুখ নিয়ে তার পিছন পিছন বেরুলেন। আমি তাঁর পিছনে বেরুলুম। একটা দাম্পত্য দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছে। আমি আর দাঁড়ালুম না, সোজা গিয়ে পিউয়ের পাশে বসলুম। কলাবতী মেঝেয় বসে ঢুলছিল, তাকে বললুম, 'তুমি এবার যাও।' সে চলে গেল।

কান খাড়া করে শুনেছি। শোবার ঘর থেকে মিহি আর মোটা গলার ডুয়েট আসছে, কিন্তু কথাগুলো ধরা যাচ্ছে না। শঙ্খনাথবাবু চটলেন কেন, সলিলাই বা তাঁকে দেখে ড্রেসিং-রুম থেকে অমনভাবে পালাল কেন? শঙ্খনাথবাবু কি পছন্দ করেন না যে সলিলা তার কাপড়চোপড় অন্যকে দেখায়? কেন পছন্দ করেন না?

পনেরো মিনিট পরে শঙ্খনাথবাবু এলেন। পিউয়ের খাটের পাশে বসে গম্ভীরমুখে আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, তুমি কিছু মনে কোর না, নিজের

জাঁক দেখানো সলিলার অভ্যেস।'

তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলুম। 'চাষা-মনিষ্যি'র মনে জাঁক দেখানো সম্বন্ধে সংকোচ আছে তাহলে! বললুম, 'সব মেয়েই জাঁক দেখাতে ভালবাসে, নিজের গয়না-কাপড় দেখাতে ভালবাসে। এতে মনে করার কী আছে?'

তিনি বললেন, 'তুমি দেখাতে ভালবাস?'

'আমার থাকলে ভালবাসতুম।'

'হুঁ'—বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন; আর কোন কথা বললেন না, পিউয়ের পানে একবার চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমার নিশি-জাগরণ আরম্ভ হল। আজও বই আনতে ভুলে গেছি। বসে বসে ভাবছি ...এ ভাবে আর কতদিন চলবে? সুস্থ মেয়েকে রাত জেগে পাহারা দেওয়া কি নার্সের কাজ?...সলিলা...মেয়ের কথা ভাবে না, স্বামীর কথা ভাবে না...এত পেয়েও তবু তৃষ্ণার শেষ নেই। সে নির্বোধ নয়, বুদ্ধি আছে; কিন্তু তার বুদ্ধিকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অন্ধ ভোগতৃষ্ণা...এর শেষ কোথায়? চিরদিন ত রূপযৌবন থাকবে না, তখন ও কী করবে? .. আর শঙ্খনাথবাবু? গরিবের ছেলে, নিজের চেষ্টায় বড়মানুষ হয়েছেন; কিন্তু মন মধ্যবিত্ত রয়ে গেছে। সাদাসিধে আটপৌরে মন, এখনও বড়মানুষির আঁচ মনে লাগেনি। কিন্তু লাগতে কতক্ষণ!

পিউ একটু উসখুস করল। তাকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিলুম, সে আবার শান্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল।

একটা—দুটো—তিনটে। রাত শেষ হয়ে আসছে। আজ কেন জানি না একটু ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। আমি রাতের পর রাত জেগে সেবা করেছি, কখনও ক্লান্তি আসেনি। আজ ক্লান্ত মনে হচ্ছে; দেহের ক্লান্তি কি মনের ক্লান্তি বুঝতে পারছি না। কিন্তু যাকে সারা-জীবন এই কাজ করতে হবে, তার ক্লান্তি এলে চলবে কেন? ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

সাড়ে তিনটের সময় দোরের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি শঙ্খনাথবাবু দু'পেয়ালা চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন; মুখে একটু হাসি। উঠে গিয়ে তাঁর হাত থেকে চা নিলুম। বললুম, 'আপনি রোজ রোজ এত রাত্রে আমার জন্যে চা তৈরি করে আনেন কেন? আমার দরকার হলে আমি নিজেই ত চা তৈরি করে নিতে পারি।'

তিনি বললেন, 'শুধু কি তোমার জন্যে তৈরি করেছি! শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুমুতে পারি না, তখন চা খেতে ইচ্ছে করে। নিজেই চা তৈরি করে খাই। তুমি জেগে থাক তাই তোমার জন্যেও করি।'

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম, 'ধন্যবাদ। আপনি—'

তিনি তর্জনী তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমি খানিক তাঁর হাসি-হাসি মুখের পানে চেয়ে বললুম, 'কী হল?'

তিনি বললেন, 'আমাকে 'আপনি' বলছ যে! 'তুমি' বলবার কথা। কী চুক্তি হয়েছিল?'

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। কিন্তু সত্যিই ত আর ভদ্রলোককে 'তুমি' বলা যায় না, মুখ দিয়ে বেরুবে কেন? রাগের মুখে কী বলেছিলুম, উনি সেটি মনে গেঁথে রেখেছেন।

ও-কথা এড়িয়ে বললুম, 'শঙ্খনাথবাবু, একটা কথা বলি?'

তিনি সন্দিগ্ধভাবে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, 'কী কথা?'

একটু ইতস্তত করে বললুম, 'এবার আমাকে ছুটি দিন। পিউ ত এখন সেরে গেছে—'

'কথা ছিল যতদিন না ভাল ঝি পাই ততদিন তুমি থাকবে।'

'তা সত্যি, কিন্তু কতদিনে আপনি ভাল ঝি পাবেন তার ঠিক কী? আমি—অন্য কাজও ত আছে আমার—'

'যদি আরও বেশী টাকা চাও—'

'না না, টাকার কথা নয়। টাকা আপনি যথেষ্ট দিচ্ছেন, কিন্তু—'

'বুঝেছি, সলিলার ব্যবহারে তুমি রাগ করেছ। কিন্তু পিউ ত কোন দোষ করেনি!'

আমার চোখে জল এসে পড়ল। কোনমতে সামলে নিয়ে বললুম, 'কেউ কোন দোষ করেনি। কিন্তু আমাকে আর এখানে দরকার নেই, কাল থেকে আর আমি আসব না।'

এবার তাঁর সুর কড়া হয়ে উঠল—'বেশ, আসতে না চাও এসো না। আমি কারুর ওপর জোর করতে চাই না। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি বলেই থাকতে বলেছিলাম।' এই বলে হঠাৎ চলে গেলেন।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। শঙ্খনাথবাবু এতটা অবুঝ হবেন ভাবিনি। তাঁকে অসন্তুষ্ট করে চলে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না, ভালয় ভালয় যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু উপায় কী? বাঁধন ত ছিঁড়তে হবে।

সকালে পিউ জেগে ওঠবার আগেই চলে এলুম। ইচ্ছে হল পিউয়ের ঘুমন্ত গালে একটা চুমু খাই। কিন্তু কাজ নেই মায়া বাড়িয়ে।

শঙ্খনাথবাবু গম্ভীরমুখে টাকা চুকিয়ে দিলেন, কথা কইলেন না। মোটর বাসায় পেঁছে দিয়ে গেল।

পিউয়ের কথা মনে পড়ছে আর বুকের মধ্যে টনটন করে উঠছে। আর হয়ত কোনদিন ওকে দেখতে পাব না। কিন্তু এই ভাল।

বাসায় পেঁছে দেখলুম শুক্লা কাজে বেরুচ্ছে। বলে গেল, 'এ-বেলা রান্না হল না, হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খাস। আমার ফিরতে সন্ধ্যে হবে।'

কিন্তু হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খেতে ইচ্ছে হল না। বাড়িতে ডিম ছিল, তাই দুটো সেদ্ধ করে খেলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম।

ঘুম ভাঙল পৌনে দুটোর সময়। উঠে রান্না চড়ালুম। বেশী কিছু নয়, ভাত ডাল আর একটা নিরামিষ তরকারি। শুক্লা ফিরলে দু'জনে মিলে খাব। যদি দরকার হয় হোটেল থেকে মাংস আনিয়ে নিলেই হবে।

রান্না শেষ করে ডায়েরি লিখতে বসেছি। আজ রাত্রে জামাইবাবু আসবেন কি না কে জানে! মনটা ওই ব্যাপার নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। যদি আসেন রাত্রি দশটার আগে আসবেন না। তখন ওঁর জন্যে ভাল করে রান্না করব। আজ রাত্তিরে আমার ত কোথাও যাবার নেই।

২১ শ্রাবণ।

শুক্লা ফিরল সন্ধ্যে পেরিয়ে। একটা বড় নার্সিং-হোমে নার্সের ঘাটতি হয়েছে, শুক্লা সেখানে যাচ্ছে। দিনের বেলা কাজ।

শুক্লা ইউনিফর্ম ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এল, দু'জনে খেতে বসলুম। খাওয়া শেষ হলে দু'জনে বিছানায় গিয়ে শুলুম, মুখোমুখি শুয়ে গল্প করতে লাগলুম। সেই আগের কালের মতন, যখন হস্টেলে থাকতুম। এখনও সুবিধে পেলেই আমরা ওইভাবে গল্প করি।

শুক্লাকে সলিলার কথা বললুম, শুনে সে হাসতে লাগল। আমি ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে তাকে গন্ধ শোঁকালুম, সে চোখ বুজে চুপটি করে পড়ে রইল; তারপর গুন্-গুনিয়ে গাইল,—'গগন মগন হল গন্ধে, সমীরণ মূর্ছে আনন্দে—'

আমি বললুম, 'এমন গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মরেও সুখ, কী বলিস?'

শুক্লা বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের কপালে নেই। মরণকালে আমাদের এ গন্ধ কে শোঁকাবে বল্?'

মরণকালের এখনও বোধহয় দেরি আছে। থুখুড়ি বুড়ী হয়ে যাব, তবে মরব। তখন

বুড়ী নার্সকে আড়াই শো টাকা দামের গন্ধ কে শোঁকাবে!...

এক সময় জিগ্যেস করলুম, 'হ্যাঁরে, সেই টেলিফোন আর এসেছিল?'

'না, আর আসেনি। কিন্তু যদি মন্মথ কর হয়, আর জেনেশুনে বজ্জাতি করবার জন্যে ফোন করে থাকে—'

'তাহলে?'

'তাহলে সহজে ছাড়বে না। নাছোড়বান্দা লোক। দেখছিস না, তোর আশা এখনও ছাড়েনি।'

'জামাইবাবুকে তোর সন্দেহের কথা বলেছিলি?'

'তার পর থেকে দেখাই পাইনি, বলব কাকে? টেলিফোনও করেননি।'

'আজ হয়ত আসবেন।'

রাত্রে আমরা যে-সময়ে খাই সে-সময় খেলুম না। শুক্লা ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছে, হয়ত জামাইবাবু আসবেন। রান্না তিনজনের মতই করে রাখা হয়েছে।

প্রায় পৌনে দশটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরলুম। নিশ্চয় জামাইবাবু।

মোটা গলায় আওয়াজ এল,—'হ্যালো—প্রিয়দম্বা?'

এক মুহূর্তের জন্যে থতিয়ে গেলুম, তারপর বললুম, 'শঙ্খনাথবাবু! এত রাত্রে কী খবর?'

তিনি বললেন, 'খবর আর কী, পিউ কিছুতেই ঘুমুচ্ছে না, কেবল দম্মা দম্মা বলে কাঁদছে।'

'দম্মা দম্মা বলে কাঁদছে! তার মানে?'

'বুঝতে পারলে না? তোমাকে ডাকছে। তোমার পুরো নামটা বলতে পারে না, তাই দম্মা বলে।'

ভারি রাগ হল, বললুম, 'এ আপনার কাজ, আপনি ওকে শিখিয়েছেন দম্মা বলতে!'

'আরে না না, আমি শেখাব কেন? ও যা শোনে তাই শেখে। আমাকে প্রিয়দম্বা বলতে শুনেছে, তাই—'

'যাকগে। ওকে খানিকটা ওভাল্‌টিন খাইয়ে দিন। তাহলেই ঘুমিয়ে পড়বে।'

'খাওয়াবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু খাচ্ছে না। কেবল কাঁদছে। তুমি না এলে ও ঘুমুবে না।'

কী উত্তর দেব, চুপ করে রইলুম। শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'তুমি একটিবার আসবে? গাড়ি পাঠাব?'

গলার স্বর যতদূর সম্ভব নীরস করে বললুম, 'পাঠান। কিন্তু পিউ ঘুমুলেই আমি চলে আসব।'

'আচ্ছা আচ্ছা।'

টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে গেলুম নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে শুক্লা এসে ঢুকল,—'কী রে, এখন বেরুবি নাকি?'

তাকে বললুম পিউয়ের কথা। শুনে সে বলল, 'আহা, বেচারী মায়ের আদর ত কখনও পায়নি, তাই তোকেই আঁকড়ে ধরেছে। আজ কি সারারাত থাকবি?'

বললুম, 'না, ওকে ঘুম পাড়িয়ে ফিরে আসব।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে গাড়ি এল।

গিয়ে দেখলুম পিউ ঘুমিয়ে পড়েছে। শঙ্খনাথবাবু ঘরে আছেন, কলাবতী পিউয়ের খাটের পাশে মেঝেয় বসে আছে।

শঙ্খনাথবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'এইমাত্র কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল।'

পিউয়ের পাশে গিয়ে বসলুম। চোখের কোলে জল শুকিয়ে আছে, ঠোঁট দুটি ঘুমের

মধ্যেও ফুলে ফুলে উঠছে। ইচ্ছে হল দু' হাতে ওকে বুকে চেপে ধরে ঘুম ভাঙিয়ে দিই। কিন্তু না, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে হয়ত আর ঘুমুবে না। যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন ঘুমুক।

আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত রাখলুম। একটি ছোট্ট নিশ্বাস পড়ল; যেন আরও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল। ঘুমের মধ্যে কি বুঝতে পেরেছে যে আমি এসেছি?

আধ ঘণ্টা তার গায়ে হাত দিয়ে বসে রইলুম। কলাবতী উঠে গিয়ে দোরের পাশে বসল। শঙ্খনাথবাবু ঘরের এমুড়ো-ওমুড়ো পায়চারি করতে লাগলেন। সলিলা বোধহয় আজ নাচতে বেরিয়েছে, তাকে দেখলুম না।

সাড়ে দশটার পর উঠলুম। শঙ্খনাথবাবু পায়চারি থামিয়ে তীব্র চোখে আমার পানে তাকালেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, বললুম, 'আমি এবার যাই।'

'যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। আমার থাকার দরকার নেই।'

তিনি আরও কিছুক্ষণ তীব্র চোখে চেয়ে রইলেন, তারপর পকেট থেকে টাকা বার করে আমার সামনে ধরলেন।

রাগে গা জ্বলে গেল। আমি যেন টাকার জন্যে এসেছি। বড়মানুষ কিনা, টাকা ছাড়া আর-কিছু বোঝেন না। খুব ধীরভাবে বললুম, 'টাকার দরকার নেই।'

'নেবে না?'

'না।'

শঙ্খনাথবাবু নোটগুলো মুঠিতে পাকিয়ে পকেটে পুরলেন। মনে হল তিনি ভীষণ অপমানিত হয়েছেন এবং দাঁত কিড়্মিড়্ করছেন। আমি আর দাঁড়ালুম না, ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত নীচে নেমে গেলুম। যা রাগী লোক, এখনই হয়ত চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন। এমন মানুষ দেখিনি; নিজের মনের মতন সব হওয়া চাই, তা না হলেই চিৎকার লাফালাফি। আমার ইচ্ছে আমি টাকা নেব না। উনি মেজাজ দেখাবার কে?

বাসায় ফিরলুম প্রায় এগারোটা।

জামাইবাবু এসেছেন। এখনও খেতে বসেননি, আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। হাসি-মুখে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এস সখি! তোমার নাকি একটি মেয়ে জুটেছে?'

তাঁর পাশে গিয়ে বসলুম। শুক্লা বলল, 'আর বসিস্‌নি প্রিয়া, কাপড় বদলে আয়। আমি ভাত বাড়তে চললুম।'

আমার মনটাও কেমনধারা হয়ে গিয়েছিল, জামাইবাবুর সঙ্গে বসে একটু হাসি-গল্প করব তা আর ইচ্ছে হল না। নিজের ঘরে গিয়ে কাপড়চোপড় বদলে মুখে চোখে জল দিয়ে এসে খেতে বসলুম।

বসবার ঘরে টেবিলের ওপর চাদর পেতে আমাদের খাওয়া দাওয়া। যা যা রান্না হয়েছে টেবিলের ওপর এনে রাখা হয়, তারপর যার যেমন দরকার নিজের হাতে তুলে নিয়ে খাই।

খেতে খেতে কথা হল। জামাইবাবু বেশীর ভাগ কথা বললেন। শুক্লা তাঁকে মন্মথ করের কথা বলেছে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। জামাইবাবু তাকে চেনেন; ভারি ভাল ছেলে, ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট। কয়েক বছরের মধ্যে প্র্যাক্‌টিস্‌ বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সে মিছিমিছি পরের গুপ্তকথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে কেন?

একটা ভাল খবর এই যে, জামাইবাবুর সহধর্মিণীর কানে কথাটা এখনও ওঠেনি। তাই তিনি একটু আশ্বস্ত হয়েছেন। বললেন, 'তুমি বোধহয় ভুল করেছ শুক্লা। টেলিফোনে গলার আওয়াজ সব সময় ঠিক ধরা যায় না। একজনের গলা আর-একজনের গলা বলে মনে হয়।'

শুক্লা বলল, 'কিন্তু একজন কেউ জানতে পেরেছে।'

জামাইবাবু বললেন, 'হয়ত পেরেছে। কিন্তু তার মনে কোনও কু-অভিপ্রায় নেই।

থাকলে এতদিন শহরময় ঢি-ঢি পড়ে যেত, আমার বাড়ি ঢোকবার উপায় থাকত না।'

শুক্লা চুপ করে রইল; কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করল, 'মন্মথ করের বিয়ে হয়েছে কি না জান?'

জামাইবাবু আশ্চর্য হয়ে চোখ তুললেন,—'বিয়ে! যতদূর জানি, সে বিয়ে করেনি। কেন বল দেখি?'

শুক্লা তখন চায়ের নেমন্তন্নর কথা বলল। সব শুনে জামাইবাবু বেশ কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইলেন। তারপর বললেন, 'তাই নাকি! ওর এসব গুণ আছে তা জানতাম না। কিন্তু মতলবটা কী? চাপ দিয়ে প্রিয়ংবদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়?'

আমি হাল্কা সুরে বললুম, 'কিন্তু তাতে ক্ষতিই বা কী? ওর সঙ্গে চা খেলে আমার ত আর জাত যাবে না!'

জামাইবাবু মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'না সখি, ও যদি এই ক্লাসের লোক হয় তাহলে তুমি কক্ষনো ওর চায়ের নেমন্তন্ন নেবে না। কোন কেসে ডাকলেও যাবে না। ও যা পারে করুক। ইতিমধ্যে খোঁজ নিচ্ছি ও কেমন লোক। যদি সত্যিই পাজি লোক হয়,—' তিনি কপাল কুঁচকে চুপ করলেন, কথাটা শেষ করলেন না।

খাওয়া শেষ হলে জামাইবাবুকে পান এনে দিলুম। তিনি হেসে বললেন, 'কই, তোমার মেয়ের কথা বললে না?'

বললুম, 'শুক্লার কাছে শুনবেন। আমার ঘুম পাচ্ছে, শুতে চললুম।'

ওরা বসে রইল, আমি শোবার ঘরে এসে দোর বন্ধ করলুম। যেদিনই জামাইবাবু আসেন, আমি খাওয়ার পর একটা ছুতো করে নিজের ঘরে চলে আসি। ওদের ত একটু নিরিবিলি দরকার।

আজ কিন্তু সত্যিই আমার শরীরটা ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম পিউয়ের কথা। আজ সে আমার জন্যে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে; কাল হয়ত আর কাঁদবে না, এমনিই ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর ক্রমে আমাকে ভুলে যাবে। ছেলেমানুষ ত, ওদের স্মৃতিশক্তিই বা কতটুকু! পরে যদি কোনদিন আমাকে দেখতে পায়, চিনতেই পারবে না।

মাত্র তিন দিন ত পিউ আমাকে দেখেছে, এরই মধ্যে এত ন্যাওটা হল কী করে? মায়ের আদর পায়নি তাই? কী জানি! আমারই বা ওর ওপর এত মন পড়ল কেন? সুন্দর মেয়ে, তাই? কী জানি......

২৭ শ্রাবণ।

কয়েকদিন ডায়েরি লেখা হয়নি।

শুনেছি যারা ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করে, প্রথম প্রথম তারা খুব আগ্রহের সঙ্গে লেখে; তারপর ক্রমে তাদের মন এলিয়ে পড়ে। আমারও হয়ত তাই হয়েছে। ক'দিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ আছে, বেশ গুমোট চলেছে। বর্ষাঋতু প্রায় শেষ হয়ে এল। এ সময় শরীর ভাল থাকে না। তার ওপর আমার একটা নতুন কাজ জুটেছে; বেলা দুপুর থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত একটি রোগিণীর সেবা করতে হয়। যখন কাজ সেরে ফিরে আসি তখন আর ডায়েরি লেখার মতন মনের অবস্থা থাকে না।

রোগিণীর বয়স হয়েছে, বড়মানুষের গিন্নী। রোগও এমন কিছু মারাত্মক নয়; কিন্তু মহিলাটি বাড়িসুদ্ধ লোককে তটস্থ করে রেখেছেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হুকুম চালাচ্ছেন; ছেলেরা ছুটোছুটি করছে, পুত্রবধূরা ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। কর্তা মাঝে মাঝে দরজায় উঁকি দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ঘরে ঢোকবার হুকুম নেই। পাছে আমার ওপর তাঁর চোখ পড়ে।

এমনই বিরক্তিকর পরিবেশের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়। কিন্তু যাক গে, ভাল লাগে না এসব ছোট কথা লিখতে।

কাল কাজ থেকে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। পোশাক ছেড়ে স্নান করলুম, তারপর হাল্কা একটা শাড়ি পরে শুক্লার সঙ্গে চা খেতে বসলুম। শুক্লার আজ কাজ নেই, সে বাড়িতেই ছিল; রান্না-বান্না সব করে রেখেছে।

চা খাওয়া শেষ হয়েছে, আমরা বসে গল্প করছি, এমন সময় নীচে দরজার সামনে একটা মোটর এসে থামার শব্দ হল। শব্দটা যেন চেনা চেনা। উঠে গিয়ে বারান্দা থেকে নীচে তাকালুম। বুকটা ধক করে উঠল। শঙ্খনাথবাবুর প্রকাণ্ড গাড়িখানা এসে দাঁড়িয়েছে এবং তিনি গাড়ি থেকে নামছেন।

ছুটে গিয়ে শুক্লাকে বললুম, 'শঙ্খনাথবাবু আসছেন।' তারপর দরজা খুলে দিতে গেলুম।

ক্লান্তভাবে সিঁড়ি বেয়ে উঠে শঙ্খনাথবাবু দরজার সামনে দাঁড়ালেন। আমার পানে নিষ্পলক চেয়ে রইলেন।

আমি অস্বস্তি দমন করে বললুম, 'আসুন। পিউ ভাল আছে?'

তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন কি না সন্দেহ। হঠাৎ বললেন, 'বাঃ! তোমাকে এ-বেশে কখনও দেখিনি। যেন লক্ষ্মী ঠাকরুন।'

জড়সড় হয়ে পড়লুম, কী বলব ভেবে পেলুম না। তিনি আমার আরও কাছে সরে এসে করুণস্বরে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, আজ রাত্তিরে আমাকে দুটি খেতে দিতে পারবে? এই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।'

আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। শঙ্খনাথবাবু খেতে এসেছেন আমার কাছে! তারপর সামলে নিয়ে বললুম, 'আসুন আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরে বসবেন চলুন।'

তাঁকে ঘরে এনে বসালুম। দেখলুম ইতিমধ্যে শুক্লা চায়ের বাসন সরিয়ে ফেলেছে এবং নিজেও অন্তর্ধান করেছে।

শঙ্খনাথবাবু ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'খাসা বাসাটি! তা আমাকে খেতে দেবে ত?'

আমি ব্যাকুল হয়ে বললুম, 'শঙ্খনাথবাবু, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি ঠাট্টা করছেন, না সত্যি সত্যি বলছেন!'

তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কী মুশকিল! ঠাট্টা করব কেন! আমিই সত্যিই খেতে এসেছি।'

'কিন্তু কেন? কেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। বাড়িতে খাবেন না কেন?'

তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল, বললেন, 'আমার বাড়িতে আজ মোচ্ছব। তাই আগে-ভাগেই চলে এলাম।'

'মোচ্ছব! সে আবার কী?'

'মোচ্ছব বুঝলে না? নাচগানের মোচ্ছব। ছাতের ওপর আসর বসবে, রেডিওতে নাচের বাজনা বাজবে, সারি সারি টেবিল সাজিয়ে বুফে ডিনার তৈরি থাকবে। বোষ্টম-বোষ্টমীরা নাচবে আর খাবে।'

'ওঃ! আজ বুঝি আপনার বাড়িতে পার্টি?'

'হুঁ। গোটা পঞ্চাশ ন্যাড়া-নেড়ীর নেমন্তন্ন হয়েছে। ন'টা থেকে পার্টি আরম্ভ হবে, তার আগেই আমি কেটে পড়েছি।'

ওঁর কথা শুনলে হাসিও পায় দুঃখও হয়। হাসি চেপে বললুম, 'আপনি না হয় পালিয়ে এলেন, কিন্তু পিউ কোথায় রইল?'

'কলাবতীর কাছে। সে আর কোথায় যাবে, তার ত পালাবার উপায় নেই।'

একবার ইচ্ছে হল জিগ্যেস করি, 'তাকে নিয়ে এলেন না কেন?' কিন্তু তা না বলে

প্রশ্ন করলুম, 'পিউ আমার জন্যে কান্নাকাটি করে না?'

তিনি বললেন, 'কান্নাকাটি আর করে না, তবে মাঝে মাঝে 'দম্মা দম্মা' বলে ডাকে। সে যাক, এখন খেতে দেবে কি না বল। যদি না দাও হোটেলে চেষ্টা দেখি।'

বললুম, 'হোটেলে চেষ্টা দেখতে হবে না, এখানেই খাবেন। কিন্তু শাক ভাত। তার বেশী বোধহয় কিছু দিতে পারব না।'

খুশি হয়ে বললেন, 'শাক ভাতই যথেষ্ট।'

'তাহলে আপনি বসুন, আমি এখনই আসছি'—বলে আমি রান্নাঘরে গেলুম।

শুক্লা রান্নাঘরে ছিল, আমার পানে চোখ বড় করে তাকাল। আমি ফিসফিস করে তাকে সব বললুম। শুনে সে মাথায় হাত দিয়ে বসল।

'বড়মানুষ অতিথি, কী খেতে দেব রে?'

'কী কী আছে?'

'আজ কি কিছু রেঁধেছি। পুঁইশাক আর কুচো-চিংড়ি দিয়ে বাটি-চচ্চড়ি, কাঁকড়ার ঝাল আর ভাত।'

'তা আর উপায় কী, ওই দিয়েই চালাতে হবে। ভাতে বোধহয় কুলবে না—'

'আমি দুমুঠো চাল চাপিয়ে দিচ্ছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে। তুই যা।'

'না, তুই আয় আমার সঙ্গে, শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তুই ওঁর কাছে বসে গল্প করিস, আমি রাঁধব। তুই একা সারাক্ষণ রেঁধে মরবি কেন?'

'বেশ, তোর যখন তাই ইচ্ছে—'

দুজনে বসবার ঘরে গিয়ে দেখি শঙ্খনাথবাবু চোখ বুজে হাত জোড় করে বসে আছেন; তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ছে, যেন বিড়বিড় করে কিছু বলছেন। আমাদের পায়ের শব্দে তিনি চোখ খুললেন। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'ও কী হচ্ছে!'

তিনি বললেন, 'মা-কালীর কাছে মানত করছিলাম—হে মা, আজ রাত্তির বারোটার আগে যেন বিষ্টি হয়, ওদের মোচ্ছব যেন ভেসে যায়।'

আমরা দুজনেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলুম, 'কী মানুষ আপনি! পরের অনিষ্ট-চিন্তা করছেন?'

তিনি চোখ পাকিয়ে বললেন, 'অনিষ্ট-চিন্তা করব না! যারা আমার জীবনটা ছারখার করে দিয়েছে তাদের অনিষ্ট-চিন্তা করব না?'

আমার হাসি থেমে গেল। বললুম, 'ও কথা যাক। এই আমার বন্ধু শুক্লা। আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি, একই কাজ করি।'

তিনি বললেন, 'বেশ বেশ, বয়সও প্রায় একই। তা আজ আমি তোমাদের দুজনেরই অতিথি।'

বললুম, 'হ্যাঁ। একটু দেরি হবে কিন্তু। ততক্ষণ আপনি শুক্লার সঙ্গে গল্প করুন। ইতিমধ্যে যদি চা খেতে চান—'

'দরকার নেই।'

আমি রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে রান্না চড়ালুম। ভাঁড়ারে চাট্টিখানি ভাল চাল ছিল, বাঁক্‌তুলসী চাল, তাই চার মুঠি চড়িয়ে দিলুম। শঙ্খনাথবাবুর খোরাক কী রকম তা ত জানি না, তবে চেহারা দেখে খোশ-খোরাকি মনে হয় না। একটু বেশী করে ভাত রাঁধাই ভাল, শেষে লজ্জায় পড়ে যাব।

আমাদের দুটো প্রেশার-স্টোভ আছে; একটাতে ভাত চড়িয়ে দিলুম, অন্যটাতে আলু-বেগুন-বড়ি দিয়ে ঝোল চড়ালুম। তবু তিনটে ব্যঞ্জন হবে। তার কম কি ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়?

সাড়ে ন'টার সময় শঙ্খনাথবাবুকে খেতে দিলুম।

ইতিমধ্যে শুক্লার সঙ্গে তাঁর ভাব হয়ে গেছে। শুক্লাকেও তিনি গোড়া থেকে 'তুমি'

বলেই সম্বোধন করছিলেন এবং জোর গলায় তাকে লেকচার দিচ্ছিলেন। লেকচারের মর্ম —তোমাদের মতন মেয়েরা বিয়ে করে না বলেই ত দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে।—শুক্লা গালে হাত দিয়ে বসে শুনছিল। কী বলবে সে? বলবার ত কিছু নেই।

আমি টেবিলের ওপর সাদা চাদর পেতে অন্ন-ব্যঞ্জন তার ওপর রাখতেই তিনি চেয়ার টেনে খেতে বসে গেলেন। আমাদের একবার জিগ্যেস করলেন না, আমরা তাঁর সঙ্গে খাব কি না! কথাটা বোধহয় তাঁর মনেই আসেনি। শুক্লা আড়চোখে আমার পানে চেয়ে একটু হাসল।

খুব তৃপ্তি করে খেলেন শঙ্খনাথবাবু। প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন চেখে চেখে, প্রত্যেকটি গ্রাসের স্বাদ নিয়ে। বাটি-চচ্চড়ি দু'বার চেয়ে খেলেন। তারপর খাওয়া শেষ করে মাঝারি গোছের একটি ঢেকুর তুলে মুখ ধুয়ে এসে বসলেন। পরম তৃপ্তিতে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আঃ!'

শুক্লা বিনয় করে বলল, 'কিছুই ত খেলেন না।'

তিনি পেটে হাত বুলিয়ে বললেন, 'পেটে জায়গা থাকলে আরও খেতাম। কে রেঁধেছে? এমন রান্না তিন বছর খাইনি।'

শুক্লা বলল, 'আমরা দু'জনেই রেঁধেছি।'

তিনি বললেন, 'তোমরা আমার লোভ বাড়িয়ে দিলে। আবার একদিন এসে যদি খেতে চাই, খেতে দেবে ত?'

শুক্লা বলল, 'নিশ্চয় দেব। কিন্তু দয়া করে অন্তত দু'ঘণ্টা আগে খবর দেবেন।'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'সেটি হবে না। যখন আসব হঠাৎ আসব। তোমরা নিজেদের জন্যে যা রেঁধেছ তাই খাব।'

বললুম, 'তাহলে বাটি-চচ্চড়ি আর কাঁকড়ার ঝাল ছাড়া আর-কিছু জুটবে না।'

'যা জুটবে তাই খাব। প্রিয়দম্বা, তোমরা এখনও বাটি-চচ্চড়ি আর কাঁকড়ার ঝালের মর্ম বোঝনি। যদি তিন বছর বাবুর্চির হাতের কালিয়া কাবাব খেতে তাহলে বুঝতে।' কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইস্, এগারোটা বাজে। তোমাদের খেতে দেরি হয়ে গেল। আজ উঠি।'

তিনি বারান্দায় এলেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে এলুম। আকাশে অল্প মেঘ আছে, তার ফাঁকে ফাঁকে তারা মিটমিট করছে। আমি বললুম, 'আপনার প্রার্থনা মা-কালী শুনতে পাননি মনে হচ্ছে।'

তিনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বিমর্ষভাবে 'হুঁ' বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম গাড়ি চলে গেল। তখন আমরা এসে খেতে বসলুম।

শুক্লা বলল, 'যা-ই বলিস লোকটি ভাল। সত্যি ভাল।'

'আমি কি বলেছি মন্দ!'

'শুধু বাইরের পালিশ থাকলেই হয় না। মন্মথ করের ত খুব পালিশ আছে, তাই বলে সে কি ভাল লোক?'

'কে বলেছে মন্মথ কর ভাল লোক? তবে ভদ্রসমাজে বাস করতে হলে একটু পালিশ দরকার বইকি।'

খাওয়া শেষ করে আমরা রাত বারোটা পর্যন্ত গল্প করলুম। তর্কে শুক্লা প্রমাণ করে দিলে শঙ্খনাথবাবু খাঁটি সোনা, তাঁর পালিশের দরকার নেই; আর মন্মথ করের যতই পালিশ থাকুক সে একটা নেকড়ে বাঘ এবং অজগর সাপ; হাড়ে হাড়ে বজ্জাত।

গল্প করতে করতে এক বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালবেলা উঠে দেখি আকাশ বেশ পরিষ্কার; রাত্তিরে বৃষ্টি হয়নি। শঙ্খনাথবাবুর মনস্কামনা সিদ্ধ হল না। আমার মনটাও একটু খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টি হলে বেশ মজা হত।

বেলা আন্দাজ দশটার সময় শঙ্খনাথবাবুর মোটর এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল, মোটর থেকে নামল শিউসেবক। তার হাতে একটা বাদামী কাগজ-মোড়া চৌকো গোছের বাক্স। আমি সিঁড়ির দরজা খুলে দিলে সে সেলাম করে বাক্সটা আমার হাতে দিল, সসম্ভ্রম হেসে বলল, 'বাবুজি পাঠিয়েছেন।'

আমি আর শুক্লা বাক্সটি টেবিলের ওপর রেখে কাগজের মোড়ক খুললুম। দেখি একটি ঝক্‌ঝকে সুন্দর ইলেকট্রিক স্টোভ।

শুক্লা হাততালি দিয়ে কলকণ্ঠে হেসে উঠল, 'দেখেছিস ভদ্রলোক কাকে বলে?'

শিউসেবককে দু'টাকা বকশিশ দিলুম।

৬ ভাদ্র।

কয়েকদিন ডায়েরি লেখা হয়নি। কী করব, হয়ে উঠছে না। কাজকর্ম করে তবে ত ডায়েরি লেখা!

জীবনের চাকা আবার বাঁধা-পরা পথে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। রোগীর সেবা করা, খাওয়া ঘুমোনো গল্প করা। থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

জামাইবাবু রাত্রির অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতন আসা-যাওয়া করেন; কোনদিন জানতে পারি, কোনদিন পারি না। শুক্লার মুখে শুনেছি, মন্মথ কর সম্বন্ধে কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ভয়ানক ধূর্ত লোক। একদিন আমাকে ফোন করেছিল, 'কেমন আছেন? চায়ের নেমন্তন্ন মনে আছে ত?'

বলেছিলুম, 'মনে আছে। কিন্তু ভীষণ ব্যস্ত, সময় নেই।'

সে বলেছিল, 'ব্যস্ত? আমার একটা কেসে নার্স দরকার, ভেবেছিলাম আপনাকেই ডাকব।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু এখন ত পারব না।'

'আচ্ছা, আপনি যাঁর সঙ্গে থাকেন, কী নাম মনে পড়ছে না, তিনিও কি এন্‌গেজড্‌?'

'হ্যাঁ, শুক্লা অন্য জায়গায় কাজ করছে।'

'ও! তা আমি অন্য ব্যবস্থা করব। আচ্ছা, আপনি ডক্টর নিরঞ্জন দাসকে চেনেন কি?'

একটু চমকে গেলুম, 'ডক্টর দাসকে চিনি বইকি। তাঁর কাছে পড়েছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ভারি চমৎকার লোক—না?'

'তাই ত মনে হয়। কেন বলুন দেখি?'

'তিনি অমন ভাল লোক, কিন্তু তাঁর স্ত্রী শুনেছি ভীষণ দজ্জাল খাণ্ডার মেয়েমানুষ। আপনি নিশ্চয় জানেন?'

'ডাক্তারদের ঘরের খবর আমি কোত্থেকে জানব?'

'তা বটে। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। চায়ের কথাটা মনে রাখবেন।'

আর সন্দেহ নেই, মন্মথ করই শুক্লা আর ডক্টর দাসের কথা জানতে পেরেছে। কী চালাকির সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিল। ডক্টর দাসের স্ত্রী দজ্জাল খাণ্ডার মেয়েমানুষ; অর্থাৎ তাঁর কানে খবরটা তুলে দিলে কী ব্যাপার হবে তোমরা ভেবে দেখ। উঃ সাংঘাতিক লোক এই মন্মথ কর।

কিন্তু কেন? শুক্লা আমার বন্ধু, তাকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি মন্মথ করের সঙ্গে চা খেতে যাব, এই জন্যে? কিংবা ও হয়ত ভেবেছে আমাদের দু'জনের সঙ্গেই ডক্টর দাসের ঘনিষ্ঠতা। কী নোংরা নির্ঘিন্নে মন লোকটার! কিন্তু আমার ওপরেই বা এত নজর কেন? লম্পটের চোখে আমি কি এতই লোভনীয়?

কী আছে স্ত্রীলোকের শরীরে যার জন্যে পৃথিবী জুড়ে এমন টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি? খানিকটা রক্ত-মাংস বই ত নয়। এরই জন্যে এত? কিংবা ওরা হয়ত ভাবে শরীরটা পেলে

সেই সঙ্গে আরও কিছু পাবে। যা খুঁজছে তা পায় না, তাই বোধহয় ওদের দেহের ক্ষুধা মেটে না; একটা দেহ ছেড়ে আর একটা দেহের পানে ছুটে যায়। তারপর যখন নেশা কেটে যায় তখন দেখে সব ভাঁড়ই শুকনো, কোন ভাঁড়েই রস নেই।

যাকগে। এসব অরুচিকর কথা ভেবে লাভ নেই। আমার জীবনে ও জিনিসকে আমি কাছে ঘেঁষতে দিইনি, কখনও দেবও না। আমি বেশ আছি, শান্তিতে আছি। শুক্লা সেদিন আপন মনে গাইছিল—'সই, কে বলে পিরীতি ভাল, হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া কাঁদিয়া জনম গেল'—দরকার নেই আমার পিরীতি করিয়া। পিরীতি করার কত সুখ তা ত চোখেই দেখেছি। শুক্লার মনে একদণ্ড শান্তি নেই, স্বস্তি নেই; যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছে।

পিউকে অনেকদিন দেখিনি। শঙ্খনাথবাবু বলে গিয়েছিলেন আবার একদিন খেতে আসবেন, কিন্তু আসেননি। কাজের লোক, হয়ত ভুলে গিয়েছেন। সেদিন শুক্লা বলল, 'ভদ্রলোক আর ত এলেন না। এমন সুন্দর জিনিস উপহার দিয়েছেন, আমাদের উচিত ওঁকে ধন্যবাদ দেওয়া। একবার ফোন কর্‌ না।'

ফোন করলুম, কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। বাড়িতে বোধহয় কেউ নেই। শিউসেবকও যদি ফোন ধরত তাকে পিউয়ের কথা জিগ্যেস করতুম। এতদিনে নিশ্চয় বাড়িময় ছুটোছুটি আর খেলা করে বেড়াচ্ছে।

ভাদ্র মাস পড়ে অবধি বৃষ্টি বন্ধ ছিল, আকাশে মেঘও ছিল না। ভেবেছিলুম বর্ষা বুঝি শেষ হল। কিন্তু আজ সকাল থেকে আবার টিপটিপ আরম্ভ হয়েছে।

আমার জীবনে একটা বিচিত্র ব্যাপার বার বার ঘটতে দেখেছি। এক ত জন্মদিনে বৃষ্টি হবেই। তাছাড়া হঠাৎ যদি অসময়ে বৃষ্টি নামে সেদিন আমার জীবনে একটা কিছু ঘটবে, তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। বাবা যেদিন মারা যান, সেদিন বৃষ্টি পড়েছিল। তাই ভাবছি, আজ কিছু ঘটবে নাকি? কী ঘটতে পারে? কী ঘটা সম্ভব?

৭ ভাদ্র।

কাল ডায়েরি লেখা শেষ করলুম বিকেল পাঁচটার সময়। সওয়া পাঁচটার সময় টেলিফোন এল।

শঙ্খনাথবাবু ফোন করছেন; গলার আওয়াজ একটু যেন অন্য রকম। বললেন, 'প্রিয়দম্বা, তুমি একবার আসবে?'

উৎকণ্ঠিত হয়ে বললুম, 'কী হয়েছে! পিউ কেমন আছে?'

তিনি বললেন, 'পিউ ভালই আছে। আমার নিজের একটু শরীর খারাপ হয়েছে।'

'শরীর খারাপ! কী রকম শরীর খারাপ?'

'সামান্য জ্বর হয়েছে। আর গায়ে ব্যথা। একটু দুর্বল বোধ করছি।'

'বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ডাক্তার কী বললেন?'

'ডাক্তার ডাকিনি? সামান্য জ্বরে ডাক্তার কী করবে? তুমি একবার আসবে? আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

শুক্লা বাড়ি নেই। তাকে একছত্র চিঠি লিখে তৈরি হয়ে নিলুম। ব্যাগে সব জিনিস আছে কিনা দেখে নিলুম। হয়ত রাত্তিরে থাকতে হবে। শঙ্খনাথবাবু বললেন বটে সামান্য জ্বর, কিন্তু বলা যায় না। এক ধরনের মানুষ আছে যারা নিজের অসুখকে অসুখ বলেই মনে করে না।

পৌনে ছ'টার সময় গাড়ি এল। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম। আকাশ অন্ধকার, কিন্তু রাস্তায় এখনও আলো জ্বলেনি।

শঙ্খনাথবাবুর বাড়িতে আলো জ্বলেনি। শিউসেবক গাড়িবারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল. সেলাম করে বলল, 'আসুন মাজী। বাবু নীচেই আছেন।' শিউসেবক আজ আমাকে প্রথম 'মাজী' বলল।

বাড়িতে ঢুকেই সামনে লবি; লবির বাঁ পাশে ড্রয়িং-রুম, ডান পাশ দিয়ে ওপরের সিঁড়ি উঠে গেছে। আর লবির মুখোমুখি একটা ঘর। ঘরটা অন্ধকার ছিল। শিউসেবক আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে আলো জেবলে দিল। মাঝারি গোছের ঘর; একটা টেবিল, টেবিলের ওপর টেলিফোন; গোটা দুই চেয়ার. আর একটা খাট। খাটের ওপর শঙ্খনাথ-বাবু দোরের দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন।

শঙ্খনাথবাবুর চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, তার ওপর মুখে দু'তিন দিনের দাড়ি। একটু হেসে হাত বাড়ালেন,—'এস প্রিয়দম্বা।'

বললুম, 'এ কী, আপনি এখানে শুয়ে আছেন যে!'

তাঁর মুখ একটু ম্লান হল। বললেন, 'এটা অফিস-ঘর। বাড়িতে যখন কাজকর্ম করি. এখানেই বসি।'

বললুম. 'তা বেশ ত, কিন্তু অসুস্থ শরীরে এখানে শোবার কী দরকার?'

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন. 'যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, তাই নীচে থাকবার ব্যবস্থা করেছি। শেষে ছোঁয়াচ লেগে বাড়িসুদ্ধ পড়বে!'

টেবিলের উপর ব্যাগ রেখে চেয়ার টেনে তাঁর খাটের পাশে বসলুম। বললুম. 'দেখি আপনার নাড়ী।'

তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তারপর—তারপর—

কিন্তু নিজের কথা পরে বলব; আগে ওঁর কথাটা শেষ করে নিই।

নাড়ী দুর্বল এবং চঞ্চল। গা বেশ গরম। টেম্পারেচার নিলুম: একশ এক পয়েন্ট চার।

'কবে থেকে জ্বর হয়েছে?'

'পরশু রাত্তির থেকে।'

'ওষুধ-বিষুধ কিছু খেয়েছেন?'

'কয়েকটা অ্যাস্পিরিনের বড়ি খেয়েছি।'

'আর পথ্য?'

'সাবুর জল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবলুম, তারপর মুখ তুলে বললুম, 'আপনার ফোন ব্যবহার করতে পারি?'

'কাকে ফোন করবে?' ,

'ডাক্তারকে।'

'ডাক্তার ডাকা দরকার?'

'দরকার।'

'বেশ, ডাক। ডক্টর করের ফোন নম্বর—'

'ডক্টর করকে ডাকব না। আমার একজন জানা ডাক্তার আছেন, তাঁকে ডাকব।'

'যা ভাল বোঝ কর।'

জামাইবাবুকে ডাকলুম। তিনি ভাগ্যক্রমে নিজের ডিস্পেন্সারিতে ছিলেন, সব শুনে বললেন, 'ইনফ্লুয়েঞ্জাই ত মনে হচ্ছে।'

বললুম, 'আপনি একবার আসবেন?'

তিনি বললেন, 'আমি স্ত্রী-রোগের ডাক্তার, আমাকে কেন?'

'আপনি আসুন।'

'আচ্ছা যাব। কিন্তু একটু দেরি হবে. একটা কল্ সেরে যাব। সাতটা বাজবে।'

'তাই সই।'

ফোন ছেড়ে দিলুম। কব্জির ঘড়িতে ছ'টা বেজেছে।

শিউসেবককে ডেকে বললুম, 'এক পট্ কড়া কফি তৈরি করে নিয়ে এস। আর গোটা কয়েক টোস্ট। টোস্টে মাখন লাগিও না।'

'জী', বলে শিউসেবক চলে যাচ্ছিল তাকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, 'পিউ কোথায়?'

শিউসেবক বলল, 'পিউ-দিদি ওপরেই আছে। কলাবতী তাকে খেলা দিচ্ছে। এখানে আনতে বলব?'

'না না, এখানে আনতে হবে না। তুমি যাও, কফি আর টোস্ট তৈরি করে আন।'

শিউসেবক চলে গেল। শঙ্খনাথবাবু কাতরভাবে বললেন, 'কিন্তু আমার যে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না প্রিয়দম্বা।'

'ইচ্ছে করুক আর না-করুক, খেতে ত হবে।'

তিনি মুখ বিকৃত করে শুয়ে রইলেন।

আমি অন্য কথা পাড়লুম, 'সেদিন আপনি যে চমৎকার স্টোভ উপহার দিয়েছিলেন তার জন্যে শুক্লা ধন্যবাদ জানিয়েছে।'

তিনি বললেন, 'সেদিন তোমরা যা খাইয়েছিলে অমন তৃপ্তি করে অনেকদিন খাইনি।'

বললুম, 'আবার যাবেন বলেছিলেন, গেলেন না ত।'

তিনি বালিশের ওপর কনুই রেখে উঁচু হয়ে বললেন, 'যাব কোত্থেকে? ওই ব্যাটা লট্পট্ সিং বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে।'

'লট্পট্ সিং কে?'

তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল,—'লট্পট্কে জান না? কর্নেল হড়্বড়্ সিংয়ের ব্যাটা লেফটেনেণ্ট লট্পট্ সিং। আমার বউয়ের প্রাণের বন্ধু।'

শঙ্খনাথবাবুর অভ্যেস লোকের নাম উল্টোপাল্টা করা। বোধহয় লোকটার নাম লজপৎ সিং, উনি তাকে লট্পট্ সিং করেছেন।

বললুম, 'তা যাতায়াত শুরু করেছে ত কী হয়েছে! বাড়িতে অতিথি আসবে না?'

তিনি বললেন, 'অতিথি আসুক। ড্রয়িং-রুমে বসে গল্প করুক, চা খাক, তারপর চলে যাক।—আমি সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরি না, সেদিন একটা দরকারে চারটের সময় ফিরে এসে দেখি, লট্পট্ সিং আমার বউয়ের শোবার ঘরে আয়নার সামনে বসে সিগারেট খাচ্ছে। ভেবে দেখ দিকি!'

'আপনার স্ত্রী সেখানে ছিলেন?'

'সলিলা পাশের ঘরে সাজ-পোশাক পরছিল। মানে দু'জনে মিলে বেরুবে।'

'তারপর?'

'তারপর লট্পট্ সিংকে বললুম,—'নিকালো হিঁয়াসে। ফের যদি আমার বাড়িতে মাথা গলিয়েছ ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব।' বেটা নেড়ি কুত্তার মত পালাল।'

'আর আপনার স্ত্রী?'

'সলিলার বাইরে বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? ঘরে বন্ধ করে রাখতে ত পারি না, তাই নিজেই বাড়ি আগ্লে পড়ে আছি। প্যান্প্যান্ নাকে-কাঁদুনি শুনছি। আমি সভ্য-সমাজের চাল-চলন বুঝি না, তাই মিছিমিছি সন্দেহ করি। নিজের স্ত্রীকে যারা সন্দেহ করে তারা মানুষ নয়, যারা ঘরে আটকে রাখে তারা পশুর অধম—বুঝলে?'

তিনি ক্লান্তভাবে আবার শুয়ে পড়লেন। আমি বললুম, 'আপনার শরীর দুর্বল হয়েছে, বেশী কথা কইবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন। এ অবস্থায় বেশী উত্তেজনা ভাল নয়।'

তিনি চোখ বুজে রইলেন।

বাইরে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। টিপটিপ বৃষ্টি চলেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল —এইজন্যে অসময়ে বৃষ্টি নেমেছে। আমার মাথা খাবার জন্যে! কিন্তু—এ আমার কী হল? এ কী হল? কেন মরতে ওঁর নাড়ী দেখতে গিয়েছিলুম।

উনি বললেন, 'আর একবার নাড়ী দেখ ত প্রিয়দম্বা। যেন আরও দুর্বল মনে হচ্ছে।'

ভয় পেয়ে ওঁর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলুম। না, ভয়ের কিছু নেই, তবে নাড়ী আরও দুর্বল হয়েছে। কী করি এখন! জামাইবাবুর আসতে দেরি আছে। শিউসেবক কফি নিয়ে এল না এখনও। আমার মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে হচ্ছে ডাক ছেড়ে কাঁদি।

মনটাকে হিঁচড়ে টেনে খাড়া করলুম। না, এখন ওসব নয়; কাঁদবার অনেক সময় আছে।

'আমি ওষুধ দিচ্ছি,' বলে উঠে টেবিলের পাশে গেলুম। আমার ব্যাগে স্পিরিট অব অ্যামোনিয়া আছে, তাই ফোঁটা কয়েক খাইয়ে দিই—

শিশি বার করেছি এমন সময় এক কাণ্ড! সে কী কাণ্ড!

দেখি উনি হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসেছেন, জ্বলজ্বল চোখে দোরের বাইরে তাকিয়ে আছেন। তারপর এক হুঙ্কার ছাড়লেন, 'সলিলা! কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

গলা বাড়িয়ে দেখলুম, সলিলা লবির কিনারায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার পরনে গাঢ় নীল রঙের শাড়ি, হাতে একটা ছোট ব্যাগ। বোধহয় পা টিপেটিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ভেবেছিল শঙ্খনাথবাবু দেখতে পাবেন না। আমি যদি তাঁর সামনে চেয়ারে বসে থাকতুম তাহলে বোধহয় দেখতে পেতেন না।

সলিলার শরীরের মোড় বাইরের দিকে, মুখখানা আমাদের দিকে। এইভাবে সে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ফিরে এসে দোরের সামনে দাঁড়াল। তার মুখখানা ফ্যাকাসে, চোখের মিশমিশে কালো মণি দুটো আরও কালো দেখাচ্ছে।

শঙ্খনাথবাবু আবার বললেন, 'যাচ্ছ কোথায় তুমি?'

সলিলার চোখ দুটো একবার আমার দিকে ফিরল। মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল। এত নরম সুকুমার মুখ এত কঠিন হয়ে উঠতে পারে ভাবা যায় না। কিন্তু সে নিচু গলাতেই বলল, 'আমার বাবা এসেছেন, গ্র্যান্ড হোটেলে আছেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'বাবা এসেছেন! মিথ্যে কথা। যাও, ওপরে যাও—বাড়ি থেকে তুমি বেরুতে পাবে না।' এই বলে শঙ্খনাথবাবু সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখালেন।

সলিলার চোখের দৃষ্টি যেন বিষিয়ে উঠল, সে বলল, 'আমি যাব।'

'না, তুমি যাবে না। আমার হুকুম, তুমি বাড়ি থাকবে।'

'তোমার হুকুম আমি মানি না। আমি যাচ্ছি। কেউ আমাকে আটকাতে পারে না।'

শঙ্খনাথবাবু ধড়মড় করে খাট থেকে নামবার উপক্রম করলেন। আমি এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম, এখন ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললুম। তারপর যা বলেছি যা করেছি সব পাগলের কাণ্ড।

তিনি খাট থেকে নামতে নামতে চিৎকার করে উঠলেন, 'কী, এত বড় আস্পর্ধা—'

আমি দুই হাত তাঁর বুকের ওপর রেখে তাঁকে আটকে রাখবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু আটকে রাখা কি যায়! তিনি যেন উন্মত্ত, এখনই আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন। আমি তখন সমস্ত শরীর দিয়ে চেপে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম, হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'না, তুমি উঠতে পাবে না। দুর্বল শরীরে তোমার হার্ট ফেল করে যাবে। যার ইচ্ছে যাক, যেখানে ইচ্ছে যাক। তোমাকে আমি উঠতে দেব না।'

লিখতে লিখতে ভাবছি, সত্যিই কি এই কথাগুলো আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল? না আমার অন্তর্যামী আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিলেন? আমি ত ভেবে-চিন্তে কিছু বলিনি, প্রচণ্ড ব্যগ্রতার তাগিদে কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

যাহোক, আস্তে আস্তে তিনি শান্ত হলেন; কিন্তু চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে রইল।

আমি কে, তাও বোধহয় অনুভব করলেন না। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলুম সলিলা চলে গেছে। মোটরের আওয়াজ শুনিনি; বোধহয় হেঁটে বাড়ির ফটক পার হয়েছে, তারপর রাস্তায় ট্যাক্সি ধরেছে।

ইনি নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছেন, যেন গায়ের জোর সব ফুরিয়ে গেছে। ওষুধ খাইয়ে দিলুম, স্পিরিট্ অ্যামন অ্যারোম্যাট্ বিশ ফোঁটা। তারপরে কফি আর টোস্ট নিয়ে শিউ-সেবক এল। এদিকে যে এত ব্যাপার হয়ে গেছে, তার মুখ দেখে মনে হল সে কিছু জানে না।

শিউসেবক টেবিলের ওপর ট্রে রাখল। আমি খাটের ধারে গিয়ে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম, 'কফি ঢেলে দেব?'

তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। এতক্ষণে যেন আমাকে দেখতে পেলেন, বালিশ থেকে মাথা তুলে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, গ্র্যান্ড হোটেলে ফোন কর ত। ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নাও প্রাণগোপাল সেন হোটেলে উঠেছে কি না!'

'প্রাণগোপাল সেন কে?'

'পি. জি. সেন, আই. সি. এস—সলিলার বাপ।'

আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেলুম। সলিলা যদি মিছে কথা বলে থাকে, তার বাপ যদি না এসে থাকেন, তাহলে ইনি জানতে পারলে আবার লাফালাফি শুরু করে দেবেন। কী করি! খানিক ইতস্তত করে বললুম, 'আগে কফি টোস্ট খেয়ে নিন, তারপরে ফোন করব।'

আপত্তি করলেন না। আমি বিছানার ওপর ট্রে রেখে কফি ঢেলে দিলুম, উনি বসে বসে খেতে লাগলেন। এক টুকরো শুকনো টোস্টও খেলেন। কতকটা সামলেছেন মনে হচ্ছে।

খাওয়া শেষ হয়েছে কি না-হয়েছে অমনি বললেন, 'এবার ফোন কর।'

নাছোড়বান্দা মানুষ। কিন্তু ফোন করতে হল না, এই সময় জামাইবাবুর মোটর এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। জামাইবাবু যখন আমাদের বাসায় যান তখন মোটরে যান না, কিন্তু তাঁর একটি মোটর আছে। বেশী বড় গাড়ি নয়, কালো রঙের ছোট একটি গাড়ি। এই গাড়িতে চড়ে তিনি রুগী দেখতে যান।

আমি লবিতে বেরিয়ে গিয়ে তাঁকে ঘরে নিয়ে এলুম। তাঁর পরনে কোট প্যান্ট টাই, পকেট থেকে স্টেথস্কোপ উঁচু হয়ে আছে। মন্মথ করের মতন অমন ফিটফাট নয়, কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদ চেহারা মিলিয়ে একটি অনায়াস আভিজাত্য আছে। অনেকদিন তাঁকে এ বেশে দেখিনি।

শঙ্খনাথবাবু খাটে বসে ছিলেন, কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে নতুন ডাক্তারের পানে চেয়ে রইলেন, তারপর তাঁর মুখের সংশয় পরিষ্কার হয়ে গেল। একটু অনুযোগের সুরে বললেন, 'দেখুন না ডাক্তারবাবু, আমার কিছুই হয়নি, মিছিমিছি প্রিয়দম্বা আপনাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে আনল।'

জামাইবাবু হাসলেন, 'কিছু হয়েছে কিনা আমি দেখলেই বুঝতে পারব। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

শঙ্খনাথবাবু শুলেন। ডাক্তার তাঁর নাড়ী দেখতে দেখতে সহজভাবে কথা বলতে লাগলেন, 'আপনার মেয়ে নাকি প্রিয়ংবদার খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েছে!'

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'মেয়ে ন্যাওটা হলে কী হবে, প্রিয়দম্বা তাকে একটুও ভালবাসে না।'

এমন না হলে পুরুষমানুষের বুদ্ধি। আমি পিউকে ভালবাসি না! জামাইবাবুকে বললুম, 'আপনি পরীক্ষা করুন, আমি চট্ করে পিউকে দেখে আসি।'

ডাক্তার রুগীকে বললেন, 'আপনি এবার গায়ের জামা খুলুন।'

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখলুম, পিউয়ের ঘরে কলাবতী মেঝের ওপর বসে আছে. আর পিউ তার কোলে শুয়ে কলা খাচ্ছে। বেশ শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব, বাড়ির গিন্নী যে কর্তার সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়েছে, তা কেউ জানে বলেও

মনে হল না।

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পিউ চোখ টেরিয়ে আমাকে দেখল, তারপর হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠে দাঁড়াল।

আমি বললুম, 'পিউ!'

'দম্মা!' বলে পিউ ছুটে এসে আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরল। ভোলেনি আমাকে। চোখে জল এল, কোলে তুলে নিয়ে আদর করলুম, চুমু খেলুম; চুপিচুপি তার কানে কানে বললুম, 'পিউ, তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে?'

পিউ বলল, 'উঁ?'

বললুম, 'কিছু না। কলা খেয়েছ, এবার ঘুমিয়ে পড়।'

সে আমার কাঁধে মাথা রাখল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম, কলাবতীকে বললুম, 'তুমি থাকবে ত?'

সে বলল, 'জী, রাত্রে আমি পিউরানীর কাছে শুই।'

'বেশ। আমি আবার দেখে যাব।' বলে আমি নীচে নেমে গেলুম।

পরীক্ষা শেষ হয়েছে, জামাইবাবু চেয়ারে বসে প্রেস্ক্রিপশন লিখছেন, আমাকে দেখে মুখ তুললেন,—'আশঙ্কার কিছু নেই, কিন্তু পাক্কা দু'দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। নড়াচড়া বারণ! এই ওষুধটা আনিয়ে নাও—তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে। আজ রাত্রে এক দাগ দিলেই চলবে, বাকী ওষুধ কাল খাবেন।'

প্রেস্ক্রিপশন নিয়ে জিগ্যেস করলুম, 'কী খেতে দিতে হবে? কাল সাবুর জল খেয়ে ছিলেন, আজ আমি এসে কফি আর টোস্ট খাইয়েছি।'

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক করেছ। চা কফি কোকো টোস্ট দিতে পার। কাল জ্বর নেমে যাবে, তখন মুরগির সুপ, হাফ বয়েল্ড ডিম দেওয়া চলবে।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন, রুগীর দিকে হেসে তাকালেন, 'দুটো দিন একটু কষ্ট করুন, তারপর চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।— আচ্ছা চলি।'

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনার ফী—'

ডাক্তার বললেন, 'আপনি ত আমাকে ডাকেননি, আপনার কাছ থেকে ফী নেব কেন? প্রিয়ংবদা ডেকেছে, ওর কাছ থেকে নেব।'

ডাক্তার ঘর থেকে বেরুলেন, আমি সঙ্গে গেলুম। জিগ্যেস করলুম, 'রাত্তিরে কি আমার থাকা দরকার?'

বললেন, 'আমি ত কোন দরকার দেখি না।'

তখন আমি সলিলার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথা বললুম। শুনে তিনি বললেন, 'তাই নাকি! তাহলে ত তোমাকে থাকতে হয়। মহিলাটি যদি দুপুর রাত্রে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয়ে যায়, তখন রুগীকে সামলাবে কে?'

'বেশ, আমি থাকব।'

'আচ্ছা। আমি শুক্লাকে খবর দেব যে আজ রাত্তিরে তুমি ফিরবে না।'

একটু হেসে তিনি গাড়িতে উঠলেন, গাড়ি চলে গেল। শিউসেবক লবিতেই ছিল, তাকে প্রেস্ক্রিপশন দিয়ে বললুম, 'ওষুধটা ডিস্পেন্সারি থেকে আনিয়ে নাও।' সে চলে গেল।

আমি ঘরে ফিরে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে রুগীর হুকুম হল, 'এবার গ্র্যান্ড হোটেলে ফোন কর।'

আর এড়ানো যায় না। ডাইরেক্টরিতে নম্বর খুঁজে ফোন করলুম। ম্যানেজারকে পাওয়া গেল না, তার বদলে যে লোকটা ছিল সে স্পষ্টভাবে বলতে পারল না প্রাণগোপাল সেন নামে কেউ হোটেলে আছেন কি না! ভালই হল, শঙ্খনাথবাবুকে তাই বললুম। তিনি মুখ অন্ধকার করে শুয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'ডাক্তারবাবুটি বেশ লোক, চ্যাংড়া ডাক্তার নয়। নাম কী?

'নিরঞ্জন দাস।'

'তোমার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে দেখলাম।'

'হ্যাঁ, আমি ওঁর ছাত্রী, ওঁর কাছে পড়েছি।'

আর কিছু বললেন না, চোখ বুজে শুয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে যাবার পর তিনি চোখ খুলে আমার দিকে ঘাড় ফেরালেন, 'রাত্তিরে থাকবে?'

'থাকব।'

'তুমি ত খেয়ে আসনি!'

'না।'

তিনি তখন ডাকলেন, 'শিউসেবক!'

শিউসেবক বোধহয় অন্য কোন চাকরকে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে নিজে লবিতে দাঁড়িয়ে ছিল, সে ঘরে এসে বলল, 'জী?'

'ইনি আজ এখানে খাবেন। ওঁর খাবার এই ঘরে নিয়ে এস।'

আমি বললুম, 'এই আটটা বেজেছে। এখন নয়, ন'টার পর। সেই সঙ্গে এ'র জন্যে দুধ দিয়ে কোকো তৈরি করে আনবে।'

'জী।' শিউসেবক চলে গেল। সে পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে কিন্তু মালিকের সামনে হিন্দীতে কথা বলে। কলাবতী একেবারেই বাংলা বলতে পারে না, চেষ্টাও করে না।

সাড়ে আটটার সময় ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এল। এক দাগ খাইয়ে দিলুম।

তারপর আস্তে আস্তে সময় কাটতে লাগল। রুগী কখনও চুপচাপ শুয়ে আছেন, কখনও এপাশ ওপাশ করছেন। শরীরে যদি বা স্বস্তি থাকে, মনে স্বস্তি নেই। মনটা শরশয্যায় শুয়ে আছে।

সওয়া ন'টার সময় শিউসেবক খাবারের প্রকাণ্ড ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল, টেবিলের ওপর ট্রে রেখে বলল, 'মাজী, খাবার এনেছি।'

ন্যাপকিন দিয়ে ট্রে ঢাকা, কী খাবার এনেছে দেখতে পেলুম না। জিগ্যেস করলুম, 'বাবুর মিল্ক-কোকো এনেছ?'

'জী, এনেছি।'

উঠে গিয়ে ট্রে থেকে ন্যাপকিন তুললুম। বাদশাহী ব্যাপার। পোলাও চাপাটি মাছের ফ্রাই মাংসের কালিয়া চিংড়িমাছের মালাইকারি চাটনি রাবড়ি সন্দেশ। এক পাশে একটা বড় পেয়ালায় গরম মিল্ক-কোকো।

পেয়ালা নিয়ে খাটের কাছে গেলুম,—'উঠে বসুন, খাবার এনেছি।'

উঠে বসে পেয়ালা হাতে নিলেন, বললেন, 'তুমি খেতে বোস।'

ঘরের লাগাও বাথরুম, সেখানে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের মুখখানা আয়নায় দেখলুম। প্রিয়ংবদা ভৌমিক, তোমার জীবন ওলট-পালট হয়ে গেছে, কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না।

ফিরে এসে খেতে বসলুম। উনি বসে বসে আমার খাওয়া দেখতে লাগলেন। এক সময় জিগ্যেস করলেন, 'কেমন রেঁধেছে?'

বললুম, 'কাঁকড়ার ঝাল বাটি-চচ্চড়ির চেয়ে ভাল।'

একটু হাসলেন, মুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। বেশ বোঝা যায় উনি মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসেন, মানুষকে তৃপ্ত করে খেতে দেখলে নিজে তৃপ্ত পান।

খুব তৃপ্ত করেই খেলুম। উনি বসে বসে দেখলেন। শিউসেবক পাশে দাঁড়িয়ে খাওয়া তদারক করল; তারপর খাওয়া শেষ হলে বাসন তুলে নিয়ে চলে গেল।

হাতমুখ ধুয়ে খাটের ধারে চেয়ারে এসে বসলুম, 'এবার আপনি শুয়ে পড়ুন। দশটা

বেজে গেছে, ঘুমুবার চেষ্টা করুন।'

'আমি ঘুমুব, তুমি একা জেগে থাকবে?'

'আমি চেয়ারে বসে বসে ঘুমুতে পারি। নিন আর কথা নয়, শুয়ে পড়ুন।'

আর কথা হল না, উনি শুলেন। চোখের ওপর একটা বাহু রেখে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।—

এইবার নিজের কথা লিখি। কিন্তু কী ছাই লিখব? মরণের কি ধরন আছে! কেউ তিল তিল করে পুড়ে মরে, কেউ আতশবাজির মতন এক লহমায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এরই নাম ভালবাসা!

ভালবাসার কথা গল্প উপন্যাসে পড়েছি, শুক্লার মুখে কিছু কিছু শুনেছি। সে একবার বলেছিল—'ভালবাসার কতখানি চোখের নেশা কতখানি মনের মিল, কতটা স্বার্থ-পরতা কতটা আত্মদান বুঝতে পারি না, হয়ত সবটাই জৈববৃত্তি।' কিন্তু প্রেম যে হঠাৎ এসে এক মুহূর্তে জীবনকে তোলপাড় করে দিতে পারে একথা সে বলেনি। তবে কি সকলের প্রেম একরকম নয়?

প্রথম দর্শনেই প্রেম হয় শুনেছি। শকুন্তলার হয়েছিল, রোমিও-জুলিয়েটের হয়েছিল; আজকালও নিশ্চয় হয়। কিন্তু আমার হল না কেন? ওই যে মানুষটি একমুখ দাড়ি নিয়ে শুয়ে রয়েছেন ওঁকে ত আজ নতুন দেখছি না, বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি: তবে এতদিন কিছু মনে হয়নি কেন? বরং ওঁর কথাবার্তা আচার-ব্যবহার খারাপই লেগেছিল। তারপর অবশ্য গা-সওয়া হয়েছিল, লোকটি যে অন্তরে খাঁটি তাও বুঝতে পেরেছিলুম। কিন্তু তাই বলে এ-রকম হবে এ যে কল্পনার অতীত! পুরুষের স্পর্শে কি ম্যাজিক আছে? এই জন্যেই কি আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—ঘি আর আগুন!

কিন্তু তাই বা কেন? আমার পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে; কচি খুকী নই, প্রথম-প্রণয়-ভীতা নবীনা কিশোরী নই। কাজের সূত্রে অনেক পুরুষের সঙ্গে হাত ঠেকাঠেকি হয়েছে; জামাইবাবুর সঙ্গে কতবার খেলার ছলে পাঞ্জা লড়েছি, কখনও কিছু মনে হয়নি। তবে আজ আমার এ কী হল! এ কি কারুর হয়? এ কি সম্ভব?

নাড়ী দেখবার জন্যে ওঁর কব্জি আমার হাতে নিয়েছিলুম। মনে হল আমার চুল থেকে নখ পর্যন্ত একটা শিহরণ বয়ে গেল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল; বুকের মধ্যে ঝড়ের বেগে মৃদঙ্গ বেজে উঠল। তারপর যন্ত্রের মতন কী করেছি আবছা মনে আছে। হঠাৎ যখন সচেতন হলুম তখন দেখি, ওঁকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছি আর পাগলের মতন বলছি—'না, তুমি উঠতে পাবে না...তোমাকে উঠতে দেব না।'...

এ আমার কী সর্বনাশ হল! শুক্লা বলেছিল—পুরুষদের মধ্যে নেকড়ে বাঘ আছে, অজগর সাপ আছে। শঙ্খনাথবাবু কি তাই? আমাকে মোহাচ্ছন্ন করেছেন? কিন্তু তাই বা কী করে হবে? কোনদিন ওঁর চোখে লোভ দেখিনি। সরল সহজ মানুষ। তবে কি আমারই দোষ? আমার মন দুর্বল? কিন্তু কী দেখে আমার মন ওঁর দিকে আকৃষ্ট হল! উনি বিবাহিত, স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে। ছি-ছি, আমার মন এত অবুঝ? ঘেন্নাপিত্তি নেই?

এই ভালবাসা! এই প্রেম! হোক প্রেম, কিন্তু নিকষিত হেম নয়। প্রেমের এত গুণগান শুনেছি, সব মিথ্যে। চণ্ডীদাস জানতেন প্রেম ভাল নয়, তাতে খাদই বেশী। আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। সারা জন্ম ধরে কাঁদাবে।...

বারোটা বাজল। উনি চোখের ওপর হাত রেখে ঘুমুচ্ছেন, টেবিলের ওপর ঘোমটা-ঢাকা ল্যাম্প জ্বলছে। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। আমি আস্তে আস্তে উঠে বাইরে গেলুম।

লবিতে আলো জ্বলছে না, ঘরের আলো দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে অন্ধকারকে একটু স্বচ্ছ করেছে। দেখলুম, লবির এক পাশে দেয়াল ঘেঁষে শিউসেবক একটা কম্বল পেতে শুয়ে আছে। বোধহয় জেগেই ছিল, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল; আমার কাছে এসে খাটো

গলায় বলল, 'মাজী, কিছু দরকার আছে কি?'

বললুম, 'শিউসেবক, তুমি এখানে শুয়েছ ভালই করেছ। এখন কিছু দরকার নেই, যদি দরকার হয় তোমাকে ডাকব।'

'বহুৎ আচ্ছা মাজী।'

শিউসেবক প্রভুভক্ত চাকর। ওকে কেউ এখানে থাকতে বলেনি, নিজে থেকেই আছে। লক্ষ্য করেছি শিউসেবক আর কলাবতী দু'জনেই মালিকের অন্ধ ভক্ত। কিন্তু মালিকের স্ত্রীকে বোধহয় একটুও শ্রদ্ধা করে না।

লবির কিনারায় গিয়ে বাইরের অন্ধকারে হাত বাড়ালুম, হাতে বৃষ্টির ছিটে লাগল। এখনও টিপিটিপি চলেছে।

ঘরে ফিরে গেলুম।

চেয়ারে বসেছি, উনি চোখের ওপর থেকে হাত নামিয়ে বললেন, 'সলিলা ফিরেছে?'

'না।'

আবার চোখের ওপর হাত রেখে শুলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'মেয়েমানুষের দাবাই কী জান? চাবুক। সকালে একবার, রাত্তিরে একবার। তবে তারা শায়েস্তা থাকে।'

বললুম, 'চাবুক লাগালেই পারেন। কে মানা করেছে?'

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, 'ওইটে যে পারি না। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলতে যদি পারতাম তাহলে কি আমার এ দশা হত।'

'তবে আর ভেবে কী হবে! ঘুমিয়ে পড়ুন, রাত এখনও অনেক বাকী।' আমিও যে মেয়েমানুষ সেকথা আর বললুম না। অবশ্য তিনি একটি বিশেষ মেয়েমানুষকে লক্ষ্য করে কথাটা বলেছিলেন। এবং একথাও আমার বুঝতে বাকী থাকেনি যে, সলিলা যতই মন্দ হোক তাকে তিনি ভালবাসেন। সলিলা তাঁকে ভালবাসে না, সে অতি নীচ প্রকৃতির মেয়ে; তবু তাকেই তিনি ভালবাসেন, আর কাউকে নয়।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে অনাহত মৃদঙ্গধ্বনি বেজে চলেছে। কী চুলোর ছাই পেয়ে মৃদঙ্গ বাজছে? কী পেলুম, কী দিলুম?

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। ইনি মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছেন, আবার জেগে উঠেই প্রশ্নভরা চোখে চাইছেন; আমি মাথা নেড়ে উত্তর দিচ্ছি—না, সলিলা আসেনি।

রাত্রি আড়াইটের সময় একবার চুপি চুপি ওপরে গেলুম। পিউয়ের ঘরে দাউ দাউ করে দুটো বাল্ব জ্বলছে; কলাবতী পিউয়ের বিছানায় শুয়ে তাকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমুচ্ছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে পিউকে দেখলুম; ইচ্ছে হল কলাবতীকে সরিয়ে আমি পিউকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমুই। কিন্তু—

আজ একবার পাগলামি করেছি, বার বার পাগলামি ভাল নয়। তাছাড়া নীচে রুগী আছেন।

একটা বাল্ব নিভিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে গেলুম। রুগী চোখ চেয়ে আছেন। তাঁর চোখের নিঃশব্দ প্রশ্নের উত্তরে বললুম, 'না, আসেনি। আমি পিউকে দেখতে গিয়েছিলুম।'

তিনি আবার চোখের ওপর বাহু রাখলেন।

রাত কেটে গেল, সকাল হল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে; কাঁচা রোদ্দুর ভিজে আকাশের গায়ে সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে।

রুগীর টেম্পারেচার নিলুম; জ্বর কমেছে, সাড়ে নিরেনব্বুই। তাঁকে কফি টোস্ট খাওয়ালুম, নিজেও এক পেয়ালা চা খেলুম। শিউসেবককে বললুম, 'আধ ঘণ্টা পরে এক দাগ ওষুধ খাওয়াবে, তারপর তিন ঘণ্টা অন্তর ওষুধ খাইয়ে যাবে।' ব্যাগ তুলে নিয়ে রুগীকে বললুম, 'আমি এবার চললুম। আর একটু বেলা হলে দাড়িটা কামাবেন।'

দরজা পার হয়েছি, পিছন থেকে ডাক এল, 'শুনে যাও।'

ফিরে গিয়ে সামনে দাঁড়ালুম। চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন, 'একবার 'তুমি' বলবার পর আবার 'আপনি' কেন?'

আমি উত্তর দিলুম না, ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। অত রাগারাগির মধ্যেও লক্ষ্য করেছেন!

বাসায় ফিরে গিয়ে শুনতে পেলুম শুক্লা নিজের শোবার ঘরে গান গাইছে—'অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।'

দোরের কাছ থেকে উঁকি মেরে দেখি, সে স্নান করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। বললুম, 'ও গান নয় শুক্লা, সেই গানটা গা—কে বলে পিরীতি ভাল।'

সে চিরুনি হাতে কাছে এসে দাঁড়াল, আমার মুখের পানে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, 'কী হয়েছে রে?'

বললুম, 'যা হবার তাই হয়েছে। তুই যেমন মরেছিলি, আমিও তেমনি মরেছি। তোর তবু একটা সুরাহা ছিল, জামাইবাবু তোকে ভালবাসতেন। আমার কিচ্ছু নেই।'

চোখ থেকে হঠাৎ জল বেরিয়ে এল।

শুক্লা আমাকে জড়িয়ে নিল তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যা, আগে স্নান করে ঠাণ্ডা হ, তারপর শুনব।'

যেতে যেতে বললুম, 'আর ঠাণ্ডা! এজন্মে আর ঠাণ্ডা হব না।'

পরে শুক্লাকে সব বললুম। আর সাবধান করে দিলুম, 'জামাইবাবুকে কিছু বলবি না।'

সে বলল, 'তাঁকে কিছু বলতে হবে না। তিনি ডাক্তার, রুগীর মুখ দেখে রোগ ধরতে পারেন। কিন্তু এ আমাদের কী হল ভাই! দু'জনের কপালের লেখাজোখা কি একই রকম?'

বিকেলবেলা ফোন করলুম,—'আমি প্রিয়ংবদা। এবেলা শরীর কেমন?'

তিনি বললেন, 'ভালই মনে হচ্ছে। জ্বর বোধহয় নেই। তবে একটু দুর্বলতা আছে।'

'ডাক্তারের হুকুম মনে আছে ত? দু'দিন নড়াচড়া বারণ।'

'মনে আছে।'

'বাড়ির খবর কী?'

'বাড়ির খবর—মানে সলিলার খবর? সে ফেরেনি। যাকগে, যা ইচ্ছে করুক, আমার কী?' কথাগুলো ভারি বৈরাগ্যপূর্ণ শোনাল।

'পিউ ভাল আছে?'

'আছে। কাল রাত জেগে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে ত?'

কষ্ট! মনে মনে ভাবলুম, আমার কষ্ট তুমি কী বুঝবে? মুখে বললুম, 'রাত জাগতে আমার কষ্ট হয় না।'

একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কাল তুমি খুব বাঁচিয়ে দিয়েছ। রাগ হলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। চাষা-মনিষ্যি ত।'

বললুম, 'আপনি চাষা-মনিষ্যি নয়। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করি, লেখাপড়া শেখেননি কেন?'

ধমক দিয়ে বললেন, 'আবার 'আপনি'!'

দু-তিনবার ঢোক গিললুম, তারপর বললুম, 'আচ্ছা বল, লেখাপড়া শেখনি কেন?'

সহজভাবে বললেন, 'শিখব কখন? বাবা সামান্য চাকরি করতেন; আমার যখন তেরো বছর বয়স তখন তিনি মারা গেলেন। সংসার ঘাড়ে পড়ল। তারপর মা মারা গেলেন, তারপর ছোটবোনটাও মরে গেল। বাস্, সংসারে আমি একা; আর লেখাপড়ার দরকার কী? রোজগারের ধান্দায় লেগে গেলাম।'

ইচ্ছে হল জিগ্যেস করি, এমন বউ যোগাড় করলেন কোত্থেকে? কিন্তু সংকোচ হল, প্রশ্ন করতে পারলুম না। বললুম, 'আচ্ছা কাল আবার ফোন করব।'

'আচ্ছা।'

ফোন রেখে দিলুম। শরীরের সমস্ত স্নায়ুশিরা যেন টান হয়ে আছে। আবার এবেলা স্নান করব। তারপর খেয়ে ঘুমুব, যত পারি ঘুমুব। যতক্ষণ ঘুমুব অন্তত ততক্ষণ মনটা শান্ত থাকবে।

স্নান করে এসে শোবার ঘরে দোর বন্ধ করলুম। আলো জেলে আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। আয়নায় আমার দেহের প্রতিবিম্ব পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে নেবার মতন নয়। কিন্তু কতদিন থাকবে এ যৌবন? মেয়েদের যৌবন কতদিন থাকে? সকালবেলার ফোটা ফুল সন্ধ্যে বেলায় শুকিয়ে যায়।

রাত্রি ন'টার সময় আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। ভেবেছিলুম ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু কোথায় ঘুম! এগারোটা পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লুম। চোখে মুখে জল দিয়ে আলো জেলে ডায়েরি লিখতে বসেছি।

রাত্রি এখন আড়াইটে। বেশ আছি আমি: দিনে ঘুম নেই, রাত্রে ঘুম নেই। একেবারে তপস্বিনী হয়ে গেছি।

১৫ ভাদ্র।

এই কয়েক দিনের মধ্যে কত কাণ্ডই না হয়ে গেল। বাবাঃ, যেন কালবোশেখীর ঝড়। শুধু আমার জীবনে নয়, শুক্লার জীবনেও। আজ রবিবার। গত বুধবারে ডাক্তার মন্মথ করের ফোন এল। গলার আওয়াজ আগের মতই মোলায়েম, কিন্তু মনে হয় মখমলের খাপের মধ্যে ধারালো ছুরি ঢাকা আছে। বললেন, 'মিস্ ভৌমিক, ভাল আছেন ত? খবর পেলাম শঙ্খনাথবাবুর অসুখ হয়েছিল, আপনি সেবা করতে গিয়েছিলেন। দেখছি শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে আপনার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। আমাকে ডাকবার আগেই তিনি আপনাকে ডাকেন।'

আমার গলা বুজে এল। এ কথার কী উত্তর দেব? তিনি আবার বললেন, 'আরও শুনলাম ডক্টর নিরঞ্জন দাসকে কল্ দেওয়া হয়েছিল। আমি শঙ্খনাথবাবুর ফ্যামিলি ডক্টর; অথচ তাঁর অসুখে আমাকে না-ডেকে ডাকা হয়েছিল নিরঞ্জন দাসকে! কে ডেকেছিল? আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'মিস্ ভৌমিক, শঙ্খনাথবাবুর মেয়ের যখন অসুখ হয় তখন আমিই আপনাকে ডেকে কাজ দিয়েছিলুম। সে কথা এখন আপনার মনে নেই, কারণ শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে এখন আপনার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে—তাছাড়া নিরঞ্জন দাসও আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—'

আমি মরিয়া হয়ে বললুম, 'আপনি ভুল করছেন ডক্টর কর। শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নেই, তিনি আমাকে কল্ দিয়েছিলেন তাই গিয়েছিলুম। অবশ্য ডক্টর দাস আমার বন্ধু; কিন্তু তিনি ডাক্তার হিসেবে শঙ্খনাথবাবুকে দেখতে যাননি, ফী নেননি। তাঁকে আমি ডেকেছিলুম, কারণ তাঁর কথাই আমার আগে মনে পড়েছিল—'

'তা ত পড়বেই!' বাঁকা হাসির সঙ্গে কথাগুলো আমার কানে বিঁধল—'আপনি খাসা আছেন। একদিকে বড়মানুষ শঙ্খনাথ ঘোষ, যিনি গাড়িতে করে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেন; অন্যদিকে বড় ডাক্তার নিরঞ্জন দাস, যিনি রাত দুপুরে আপনাদের বাসায় যাতায়াত করেন। অথচ আমি চায়ের নেমন্তন্ন করলে আপনি সময় পান না!'

আমার মুখচোখ গরম হয়ে উঠেছিল, বললুম, 'আর কিছু বলবার আছে?'

তিনি বললেন, 'বলবার আছে অনেক কিছুই। কিন্তু আপনাকে নয়। যেখানে বললে কাজ হবে সেখানে বলব। আমি আপনার উপকার করেছিলাম আপনি তার চমৎকার প্রতিদান দিয়েছেন, আমাকে সরিয়ে নিরঞ্জন দাসকে ডেকে এনেছেন। একথা আমার মনে থাকবে। আচ্ছা, নমস্কার।'

টেলিফোন রেখে সেইখানেই বসে রইলুম। কী হবে এখন! হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপর শুক্লা এল, তাকে বললুম। তার মুখখানিও সিটিয়ে শুকিয়ে নীল হয়ে গেল।

পরদিন সকাল আটটার সময় আবার টেলিফোন। আমি আর শুক্লা দু'জনেই ঘরে ছিলুম, আড়ষ্ট হয়ে টেলিফোনের দিকে চেয়ে রইলুম; যেন টেলিফোন নয়, একটা সাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে রয়েছে, এখনই ফণা তুলে ছোবল মারবে। শুক্লা শেষে বলল, 'তুই ফোন ধর প্রিয়া, আমার হাত-পা কাঁপছে।'

ফোন তুলে কানের কাছে ধরলুম, চিঁচিঁ সুরে বললুম, 'হ্যালো!'

জামাইবাবুর গলা—'প্রিয়ংবদা! শোন, তুমি এখনই একবার আমার বাড়িতে আসতে পারবে? একজনকে নার্স করতে হবে।' তাঁর কণ্ঠস্বর দৃঢ়, কঠিন; ডাক্তারের কণ্ঠস্বর।

ভয় কেটে গেল, ব্যগ্র হয়ে বললুম, 'কী হয়েছে? কাকে নার্স করতে হবে?'

তিনি একটু থেমে বললেন, 'আমার স্ত্রীকে। হঠাৎ তাঁর স্ট্রোক হয়েছে, প্যারালিটিক স্ট্রোক। তুমি ফ্রী আছ? আসতে পারবে?'

কিছুক্ষণ কথা কইতে পারলুম না, তারপর বললুম, 'পারব। আধ ঘণ্টার মধ্যে গিয়ে পেঁছুব।'

'বেশ। বাড়ির ঠিকানা জানা আছে, চলে এস।' তিনি ফোন রেখে দিলেন।

শুক্লা দাঁড়িয়ে একতরফা কথা শুনছিল। সে বুঝতে পেরেছিল জামাইবাবু ফোন করেছেন এবং একটা গুরুতর কিছু ঘটেছে। সে আমার আঁচল খামচে ধরে শীর্ণ গলায় বলল, 'প্রিয়া—কী—কী—?'

'আমার ঘরে আয়, বলছি। হয়ত—হয়ত ভগবান তোর পানে মুখ তুলে চেয়েছেন।'

শোবার ঘরে কাপড় বদলাতে বদলাতে শুক্লাকে বললুম। সে আমার বিছানায় বসে শুনছিল, আস্তে আস্তে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। তার মুখখানা মড়ার মতন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আশা! যে-মানুষ আশা ছেড়ে দিয়েছে সে যদি হঠাৎ আশার আলো দেখতে পায় তাহলে আচমকা ধাক্কা সামলাতে পারে না। আমিও আশা করছি, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আশা করছি, জামাইবাবু যেন মুক্তি পান। শুক্লার জীবন যেন ফলে ফুলে ভরে ওঠে।

কিন্তু তবু, ভেবে দেখতে গেলে, কিসের জন্যে আশা? একটা মানুষ সাংঘাতিক পীড়িত, সে যেন বেঁচে না-ওঠে এই আশা? খুব উচ্চাঙ্গের আশা নয়। তবু স্বার্থপর মন ওই আশাকেই আঁকড়ে ধরেছে। ভাবছি, জামাইবাবুর মনেও কি এই আশা উঁকি-ঝুঁকি মারছে?

বললুম, 'যদি সুবিধে পাই ফোন করব।' ব্যাগ নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। জামাইবাবুর বাড়িতে কখনও যাইনি, কিন্তু খুঁজে নিতে পারব।

জামাইবাবুর বাড়ি কলকাতার উত্তরাংশে। দোতলা বাড়ি; নীচের তলায় একটা সাধারণ বসবার ঘর, চাকরদের ঘর, রান্নাঘর ভাঁড়ার। একজন চাকর সদরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে দেখে বলল, 'আপনি কি মিস্ ভৌমিক? এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান, ডাক্তারবাবু ওপরে আছেন।'

দোতলায় সিঁড়ির মুখেই একটা ঘর, ড্রয়িং-রুমের মতন সাজানো। সোফা-সেট্ আছে, সাজসরঞ্জাম আছে; কিন্তু কিছুরই ছিরি-ছাঁদ নেই। সব এলোমেলো অপরিচ্ছন্ন।

জামাইবাবু সোফায় বসে একজন বৃদ্ধ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ডক্টর বর্ধন কলকাতার ডাক্তার-সমাজের মাথার মণি; প্রায় সব ডাক্তারই তাঁর শিষ্য। তিনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি তাঁকে চিনি। আমি যখন ঘরে ঢুকলুম তখন তিনি শান্ত গম্ভীর গলায় বলছেন,—'...তুমি নিজের হাতে রেখো না—' আমাকে দেখে থেমে গেলেন।

জামাইবাবু বললেন, 'না সার। এস প্রিয়ংবদা।'

ডক্টর বর্ধন বললেন, 'আমি উঠি। দরকার হলে জানিও।'

'জানাব স্যার।'

ডক্টর বর্ধন চলে গেলেন। জামাইবাবু তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এলেন, আমাকে বললেন, 'বোস সখি।' আমি সোফার একপাশে বসলুম। তিনিও সোফায় বসে কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে কী ভাবলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে একটু ফিকে হেসে বললেন, 'তোমাকে ডেকে ভুল করেছি সখি। যাহোক, এসেছ যখন দেখে যাও।'

'কখন কী হল আগে বলুন।'

তিনি হেলান দিয়ে বসে উস্কখুস্ক চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কাল রাত্রি দশটার সময় কেউ একজন ফোন করেছিল...আমি বাড়ি ছিলাম না...ফোন পাবার পর আমার স্ত্রী ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করেন, তারপর রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। আমি এসে দেখি—স্ট্রোক হয়েছে, বাঁ অঙ্গটা পড়ে গেছে।'

বললুম, 'কে ফোন করেছিল জানা গেছে কি?'

তিনি চকিত হয়ে চাইলেন, 'না। তুমি জান?'

'জানি। মন্মথ কর।' বলে কাল বিকেলের ঘটনা বললুম।

তিনি একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, 'হুঁ। আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। মন্মথ করের উদ্দেশ্য কিন্তু সিদ্ধ হল না, সে যা চেয়েছিল তার উল্টো ফল হল।—এস।'

তিনি আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। খাটের পায়ের কাছে একজন ঝি দাঁড়িয়ে আছে, আর খাটে শুয়ে আছেন একটি মহিলা। আগে তাঁকে দেখিনি, এই প্রথম দেখলুম। লম্বা হাড়ে-মাসে শরীর, মুখে বেশী মাংস নেই, রঙ লালচে সাদা, ঘন জোড়া-ভুরু, নাকটা মুখের ওপর খাঁড়ার মতন উঁচু হয়ে আছে। মুখের বাঁ দিকটা রোগের আক্রমণে বেঁকে গেছে। তবু যৌবনকালে ইনি উগ্র ধরনের সুন্দরী ছিলেন তা এখনও বোঝা যায়। ইনিই ডক্টর নিরঞ্জন দাসের স্ত্রী।

আমরা খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। রোগিণী আমাদের দিকে মাথা ঘোরাতে পারলেন না, কেবল চোখ ফিরিয়ে তাকালেন। মানুষের চোখে এমন বিষাক্ত আক্রোশ আর বোধহয় কখনও দেখিনি। চমকে উঠতে হয়। তারপর তাঁর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল; বিকল স্বরযন্ত্রের আওয়াজ, কিছু বোঝা গেল না। জামাইবাবু তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বলবে?'

আবার তাঁর মুখ দিয়ে গোঙানির মতন শব্দ বেরুল, যার মানে বোঝা না-গেলেও মনের ভাব বুঝতে কষ্ট হয় না। জামাইবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'চল, আমাদের দেখে উনি উত্যক্ত হচ্ছেন।'

বাইরের ঘরে ফিরে গিয়ে জামাইবাবুর মুখের পানে চাইলুম। তিনি বললেন, 'ভেবেছিলাম নিজেই চিকিৎসা করব, তোমরা দেখাশোনা করবে। কিন্তু মাস্টারমশাই যা বলে গেলেন তারপর আর তা সম্ভব নয়। স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনিবনাও নেই একথা জানাজানি হয়ে গেছে, এমন কী মাস্টারমশায়ের কানে পর্যন্ত উঠেছে। আমার চিকিৎসায় যদি কিছু মন্দ ফল হয়—বুঝতে পারছ? তার চেয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া ভাল। সেখানে অন্য ডাক্তার চিকিৎসা করবেন, আমার কোনও দায় থাকবে না। আমি কেবল বাইরে থেকে দেখাশোনা করব।'

জিগ্যেস করলুম, 'রোগের প্রগ্নসিস্ কী রকম?'

মাথা নেড়ে বললেন, 'কিছু বলতে পারি না। অবশ্য আরাম হবার কোনও আশাই নেই, কিন্তু এই অবস্থায় পাঁচ বছর বিছানায় শুয়ে থাকাও সম্ভব।'

বুক দমে গেল। তিনি আমার মনের অবস্থা বুঝে একটু হেসে বললেন, 'সখি, দুনিয়ার কাছে কিছু আশা কোরো না, তাহলেই ধাক্কা খাবে। সংসার নিজের নিয়মে চলে, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার তোয়াক্কা রাখে না।—চল, গাড়িতে তোমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

প্রায় আঁতকে উঠলুম, 'আপনি ওখানে যাবেন?'

তাঁর মুখে কেমন একরকম হাসি ফুটে উঠল; তার কতকটা ব্যঙ্গ কতকটা আত্মগ্লানি। বললেন, 'এখন আর ভয় কিসের? লজ্জাই বা কিসের? আমি অবশ্য কোনদিনই লজ্জা করিনি, কিন্তু কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় ছিল; এখন আর তাও নেই।—চল, তোমাকে পেঁছে দিয়ে হাসপাতালে যাব। সেখানে একটা প্রাইভেট ক্যাবিনের ব্যবস্থা করে আজই রুগীকে রিমুভ করতে চাই।'

বাসার সামনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'শুক্লাকে বলো যেন বেশী বিচলিত না হয়। আমি যদি পারি রাত্তিরে আসব।'

শুক্লা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, আমি আসতেই আমাকে খামচে ধরল,—'ফিরে এলি যে?'

যা দেখেছি যা শুনেছি সব তাকে বললুম, সে আমাকে খামচে ধরে বসে রইল। শেষে ভয়-জড়ানো সুরে বলল, 'কী হবে প্রিয়া?'

বললুম, 'জামাইবাবু বলেছেন, দুনিয়ার কাছে কিছু আশা কোরো না, তাহলেই ধাক্কা খাবে। তোকে বেশী বিচলিত হতে মানা করছেন। আজ রাত্তিরে হয়ত আসতে পারেন।'

শুক্লা কিছুক্ষণ বুকে ঘাড় গুঁজে বসে রইল, তারপর উঠে স্নান করতে চলে গেল। স্নান করে যখন ফিরে এল তখন তার মুখ দেখে বুঝলুম, সে মন শক্ত করেছে। উঃ, আশা মানুষের মনকে কী দুর্বলই করে দিতে পারে!

জামাইবাবু কিন্তু রাত্তিরে এলেন না, বাড়ি থেকে ফোন করলেন,—'আজ হাসপাতালে ক্যাবিন পাওয়া গেল না। কাল একটা খালি হবে। আজ তোমাদের বাসায় যেতে পারব না, রুগীর কাছে থাকতে হবে।'

'আমি যাব?'

'না, তাতে বিপরীত ফল হতে পারে। শুক্লাকে ফোন দাও, তার সঙ্গে দুটো কথা বলি।'

শুক্লার হাতে ফোন দিয়ে আমি সরে গেলুম—

পরদিন শুক্রবার। সন্ধ্যের পর জামাইবাবু এলেন। আমি নিজের ঘরে ছিলুম, বেরিয়ে এসে শুক্লার ঘরে গলার আওয়াজ পেয়ে সেই দিকে গেলুম। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখি, জামাইবাবু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আর শুক্লা তাঁর বুকে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদছে।

পা টিপে টিপে সরে আসছিলুম, জামাইবাবু হাত নেড়ে বললেন, 'সখি, এদিকে এস। তুমি শুক্লাকে বোঝাও যে এবার বিয়ে করলে কেউ নিন্দে করবে না।'

আমি সসংকোচে ঘরে ঢুকলুম; ওরা যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জা করতেও ভুলে গেছে। জামাইবাবু বললেন, 'এত বোঝাচ্ছি কিছুতেই বুঝছে না।'

শুক্লা মাথা নেড়ে কান্না-ভরা গলায় বলল, 'না, আমি বুঝব না। তুমি আমাকে লোভ দেখিও না। এখন বিয়ে করলে সবাই তোমায় ছি-ছি করবে, শহরে কান পাতা যাবে না। তুমি শ্রদ্ধা হারাবে, সম্মান হারাবে, পসার হারাবে। সে আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

জামাইবাবু বললেন, 'এখনই ছি-ছির কিছু বাকী আছে? তোমার-আমার কথা সবাই জানতে পেরেছে।'

'তা জানুক। তাতে আমার নিন্দে, তুমি পুরুষমানুষ, তোমার নিন্দে নেই। কিন্তু যদি বিয়ে কর, সবাই জো পেয়ে যাবে। তুমি গাইনকোলজিস্ট, কেউ তোমাকে মেয়েদের চিকিৎসা করতে ডাকবে না।'

জামাইবাবু গাঢ়স্বরে বলে উঠলেন, 'কিন্তু শুক্লা, আমি যে সংসার চাই, ছেলেমেয়ে চাই—'

'আর আমি কি চাই না?' শুক্লা ভিজে চোখ তুলে তাঁর মুখের পানে তাকাল।

হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেল। ওদের মনের এই দিকটা এতদিন দেখতে পাইনি।

সন্তানের জন্যে কী তীব্র কামনা ওদের মনে! সাধারণ পাঁচজনের মতন সংসারের সাধ, সন্তানের সাধ। অথচ বর্তমান অবস্থায় তা ত হবার নয়। তাই জামাইবাবু শুক্লাকে বিয়ে করবার জন্যে এমন ক্ষেপে উঠেছেন। কিন্তু শুক্লা তা হতে দেবে না; বুক ফেটে গেলেও সে জামাইবাবুর এতটুকু অনিষ্ট হতে দেবে না।

শেষ পর্যন্ত জামাইবাবু রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, আমি হাত ধরে ফিরিয়ে আনলুম, —'না-খেয়ে যেতে পাবেন না।'

তাঁর রাগ কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না। খানিক পরেই হেসে বললেন, 'বিয়ে না-করলে ত বয়ে গেল, গোঁফজোড়াতে দিলে চাড়া তোমার মত অনেক পাব। কিন্তু একটা কাজ ত করতে পার; আমার বাড়িটা গরুর গোয়াল হয়ে আছে, সেটাকে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে দিতে পার। করবে?'

আমি বলে উঠলুম, 'নিশ্চয় পারব। আমরা দু'জনে মিলে আপনার বাড়ি তকতকে ঝকঝকে করে দেব। কি বলিস শুক্লা?'

শুক্লার কান্না-ধোয়া চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

আমি বললুম, 'কাল সকালেই আমরা যাব। একদিনে যদি কাজ শেষ না হয় পরশুও যাব। আপনার বাড়ির পঙ্কোদ্ধার করে ছেড়ে দেব। অনেক খরচ কিন্তু। দরজা-জানলার পর্দা ফেলে দিতে হবে, সোফা-সেটের স্প্রিং গদি সব বদলাতে হবে। পাঁচ শো টাকার কমে হবে না। দেবেন ত?'

জামাইবাবু ভীষণ খুশি হলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর কিন্তু তিনি রইলেন না। হাসপাতালে গিয়ে স্ত্রীর রিপোর্ট নেবেন, তারপর বাড়ি যাবেন।

পরদিন, অর্থাৎ কাল সকালবেলা, চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। শুক্লার একটু ভয়-ভয় ভাব, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করছে না। বাড়িতে পৌঁছে দেখলুম, জামাইবাবু কাজে বেরিয়ে গেছেন; চাকর বলল, 'আমার নাম সুবোধ। বাবু হুকুম দিয়ে গেছেন আপনাদের যা চাই সব যোগাড় করে দিতে। আমি দুটো জন-মজুর ডেকে এনেছি। আর কী কী চাই হুকুম করুন।'

আমি বললুম, 'আমরা আগে বাড়িটা আগাগোড়া দেখতে চাই।'

'আজ্ঞে আসুন', বলে সুবোধ আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। আড়চোখে লক্ষ্য করলুম শুক্লার চোখে জল এসেছে। আমি আর তার পানে তাকালুম না।

বাড়িতে একটা চাকর একটা ঝি, সুবোধ আর শশী। তাছাড়া রান্নার জন্য বামুন-মেয়ে আছে। মোটর-ড্রাইভার পশুপও বাড়িতেই থাকে। নীচের তলাটা অত্যন্ত অপরিষ্কার; রান্নাঘর জলে কাদায় একহাঁটু হয়ে আছে; ছাতলা-ধরা কলতলাতে পা দিতে ভয় করে। জামাইবাবুর অর্ধাঙ্গিনী শুধু চেঁচাতে পারতেন সুগৃহিণী ছিলেন না।

সুবোধকে ডেকে বললুম, 'খানিকটা চুন আর বালি আনিয়ে নাও; আর নারকেল ছোবড়া। মজুর দুটোকে লাগিয়ে দাও, তারা ঘষে-মেজে কলতলা পরিষ্কার করুক।'

সুবোধ 'আজ্ঞে' বলে চলে গেল।

বামুন-মেয়ে ধোঁয়া-ভরা রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল। বেঁটে মোটা আধ-বয়সী মেয়েমানুষ, চোখ-ভরা কৌতূহল। তাকে ডেকে বললুম, 'আজ দুপুরবেলা আমরা দু'জন এখানে খাব। ডাক্তারবাবুও খাবেন।' সে থানের আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে দিতে ঘাড় নাড়ল। আমাদের কী ভাবল কে জানে!

নীচেরতলার মোটামুটি ব্যবস্থা করে আমরা ওপরে গেলুম। ওপরতলার অবস্থা ওরই মধ্যে ভাল, কিন্তু তবু দেখলে গা কিচকিচ করে। জানলার কাচে এত ময়লা জমেছে যে আলো ঢোকে না, মেঝে এত নোংরা যে মোজেইকের কার্জ প্রায় দেখা যায় না। তাছাড়া জানলা-দরজার পর্দা খাট বিছানা চেয়ার টেবিল টেনে ফেলে দিলেই হয়। শশী-ঝি ওপরে ছিল, আমাদের দেখে কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে বললুম, 'তুমি বাড়ির ঝি? এ কী অবস্থা

করে রেখেছ বাড়ির? বাড়িতে কি ঝাঁটপাটও পড়ে না?'

শশী-ঝি বুঝেছিল আমরা হেঁজিপেঁজি নই, তাই নাকি সুরে আরম্ভ করল, 'আমি একা মানুষ, কোন্ দিক দেখব মা! নীচে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কুটনো কোটা, বাটনা বাটা; ওপরে গিন্নী-ঠাকরুনের ফাই-ফরমাস, পান সাজা। তার ওপর মুখ-ঝামটা। সারাদিন ওপর আর নীচে, ওপর আর নীচে। একটা গতরে কত সামলাব?'

বললুম, 'আচ্ছা, হয়েছে। বাড়িতে গুঁড়ো সাবান আছে?'

শশী বলল, 'আছে মা, কাপড় কাচার গুঁড়ো সাবান আছে।'

'বেশ। নীচে গিয়ে এক বালতি জল গরম করে তাতে গুঁড়ো সাবান দিয়ে নিয়ে এস। ঘরদোর সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।'

'হ্যাঁ মা,' বলে শশী চলে গেল।

আমি আঁচল দিয়ে গাছ-কোমর বাঁধতে বাঁধতে শুক্লাকে বললুম, 'নে কোমরে আঁচল জড়া। তোকেও কাজ করতে হবে। তোর ঘর-দোর আমি একা পরিষ্কার করতে পারব না।'

শুক্লা লাল হয়ে উঠল, তারপর কোমরে আঁচল জড়াতে লাগল।

দুপুর পেরিয়ে জামাইবাবু এলেন। সঙ্গে অনেক খাবার এনেছেন: মধুক্ষরার নিখুঁতি, দই সন্দেশ। বাড়ি দেখে বললেন, 'আরে বাঃ! বাড়ির চেহারা ফিরে গেছে। তোমাদের খাবার কী ব্যবস্থা হয়েছে জানি না, তাই বাজার থেকে খাবার এনেছি।'

বামুন-মেয়ে অবশ্য রান্নাবান্না করে রেখেছিল। ওপরে খাবার দিয়ে গেল, আমরা তিনজনে একসঙ্গে বসে খেলুম। তারপর খানিকক্ষণ গল্পসল্প করে আমাদের হাতে পাঁচ শো টাকা দিয়ে জামাইবাবু চলে গেলেন।

আমরাও বাজার করতে বেরুলুম। পর্দা, বিছানার চাদর, মশারি, বালিশ, কত কী যে কিনতে হবে ঠিক নেই।

সন্ধ্যের পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাসায় ফিরে এলুম। এ আমার ভালই হয়েছে, নিজের কথা ভাববার সময় পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে যাচ্ছে তখন বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করে উঠছে।

স্নান করে তাড়াতাড়ি রাত্রির খাওয়া খেয়ে নিলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম। সারারাত্রি খুব ঘুমিয়েছি, একবারও ঘুম ভাঙেনি। রাত্রে জামাইবাবু এসেছিলেন কি না তাও জানতে পারিনি।

আজ সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, আকাশে মেঘ জমেছে, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

কাল জামাইবাবুর বাড়ির কাজ শেষ হয়নি; আমরা দুজনে চা খেয়ে বেরুতে যাচ্ছি, টেলিফোন বেজে উঠল। হয়ত জামাইবাবু, তাঁর স্ত্রীর কোন খবর আছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরলুম। কিন্তু জামাইবাবু নয়, শঙ্খনাথবাবু। গলার আওয়াজ ভারী-ভারী। বললেন, 'তুমি আছ? আমি এখনি যাচ্ছি!'

'কী হয়েছে?'

'মুখেই বলব।'

'আচ্ছা, আসুন।'

ফোন রেখে শুক্লাকে বললুম, 'শঙ্খনাথবাবু আসছেন। কী দরকার বললেন না। তুই বরং এগিয়ে যা, আমি পরে যাব।'

শুক্লা বলল, 'না, দুজনে একসঙ্গে যাব।'

পনেরো মিনিট পরে খট্ খট্ করে দোরের কড়া নড়ে উঠল। গাড়ি কখন এসেছে জানতে পারিনি; দোর খুলে দেখি, সামনে শঙ্খনাথবাবু, তাঁর পিছনে পিউকে কোলে নিয়ে কলাবতী।

ইটের পাঁজায় আগুন দিলে বাইরে থেকে আগুন দেখা যায় না, কিন্তু কাছে গেলে গায়ে আঁচ লাগে। উনি যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন তখন আমার গায়ে যেন আঁচ

লাগল। কী হয়েছে? ভয়ংকর একটা কিছু হয়েছে। পিউকে নিয়ে উনি এসেছেন কেন?

আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না, নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলুম। উনি তখন কথা বললেন। যেন অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে রেখেছেন এমনইভাবে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, পিউকে নিয়ে এসেছি, সে দিনকতক তোমার কাছে থাকবে।'

এই কথা শুনে আমার অবস্থা কী হল তা আমি বোঝাতে পারব না, শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—'পিউ আমার কাছে থাকবে!'

'হ্যাঁ। আমি—'

শুক্লা আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বলল, 'আগে ঘরে এসে বসুন। এই বুঝি পিউ? ওমা, এ ত মেয়ে নয়, এ যে চাঁদের কণা।' এই বলে পিউকে কলাবতীর কোল থেকে কেড়ে নিল।

শঙ্খনাথবাবু ঘরে এসে বসলেন,—'আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। পিউকে তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি ছাড়া আর-কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।'

আমরা দেয়ালে-আঁকা ছবির মতন দাঁড়িয়ে রইলুম। শেষে বললুম, 'কিন্তু—কিন্তু—হঠাৎ—'

তিনি পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে টেবিলের উপর রাখলেন, বললেন, 'এই টাকা রইল, যা দরকার হয় খরচ কোরো। কলাবতীকে এখানে রাখলে ভাল হত; কিন্তু ওর নিজের বাচ্চা আছে, তাকে ছেড়ে এখানে থাকতে পারবে না। ও দু'বেলা এসে পিউকে খাইয়ে যাবে।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কতদিনের জন্যে যাচ্ছেন?'

'কিছু ঠিক নেই। দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই ফিরব বোধহয়।'

তিনি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন দেখে আমার আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। বললুম, 'কী হয়েছে আমি জানতে চাই।'

এতক্ষণ তিনি সংযতভাবে কথা বলছিলেন, এবার একেবারে হুংকার ছেড়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। শুক্লা তাই দেখে পিউকে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালাল, কলাবতী তার পিছু পিছু গেল। শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'কী হয়েছে! যা হবার তাই হয়েছে। সলিলা পালিয়েছে। ওই শালা লট্‌পট্ সিংয়ের সঙ্গে পালিয়েছে। আমাকে মিছে কথা বলেছিল, বাপ আসেনি, কেউ আসেনি। সেই রাত্রেই পালিয়েছে।'

মনটা যেন অসাড় হয়ে গেল। সেই রাত্রেই সলিলা আমার চোখের সামনে স্বামীকে ছেড়ে আর-একজনের সঙ্গে চলে গেছে। কিন্তু—

প্রশ্ন করলুম, 'আপনি কী করে জানলেন যে ওই লোকটার সঙ্গেই পালিয়েছে?'

বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি। ডাক্তার মন্মথ কর কাল রাত্রে টেলিফোন করেছিল—সে দেখেছে হাওড়া স্টেশনে সলিলা আর লেফটেনেণ্ট লট্‌পট্ সিং একসঙ্গে ট্রেনে উঠছে।'

এখানেও মন্মথ কর! পরের জীবনের গুপ্ত রহস্য খুঁজে বেড়ানই বোধহয় ওর কাজ।

'আমি ভেবেছিলাম সলিলা ঝগড়াঝাঁটি করে বাপের কাছে চলে গেছে। ইচ্ছে করেই খোঁজ নিইনি, আসবার হয় আপনি আসবে। এখন দেখছি বাপ নয়, নাগরের সঙ্গে পালিয়েছে। শুধু-হাতে যায়নি, নিজের গয়নগাঁটি যা ছিল সব নিয়ে গেছে।—যাকগে, চুলোয় যাক গয়না। আমি চললুম। পিউকে দেখো।'

তিনি দোরের দিকে চললেন। আমার মাথার মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে গেল, ছুটে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম,—'সলিলা পালিয়েছে কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়? সলিলাকে ফিরিয়ে আনতে? তাকে ফিরিয়ে এনে আবার ঘরকন্না করবে?'

তিনি গর্জে উঠলেন, 'না, ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি না। সে আমার মুখে চুনকালি দিয়েছে, তারই জবাব দিতে যাচ্ছি।'

'জবাব! কী জবাব দেবে তুমি?'

'এই যে জবাব!' এই বলে পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে দেখালেন। পিস্তল আগে কখনও দেখিনি, সিনেমায় দেখে তার চেহারা জানা ছিল। কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'খুন করবে?'

দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'কুকুরের মত গুলি করে মারব জানোয়ার দুটোকে।'

'কিন্তু—কিন্তু যদি ধরা পড়?'

'ধরা পড়ি, ফাঁসি যাব।'

'না না, আমি তোমাকে যেতে দেব না—'

তারপর মুহূর্তের জন্যে বোধহয় জ্ঞান ছিল না, যখন জ্ঞান হল দেখি সিঁড়ির দরজা ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, উনি চলে গেছেন।

৮ আশ্বিন।

তিন হপ্তা হল লোকটা চলে গেছে, আর কোনও খবর নেই।

পিউ আমার কাছে আছে। পিউকে না পেলে বোধহয় মরে যেতুম। ও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

কাজকর্ম মাথায় উঠেছে। কাজের ডাক যখন আসে তখন বলি, আমার সময় নেই, অন্য কাজ আছে। পিউ এখন আমার একমাত্র কাজ। ওর পিতৃদেব এক হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন পিউয়ের খরচ চালাবার জন্যে। সে টাকা আমি পিউয়ের নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছি। পিউয়ের খরচ চালাবার ক্ষমতা আমার আছে।

কী মেয়ে পিউ! একবার কাঁদল না, একবার বলল না, 'বাড়ি যাব'। যেন এই বাসাটাই তার চিরদিনের ঘরবাড়ি; আমি তার চিরকালের আপনজন। জানি না, হয়ত আগের জন্মে ওকে পেটে ধরেছিলুম।

দম্মা দম্মা দম্মা—সারাক্ষণ খালি দম্মা। পুতুল নিয়ে খেলা করছে, হঠাৎ ছুটে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—'দম্মা!' কোলের মধ্যে কিছুক্ষণ মুখ গুঁজে থেকে, ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে আবার গিয়ে খেলা করতে লাগল! আমি রাগ দেখিয়ে বলি, 'তুই আমাকে দম্মা বলবি কেন?'

ঘাড় হেলিয়ে মিটিমিটি হেসে তাকায়, বলে, 'উঁ!'

'প্রিয়ংবদা বলতে পারিস না?'

আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে,—'পি-ও-দম্মা?'

'তবে রে!' চড় তুলে ছুটে যাই, সে খিলখিল করে হেসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। দুষ্টু কি কম?

চুপিচুপি জিগ্যেস করি, 'হ্যাঁরে, তোর মা কোথায়?'

'মা নেই-নেই।' বলে আবার খেলা শুরু করে। মা সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ নেই; মাকে ও চেনে না।

ওকে মায়ের কথা একেবারে ভুলিয়ে দিতে হবে। বড় হয়ে যেন জানতে না পারে, ওর মা কুলত্যাগিনী। কিন্তু কী করে ভোলানো যায়? একমাত্র উপায়, ও যদি আর-কাউকে মা বলে চিনতে শেখে। একদিন শুক্লা আর জামাইবাবুর সামনে কথা উঠেছিল, জামাইবাবু গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, 'সখি, তুমি এক কাজ কর। ওকে শেখাও তোমাকে মা বলতে, তাহলে সব গোল মিটে যাবে।' ওঁর কথা শুনে চুপিচুপি উঠে পালিয়ে এসেছিলুম। উনি সব জানেন, শুক্লা যদি নাও বলে থাকে, উনি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু ও আমি পারব না, মনে যাই থাকুক।

রাত্রে পিউকে আমি নিজের কাছে নিয়ে শুই। শোবার ঘরে একটা নাইট-ল্যাম্প লাগিয়েছি, সারারাত সেটা জ্বলে। রাত্তিরে দু-তিনবার পিউয়ের ঘুম ভাঙে, ঘর অন্ধকার

দেখলে ভয় পায়। ওকে রাত্তিরে কোলের কাছে নিয়ে যখন শুই, কত কথা মনে আসে। একদিন ভেবেছিলুম, পরের সোনা কানে দেব না, কিন্তু এখন? সেই সোনা শিকল হয়ে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরেছে, কিন্তু কই, ছাড়াবার চেষ্টা ত করছি না!.. চেষ্টা করব কোত্থেকে? একটা দুর্দান্ত বর্বর যে আমার মাথা খেয়ে দিয়ে চলে গেছে। আমার লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, আত্মসম্মান নেই কিচ্ছুই নেই—

ওর কথা আমি ভাবি না, ভাবতে চাই না; জোর করে ওর চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখি। কিন্তু গভীর রাত্রে যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন ঝাঁকে ঝাঁকে দুশ্চিন্তা এসে মনকে জুড়ে বসে। কোথায় চলে গেল মানুষটা! সারা ভারতবর্ষ একটা অপদার্থ স্ত্রীলোকের পিছনে পিস্তল নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! ধরতে পারবে কি? যদি ধরতে পারে খুন না করে ছাড়বে না। তারপর? খুন করে পুলিসের হাত এড়ানো কি সহজ? ধরা পড়ে যাবে; হয়ত খুন করে নিজেই গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা দেবে। তারপর—আদালতে খুনের বিচার! আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পিউকে বুকে আঁকড়ে চোখ বুজে পড়ে থাকি।

আগে আমার খবরের কাগজ পড়া অভ্যেস ছিল না, আজকাল রোজ পড়ি। ভয় করে, বুক দুরদুর করে, তবু না পড়ে পারি না। হয়ত কাগজ খুলে দেখব, অমুক তার পলাতকা স্ত্রী খুন করেছে। ভগবানের দয়ায় এখনও সে-রকম খবর চোখে পড়েনি। যদি খুঁজে না পায়, যদি হতাশ হয়ে ফিরে আসে, বেশ হয়। পিউকে এত ভালবাসে তার কাছে ফিরে আসতে কি মন চায় না?

পিউ কিন্তু এখন আমার হয়ে গেছে। এখন যদি ওর বাপ এসে মেয়ে ফেরত চায়, বলব, দেব না মেয়ে, যাও তুমি বাউন্ডুলের মতন বউ খুঁজে বেড়াওগে! পিউকে আমি ছাড়ব না। পিউও আমাকে ছেড়ে কক্ষনো বাপের কাছে যেতে চাইবে না।

কিন্তু—তা কি পারব? ও এসে যদি হাত পেতে দাঁড়ায়, আমি 'না' বলতে পারব কি? হা ভগবান, এ তুমি আমার কী করলে? ও একটা নেকড়ে বাঘ, একটা অজগর সাপ! ও যদি হাত পেতে দাঁড়ায় আমি বলব—তোমাকে 'না' বলবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমাকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেল, আমি নিশ্চিন্দি হই।..

কলাবতী রোজ সকাল সন্ধ্যে আসে। শিউসেবক তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, আবার পিউয়ের খাওয়া হলে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। সন্ধ্যেবেলা কলাবতী বেশীক্ষণ থাকে না, পিউ ঘুমিয়ে পড়লেই চলে যায়। কিন্তু ভোরবেলা যখন আসে, পিউকে খাইয়ে দুদণ্ড পা ছড়িয়ে বসে গল্প করে। আমি তাকে চা জলখাবার দিই, সে তাই খেতে খেতে বাঁকা বাঁকা হিন্দীতে কথা বলে।

ওদের দেশ ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিমে। ভারত যখন ভাগ হল তখন ওরা পড়ে গেল পাকিস্তানে। সেই মারামারি কাটাকাটি নিষ্ঠুর পাশবিকতার মধ্যে থেকে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ওরা নিঃস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানে এসেও ওদের দুর্দশা ঘুচল না। খাদ্য নেই, মাথা গোঁজবার জায়গা নেই; মীরাটের রাস্তায় রাস্তায় ওরা কেঁদে বেড়াচ্ছিল। সেই সময় শঙ্খনাথবাবু কী কাজে মীরাটে ছিলেন, ওরা তাঁর নজরে পড়ে যায়। তিনি ওদের কলকাতায় নিয়ে আসেন। সেই থেকে ওরা ওঁর কাছে আছে। উনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ মহাদেব।

মহাদেবের মহাদেবীর প্রতি কিন্তু কলাবতীর মোটেই ভক্তি নেই। ওদের চোখের সামনেই সলিলা বিয়ে হয়ে এসেছে। প্রথমে সলিলার রূপ দেখে ওরা মুগ্ধ হয়েছিল, তারপর যতই সলিলার গুণ প্রকাশ হতে লাগল, ততই ওদের ভক্তি চটে যেতে লাগল। পিউ জন্মাবার পর ওদের মন সলিলার ওপর একেবারে বিষিয়ে উঠল; পিউকে সলিলা দেখে না, নিজের নাচ গান আমোদ নিয়ে মত্ত থাকে। কলাবতী আমাকে বলল, 'মাজী, 'বহু'র রূপ আছে বটে, কিন্তু সে ভাল মেয়ে নয়; আমার বাবুজীর উপযুক্ত 'বহু'

নয়। ছোট ঘরের মেয়ে। ভাল ঘরের মেয়ে কি তয়ফাওয়ালীর মত নেচে বেড়ায়? ছি-ছি-ছি! ও চলে গেছে ভালই হয়েছে। ও-রকম মেয়ে কখনও ঘরে থাকে না। এখন ভগবানের কাছে জানাচ্ছি, আমার বাবুজী যেন ঘরে ফিরে আসেন, একটি ভদ্রলোকের মেয়ে বিয়ে করে শান্তিতে থাকেন।'

কলাবতী রোজ সকালে পিউয়ের ঘুম ভাঙবার আগেই এসে হাজির হয়। একদিন বেচারী আসতে পারেনি। সে কী কান্ড! সকালবেলা চোখ চেয়েই পিউ বলল, 'কলা খাব।' কিন্তু কোথায় কলা! তাকে ভোলাবার চেষ্টা করলুম,—'আজ কলা নেই-নেই। আজ তুমি বোতলে করে দুধু খাবে। কেমন? লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে—'

কে কার কথা শোনে? পিউ বিছানায় শুয়ে শুয়েই কান্না শুরু করল,—'কলা খাব।' সে সহজে কাঁদে না, কিন্তু ঠিক সময়ে 'কলা' না পেলে রক্ষে নেই।

তার কান্না শুনে শুক্লা দোরের কাছে এসে দাঁড়াল,—'পিউ-মেয়ে কাঁদে কেন?'

'কলাবতী আসেনি, তাই কাঁদছে।' আমি পিউয়ের পাশে শুয়ে তাকে আদর করে বললুম, 'ছি, কাঁদতে নেই। তুমি এখন বড় হয়েছ, কাঁদলে লোকে নিন্দে করবে। বলবে —পিউ দুষ্টু মেয়ে, পিউ কথা শোনে না। আমি এক্ষুনি তোমার জন্যে দুধ আনছি—'

পিউ কান্না থামিয়ে বিছানায় উঠে বসল, একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইল; যেন নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে। তারপর 'দম্মা খাবো' বলে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার বুকের মধ্যে মুন্ডু গুঁজে দিলে। রাক্কুসী!

কী করি আমি তখন! দিশেহারা হয়ে শুক্লার পানে তাকালুম। মুখপুড়ী আমার দশা দেখে মুখে আঁচল গুঁজে হাসছে।

পিউ কিন্তু ভারী ঠকে গিয়েছিল সেদিন।

শুক্লা পিউকে ভালবাসে। সেই প্রথম দিন ওকে কোলে নিয়ে আদর করেছিল, তারপর থেকে কিন্তু বেশী কাছে আসে না। যখন বাইরে যায় ওর জন্যে কত রকম খেলনা কিনে নিয়ে আসে; কিন্তু নিজে দূরে দূরে থাকে। আমি তা লক্ষ্য করেছিলুম; একদিন জিগ্যেস করলুম, তখন সে ম্লানমুখে বলল, 'না ভাই, আমি ওকে ছোঁব না। জানিস ত আমাদের পেটে কী প্রচন্ড ক্ষিদে। পিউকে ছুঁলে ওর যদি অনিষ্ট হয়! যদি নজর লাগে!'

সত্যি ওদের জীবন কেমন যেন দড়কচাপড়া হয়ে আছে। সন্তানের জন্যে দু'জনেই পাগল, কিন্তু উপায় নেই। জামাইবাবুর স্ত্রী হাসপাতালে আছেন; জলের মতন টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু তিনি মরবেনও না, সেরেও উঠবেন না। কতদিন এইভাবে চলবে কেউ বলতে পারে না। আমার এক-এক সময় অসহ্য মনে হয়, ইচ্ছে হয় হাসপাতালে গিয়ে মহিলাটির গলা টিপে দিই। কিন্তু জামাইবাবুর ধৈর্য আছে বলতে হবে। হাসিমুখে কর্তব্য করে যাচ্ছেন। ওঁর প্রাণের ব্যথা শুক্লা জানে আর আমি জানি।

শুক্লা মাঝে মাঝে জামাইবাবুর বাড়িতে যায়, ঘরকন্না তদারক করে আসে। আমার সেই প্রথম দিনের পর আর যাওয়া হয়নি। শুনেছি, বাড়ির এখন ছিরি ফিরেছে। কিন্তু ছিরি ফিরলে কী হবে, সবই ঝি-চাকরের হাতে। জামাইবাবু একলা মানুষ, বেশীর ভাগ সময় বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়। শুক্লা ত সেখানে গিয়ে থাকতে পারে না। জামাইবাবু কাশী থেকে মাকে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, কাশী ছাড়তে চান না। বুড়ী ঝিটাও কয়েক বছর আগে মরে গেছে।

এদিকে পুজো এসে পড়ল। এখনও পুজোর বাজার হয়নি। একদিন কলাবতীকে পিউয়ের কাছে বসিয়ে আমি আর শুক্লা যাব বাজার করতে। শুক্লা কেবল একটা শাড়ি কিনবে; আমিও নিজের জন্যে বিশেষ কিছু কিনব না, কিন্তু পিউয়ের জন্যে জুতো জামা সব কিনব। ভাবছি ওর শীতের পোশাকও এই সময় কিছু কিনে রাখব; এক সেট ভাল অ্যাঙ্গোরা উলের পোশাক। কলাবতীর জন্যেও একখানা শাড়ি কিনতে হবে। ওর বাবুজী বাড়ি নেই, পুজোর সময় ও যদি নতুন শাড়ি না পায়, ওর মনে দুঃখ হবে।

বাবুজী যে কবে ফিরবেন তা বাবুজীই জানেন।

৩ কার্তিক।

'দরশ বিনু দুখন লাগে নয়ন'—শুক্রা নিজের ঘরে অলস গলায় মীরার ভজন গাইছে। ও কেন এ গান গায়? ওর ত দরশ পাবার কোনও অসুবিধে নেই। ও কেন বিরহের গান গায়?

রাজবধূ মীরা। গিরিধরকে কী ভালই বেসেছিল! কিছু চায়নি সে গিরিধরের কাছে। বলেছিল—গিরিধর যদি আমাকে বিক্রি করে দেয় আমি বিক্রি হয়ে যাব। হয়ত ভগবানকেই এত ভালবাসা যায়; মানুষকে কি মানুষ এত ভালবাসতে পারে? মানুষকে মানুষ ভালবাসে রক্তমাংস দিয়ে, যেমন দিতে চায় তেমনই পেতে চায়। ঠাকুর, তোমাকে মীরার মতন ভালবাসার শক্তি আমার নেই। আমি একটা মানুষকে ভালবেসেছি, রক্তমাংস দিয়ে ভালবেসেছি। তোমার কাছে সে ভালবাসার কি কোন দাম নেই?

পুজো এল, চলে গেল। মহাষ্টমীর দিন পিউকে সাজিয়ে গুজিয়ে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম, ঠাকুর দেখে কী খুশি! তাকে বললুম, 'পিউ, হাত-জোড় করে ঠাকুরকে প্রণাম কর; বল—ঠাকুর, আমাদের সক্কলের ভাল কর।' সে কপালে হাত ঠেকিয়ে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করল। বিজবিজ করে কী বলল তা কিন্তু বোঝা গেল না। ঠাকুর হয়ত বুঝেছেন।

কার্তিক মাস আরম্ভ হয়ে গেছে। দেড় মাস হয়ে গেল, একটা খবর নেই। কোথায় গেছেন, কিছু জানবার উপায় নেই। কাউকে জিগ্যেস করবার নেই। বেঁচে আছেন ত?

ভাবতে পারি না, মাথা গোলমাল হয়ে যায়। রাত্রে পিউকে বুকের কাছে নিয়ে কাঁদি। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, কাঁদব না? কাঁদবার জন্যেই ত জন্ম।

৭ কার্তিক।

শেষরাত্রি থেকে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আশ্বিনে ঝড়বৃষ্টি হয়, এবার কার্তিক মাসে হল। অকালের বাদল। আমার কপালে কী আছে জানি না।

দুর্যোগের জন্যে সকালে কলাবতী আসতে পারেনি। পিউ ঘুম ভেঙে হাঙ্গামা শুরু করেছিল, অতি কষ্টে ঠান্ডা করেছি। টিনের দুধ খেয়েছে; কিন্তু গাল ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ফোলাচ্ছে। কী যে করি ওকে নিয়ে!...

দুপুরবেলা পিউ ঘুমুলে ডায়েরি লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভাল লাগল না। বাইরে ঝড় থেমেছে, রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। মনটা উদাস হয়ে গেল। পিউয়ের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ঘুম ভেঙে গেল শুক্রার গলার আওয়াজে। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে,—'আসুন আসুন—কেমন আছেন?'

তারপরই মোটা গলার আওয়াজ,—'প্রিয়দম্বা কোথায়? পিউ কোথায়?'

আমার শরীর নিথর হয়ে গেল; তারপর থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করল। কিছুতেই কাঁপুনি থামাতে পারি না; যেন ম্যালেরিয়ার জ্বর আসছে। পিউ আগেই জেগে উঠেছিল, বিছানায় বসে পুতুল নিয়ে খেলা করছিল। সে ঘাড় হেলিয়ে শুনছে, বাপের গলা চিনতে পেরেছে।

শুক্রা ছুটে ঘরে ঢুকল, আমার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, 'এই প্রিয়া, শিগ্গির ওঠ। শঙ্খনাথবাবু এসেছেন।' বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

দশ মিনিট পরে আমি যখন পিউকে কোলে নিয়ে বাইরের ঘরে গেলুম তখন

শরীরের কাঁপুনি থেমেছে, মনও শক্ত করেছি। কিছুতেই হৃদয়াবেগ প্রকাশ করা হবে না, সহজভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষ যেমন কথা বলে তেমনই কথা বলব।

তবু তাঁকে দেখে বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। রোগা হয়ে গেছেন, চোখের কোলে কালি; আগুনে-ঝলসানো চেহারা। বসে ছিলেন, আমাদের দেখে উঠে এসে পিউয়ের দিকে হাত বাড়ালেন। পিউ একটু ইতস্তত করে তাঁর কোলে গেল, আবার তখনই আমার কোলে ফিরে এল। কারুর মুখে কথা নেই।

কলাবতীকে উনি সঙ্গে এনেছেন, সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল; এখন এগিয়ে এসে আমার কোল থেকে পিউকে নিয়ে চুপি চুপি বলল, 'চল পিউরানি, আমরা খেলা করি গিয়ে।' আমাকে বলল, 'মাজী, পিউকে ফুটপাথে নিয়ে যাই? বিষ্টি থেমেছে।'

'যাও।'

সে পিউকে নিয়ে চলে গেল।

শুক্লা গলা বাড়িয়ে বলল, 'চা করছি। শঙ্খনাথবাবু, চলে যাবেন না।'

উনি গলার মধ্যে সম্মতিসূচক শব্দ করে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমি একটু দূরে বসলুম।

দু'জনে চুপ করে বসে আছি। উনি কী ভাবছেন উনিই জানেন, আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। কী বলব? এ-রকম অবস্থায় মানুষ সহজভাবে কোন্ কথা বলে?

শেষ পর্যন্ত উনি প্রথম কথা কইলেন, আমার পানে চোখ না তুলেই বললেন, 'সলিলা মরে গেছে।'

মরে গেছে! বিদ্যুতের মতন সলিলার চেহারা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। এত রূপ, এমন যৌবন—মরে গেছে! তাহলে উনি তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন! তাহলে—!

তারপর তিনি এলোমেলো কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কখনও দুটো কথা বলে চুপ করে বসে থাকেন, কখনও গড়গড় করে খুব খানিকটা কথা বলেন। গলার স্বর কখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়, আবার কিছুক্ষণের জন্যে জোরালো হয়ে ওঠে। আমি আচ্ছন্নের মতন বসে আছি। শুনতে শুনতে কখন তাঁর কাছে গিয়ে বসেছি জানতে পারিনি। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে, পশ্চিমের আকাশে মেঘের গায়ে আলতাপাটি শিমের রঙ ধরেছে, ঘরের মধ্যে বেশী আলো নেই। আমি যেন ছেলেমানুষের মতন বসে রোমাঞ্চকর গল্প শুনছি।—

শঙ্খনাথবাবু যখন জানতে পারলেন যে সলিলা লেফটেনেণ্ট লজপৎ সিংয়ের সঙ্গে পালিয়েছে তখনই তিনি তার বাপ কর্নেল হরবংশ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। হরবংশ সিংয়ের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, তাগড়া চেহারা, অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। শঙ্খনাথবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লজপৎ সিং কোথায়?'

হরবংশ সিং শঙ্খনাথবাবুকে চিনত, আগে দু-একবার দেখেছে; কিন্তু এখন চিনতে পারল না। বলল, 'হু আর ইউ? কী চাও?'

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'তোমার ব্যাটা লজপৎ সিংকে চাই। কোথায় সে?'

হরবংশ সিং চোখ রাঙিয়ে এগিয়ে এল, বলল, 'সে খবরে তোমার দরকার কী? মিলিটারী গুপ্ত কথা জানতে এসেছ? যাও—গেট আউট।'

শঙ্খনাথবাবু তার গালে একটি চড় মারলেন। সে মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু চেঁচামেচি করল না। একটা অর্ডার্লি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, বোধহয় লজপৎ সিংয়ের ব্যাপার জানত; সে ছুটে এসে শঙ্খনাথবাবুকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল, রাস্তায় বার করে দিয়ে খাটো গলায় বলল, 'বাবুজী, এখানে কি জন্যে এসেছ? দিল্লি যাও।'

পরদিন সকালে পিউকে আমার কাছে রেখে সন্ধ্যের গাড়িতে তিনি দিল্লি-যাত্রা করলেন। প্লেনে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্লেনের টিকিট পেলেন না।

ট্রেনের কামরায় একটি বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনিও দিল্লি যাচ্ছেন। মিলিটারী অফিসার, মেজর হরিদাস মৈত্র। দিল্লিতে পোস্টেড, ছুটি নিয়ে বাড়ি এসে-

ছিলেন, আবার কাজে জয়েন করতে যাচ্ছেন। কথায় কথায় শঙ্খনাথবাবু তাকে জিগ্যেস করলেন, লেফটেনেণ্ট লজপৎ সিংকে তিনি চেনেন কি না! মেজর মৈত্র লজপৎ সিংকে চেনেন না, তার বাপ হরবংশ সিংয়ের নাম জানা থাকলেও পরিচয় নেই। আর্মিতে হাজার হাজার অফিসার আছে, কে কাকে চেনে?

পরদিন সন্ধ্যেবেলা নয়াদিল্লি স্টেশনে পেঁছে শঙ্খনাথবাবু মেজর মৈত্রকে বললেন, 'আপনাদের মিলিটারী মহলে খোঁজ নিলে লজপৎ সিংয়ের খবর পাওয়া যাবে কি?'

মেজর মৈত্র বললেন, 'আপনি এক কাজ করুন। আমার ঠিকানা দিচ্ছি, পরশু আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ইতিমধ্যে আমি খবর সংগ্রহ করে রাখব।'

তিনি ঠিকানা দিয়ে চলে গেলেন। শঙ্খনাথবাবু একটা হোটেলে উঠলেন। সেই রাত্রেই তিনি অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। কাছেপিঠে কয়েকটি হোটেল ছিল, সেখানে খোঁজ নিলেন। পিস্তল তাঁর পকেটে আছে। কিন্তু সন্দেহজনক কাউকে পেলেন না।

পরদিন সকাল থেকে রীতিমতো তল্লাশ শুরু হল। দিল্লিতে অসংখ্য হোটেল; নয়াদিল্লির অশোক হোটেল থেকে পুরনো দিল্লির মোসাফিরখানা পর্যন্ত নানা হোটেল আছে। শঙ্খনাথবাবু পিস্তল পকেটে নিয়ে একটির পর একটি হোটেল তল্লাশ করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও আশাজনক কোন খবর পেলেন না। একটা হোটেলে গিয়ে শুনলেন, এক জোড়া স্ত্রী পুরুষ কয়েকদিন থেকে সেখানে আছে; তারা বাইরে বেশী বেরোয় না, ঘরের মধ্যেই থাকে। তাদের ভাষা খুব পরিষ্কার নয়, বাঙালী কিংবা মাদ্রাজী হতে পারে। বর্ণনা শুনে শঙ্খনাথবাবুর সন্দেহ হল এরাই সলিলা আর লজপৎ সিং। তিনি ম্যানেজারের কাছ থেকে ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

তিনতলার ওপর ঘর। শঙ্খনাথবাবু এক হাতে পকেটের পিস্তল চেপে ধরে অন্য হাতে দরজায় টোকা দিলেন। দরজা খুলে দাঁড়াল ড্রেসিং-গাউন পরা এক ছোকরা, তার পিছনে একটি তরুণী। সলিলা আর লজপৎ সিং নয়। দুজনেই বাঙালী; নতুন বিয়ে হয়েছে, রাজধানীতে মধুচন্দ্র যাপন করতে এসেছে। পরস্পরের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে, বাইরে বেরোয় না। শঙ্খনাথবাবু মাফ চেয়ে চলে আসছিলেন, কিন্তু তারা ছাড়ল না। অনেকদিন তারা বাঙালীর সঙ্গে কথা বলেনি; তারা শঙ্খনাথবাবুকে ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক গল্প করল, চা খাওয়াল। তারপর 'আবার আসবেন' বলে ছেড়ে দিল।

সমস্ত দিন খোঁজাখুঁজির পর রাত্রি দশটার সময় শঙ্খনাথবাবু নিজের হোটেলে ফিরে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে ধোঁকা লাগল: ওরা যদি হোটেলে না উঠে থাকে? যদি কোন বন্ধুর বাসায় উঠে থাকে? কিন্তু শঙ্খনাথবাবু সহজে হতাশ হবার লোক নন; তিনি প্রথমে দিল্লির সমস্ত হোটেল দেখবেন, এখনও অনেক হোটেল বাকী আছে। তারপর অন্য রাস্তা ধরবেন। ভারতবর্ষ তোলপাড় করে ফেলবেন; যতক্ষণ পলাতকদের ধরতে না পারেন ততক্ষণ নিরস্ত হবেন না।—

শুক্লা এই সময় চা আর জলখাবার এনে টেবিলে রাখল; নিজেও বসল। শঙ্খনাথবাবু কিছুই লক্ষ্য করলেন না, আপন মনে ছাড়াছাড়া ভাবে গল্প বলে যেতে লাগলেন।

—পরদিন তিনি মেজর মৈত্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মেজর মৈত্র বললেন, 'হেড কোয়ার্টার থেকে খবর যোগাড় করেছি। লেফটেনেণ্ট লজপৎ সিং কলকাতায় পোস্টেড ছিল, দশদিন আগে হঠাৎ কমিশনে রিজাইন করেছে। ওরা জলন্ধরের লোক। ইস্তফা দিয়ে হয়ত দেশে ফিরে গেছে।'

'আর কোন খবর নেই?'

'না।'

সেখান থেকে শঙ্খনাথবাবু অশোক হোটেলে গেলেন। বিরাট হোটেল। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হল না, কিন্তু ম্যানেজারের অসংখ্য সহকারীর মধ্যে একজন বাঙালী যুবক ছিল, শঙ্খনাথবাবু তাকে ধরলেন। বর্ণনা শুনে যুবক বলল, 'হপ্তাখানেক আগে এই রকম একটি

দম্পতি এসেছিল। মহিলাটি অপূর্ব সুন্দরী; বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তারা দু'রাত্রি ছিল, তারপর চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

যুবক একটা বাঁধানো খাতা খুলে দেখলে, বলল, 'এই যে, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এল সিং। না, ঠিকানা রেখে যায়নি। কিন্তু—দাঁড়ান।' যুবক খাতা বন্ধ করে খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইল, তারপর বলল, 'মনে পড়েছে। তারা বম্বেতে তাজমহল হোটেলে স্যুট রিজার্ভ করবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছিল।'

সেই রাত্রেই শঙ্খনাথবাবু প্লেনে বোম্বাই যাত্রা করলেন।

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ তাজমহল হোটেলে পলাতকদের খোঁজ পাওয়া গেল। তারা এসে দু'রাত্রি ছিল, তারপর চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না।

শঙ্খনাথবাবু একটা সূত্র পেয়েছিলেন, আবার তা হারিয়ে গেল।

বম্বেতে দু'দিন খোঁজাখুঁজি করে আবার তিনি দিল্লি ফিরে গেলেন। সেখান থেকে জলন্ধর গেলেন, সেখান থেকে অমৃতসর পাতিয়ালা। কিন্তু কোথাও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

এইভাবে দু'হপ্তা কেটে গেল। একদিন শঙ্খনাথবাবুর কী মনে হল, তিনি আগ্রা গেলেন। আগ্রায় তাজমহল দেখলেন, হোটেলগুলোতে অনুসন্ধান করলেন, আগ্রা ফোর্ট, ফতেপুর সিক্রিতে ঘুরে বেড়ালেন; কিন্তু কোনই ফল হল না। ওরা যদি এখানে এসেও থাকে, তিনি আসবার আগেই পালিয়েছে। কোথাও তারা দু'রাত্রির বেশী থাকে না।

পরদিন সকালে তিনি স্টেশনে গেলেন, এখান থেকে মথুরা যাবেন। ওদের অবশ্য তীর্থস্থানে যাওয়ার সম্ভাবনা কম; কিন্তু তীর্থস্থানে নিত্য অচেনা লোকের ভিড় লেগে থাকে, সেখানে লুকিয়ে থাকার সুবিধে আছে।

তিনি টিকিট কিনে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেন। কিন্তু তাঁকে মথুরা যেতে হল না, আগ্রার রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মেই তিনি সলিলার দেখা পেলেন।

তখনও ট্রেন আসেনি, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে বেশ একটু উত্তেজনা। যাত্রীরা, কুলিরা, এমন কী স্টেশনের কর্মচারীরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে যেখানে রেলের লাইন দূরে চলে গেছে সেই দিকে তাকিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে। শঙ্খনাথবাবু একজন টিকিট চেকারকে জিগ্যেস করলেন, সে বলল, স্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটি স্ত্রীলোকের লাশ পাওয়া গেছে, তাকেই আনা হচ্ছে। মনে হয় রাত্রে সিক্স আপ গাড়ি আগ্রা ছাড়ার পর কেউ তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে। রাত্রে জানা যায়নি, সকালে গুমটি থেকে খবর এসেছে।

একটা ট্রলি আসছে দেখা গেল। ক্রমে ট্রলি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। তার ওপর শুয়ে আছে সলিলার দেহ। মুখখানা আশ্চর্য রকম অবিকৃত, কিন্তু দেহ চূর্ণ হয়ে গেছে। সিল্কের শাড়ি রক্তে মাখামাখি, গায়ে একটিও গয়না নেই।

ব্যাপার অনুমান করা শক্ত নয়। লজপৎ সিং সলিলাকে নিয়ে সারা ভারতবর্ষ ছুটো-ছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, প্রেমের নেশাও ছুটে গিয়েছিল। কাল দুপুর-রাত্রে তারা আগ্রা স্টেশনে ট্রেনে উঠেছিল, তারপর লজপৎ সিং সলিলার গায়ের গয়না কেড়ে নিয়ে তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

শঙ্খনাথবাবু কাউকে কিছু বললেন না, লাশ সনাক্ত করলেন না। মথুরার টিকিট বদল করে কলকাতার টিকিট কিনে বাড়ি ফিরে এলেন। লজপৎ সিং সম্বন্ধে তাঁর মন সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছে। সে মরুক বাঁচুক এখন আর কিছু আসে-যায় না।

গল্প শেষ হবার পর আমরা কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইলুম। তারপর শুক্লা উঠে পেয়ালায় চা ঢেলে ওঁর হাতে দিল। তিনি পেয়ালা নিয়ে কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর এক চুমুকে পেয়ালা শেষ করে টেবিলের ওপর রাখলেন। শুক্লা মৃদুস্বরে বলল, 'একটু কিছু মুখে দেবেন না।'

'না।' তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন; এমন ভাবে চারদিকে তাকালেন, যেন কোথায় আছেন ঠাহর করতে পারছেন না।

শুক্লা তাঁর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখ ছলছল করছে, সে গাঢ় স্বরে বলল, 'শঙ্খনাথবাবু, যা হয়ে গেছে তা ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। আমরা আপনাকে নিতান্ত আপন জন মনে করি তাই বলতে সাহস করছি। জীবনে অনেক দুঃখ শোক আসে, তাই বলে ভেঙে পড়লে ত চলবে না।'

উনি বললেন, 'কে ভেঙে পড়েছে! আমি! আমি?' বলে একটা শুকনো কঠিন হাসি হাসলেন।

শুক্লা বলল, 'কোনও দুঃখই স্থায়ী নয়, অতিবড় শোকও মানুষ ভুলে যায়। সংসার ছাড়া ত আমাদের গতি নেই, তাই ভুলতেই হবে। আপনিও সেই চেষ্টা করুন। অতীতকে ভুলে গিয়ে আবার সংসারের দিকে মন ফিরিয়ে আনুন। আপনার কতই বা বয়স—'

তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'আবার সংসার! কী বলছ তুমি? আর না—আর না। মেয়েমানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আমার জন্মের মত চুকে গেছে।'

শুক্লা থতমত হয়ে বলল, 'কিন্তু পিউয়ের কথাও ত ভাবতে হবে।'

'পিউ!' তিনি চারদিকে চাইলেন,—'পিউ কোথায়? তাকে নিয়ে যাব।'

এই সময় কলাবতী পিউকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

কান্নায় আমার গলা বুজে এসেছিল। বুকের মধ্যে ঝড় বইছিল। আমি ছুটে গিয়ে পিউকে কোলে নিলুম, তাকে বুকে চেপে বললুম, 'না, আমি পিউকে যেতে দেব না।' এই বলে পিউকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলুম।

বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলুম। পিউও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, সে চুপটি করে শুয়ে রইল।

খানিক পরে চোখ মুছে দেখি উনি বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখাচোখি হতেই বললেন, 'প্রিয়দম্বা, তুমি আমার উপর রাগ করেছ?' তাঁর কণ্ঠস্বর বড় করুণ, দীনতাভরা।

পিউকে জড়িয়ে ধরে বললুম, 'না, পিউকে আমি দেব না।'

'পিউ তোমার কাছেই থাক। কিন্তু তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না।' এই বলে খুব আস্তে আস্তে আমার গায়ে হাত রাখলেন।

আমার সমস্ত শরীর শিউরে কেঁপে উঠল। আমি আবার বালিশে মাথা গুঁজে আর্তস্বরে বললুম, 'না না, আমাকে ছুঁয়ো না। তুমি যাও—তুমি চলে যাও।'

তাঁর হাত আমার কাঁধের ওপর থেকে সরে গেল। কিছুক্ষণ পরে চোখ মুছে মুখ তুললুম, দেখি উনি নিঃশব্দে চলে গেছেন।

শুক্লা ঘরে ঢুকল। যেন কিছুই হয়নি এমনই সহজ সুরে বলল, 'শঙ্খনাথবাবু কলাবতীকে নিয়ে চলে গেলেন। রাত হয়ে গেছে, এবার ওঠ। পিউকে খাওয়াতে হবে না?'

পিউ আজ বোতলের দুধ খেতে কোন হাঙ্গামা করল না। তাকে খাইয়ে আবার বিছানায় শুলুম। শুক্লাকে বললুম, 'আমি আজ কিছু খাব না। খিদে নেই।'

শুক্লা মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে চলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, 'উনি কি রাগ করে চলে গেলেন?'

'না—হ্যাঁ—ওই একরকম—'বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল।

পিউ সহজে ঘুমুল না; তারও বোধহয় ঘুম চটে গেছে। পিটপিট করে তাকিয়ে রইল। আমি তখন তার কানে কানে বললুম, 'তোর বাবাটা যাচ্ছেতাই, না পিউ?'

পিউ মুখ গম্ভীর করে বলল, 'হুঁ।'

'তোকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি দিইনি, তাই আমাকে বকেছে, মেরেছে।'

পিউ চোখ গোল করে বলল, 'মেরেছে?'

'হ্যাঁ, মেরেছেই ত। মারা আর কাকে বলে? আয় এবার ঘুমুই।'

কিছুক্ষণের মধ্যে পিউ ঘুমিয়ে পড়ল। আমি সারা রাত চোখ চেয়ে জেগে রইলুম। জেগে জেগে এক সময় মনে হল, পিউ যে মাতৃহীনা হয়েছে একথা কারুর খেয়াল হয়নি। মা-হারা মেয়ে বলে কেউ তার জন্যে দুঃখ করবে না।

২৩ কার্তিক।

কার্তিক মাস ফুরিয়ে এল। একটু একটু শীতের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে; ভোররাত্রে গায়ে চাদর দিতে হয়।

উনি সেই যে চলে গিয়েছিলেন, আর সাড়াশব্দ নেই। নিশ্চয় রাগ করে আছেন। আমি না-হয় কেউ নয়, আমার ওপর রাগ করতে পারেন। কিন্তু মেয়ে ত নিজের, তার খোঁজ কি একবার নিতে নেই? আমি আর পারি না বাপু। ইচ্ছে করে পিউকে ফেরত দিয়ে আসি, বলি, এই নাও তোমার মেয়ে, আমাকে রেহাই দাও। মেয়েমানুষের সঙ্গে যখন সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ তখন নিজের মেয়ে নিজে মানুষ কর। আমার কিসের দায়?

শুক্লাও যেন আজকাল কেমন একরকম হয়ে গেছে। বেচারীকে দোষ দেওয়া যায় না। একদিকে নিজের কাজ, অন্যদিকে জামাইবাবুর সংসার। সে রোজ সকালে গিয়ে বাড়ি তদারক করে আসে, জামাইবাবুর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। তার ওপর গিন্নী ঠাকরুনের ভাবনা। হাসপাতালে তাঁর মাঝে বেশ বাড়াবাড়ি হয়েছিল, রক্তের চাপ বেড়ে গিয়ে আবার একটা আক্রমণ হব-হব হয়েছিল; কিন্তু সামলে গেছেন। কী দরকার ছিল সামলাবার তা জানি না।

শুক্লা হঠাৎ কিছু না বলে-কয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কোথায় যায়, কী করে, কিছুই জানতে পারি না। জিগ্যেস করলে ভাসা-ভাসা উত্তর দেয়। মাঝে মাঝে জামাইবাবুর বাড়ি থেকে ফিরতে দেরি করে। প্রশ্ন করি, এত দেরি যে! সে বলে, 'শশী ঝিকে নিয়ে বড় মুশকিল হয়েছে। রোজ বাড়ি থেকে জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে। কি যে করি।' আমি বলি 'বিয়ে করে ফেল্।' সে জবাব দেয় না, হাসেও না; হতাশ চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এইভাবে দিন কাটছে। সংসারে এত জ্বালা তবু সংসারের জন্যে আমরা পাগল। দূর ছাই, কিছু ভাল লাগে না। পিউ যদি না থাকত, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে যেদিকে দু'চক্ষু যায় চলে যেতুম।

আজ সকালে শুক্লা জামাইবাবুর বাড়ি থেকে ফিরেছে এমন সময় ফোন বেজে উঠল। আমি ফোন ধরলুম। আজ ষোল দিন পরে ওঁর গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম—'কে, প্রিয়দম্বা! কেমন আছ?'

বুজে-যাওয়া গলায় কোনমতে বললুম, 'ভাল।'

'তোমার মেয়ে কেমন আছে?'

'আমার মেয়ে!'

'মানে—পিউ কেমন আছে?'

'ভাল!'

'বেশ বেশ। শুক্লা আছে? তাকে একবার ডেকে দাও।'

শুক্লার হাতে ফোন দিয়ে আমি সরে বসলুম। কী ব্যাপার!...শুক্লা বেশী কথা বলছে না, 'হুঁ' 'হাঁ' দিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবছি—'তোমার মেয়ে কেমন আছে' মানে কী? ঠাট্টা? আমি পিউকে যেতে দিইনি তাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ? তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কী দরকার? জোর করে মেয়েকে কেড়ে নিয়ে গেলেই পারেন। ওঁর গায়ে যথেষ্ট জোর আছে, পকেটে পিস্তল

আছে। তবে ভয়টা কিসের?...কিন্তু শুক্লার সঙ্গে এত মনের কথা কেন!

'আচ্ছা আসি' বলে শুক্লা ফোন রেখে দিল, আমার পাশে এসে বসল। আমি আগ্রহ দেখালুম না, তখন সে নিজেই বলল, 'শঙ্খনাথবাবু আজ বিকেলে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। পিউয়েরও নেমন্তন্ন।'

চমকে উঠলুম,—'হঠাৎ—কী মতলব!'

সে বলল, 'মতলব আবার কী? উনি নেকড়ে বাঘও নয়, অজগর সাপও নয়; তা ত তুই জানিস। তোর জামাইবাবুকেও নেমন্তন্ন করেছেন।'

'কিন্তু হঠাৎ নেমন্তন্ন কেন?'

'তা কী জানি! আমরা একদিন ওঁকে খাইয়েছিলুম, হয়ত তারই জবাব দিচ্ছেন।'

'আমি যাব না।'

শুক্লা ভুরু তুলে আমার পানে তাকাল,—'যাবি না!'

'না। তোকে নেমন্তন্ন করেছেন তুই যা। আমি যখন ফোন ধরেছিলুম তখন আমাকে ত কিছু বলেননি। আমি যাব কেন?'

'তোর কি হিংসে হচ্ছে নাকি?'

চোখ ফেটে জল এল। বললুম, 'তোকে হিংসে হচ্ছে না। কিন্তু ও কেন আমাকে কিছু বলল না? আমি যাব না।'

এবার শুক্লা রেগে উঠল, কঠিন সুরে বলল, 'দেখ প্রিয়া, তুই বড় বাড়াবাড়ি করছিস। ভগবানের দান হাত পেতে না নিলে ভগবান হাত গুটিয়ে নেবেন। তখন সারাজন্ম ধরে কাঁদলেও আর পাবি না। মনে রাখিস।'

আমি কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরলুম, বললুম, 'শুক্লা, আমার মাথার ঠিক নেই। তুই ত সব বুঝিস। আমি যাব। তুই যা বলবি তাই করব।'

—আজ এইখানেই ডায়েরি লেখা শেষ করি। দুপুরবেলা পিউ ঘুমিয়েছে, আমি সেই ফাঁকে ডায়েরি লিখছি। কিন্তু মনটা ভারি ছটফট করছে।

বিকেলে পাঁচটার সময় আমরা বেরুব। কী জামা-কাপড় পরব তাই ভাবছি। পিউকে গরম জামা পরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজ আবার মেঘ করছে, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে।

২৪ কার্তিক।

বুকের মধ্যে অনাহত মৃদঙ্গ বাজছে। কী করে লিখব?

যখন প্রথম ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেছিলুম তখন কে জানত আমার বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন জীবন এমন রঙে রসে ভরে উঠবে! মাত্র তিন মাস কেটেছে, এরই মধ্যে সব বদলে গেল। যেন বিশ্বাস হয় না।

আমার জীবনের দৃশ্য-কাব্য বেশ তোড়জোড় করে আরম্ভ হয়েছিল, তারপর হঠাৎ যেন ঝপ করে শেষ হয়ে গেল। কিংবা এইটে হয়ত শেষ নয়, নাটকের প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়ল। এর পর আরও অনেক আছে; অনেক দুঃখ সুখ, কান্না হাসি—

আজ আমার শেষ ডায়েরি লেখা, আর লিখব না। যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলুম তখন মনের আশ্রয় ছিল না; নিজের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। কিন্তু এখন আর আমার সময় নেই; একদিকে পিউ, অন্যদিকে একটি চাষা মনিষ্যি।...ভাবছি ডায়েরির এই পাতাগুলো যদি কোন প্রবীণ লেখককে পাঠিয়ে দিই, কেমন হয়? তিনি হয়ত পড়বেন না, ফেলে দেবেন। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি পড়েন! যদি পড়ে তাঁর ভাল লাগে—?

পাঁচটার সময় ট্যাক্সিতে চড়ে বেরুলুম। পিউকে পশমের জামা পশমের টুপি পরিয়ে

নিয়েছি। যে-রকম ভিজে ভিজে হাওয়া বইছে, বৃষ্টি নামল বলে।

শুক্লা বেশ সাজগোজ করেছে। পুজোর সময় যে মেহদী রঙের মাদ্রাজী সিল্কের শাড়িটা কিনেছিল সেইটে পরেছে। এই রঙের শাড়িতে ওকে খুব মানায়। আমার কিন্তু সাজগোজ করা হল না, পিউকে সাজাতে সাজাতেই দেরি হয়ে গেল। কী বা হবে সাজগোজ করে। একটা ফিকে নীল রঙের পুরনো জর্জেটের শাড়ি পরেছি। চুলগুলো এলোখোঁপা করে জড়িয়ে নিয়েছি। এই যথেষ্ট।

আমি সাজগোজ করিনি দেখে শুক্লা মুখ টিপে হেসেছে, কিছু বলেনি। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বললুম, 'শুক্লা, ওঁর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে, সত্যি কিনা বল্। মিথ্যে বললে অনন্ত নরকে পচে মরবি।'

সে বলল, 'মিথ্যে বলব কোন্ দুঃখে! হয়েছে দেখা।'

'কেন? তোর সঙ্গে ওঁর কী দরকার?'

'বলব না।'

'আমার হিংসে হচ্ছে কিন্তু।'

'তুই থাম্। সত্যি হিংসে হলে মুখ ফুটে বলতে পারতিস না।'

'কেন পারব না! ও না-হয় আমাকে চায় না, তাই বলে হিংসে হবে না!'

শুক্লা জবাব দিল না, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। সন্দেহ হল সে হাসছে।

ট্যাক্সি গিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। গাড়ি-বারান্দার সামনে উনি দাঁড়িয়ে আছেন, একপাশে কলাবতী অন্য পাশে শিউসেবক। শিউসেবক গাড়ির দরজা খুলে দিতেই কলাবতী পিউকে ছোঁ মেরে নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

উনি বললেন, 'এস, অন্য অতিথিরা এখনও আসেননি।'

আমার দিকে একবার তাকালেন; যেন একটু অপ্রস্তুত ভাব। তারপর আমাদের ড্রয়িং-রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ওঁর চেহারা অনেকটা ভাল, সেই আগুনে-ঝলসানো ভাব আর নেই।

ড্রয়িং-রুমের ভেতরে এর আগে আসিনি; ছবির মতন সাজানো। আমি আর শুক্লা একটা সোফায় বসলুম। শুক্লা বলল, 'অন্য অতিথিরা কারা? একজন ত ডক্টর দাস—?'

উনি বললেন, 'দ্বিতীয় ব্যক্তি ডক্টর মন্মথ কর।'

আমরা হকচকিয়ে তাকালুম। মন্মথ করকে আমাদের সঙ্গে নেমন্তন্ন করেছেন! এ কী কাণ্ড!

কিন্তু আর কোনও কথা হবার আগেই বাইরে জামাইবাবুর গাড়ির হর্ন শোনা গেল। উনি বাইরে গেলেন।

আমি আর শুক্লা মুখ-তাকাতাকি করলুম। দু'জনের চোখে একই প্রশ্ন—মন্মথ করকে আবার কেন?

ওঁরা দু'জনে কথা কইতে কইতে ঘরে এলেন। জামাইবাবুর ডাক্তারী পোশাক; আমাদের দেখে কৌতুক-ভরা হাসি হাসলেন, বললেন, 'আমি কিন্তু বেশীক্ষণ থাকব না, চা খেয়েই পালাব। হাসপাতালে কাজ আছে।'

উনি বললেন, 'না ডাক্তারবাবু, আজ আপনাকে একটু থাকতে হবে। মন্মথ করকে ডেকেছি, আপনাদের সামনেই তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।'

জামাইবাবুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তীক্ষ্ণ চোখে ওঁর পানে তাকিয়ে বললেন, 'মন্মথ কর! তার সঙ্গে কিসের বোঝাপড়া?'

ওঁর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল,—'আছে। পরশু মন্মথ কর এসেছিল।' আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'ওদের দু'জনের নামে অকথ্য মিথ্যে কথা বলে গেছে। আপনাকেও বাদ দেয়নি। আমি তখন কিছু বলিনি, কেবল শুনে গেছি। আজ তাকে আসতে বলেছি, আপনাদের তিনজনের সামনে ভাল করে শিক্ষা দেব।'

আমরা কাঠ হয়ে বসে রইলুম। জামাইবাবুর কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছিল, আস্তে আস্তে তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি একটু হেসে বললেন, 'মন্মথ কর যে সত্যি কথা বলেনি আপনি জানলেন কী করে? আমাদের আপনি কতটুকুই বা জানেন?'

তিনি মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'জানি। আমার অন্তরাত্মা জানে, আপনারা খাঁটি মানুষ। আমি মানুষ চিনি। জীবনে মাত্র একবার মোহের নেশায় মানুষ চিনতে ভুল করেছিলুম, গিলটিকে সোনা মনে করেছিলুম। সে ভুল আর দ্বিতীয়বার করব না।'

জামাইবাবু ওঁর একটু কাছে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'শুক্লার সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ আপনি জানেন?'

উনি উঁচু গলায় বললেন, 'জানি। শুক্লা নিজেই আমাকে সব বলেছে। আপনি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, ও আপনাকে বিয়ে করেনি। যেদিন ওর মুখে এই কথা শুনে-ছিলাম, ইচ্ছে হয়েছিল ওকে কাঁধে তুলে নাচি। ডাক্তারবাবু, আমি ভালবাসার কাঙাল, যখন সত্যিকার ভালবাসা দেখতে পাই তখন আমার মাথা ঠিক থাকে না।'

শুক্লার দিকে তাকিয়ে দেখলুম সে রুমালে ঠোঁট চেপে মুখ নিচু করে আছে। জামাইবাবু কিন্তু হেসে উঠলেন, বললেন, 'ভালই করেছেন ওকে কাঁধে তুলে নাচেননি, তাতে ওর গুমর আরও বেড়ে যেত, হয়ত কোনদিনই আমাকে বিয়ে করত না।—যা হোক, মন্মথ কর আমাদের অনেক অনিষ্ট করার চেষ্টা করেছে, কিছুটা কৃতকার্যও হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাকে মারধোর করবেন নাকি?'

উনি চোয়ালের হাড় শক্ত করে বললেন, 'সেটা নির্ভর করবে তার ব্যবহারের ওপর।'

জামাইবাবু একটি নিশ্বাস ফেলে আমার পাশে এসে বসলেন, আমার কানে কানে বললেন, 'সখি, দেখছ কী, একেবারে আস্ত গুণ্ডা।'

মনে মনে বললুম, 'তা কি আমি জানি না! কিন্তু এমন গুণ্ডা পৃথিবীতে ক'টা আছে!'

এই সময় বাইরে একটা ছোট গাড়ি এসে দাঁড়াল। উনি বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। আমার বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল।

জামাইবাবু বললেন, 'দেখ, মন্মথ করকে সিধে করা আমাদের কম্ম নয়। যেমন বুনো ওল তেমনই বাঘা তেঁতুল দরকার।'

মন্মথ কর ওঁর সঙ্গে ঘরে ঢুকল, তারপর আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখ এক মুহূর্তে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

উনি বললেন, 'কী ডাক্তার, এদের চিনতে পার?'

স্মার্ট ডাক্তার মন্মথ করের অবস্থা দেখে কষ্ট হয়; সে থতমত খেয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'আমি—দেখুন—আড়ালে আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই—'

উনি আস্তিন গুটিয়ে হুংকার ছাড়লেন, 'আড়ালে নয়, যা বলবে সকলের সামনে বল। কী বলবার আছে তোমার?'

এক পা পেছিয়ে গিয়ে মন্মথ কর বলল, 'আমি—দেখুন—আমি ত নিজে কিছু দেখিনি, পাঁচজনের মুখে যা শুনেছি—। এসব যে মিথ্যে গুজব তা আমি কী করে জানব?'

ওঁর ডান হাতটা মন্মথ করের কাঁধের ওপর পড়ল, আঙুলগুলো চিমটের মতন তার শার্ক-স্কিনের কোট চেপে ধরল; বাঘের মতন চাপা গর্জনে উনি বললেন, 'ডাক্তার, আজ তোমাকে ছেড়ে দিলাম। ফের যদি শুনতে পাই তুমি এদের কুৎসা করেছ, তোমার জিভ উপড়ে নেব। যাও।' উনি তার কাঁধ ছেড়ে দিলেন, ডাক্তার টাউরি খেতে খেতে ঘর থেকে চলে গেল।

মন্মথ কর আমাকে কয়েকবার দুষ্ট মতলবে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিল, উনি কি শুক্লার মুখে তাই জানতে পেরে জবাব দিলেন? শুক্লা ওঁকে আমাদের জীবনের অনেক গোপন কথা বলেছে; কেন বলেছে জানি না, নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে। শুক্লা ত

বাইরের লোকের কাছে ঘরের কথা বলার মেয়ে নয়।

মন্মথ করের গাড়ি চলে গেল, আওয়াজ পেলুম। আমার একপাশে শুক্লা অন্য পাশে জামাইবাবু। গৃহস্বামী দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। কারুর মুখে কথা নেই। ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে।

উনি হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলেন, ঘরটা দপ করে হেসে উঠল। হঠাৎ যেন রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তন হল।

শিউসেবক ঘরে ঢুকল; আমার পিছনে এসে একটু ঝুঁকে খাটো গলায় বলল, 'মাজী, চা আনি?'

আমি চমকে ঘাড় ফেরালুম; শিউসেবক আমার পানেই সসম্ভ্রমে চেয়ে আছে। কিন্তু —চা আনবে কি না একথা শিউসেবক আমাকে জিগ্যেস করছে কেন? কেমন যেন বোকা হয়ে গিয়ে বললুম, 'আন।'

শিউসেবক চলে গেল। আমি জামাইবাবুর দিকে তাকালুম; তিনি ভালমানুষটির মতন চুপ করে বসে আছেন, কিন্তু তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির আভাস লেগে আছে। শুক্লার দিকে চোখ ফেরালুম; পোড়ারমুখী দুষ্টুমি-ভরা চোখ আকাশপানে তুলে বসে আছে। বাড়ির কর্তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি চোখ ফিরিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এদের মনে কী আছে বুঝতে পারছি না; বোধ হচ্ছে যেন সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে।

শিউসেবক এবং আর-একজন চাকর চা নিয়ে এল। চায়ের সঙ্গে ট্রে-ভরা দেশীবিলিতী খাবার; কচুরি সিঙাড়া কেক প্যাটি। চাকরেরা টেবিলের ওপর ট্রে সাজিয়ে রেখে চলে যাবার পর জামাইবাবু বললেন, 'আমাকে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। সখি, আমাকে চা ঢেলে দাও। এবং একটা কচুরি। বেশী কিছু খাব না।'

আমি উঠে গিয়ে টি-পট থেকে চা ঢাললুম। গৃহস্বামী জানলার দিক থেকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ বললেন, 'সখী! সখী কে?'

জামাইবাবু বললেন, 'প্রিয়ংবদাকে আমি 'সখী' বলে ডাকি। আর শুক্লা বলে 'প্রিয়া'।'

উনি টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন, হাসিমুখে একবার আমার পানে চেয়ে বললেন, 'তাই নাকি! আমি ওকে প্রিয়দম্বা বলি, কিন্তু নামটা বোধহয় ওর পছন্দ নয়। একদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। তাহলে আমিও কি ওকে সখী বলে ডাকব? কিংবা প্রিয়া?'

আমার কান গরম হয়ে উঠল। জামাইবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'নিজের মনের মতন সবাই করুক নামকরণ, বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার খুড়া রামচরণ। প্রিয়দম্বা আমার ত খুব খারাপ লাগে না; মনে হয় যেন জগদম্বার মাসতুত বোন।'

আমি দু'জনকে চা দিলুম, তারপর নিজের আর শুক্লার চা নিয়ে শুক্লার পাশে গিয়ে বসলুম। চা খাওয়া চলতে লাগল। ওদিকে ওঁরা দু'জনে কী সব গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু করেছেন। শুক্লা বলল, 'খিদে পেয়ে গেছে রে! তোর পায়নি?'

উঠে গিয়ে একটা প্লেটে খাবার ভরে নিয়ে এলুম, দু'জনে খেতে লাগলুম। কলাবতী পিউকে কোলে নিয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল; তার মুখে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত হাসি। বলল, 'পিউরানী খেতে চাইছে।'

পিউ কলাবতীর কোল থেকে পিছলে নেমে পড়ল, আমার কাছে ছুটে এসে প্লেটের দিকে ছোট্ট আঙুল দেখিয়ে বলল, 'উই খাব।'

ওকে ভারী জিনিস খেতে দিই না, কিন্তু আজ আর 'না' বলতে ইচ্ছে হল না। বললুম, 'কী খাবে তুলে নাও।'

পিউ সন্তর্পণে একটি প্যাটি তুলে নিয়ে আমার পানে তাকাল,—'খাই?'

বললুম, 'খাও।'

পিউ তখন প্যাটিতে ছোট্ট কামড় দিয়ে ঘাড়-হেলিয়ে বলল, 'ভাল।'

কলাবতী এতক্ষণ দাঁত বার করে আমার পানে তাকিয়ে ছিল, পিউ তার কাছে ফিরে গেল। দু'জনে ঘর থেকে চলে গেল। দোরের কাছ থেকে কলাবতী ঘাড় ফিরিয়ে আর-একবার দাঁত বার করল।

কী হয়েছে এদের? সবাই যেন আমার সম্বন্ধে একটা গুপ্ত কথা জানতে পেরেছে, কিন্তু বলছে না।

চা খাওয়া শেষ হল।

জামাইবাবু রুমালে মুখ মুছে বললেন, 'আমি তাহলে এবার—'

উনি হাত তুলে বললেন, 'একটু বসুন ডাক্তারবাবু। আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকার আছে।'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম, ওঁর মুখে সেই অপ্রস্তুত-ভাব ফিরে এসেছে। উঠে দাঁড়ালেন, গলা ঝাড়া দিলেন, যেন বক্তৃতা দেবার উদ্যোগ করছেন। তারপর ধরা ধরা গলায় বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনি ওর—মানে—প্রিয়—প্রিয়ংবদার অভিভাবক। তাই আপনার কাছে—ইয়ে—প্রস্তাব করছি, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।'

আমার অবস্থা বলবার চেষ্টা করব না, চেষ্টা করলেও বলতে পারব না। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল তখন জামাইবাবু ওঁকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়াচ্ছেন; শুক্লা আমার একটা হাত চেপে ধরেছে। সে কানে কানে বলল, 'চল্, ওপরে যাই।' আমার হাত ধরে টানতে টানতে সে দোরের দিকে চলল।

জামাইবাবু ডেকে বললেন, 'ও কী, চললে কোথায় সখি! প্রস্তাবের উত্তর দিয়ে যাও।'

শুক্লা বলল, 'ও উত্তর দেবে কেন? শঙ্খনাথবাবু ত ওর কাছে প্রস্তাব করেননি। তবে আমি বলতে পারি, সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। আয় প্রিয়া।—তুমি যেন পালিও না. আমরা এখনই আসছি।'

ওপরে পিউয়ের নার্সারিতে কেউ নেই, কিন্তু আলো জ্বলছে। শুক্লা আমার গলা জড়িয়ে বলল, 'প্রিয়া! আর হিংসে হচ্ছে না ত?'

শুক্লার কাঁধে মাথা রেখে একটু কাঁদলুম। মনটা হালকা হলে জিগ্যেস করলুম, 'তুই আমার কথা ওঁকে কী বলেছিস।'

শুক্লা নিরীহভাবে বলল, 'কিছু ত বলিনি?'

'শুক্লা! সত্যি বল্ নইলে এমন চিমটি কাটব—'

'না না, বেশী কিছু বলিনি। শুধু বলেছিলুম, তুই মরে যাচ্ছিস। পুরুষমানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কি ওরা কিছু দেখতে পায়!'

এমন চিমটি কেটেছি শুক্লাকে, অনেকদিন কালশিটে থাকবে।

নীচে নেমে এসে শুক্লা জামাইবাবুকে বলল, 'চল, তুমি আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে। পিউ আর প্রিয়া পরে যাবে, শঙ্খনাথবাবু ওদের পৌঁছে দেবেন।'

ওরা হাসতে হাসতে চলে গেল! আমার একটা নিশ্বাস পড়ল। এত প্রীতি, এত মমতা, এত দরদ ওদের প্রাণে! ভগবান কবে যে ওদের মুক্তি দেবেন!

ওরা চলে যাবার পর উনি ঘরের বড় আলো নিভিয়ে দিয়ে ছোট আলো জ্বলে দিলেন। গোলাপী প্রভায় ঘরটি স্বপ্নময় হয়ে উঠল।

আমি সোফার এক কোণে বসে ছিলুম, উনি আমার পাশে এসে বসলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমাকে কী বলে ডাকব আগে ঠিক হোক। প্রিয়দম্বা চলবে না?'

আমার নিশ্বাস ঘন ঘন বইতে আরম্ভ করেছিল, যথাসাধ্য দমন করে বললুম, 'না।'

'তবে—প্রিয়া? সখী?'

আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার মা-বাবা আমাকে 'বাদল' বলে ডাকতেন।'

'বাদল! বাদল!' তিনি নামটা কয়েকবার আবৃত্তি করে বললেন, 'এই ত খাসা নাম। আমিও আজ থেকে তোমাকে 'বাদল' বলে ডাকব।'

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। আমার সারা গায়ে যেন উইপোকা চলে বেড়াচ্ছে। খোঁপাটা হঠাৎ খুলে গিয়ে পিঠে এলিয়ে পড়ল।

উনি বললেন, 'ও কী, তুমি কাঁপছ কেন? ভয় করছে?'

বললুম, 'না।'

'তবে?'

চুপ করে রইলুম।

উনি হঠাৎ আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, তুমি আমাকে ভয় কোরো না। আমি বড় অসহায়। আমাকে তুমি নিজের হাতে তুলে নাও। সত্যি আমি চাষা মনিষ্যি, আমাকে তুমি সভ্য করে নাও, ভদ্র করে নাও। একটু স্নেহ একটু ভালবাসা—এর বেশী কিছু আমি চাই না।' তাঁর গলা বুজে এল।

আমি কী উত্তর দেব? আমার কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল। তারপর উনি হঠাৎ আরও ব্যগ্র স্বরে বলে উঠলেন, 'তুমি কোনদিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না?'

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না, ওঁর মুখখানা দু'হাতে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বললুম, 'তুমি ওসব কথা ভুলে যাও। আমি তোমাকে ভুলিয়ে দেব—'

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

'দম্মা!'

দোরের কাছ থেকে মিহি আওয়াজ পেয়ে দু'জনেই মুখ তুললুম। পিউয়ের ছোট্ট চেহারাটি দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; বোধহয় কলাবতী তাকে দোরের কাছে নামিয়ে দিয়ে সরে গেছে। সে এদিক ওদিক চেয়ে আমার কাছে এল; একবার বাপের দিকে তাকাল, তারপর আমার কোলে মাথা রেখে বলল, 'ঘুম পাচ্ছে।'

আমি পিউকে কোলে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। পিউ আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুবার উপক্রম করল।

উনি পাশে এসে দাঁড়ালেন, পিঠের ওপর দিয়ে আমাদের দু'জনকে বাহু দিয়ে ঘিরে খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'পিউ যেন কোনো দিন জানতে না পারে তুমি ওর মা নও।'

না, পিউ জানতে পারবে না। পিউকে জানতে দেব না। কিন্তু—বুকের মধ্যে একবার মুচড়ে উঠল—পিউ কি আমার পেটে জন্মাতে পারত না? জন্মালে কী দোষ হত?

কিন্তু না, এই ভাল। পিউ আমার পেটে জন্মালে এত সুন্দর হত কি?...

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে—রিমঝিম রিমঝিম।

বহু যুগের ওপার হতে

খৃষ্টপূর্ব যুগের পাটলিপুত্র। একটি রৌদ্র-ঝলমল প্রভাত। রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার। দুই স্তম্ভের শীর্ষে সিংহ-মূর্তি। একটি স্তম্ভের মূলে শৃঙ্খলবদ্ধ একটি বিরাট হস্তী দাঁড়াইয়া শুণ্ড আন্দোলিত করিতেছে। অপর স্তম্ভের নিকট একটি বৃহদাকার দুন্দুভি; মুষলহস্ত একজন রাজপুরুষ মুষল উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান।

সিংহদ্বারের ভিতর দিয়া রাজপুরীর ভিন্ন ভিন্ন ভবনগুলি দেখা যাইতেছে। সম্মুখেই সভাগৃহ। তাহার আশেপাশে অস্ত্রাগার মন্ত্রভবন কোষাগার প্রভৃতি। প্রতীহার-ভূমিতে দুইজন ভীমকায় প্রতীহার পরশু স্কন্ধে লইয়া পরিক্রমণ করিতেছে।

যে রাজপুরুষ দুন্দুভির নিকট দাঁড়াইয়া ছিল সে উদ্যত মুষল দিয়া দুন্দুভির উপর বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। দুন্দুভি হইতে গম্ভীর নির্ঘোষ নির্গত হইল।

সিংহদ্বারের সম্মুখে তিন দিকে পথ গিয়াছে। দুইটি পথ গিয়াছে প্রাকারের সমান্তরালে, তৃতীয় পথ সিংহদ্বার হইতে বাহির হইয়া সিধা সম্মুখ দিকে গিয়াছে। দেখা গেল, দুন্দুভির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বহু জনগণ সিংহদ্বারের দিকে আসিতেছে। পুরুষই অধিক, দুই-চারিটি স্ত্রীলোকও আছে। তাহারা আসিয়া দুন্দুভি ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

জনতার মধ্যে একটি লোক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাহার চোখের দৃষ্টি তীব্র, নাসিকার অস্থি ভগ্ন। নাম নাগবন্ধু। বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর। সে একাগ্রদৃষ্টিতে রাজপুরুষের দিকে চাহিয়া ঘোষণার প্রতীক্ষা করিতেছে।

রাজপুরুষ যখন দেখিল বহু জনগণ সমবেত হইয়াছে, তখন দুন্দুভি বাদ্য স্থগিত করিল। দুই হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া জনতাকে নীরব থাকিবার অনুজ্ঞা জানাইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—

'পাটলিপুত্রের নাগরিকবৃন্দ, শোনো...পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ চণ্ড যে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন শোনো...মন্ত্রী শিবমিশ্র মহারাজ চণ্ডের আদেশ উপেক্ষা করেছিল—'

জনতার মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল, বিশেষত নাগবন্ধু যে শিবমিশ্রের নামোল্লেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল। তাহার অধরোষ্ঠ নড়িতে লাগিল, যেন সে অস্ফুটস্বরে শিবমিশ্রের নাম উচ্চারণ করিতেছে।

ঘোষক রাজপুরুষ ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছে—

'তাই মহারাজ চণ্ড তাকে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন—পাটলিপুত্রের মহাশ্মশানে বালুর মধ্যে শিবমিশ্রকে কণ্ঠ পর্যন্ত প্রোথিত করে রাখা হবে...রাত্রে শ্মশানের শিবাদল এসে শিবমিশ্রকে জীবন্ত ছিঁড়ে খাবে...'

জনতার চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া পড়িয়াছে। নাগবন্ধু শুষ্ক অধর লেহন করিয়া জ্বলন্ত চক্ষে ঘোষকের পানে চাহিয়া আছে।

'নাগরিকবৃন্দ, স্মরণ রেখো, অমিতবিক্রম মগধেশ্বর চণ্ডের আজ্ঞা যে ব্যক্তি লঙ্ঘন করে তার কী ভয়ঙ্কর শাস্তি। সাবধান—সাবধান!...আরও জেনে রাখো, আজ দিবারাত্র মহাশ্মশান ঘিরে সতর্ক রাজপ্রহরী পাহারায় থাকবে...যদি কেউ শিবমিশ্রকে শ্মশান থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে তবে তার শূলদণ্ড হবে। সাবধান—সাবধান!'

পুনরায় দুন্দুভি ধ্বনিত করিয়া রাজপুরুষ ঘোষণা শেষ করিল। জনতা স্থির হইয়া রহিল।

তারপর জনতার অগ্রভাগে ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা দিল। সিংহদ্বারের ভিতর হইতে প্রহরী পরিবেষ্টিত শিবমিশ্র বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার আকৃতি শুষ্ক, দুই চক্ষু নীরবে অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। হস্তদ্বয় শৃঙ্খলিত। নগ্ন স্কন্ধে উপবীত। আকৃতি দেখিয়া বয়স অনুমান পঞ্চাশ বছর মনে হয়।

জনতা নীরবে দ্বিধা ভিন্ন হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল, শিবমিশ্র ও প্রহরিগণ অগ্রসর

হইলেন। নাগবন্ধুর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় শিবমিশ্র একবার তাহার পানে চক্ষু ফিরাইলেন। নাগবন্ধুর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিল, আবাব মুখ বন্ধ করিল।

শিবমিশ্র জনব্যূহে অদৃশ্য হইলেন, কেবল তাঁহার পদক্ষেপের তালে তালে শৃঙ্খল বাজিতে লাগিল—ঝনাৎ ঝন্—ঝনাৎ ঝন্—

* * *

বহু স্তম্ভযুক্ত রাজসভার অভ্যন্তর।

মহিষাকৃতি মহারাজ চণ্ড সিংহাসনে আসীন। সিংহাসনটি ভূমির উপর স্থাপিত নয়, চারিটি স্বর্ণশৃঙ্খল দ্বারা শূন্যে দোদুল্যমান; মহারাজ তাহার উপর পদ্মাসনে বসিয়া মৃদু দোল খাইতেছেন। সিংহাসনের দুই পাশে দুইজন যুবতী কিঙ্করী; একজন ময়ূর-পুচ্ছের পাখা দিয়া মহারাজকে বীজন করিতেছে, অন্যটি মণিমুক্তাখচিত সুরাভৃঙ্গার হস্তে মহারাজের তৃষ্ণার প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজসিংহাসনের সম্মুখে দশ হস্ত ব্যবধানে সভাসদগণের আসন। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট; তাহাদের মুখের গদ্‌গদ ভাব দেখিয়া বোঝা যায় তাহারা চাটুকার বয়স্য। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধ সভা-জ্যোতিষী পুঁথিপত্র সম্মুখে লইয়া নিমীলিত নেত্রে বোধকরি গ্রহ-নক্ষত্রের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন।

এক ঝাঁক নর্তকী সভার এক প্রান্ত হইতে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিয়া রাজা ও সভাসদগণের মধ্যবর্তী ব্যবধান স্থল দিয়া বসন্তের প্রজাপতির মত অন্য প্রান্তে চলিয়া গেল। রাজা প্রত্যেকটি নর্তকীকে ব্যাঘ্র-চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিলেন; তাহারা অন্তর্হিত হইলে ভৃঙ্গারধারিণী কিঙ্করীর দিকে হাত বাড়াইলেন। কিঙ্করী ত্বরিতে পাত্র ভরিয়া রাজার হাতে দিল।

এই সময় রাজ-অবরোধের কঞ্চুকী স্বস্তি-বাচন করিয়া সিংহাসনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চণ্ড সুরাপাত্র মুখে তুলিতে গিয়া তাহাকে দেখিয়া ভ্রূভঙ্গ করিলেন। বলিলেন—

'কঞ্চুকী! কি চাও?'

'আয়ুষ্মন্'—কঞ্চুকী নত হইয়া চণ্ডের কানে কানে কিছু বলিল। চণ্ডের ক্ষুদ্র চক্ষু দুষ্ট কৌতুকে নৃত্য করিয়া উঠিল।

'মোরিকার কন্যা জন্মেছে! হো হো—'

সুরাপাত্র নিঃশেষ করিয়া চণ্ড সভাসদমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। জ্যোতিষীর ধ্যানস্থ মূর্তির উপর তাঁহার চক্ষু নিবদ্ধ হইল।

তিনি হুঙ্কার ছাড়িলেন—'গ্রহাচার্য পণ্ডিত—'

গ্রহাচার্য চমকিয়া চক্ষু মেলিলেন এবং ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'শুভমস্তু—শুভমস্তু। আদেশ করুন মহারাজ।'

চণ্ড বলিলেন—'শোনো। কাল মধ্যরাত্রে রাজ-অবরোধের এক দাসী এক কন্যা প্রসব করেছে। তার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত কর।'

গ্রহাচার্য আসন গ্রহণ করিয়া পুঁথি তুলিয়া লইলেন।—

'শুভমস্তু। কন্যার পিতা কে মহারাজ?'

এই সময় রাজ-বয়স্য বটুক ভট্টের তীক্ষ্ণোচ্চ হাসির শব্দ শোনা গেল। সিংহাসনের ঊর্ধ্বে শিকল অবলম্বন করিয়া বটুক ভট্ট মর্কটের মত ঝুলিতেছিলেন, তিনি মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

'গ্রহাচার্য মশায়, এটুকু বুঝতে পারলেন না। কন্যার পিতা আমি—'

চণ্ড ভ্রূকুটি করিয়া ঊর্ধ্বে চাহিলেন।—

'বটুক—নেমে আয়!'

বটুক শিকল ধরিয়া সড়াৎ করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহার আকৃতি ক্ষীণ ও খর্ব, মাথার উপর কেশগুচ্ছ চূড়ার আকারে বাঁধা। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। তিনি গ্রহাচার্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

'শুনুন। মহারাজের অন্তঃপুরে দাসী মোরিকা কন্যার জন্ম দান করেছে—অন্তঃপুরে মহারাজ ছাড়া আর কোনও পুরুষের গতিবিধি নেই—সুতরাং কন্যার পিতা আমি। ইতি বটুকভট্টঃ। কেমন, বুঝেছেন তো?'

গ্রহাচার্য অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—'শুভমস্তু—এবার বুঝেছি—মহারাজের কন্যা—তা শুভমস্তু শুভমস্তু—'

বটুক ভট্ট আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলিলেন।—

'আপনার মস্তকের বুদ্ধিও শুভমস্তু। ইতি বটুকভট্টঃ।'

চণ্ড বলিলেন—'এইবার কন্যার ভাগ্য গণনা কর।'

'এই যে মহারাজ—'

গ্রহাচার্য দারুপট্ট লইয়া খড়ি দিয়া আঁক কষিতে আরম্ভ করিলেন।

* *

রাজ-অবরোধের একটি কক্ষ। রাজপ্রাসাদের তুলনায় কক্ষটি অত্যন্ত সাধারণভাবে সজ্জিত। কক্ষের এক কোণে ভূমির উপর শয্যা রচিত হইয়াছে। শয্যার উপর একটি যুবতী পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে; তাহার বুকের কাছে, বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে একটি সদ্যোজাত শিশু। যুবতী অসামান্যা সুন্দরী; কিন্তু বর্তমানে তাহার দেহ শীর্ণ, মুখ রক্তহীন।

মোরিকার বুকের কাছে বস্ত্রপিণ্ড ঈষৎ নড়িয়া উঠিল; তারপর তাহার ভিতর হইতে ক্ষীণ কাকুতি বাহির হইল। মোরিকা বস্ত্রাচ্ছাদন তুলিয়া শিশুকে দেখিল, আরও গাঢ়ভাবে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

* * *

রাজসভায় গ্রহাচার্য জন্মকুণ্ডলী রচনা শেষ করিয়াছেন, অস্বস্তিপূর্ণ চক্ষে কুণ্ডলীর পানে চাহিয়া আছেন।

চণ্ড প্রশ্ন করিলেন—'কি দেখলে? কন্যা ভাগ্যবতী?'

গ্রহাচার্য কুণ্ডলী হইতে শঙ্কিত চক্ষু তুলিলেন। বলিলেন—

'আয়ুষ্মন্, এই কন্যা—এহুম্—বড়ই কুলক্ষণা, প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—সাক্ষাৎ বিষকন্যা—'

চণ্ডের চক্ষু ঘূর্ণিত হইল—

'বিষকন্যা!'

গ্রহাচার্য বলিলেন—'হাঁ মহারাজ, গ্রহনক্ষত্র গণনায় তাই পাওয়া যাচ্ছে। আপনি একে বর্জন করুন—শুভমস্তু শুভমস্তু।'

চণ্ডের ললাটে গভীর ভ্রূকুটি দেখা দিল। তিনি বলিলেন—'বটে—বিষকন্যা! প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—কোন্ প্রিয়জনের অনিষ্ট করবে?'

গ্রহাচার্য আবার জন্মপত্রিকা দেখিলেন—'মাতা-পিতা দু'জনেরই অনিষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে—শুভমস্তু—মঙ্গল আর শনি পিতৃস্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিচ্ছে। তাই বলছি মহারাজ, আপনার কল্যাণের জন্য এই বিষকন্যাকে ত্যাগ করুন।'

বটুক ভট্ট এক চক্ষু মুদিত করিয়া এই বাক্যালাপ শুনিতেছিলেন, তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—'বয়স্য, গ্রহবিপ্রের কথা শুনবেন না, বটুক ভট্টের কথা শুনুন।

বিষকন্যা জন্মেছে ভালই হয়েছে। এই দাসী-কন্যাটাকে সযত্নে পালন করুন; সে যখন বড়-সড় হবে তখন তাকে নগর-নটীর পদে বসিয়ে দেবেন। ব্যস্, আপনার দুষ্ট প্রজারা সব একে একে যমালয়ে চলে যাবে। ইতি বটুকভট্টঃ।'

চণ্ড সক্রোধে বটুক ভট্টের দিকে ফিরিলেন এবং বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার চূড়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিলেন; বটুক ভট্টের ঘাড় লটপট করিতে লাগিল।

'বটুক, তোর জিভ উপ্‌ড়ে ফেলব।'

'এই যে মহারাজ—' বটুক দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া দিলেন। চণ্ডের ক্রুদ্ধ মুখে ক্রমশ হাসি ফুটিল। তিনি বটুক ভট্টের চূড়া ছাড়িয়া দিয়া এক চষক সুরা পান করিলেন।

ইতিমধ্যে গণদেব নামে একজন সভাসদ সভায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং একটি শূন্য আসনে বসিয়া পার্শ্ববর্তী সভাসদের সহিত মৃদু বাক্যালাপ করিতেছিল। চণ্ড সুরাপাত্র নিঃশেষ করিয়া উদ্বিগ্নমুখে সভাসদগণের পানে চাহিলেন। বলিলেন—

'এখন এই বিষকন্যাটাকে নিয়ে কি করা যায়?'

গণদেব নিজ আসনে উঁচু হইয়া হাত জোড় করিল—

'মহারাজ, আমি বলি, মন্ত্রী শিবমিশ্রকে যে-পথে পাঠিয়েছেন এই বিষকন্যাকেও সেই পথে পাঠিয়ে দিন, রাজ্যের সমস্ত অনিষ্ট দূর হোক।'

ক্রূর হাসিয়া চণ্ড গণদেবের পানে চাহিলেন—

'মহামন্ত্রী শিবমিশ্র এখন কি করছেন কেউ বলতো পারো?'

গণদেব বলিল—'এইমাত্র দেখে আসছি তিনি মহাশ্মশানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে শ্মশানশোভা নিরীক্ষণ করছেন। ব্রাহ্মণভোজন করাবো বলে কিছু মোদক নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নে রুচি নেই।'

চণ্ড অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। সভাসদগণও দেখাদেখি হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কাহারও মুখে হাসি ভাল ফুটিল না। চণ্ডের মুখ আবার গম্ভীর হইল, তিনি গূঢ় গর্জনে বলিলেন—

'শিবমিশ্র আমার কথার প্রতিবাদ করেছিল তাই তার এই দশা—আজ রাত্রে শিবাদল তাকে ছিঁড়ে খাবে। তোমরা স্মরণ রেখো।'

সভাসদগণ হেঁটমুখে নীরব রহিলেন। বটুক ভট্ট হাই তুলিয়া তুড়ি দিলেন—

'আজ তবে সভা ভঙ্গ হোক—ইতি বটুকভট্টঃ।'

চণ্ড সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বটুক ভট্ট অমনি সিংহাসনে গুটিসুটি পাকাইয়া শুইয়া পড়িলেন। চণ্ড গ্রহাচার্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

'গ্রহাচার্য, তুমি যা বলেছ তাই হবে। কন্যা আর তার মা দু'জনকেই আজ রাত্রে মহাশ্মশানে পাঠাব, সেখানে মা তার মেয়েকে স্বহস্তে শ্মশানে সমাধি দেবে। তাহলে গ্রহদোষ দূর হবে তো?'

গ্রহাচার্য কাঁপিয়া উঠিলেন—

'মহারাজ! এত কঠোরতার প্রয়োজন নেই—শুভমস্তু—কন্যাকে ভাগীরথীর জলে বিসর্জন দিন, কন্যার মাতার কোনও অপরাধ নেই—তাকে দিয়ে এমন—'

চণ্ড গর্জন করিয়া উঠিলেন—'অপরাধ নেই! সে এমন কুলক্ষণা কন্যার জন্ম দিয়েছে কেন?'

গ্রহাচার্য আরও কিছু বলিবার উপক্রম করিলে চণ্ড উদ্ধতভাবে হাত তুলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন—

'থাক, তোমার বাক্-বিস্তার শুনতে চাই না। যা করবার আমি স্বহস্তে করব।'

চণ্ডের মুখ ভয়ংকর আকার ধারণ করিল।

*　　*　　*

রাত্রি। রাজ-অবরোধে দাসী মোরিকার ঘরের কোণে দীপ জ্বলিতেছে। দাসী মোরিকা শয্যার উপর নতজানু হইয়া ব্যাকুল ঊর্ধ্বমুখে মহারাজ চণ্ডের পানে চাহিয়া আছে। তাহার পাশে বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে সদ্যোজাত শিশু। মহারাজ চণ্ডের মুখে কঠিন ক্রোধ, হস্তে একটি লৌহ খনিত্র।

মোরিকা বলিল—'মহারাজ, দয়া করুন—'

চণ্ড বলিলেন—'দয়া! বিষকন্যা প্রসব করে দয়া চাও! তোমাকে হত্যা করব না এই দয়া কি যথেষ্ট নয়?'

মোরিকা গলদশ্রুনেত্রে বলিল—'আমাকেই হত্যা করুন মহারাজ। কিন্তু এই নিষ্পাপ শিশু—আপনার কন্যা—দয়া করুন—দয়া করুন—'

মোরিকা চণ্ডের পদতলে পড়িল। কিন্তু চণ্ডের হৃদয় দ্রব হইল না। তিনি বলিলেন—

'যা আদেশ করেছি পালন করতে হবে—নিজের হাতে একে মহাশ্মশানের বালুতে জীবন্ত সমাধি দিতে হবে।'

পদতল হইতে মুখ তুলিয়া মোরিকা হাত জোড় করিল—

'ক্ষমা করুন—দয়া করুন! নিজের সন্তানকে নিজের হাতে—না না, আমি পারব না।'

চণ্ড ভয়ংকর স্বরে কহিলেন—'পারবে না!'

চণ্ড হেঁট হইয়া বস্ত্রপিণ্ডসুদ্ধ শিশুকে বাম হস্তে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলেন—

'পারবে না! তবে তোমার চোখের সামনে এই সর্পশিশুকে মাটিতে আছড়ে মারব—'

বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে শিশু কাঁদিয়া উঠিল। মোরিকা দুই বাহু তুলিয়া আর্তব্যাকুল স্বরে বলিল—

'না না, দিন, আমাকে দিন—আমি—আপনার আদেশ পালন করব—'

চণ্ড শিশুর বস্ত্রপিণ্ড নামাইলেন, মোরিকা তাহা নিজ বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিল। চণ্ড দ্বারের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—

'যাও—এই নাও খনিত্র।'

মোরিকা খনিত্র লইল। প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার বক্ষ হইতে নির্গত হইল। সে স্খলিতপদে দ্বারের দিকে চলিল। সে দ্বারের কাছে পেঁছিলে চণ্ড বলিলেন—

'মহাশ্মশান থেকে তুমি ফিরে আসতে পার, কিন্তু বিষকন্যা যেন ফিরে না আসে।'

মোরিকা দ্বারের কাছে একবার দাঁড়াইল, তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

* * *

চন্দ্রালোকিত মহাশ্মশান।

যতদূর দৃষ্টি যায় ধু ধু বালুকা; কেবল উত্তরদিক ঘিরিয়া ভাগীরথীর ধারা কলঙ্ক-রেখার মত দেখা যাইতেছে। বালুকার উপর অসংখ্য নরকঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; মাঝে মাঝে লৌহশূল উচ্চ হইয়া আছে। শূলশীর্ষে কোথাও বীভৎস উলঙ্গ মনুষ্যদেহ বিদ্ধ হইয়া আছে, কোথাও বা শূলমূলে মাংসহীন কঙ্কাল পুঞ্জীভূত হইয়াছে। বহু দূরে গঙ্গার তীরে অনির্বাণ চুল্লীতে রক্তবর্ণ অঙ্গার জ্বলিতেছে।

এই মহাশ্মশানের ভিতর দিয়া মোরিকা চলিয়াছে। ডান হাতে বুকের কাছে বস্ত্রাচ্ছাদিত শিশুকে ধরিয়া আছে, বাঁ হাতে খনিত্র। সে ত্রাস-বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে চাহিতেছে আর ক্লান্ত পদযুগল টানিয়া টানিয়া চলিতেছে। একটা নিশাচর পাখি কর্কশ ডাক দিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল।

মোরিকা ভয় পাইয়া বালুর উপর পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠিয়া চারিদিকে চাহিল। বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে শিশু ক্ষীণকণ্ঠে একবার কাঁদিল। মোরিকা তাহাকে বুকে চাপিয়া দ্রুত পলায়ন করিবার জন্য একদিকে ছুটিল।

একটি শূলের অর্ধপথে একটা নরদেহ বীভৎস ভঙ্গীতে বিদ্ধ হইয়া আছে, দুইটা শৃগাল ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সেই দুষ্প্রাপ্য খাদ্যের দিকে তাকাইয়া আছে; চন্দ্রালোকে তাহাদের চক্ষু জ্বলিতেছে। মোরিকা এই দিকে আসিতেছিল, হঠাৎ শূল দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপর বিপরীত দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

শৃগালের মিলিত ঐক্যনাদ শুনা যাইতেছে। দূর হইতে দেখা গেল, একপাল শৃগাল বালুর উপর চক্রাকারে বসিয়া ঊর্ধ্বমুখে ডাকিতেছে। মোরিকা সেই দিকে ছুটিতে ছুটিতে আবার পড়িয়া গেল। বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে শিশু তাহার বাহুবন্ধন হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মোরিকা উঠিয়া বসিল; তাহার চক্ষে অর্ধোন্মাদ দৃষ্টি। সে সহসা খনিত্র লইয়া বালু খনন আরম্ভ করিল। অনতি-গভীর একটি গর্ত হইলে মোরিকা দুই হস্তে বস্ত্রপিণ্ড লইয়া তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল, তারপর বালু দিয়া গর্ত পূর্ণ করিতে লাগিল। শিশুর কণ্ঠে আবার ক্ষীণ আকুতি শুনা গেল।

কিন্তু গর্ত পূর্ণ হইবার পূর্বেই মোরিকা আবার শিশুকে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার উন্মত্ত দৃষ্টি পড়িল দূরে গঙ্গার শ্যামরেখার উপর। সে বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—

'গঙ্গা!—মা জাহ্নবী, তুমি আমাদের কোলে স্থান দাও—'

এক হাতে খনিত্র, অন্য হাতে শিশুকে বুকে চাপিয়া মোরিকা গঙ্গার অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

গঙ্গার নিকটে অনির্বাণ চুল্লী। চুল্লীর পশ্চাৎপটে দেখা গেল, একদল শৃগাল কোনও অদৃশ্য কেন্দ্রের চারিধারে ব্যূহ রচনা করিয়া রহিয়াছে। শৃগালচক্রের মধ্য হইতে হঠাৎ মনুষ্যকণ্ঠের তর্জন ফুঁসিয়া উঠিল কিন্তু মনুষ্য দেখা গেল না।

মোরিকার মুহ্যমান চেতনা মনুষ্যের কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ সজাগ হইল, পাশ দিয়া যাইতে যাইতে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার মনুষ্যকণ্ঠের তর্জন শুনা গেল; শৃগালেরা পিছু হটিল। তখন মোরিকা ভয়ার্ত চক্ষে দেখিল, শৃগালচক্রের মাঝখানে বালুর উপর একটি নরমুণ্ড। দেহ নাই—কেবল মুণ্ড।

মোরিকার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার বাহির হইল; সে কোন্ দিকে পালাইবে ভাবিয়া পাইল না, অবশ দেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা সেই নরমুণ্ড উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিল—

'কে তুমি? প্রেত পিশাচ নিশাচর যে হও আমাকে রক্ষা কর—'

মোরিকা অবশে সেই দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল; শৃগালেরা তাহাকে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ অনিচ্ছায় আরও দূরে সরিয়া গেল।

মোরিকা কম্পিতকণ্ঠে কহিল—'কে তুমি?'

আকণ্ঠ প্রোথিত শিবমিশ্রের দুই গণ্ড শৃগালদষ্ট, রক্ত ঝরিতেছে। তিনি তীব্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন—

'ভয় নেই—আমি মানুষ। আমার নাম শিবমিশ্র। তুমি যে হও আমাকে বাঁচাও—'

'মন্ত্রী শিবমিশ্র!'

মোরিকা ছুটিয়া আসিয়া শিবমিশ্রের নিকট নতজানু হইল, শিশুকে মাটিতে রাখিয়া প্রাণপণে খনিত্র দিয়া বালু খুঁড়িতে লাগিল।

মোরিকা বালু খুঁড়িয়া শিবমিশ্রকে বাহির করিয়াছে; তিনি বালুর উপর শুইয়া অতি কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন। মোরিকার ক্লান্ত দেহও মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে; তাহার প্রাণশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে শিবমিশ্র কথা বলিলেন—

'তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, তোমার পরিচয় জানতে চাই। কে তুমি? এত রাত্রে

এই ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে কি জন্য এসেছ?'

মোরিকা উত্তর দিল না, কেবল অঙ্গুলিনির্দেশে বস্ত্রাবৃত শিশুকে দেখাইল। শিশু এই সময় ক্ষীণ শব্দ করিল!

শিবমিশ্র উঠিয়া বসিলেন, গণ্ডের রক্ত মুছিয়া বলিলেন—

'শিশু! শিশু নিয়ে এত রাত্রে শ্মশানে এসেছ! কে তুমি? তোমার নাম কি?'

মোরিকা নিমীলিত কণ্ঠে বলিল—

'আমার নাম—মোরিকা। আমি রাজপুরীর দাসী—'

শিবমিশ্রের চক্ষে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—

'রাজপুরীর দাসী—ময়ূরিকা!—বুঝেছি—তুমি কবে এই সন্তান প্রসব করলে?'

মোরিকা বলিল—'কাল রাত্রে—'

কিছুক্ষণ নীরব। মোরিকা কয়েকবার দীর্ঘনিশ্বাস টানিল, যেন তাহার শ্বাসকষ্ট হইতেছে।

শিবমিশ্র বলিলেন—'হতভাগিনি! মহারাজ চণ্ডের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছ তাই তোমার এই দণ্ড?'

'মহারাজ আজ্ঞা দিয়েছেন কন্যাকে নিজের হাতে শ্মশানে সমাধি দিতে হবে—'

'কিন্তু কেন? কী তোমার কন্যার অপরাধ?'

'সভাপণ্ডিত গণনা করে বলেছেন আমার কন্যা বিষকন্যা—পিতার অনিষ্টকারিণী—তাই—'

শিবমিশ্রের চক্ষু ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—

'বিষকন্যা! পিতার অনিষ্টকারিণী! দেখি—আমি বিষকন্যার লক্ষণ চিনি—'

শিবমিশ্র উঠিয়া শিশুকে তুলিয়া লইলেন; সন্তর্পণে বস্ত্রাবরণ সরাইয়া দেখিলেন। কিন্তু চন্দ্রালোকে ভাল দেখা গেল না। শিবমিশ্র তখন শিশুকে লইয়া অনির্বাণ চিতার নিকট গেলেন। চিতার নিকট অনেক ইন্ধনকাষ্ঠ পড়িয়াছিল, একটি কাষ্ঠখণ্ড লইয়া জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করিলেন; দপ্ করিয়া আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। তখন সেই আলোকে শিবমিশ্র নগ্ন শিশুর দেহ-লক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিতে করিতে পৈশাচিক উল্লাসে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি শিশুকে বুকে লইয়া দ্রুত মোরিকার কাছে ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন—

'তোমার কন্যা বিষকন্যাই বটে—'

মোরিকা উত্তর দিল না, ভূমিশয্যায় পড়িয়া শেষবার অতি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল। শিবমিশ্র জানিতে পারিলেন না, মোরিকার পাশে নতজানু হইয়া আগ্রহ-কম্পিত স্বরে বলিলেন—

'বৎসে, তুমি তোমার কন্যা আমাকে দান কর, কেউ জানবে না। তুমি রাজপুরীতে ফিরে গিয়ে বোলো যে রাজাজ্ঞা পালন করেছ—'

মোরিকার নিকট হইতে কোনও সাড়া না পাইয়া শিবমিশ্র থামিলেন, নত হইয়া মোরিকার মুখ দেখিলেন; তারপর তাহার শীর্ণ মণিবন্ধে অঙ্গুলি রাখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার অঙ্গুলি হইতে মোরিকার মৃত হস্ত মাটিতে পড়িল। শিবমিশ্র শিশুকে সবলে বুকে চাপিয়া ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলিলেন।

'এই ভাল। এ কন্যা এখন আমার।'

এই সময় আকাশের অঙ্গে আগুনের রেখা টানিয়া রক্তবর্ণ উল্কা পিণ্ডাকারে জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে শিবমিশ্র শিশুর মুখের দিকে চাহিলেন। নিজ মনেই বলিলেন—

'এ প্রকৃতির ইঙ্গিত! তোমার নাম রাখলাম—উল্কা! উল্কা!'

মোরিকার মৃতদেহ পশ্চাতে ফেলিয়া শিবমিশ্র গঙ্গার অভিমুখে চলিলেন। শিবাদল দূরে সরিয়া গিয়াছিল, এখন আবার মোরিকার দেহ ঘিরিয়া ধরিল।

গঙ্গার জলে একটি ক্ষুদ্র ডিঙা দেখা গিয়াছিল। ডিঙার আরোহী মাত্র একজন; সে দাঁড় টানিয়া শ্মশানের দিকেই আসিতেছে। শিবমিশ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ সংশয়াকুল হইয়া উঠিল।

ডিঙার আরোহী তীরে ডিঙা ভিড়াইয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। শিবমিশ্র চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিলেন।—

'কে তুমি?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি দৌড়িয়া কাছে আসিল এবং শিবমিশ্রের পদতলে পতিত হইল—

'আর্য শিবমিশ্র—'

সে যখন আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, শিবমিশ্র তখন তাহাকে চিনিতে পারিলেন—ভগ্ননাসিক নাগবন্ধু।

'নাগবন্ধু! তুমি?'

নাগবন্ধু বলিল—'প্রভু, অতি কষ্টে নৌকোয় করে শ্মশানে এসেছি। আপনি কি করে বালু-সমাধি থেকে মুক্তি পেলেন জানি না। কিন্তু আর বিলম্ব নয়, চলুন, রাত্রি শেষ হবার আগেই আপনাকে গঙ্গার পারে লিচ্ছবি দেশে পেঁছে দেব।'

শিবমিশ্র বলিলেন—'নাগবন্ধু, তুমি আমার দুর্দিনের বন্ধু। চল, লিচ্ছবি দেশেই যাব—সেখানে রাজা নেই—'

শিবমিশ্র শিশুকে বুকে লইয়া নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। নাগবন্ধু দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল।

* * *

দুইদিন পরের ঘটনা। বৈশালীর মন্ত্রভবনে উচ্চ বেদীর উপর তিনজন বয়স্থ কুলপতি পাশাপাশি বসিয়া আছেন। শিবমিশ্র তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার গণ্ডে এখনও রক্ত শুকাইয়া আছে, ক্রোড়ে বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে শিশু। পশ্চাতে নাগবন্ধু দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনেরই আকৃতি শুষ্ক ক্লান্ত ধূলিধূসর!

শিবমিশ্র শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে বলিতেছেন—

'লিচ্ছবির মহামান্য কুলপতিগণ, আমি মগধ থেকে আসছি। আমার নাম হয়তো আপনাদের অপরিচিত নয়, আমি মগধের ভূতপূর্ব মহাসচিব শিবমিশ্র।'

প্রথম কুলপতি বলিলেন—'শিবমিশ্র! চণ্ডের মহাসচিব শিবমিশ্র!'

শিবমিশ্র বলিলেন—'হাঁ। মহারাজ চণ্ড আমাকে শ্মশানে আকণ্ঠ প্রোথিত করে রেখেছিলেন; তাঁর ইচ্ছা ছিল, রাত্রে শিবাদল এসে আমার দেহ ছিঁড়ে খাবে। মহারাজের অভিলাষ কিন্তু সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়নি (নিজ গণ্ড স্পর্শ করিলেন), দৈববশে আমি রক্ষা পেয়েছি। মগধে আমার স্থান নেই, তাই আমি বৈশালীতে এসেছি—'

দ্বিতীয় কুলপতি বলিলেন—'আর্য শিবমিশ্র, শত্রু হলেও আপনি মহামান্য ব্যক্তি—আমাদের অতিথি। আসন গ্রহণ করুন আর্য।'

শিবমিশ্র বলিলেন—'আগে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন, তবে আসন গ্রহণ করব।'

তৃতীয় কুলপতি বলিলেন—'কী আপনার প্রার্থনা জ্ঞাপন করুন।'

শিবমিশ্র কহিলেন—'আমি যতদিন মগধের মহামন্ত্রী ছিলাম ততদিন বৈশালীর শত্রুতা করেছি—মগধের শত্রু তখন আমার শত্রু ছিল। কিন্তু আজ মগধ আমাকে ত্যাগ করেছে।—কুলপতিগণ, শুনুন, আমি শপথ করছি—চণ্ডকে উচ্ছেদ করব, মগধ থেকে শিশুনাগ বংশের নাম লুপ্ত করব। শিশুনাগ বংশ বিষধর সর্পের বংশ, ও বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখব না—'

দ্বিতীয় কুলপতি সানন্দে বলিলেন—'সাধু সাধু! আমরাও তাই চাই!'

শিবমিশ্র বলিতে লাগিলেন—'আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা, আপনারা গোপনে আমাকে আশ্রয় দিন; আমি যে বৈশালীতে এসেছি বা জীবিত আছি একথা যেন কেউ না জানতে পারে। আজ থেকে আমার নাম শিবমিশ্র নয়—শিবামিশ্র।'

তিনি নিজের গণ্ড স্পর্শ করিলেন। কুলপতি তিনজন পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন।

প্রথম কুলপতি বলিলেন—'আমরা আপনার প্রার্থনা সানন্দে পূর্ণ করব। যদি আর কিছু অভিলাষ থাকে বলুন।'

শিবামিশ্র বলিলেন—'আর কিছু না। শিশুনাগ বংশকে আমি নিজে ধ্বংস করতে চাই, কারুর সাহায্য চাই না। আপনারা শুধু আমাকে একটি পর্ণকুটির দান করুন।'

দ্বিতীয় কুলপতি বলিলেন—'পর্ণকুটির! আপনাকে অট্টালিকায় বাস করতে হবে। শিবামিশ্র মহাশয়, বৈশালী রাজতন্ত্র নয়, প্রজাতন্ত্র; কিন্তু তাই বলে বৈশালীতে গুণীর আদর নেই এ অপবাদ কেউ দিকে পারবে না।'

শিবামিশ্র আশীর্বাদের ভঙ্গিতে এক হাত তুলিলেন—

'ধন্য—আপনারা ধন্য।'

এই সময় বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে শিশু ক্ষীণ শব্দ করিল। কুলপতিরা চমকিয়া চাহিলেন।

প্রথম কুলপতি বলিলেন—'এ কি! শিশুর কান্না!'

শিবামিশ্র বলিলেন—'হাঁ—একটি কন্যা।'

'আপনার কন্যা?'

'এখন আমারই কন্যা। মহাশ্মশানে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছি, মহাশ্মশানের অনির্বাণ চুল্লী থেকে এই অগ্নিকণা তুলে এনেছি—একদিন এই অগ্নিকণা দাবানলের মত শিশুনাগ বংশকে ভস্ম করে দেবে—'

শিবামিশ্র নাগবন্ধুর দিকে ফিরিলেন—

'—নাগবন্ধু, তুমি মগধে ফিরে যাও বৎস। গোপনে গোপনে চণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলো। এক দিনের কাজ নয়, এ সর্পবংশ নির্মূল করতে অনেক দিন লাগবে; ধৈর্য হারিও না। মাঝে মাঝে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। মগধের সঙ্গে তুমিই আমার একমাত্র যোগসূত্র—এস বৎস।'

নাগবন্ধু নতজানু হইয়া শিবামিশ্রের পদস্পর্শ করিল, শিবামিশ্র তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

* * *

অতঃপর দশ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

বৈশালী নগরীর সুরম্য রাজপথ। পথের দুই পাশে উচ্চ অট্টালিকা। পথ দিয়া জনস্রোত চলিয়াছে, দুই-চারিটি রথ ও শিবিকাও যাতায়াত করিতেছে। খর রৌদ্রে চারিদিক উজ্জ্বল।

একজন পাণ্ডা জাতীয় লোক একটি নবাগত বিদেশীকে নগর দেখাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাণ্ডা লোকটি চতুর বাক্‌পটু; বিদেশীর চেহারা বোকাটে ধরনের কিন্তু মুখের ভাব সন্দিগ্ধ। তাহারা বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছে।

নির্দেশক বলিল—'আপনি দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, বৈশালীর মত এমন নগর আর্যাবর্তে আর পাবেন না। মর্তে অমরাবতী—সাক্ষাৎ ইন্দ্রপুরী!'

দর্শক বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—'হুঁ হুঁ, আমাকে আর বোকা বুঝিও না—আমি কাশী কাঞ্চি অবন্তী সব দেখেছি।'

নির্দেশক বলিল—'আরে মশায়, তা তো দেখেছেন। কিন্তু বৈশালীর মত এমন বড় বড় অট্টালিকা দেখেছেন? এখানে দ্বিভূমক সপ্তভূমক অট্টালিকা আছে। আপনার কাশী কাঞ্চিতে আছে?'

দর্শক চক্ষু পাকাইয়া বলিল—'কি বলছ হে তুমি? অবন্তীতে এমন উঁচু অট্টালিকা আছে যে আকাশকে ফুটো করে দিয়েছে—সেই ফুটো দিয়ে অপ্সরাদের দেখা যায়!'

এই সময় পাশের পথ দিয়া একটি চতুরশ্ব রথ সবেগে বাহির হইয়া আসিল। আর একটু হইলে দর্শক মহাশয় চাপা পড়িতেন, কিন্তু নির্দেশক ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে টানিয়া লইল। রথ চলিয়া গেল।

নির্দেশক বলিল—'আরে মশায়, শেষে কি রথ চাপা পড়ে মারা যাবেন?'

দর্শকের দৃষ্টি কিন্তু রথের দিকে—

'কার রথ? রাজার রথ বুঝি!'

নির্দেশক ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—'কতবার বলব মশায়, আমাদের দেশে রাজা নেই। প্রজাতন্ত্র—প্রজাতন্ত্র! বুঝলেন?'

দর্শক ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল—'রাজা নেই—কিন্তু—তাহলে তো রাণীও নেই।'

'না। চলুন ঐ দিকটা দেখবেন—'

'রাজকন্যাও নেই?'

'কি বিপদ! রাজাই নেই তো রাজকন্যে আসবে কোত্থেকে!'

'ভারি অদ্ভুত দেশ।'

নির্দেশক দৃঢ়ভাবে দর্শকের বাহু ধরিয়া একদিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

নগরের অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশ। বাড়িগুলি ছোট ছোট, উদ্যান দিয়া ঘেরা।

দর্শক ও নির্দেশক পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দর্শক চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিল—'এ জায়গাটা মন্দ নয়, বেশ নিরিবিলি। (একটি সুন্দর বাটিকার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া) ওটা কার বাড়ি? রাজার প্রমোদভবন বুঝি!'

নির্দেশক হতাশকণ্ঠে বলিল—'কি বিড়ম্বনা! বললাম না আমাদের রাজা নেই। ওটা শিবামিশ্রের বাড়ি।'

'শিবা মিশ্র! সে আবার কে? রাজার মন্ত্রী বুঝি!'

নির্দেশক ক্লান্তভাবে বলিল—'শিবামিশ্র কে তা জানি না। দশ বছর বৈশালীতে আছেন কিন্তু কেউ তাঁর পরিচয় জানে না।'

দর্শক বলিল—'অদ্ভুত নাম—শিবামিশ্র।'

নির্দেশক গম্ভীরস্বরে বলিল—'তাঁর মুখটা শেয়ালের মত কিনা তাই শিবামিশ্র নাম।'

'শেয়ালের মত মুখ হলেই শিবামিশ্র নাম হবে?'

'কেন হবে না? এদেশের এই নিয়ম।'

'যদি বাঁদরের মত মুখ হয়?'

'তাহলে তার নাম হবে মর্কট মিশ্র।'

'আর যদি চাঁদের মত মুখ হয়?'

নির্দেশক হাসিল—'তাহলে নাম হবে চন্দ্রবদন বর্মা। আমার নাম জানেন?—চন্দ্রবদন বর্মা। আসুন।'

সে দর্শককে টানিয়া লইয়া চলিল।

* * *

শিবামিশ্রের উদ্যান-বাটিকার পিছনের অঙ্গন। অঙ্গনের এক প্রান্তে কাষ্ঠবেদিকার উপর একটি মৃত্তিকার ময়ূর উৎকণ্ঠ হইয়া যেন আকাশের মেঘদর্শন করিতেছে। অঙ্গনের অপর প্রান্তে ময়ূর হইতে অনুমান ত্রিশ হস্ত দূরে উল্কা ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পিছনে শিবামিশ্র। উল্কার বয়স এখন দশ বৎসর; যৌবন এখনও দূরে, কিন্তু বেত্রবৎ ঋজু নমনীয় দেহে অনাগত বসন্তের প্রতিশ্রুতি। শিবামিশ্র এই দশ বৎসরে একটু বৃদ্ধ

হইয়াছেন, তাঁহার গণ্ডে শৃগালক্ষত এখনও মিলায় নাই। ক্ষত সারিয়াছে, দাগ আছে।

উল্কা ধনুকে বাণ সংযোগ করিয়া মৃৎময়ূরের দিকে লক্ষ্য স্থির করিল। তারপর বাণ মোচন করিল। বাণ গিয়া ময়ূরের কাষ্ঠবেদিকায় বিদ্ধ হইল।

উল্কা লজ্জিত হইয়া পিছনে শিবামিশ্রের পানে চাহিল। শিবামিশ্র তাহার পিছনে আসিয়া দুই স্কন্ধে হাত রাখিলেন। বলিলেন—

'কন্যা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। এ সংসারে যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় সে কোনও সিদ্ধিই লাভ করতে পারে না। (উল্কা নতমুখী হইল)—নাও, আবার তীর নাও, মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির কর—'

উল্কা আবার ধনুকে তীর পরাইয়া ধনুক তুলিল এবং নির্নিমেষ চক্ষে মৃন্ময়ূরের পানে চাহিয়া রহিল।

শিবামিশ্র বলিলেন—'হাঁ—একদৃষ্টে চেয়ে থাকো। কী দেখতে পাচ্ছ?'

উল্কা বলিল—'পাখি।'

শিবামিশ্র বলিলেন—'আরও একাগ্র মনে লক্ষ্য কর।—এবার কী দেখছ?'

উল্কা বলিল—'পাখির মাথা।'

শিবামিশ্র বলিলেন—'বেশ। আরও দৃষ্টি স্থির কর। যখন কেবল পাখির চক্ষু দেখতে পাবে—'

উল্কার ধনু হইতে তীর নির্গত হইয়া ময়ূরের দেহে বিদ্ধ হইল। উল্কা ক্রুদ্ধ আক্ষেপে ধনু ফেলিয়া দিল। শিবামিশ্র সস্নেহে তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। বলিলেন—

'উল্কা—ছি, ধৈর্য হারাতে নেই। ধনুর্বিদ্যা এক দিনে আয়ত্ত হয় না। ক্রমে শিখবে।'

উল্কার শিক্ষা চলিতেছে। শিবামিশ্রের গৃহে একটি কক্ষ। দশমবর্ষীয়া উল্কা যন্ত্র-বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। তাহার দুই সখী বাসবী ও বীরসেনা মৃদঙ্গ ও মঞ্জীরা বাজাইতেছে। কক্ষের এক কোণে বেদীর উপর বসিয়া শিবামিশ্র বিচারকের দৃষ্টিতে নৃত্য দেখিতেছেন। উল্কা নৃত্যের সঙ্গে গাহিতেছে—

শঙ্কর শশাঙ্কমৌলি
শিব সুন্দর হর শম্ভু দিগম্বর
করধৃত ডম্বর জয়জয় শশাঙ্কমৌলি।
  শিরে সুর-শৈবলিনী
  নৃত্য-উছল জলভঙ্গ—
  টলমল তরল-তরঙ্গ—
  —জয় জয় শশাঙ্কমৌলি।

নৃত্যগীত শেষ হইলে উল্কা শিবামিশ্রের পায়ের কাছে গিয়া বসিল।

বলিল—'পিতা, আজ আমাদের নৃত্যগীত আপনার ভাল লেগেছে?'

শিবামিশ্র সস্নেহে বলিলেন—'হাঁ বৎসে, ভাল লেগেছে। এখন যাও, তোমার সখীদের সঙ্গে খেলা কর গিয়ে।'

উল্কা সখীদের লইয়া প্রস্থান করিল। শিবামিশ্র উঠিয়া চিন্তান্বিত মুখে গণ্ডের ক্ষতচিহ্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে গবাক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে গবাক্ষপথে দেখা গেল, একটি লোক তোরণপথে প্রবেশ করিতেছে।

শিবামিশ্র প্রসন্নমুখে বলিলেন—'নাগবন্ধু! এস বৎস—'

নাগবন্ধু কক্ষে প্রবেশ করিয়া শিবামিশ্রের পদস্পর্শ করিল।

শিবামিশ্র বলিলেন—'জয়োস্তু। অনেকদূর পথ এসেছ, আসন গ্রহণ কর। পাটলিপুত্রের

সংবাদ কি?'

নাগবন্ধু মাটিতে বসিল, শিবামিশ্রও সম্মুখে বসিলেন।

নাগবন্ধু বলিল—'প্রভু, চণ্ডের অত্যাচার আর তো সহ্য হয় না—প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।'

'ভাল ভাল।—তারপর?'

'চণ্ডের যথেচ্ছাচারের কোনও বল্‌গা নেই, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে সকলের উপর উৎপীড়ন করছে। উচ্চ-নীচ নেই, ধনী-নির্ধন নেই—'

'ভাল ভাল।'

'প্রভু, এবার এর প্রতিকার করুন। অসহায় প্রজাপুঞ্জের শক্তি নেই, তারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করছে। তাদের দুর্গতি চরমে উঠেছে—'

'না নাগবন্ধু, এখনও চরমে ওঠেনি। প্রজাপুঞ্জের দুর্গতি যেদিন চরমে উঠবে, সেদিন কাউকে কিছু করতে হবে না, তাদের সম্মিলিত ক্রোধ একসঙ্গে জ্বলে উঠে চণ্ডকে দগ্ধ করে ফেলবে। আমি সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করছি।'

'কিন্তু—যতদিন তা না হয় ততদিন আমরা কী করব?'

'সমিধ সংগ্রহ কর, সমিধ সংগ্রহ কর, প্রজাপুঞ্জের মনে যে বিদ্বেষ ধোঁয়াচ্ছে তাকে নিভতে দিও না। আর বেশি দিন নয়, চণ্ডের সময় ঘনিয়ে এসেছে। শিশুনাগ বংশের চিরনির্বাণ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—'

তাঁহার নির্নিমেষ দূরদর্শী চক্ষু ভবিষ্যের পানে চাহিয়া রহিল।

* ২ * *

পাটলিপুত্রে চণ্ডের রাজসভা। চণ্ড সিংহাসনে আসীন। এই দশ বৎসরে চণ্ডের আকৃতি আরও বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে; সুরার প্রভাবে দুই চক্ষু কষায়বর্ণ, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। দুইজন কিংকরী সিংহাসনের দুই পাশে দাঁড়াইয়া চণ্ডকে আসব যোগাইতেছে।

সভায় সভাসদের সংখ্যা অল্প। পূর্বতন সভাসদ কেহই নাই, গ্রহাচার্যও অন্তর্হিত হইয়াছেন, বটুক ভট্টেরও দেখা নাই। যে কয়জন নবীন সভাসদ আছে তাহারা নিবিষ্ট মনে বসিয়া সুরাপান করিতেছে।

বাহিরে শৃঙ্খল-ঝনৎকার শুনা গেল। দুইজন যমদূতাকৃতি রক্ষী একটি শৃঙ্খলিত যুবককে মধ্যে লইয়া প্রবেশ করিল এবং চণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবকের নাম সেনজিৎ, বয়স অনুমান কুড়ি বৎসর। তাঁহার আকৃতি সুশ্রী, দৃষ্টি নির্ভীক।

সেনজিৎ বলিলেন—'মহারাজের জয় হোক!'

চণ্ড কিছুক্ষণ গরল-ভরা চোখে সেনজিতের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন —'সেনজিৎ!'

সেনজিৎ বলিলেন—'আজ্ঞা করুন আর্য। রক্ষীরা বিনা অপরাধে আমাকে ধরে এনেছে।'

চণ্ড বলিলেন—'আমার আজ্ঞায় ওরা তোমাকে ধরে এনেছে।—সেনজিৎ, তুমি শিশুনাগ বংশের সন্তান। শুনেছি তুমি পাটলিপুত্রের অধম নাগরিকদের সঙ্গে মেলামেশা কর—এ কথা সত্য?'

সেনজিৎ বলিলেন—'সত্য মহারাজ। পাটলিপুত্রের নাগরিকরা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি—'

চণ্ডের দৃষ্টি আরও বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

চণ্ড বলিলেন—'বটে! এই অপরাধেই তোমাকে শূলে দিতে পারি। তুমি রাজা হতে চাও, পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসতে চাও—তাই প্রজাদের মনোরঞ্জন করছ!'

সেনজিৎ স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন— 'মহারাজ! আমি স্বপ্নেও

সিংহাসনে বসবার দুরভিসন্ধি করিনি। প্রজারা আমাকে ভালবাসে—'

চণ্ড গর্জন করিলেন—'তোমাকে শূলে দেব। যাও—নিয়ে যাও।'

রক্ষীরা সেনজিৎকে টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে সেনজিৎ দৃঢ় শান্ত স্বরে বলিলেন—

'মহারাজ, আপনি আমার রাজা, আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমাকে যদি হত্যা করতে চান স্বহস্তে হত্যা করুন—আমি শিশুনাগ বংশের সন্তান। চণ্ডালের হাতে আমার লাঞ্ছনা করবেন না।'

চণ্ড টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কটি হইতে শাণিত খর্ব কৃপাণ বাহির হইয়া আসিল। সেনজিৎ নিজ বক্ষের বস্ত্রাবরণ মোচন করিয়া দিলেন।

অস্ত্র উদ্যত করিয়া চণ্ড থামিয়া গেলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বিকৃত স্খলিত হাস্য নির্গত হইল। বলিলেন—

'তোমাকে হত্যা করব না—তুমি শিশুনাগ বংশের শেষ পুরুষ।—কিন্তু পাটলিপুত্রে আর তোমার স্থান নেই, তোমাকে নির্বাসন দিলাম। যাও, নিজ দুর্গে বাস কর গিয়ে। যদি কখনও পাটলিপুত্রে পদার্পণ কর—তোমার শূলদণ্ড হবে।'

সেনজিতের অঙ্গ হইতে শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল।

সেনজিৎ যুক্তকরে বলিলেন—

'ধন্য মহারাজ।'

বিগত ঘটনার পর আরও ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে।

বৈশালীতে শিবামিশ্রের গৃহে একটি বাতায়নের সম্মুখে শিবামিশ্র ও নাগবন্ধু দাঁড়াইয়া আছেন। শিবামিশ্রের ভ্রূযুগল পলিত হইয়াছে। তিনি নাগবন্ধুর বার্তা শুনিয়া অর্ধ-স্বগত কণ্ঠে বলিতেছেন—

'ভাল ভাল—আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফল এবার ফলবে। চণ্ড চণ্ড—! আমি ভুলিনি (গণ্ডে অঙ্গুলি বুলাইলেন)—যেদিন তোমার ছিন্ন মুণ্ড মাটিতে ফেলে ক্ষিপ্ত প্রজারা পদাঘাত করবে, তোমার রক্ত কুক্কুরে লেহন করবে—সেদিন আমার হৃদয় শীতল হবে—'

নাগবন্ধু উদ্দীপ্তস্বরে বলিল—'সেদিন আসতে দেরি নেই—প্রজারা মনে মনে আগুন হয়ে উঠেছে, একটা সূত্র পেলেই ফেটে পড়বে।'

শিবামিশ্র বলিলেন—'সেই সূত্র শীঘ্রই পাবে। সামান্য কারণ থেকে বৃহৎ কার্যের উৎপত্তি হয়, একটি ক্ষুদ্র দীপশিখা সুযোগ এবং অবকাশ পেলে একটা নগর ভস্মীভূত করতে পারে। জনগণ সামান্য নয়, তাদের ক্রোধ ক্ষুদ্র নয়—চণ্ড তা বুঝবে।'

'হাঁ প্রভু।'

'কিন্তু শুধু চণ্ড নয়, অভিশপ্ত শিশুনাগ বংশের সকলকেই এই বিদ্রোহের আগুনে আহুতি দিতে হবে। এ কথা যেন মনে থাকে, মগধেও বৈশালীর মত প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে।'

'হাঁ প্রভু।'

এই সময় বাহিরে দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনা গেল। উভয়ে চকিতে গবাক্ষের বাহিরে চাহিলেন।

শ্বেতবর্ণ অশ্বের পৃষ্ঠে উল্কা আসিতেছে। অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শী; অঙ্গে পুরুষের বেশ, হস্তে ধনুর্বাণ। বল্‌গা-মুক্ত অশ্ব নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

অঙ্গনের প্রান্তে মৃন্ময়ূর এখনও উৎকণ্ঠ হইয়া আছে। ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠ হইতে উল্কা ময়ূর লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। তীর ময়ূরের চক্ষু বিদ্ধ করিল।

উল্কা বিজয়োৎফুল্লমুখে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তারপর অশ্বের বেগ সংযত করিয়া বাতায়নতলে আসিয়া দাঁড়াইল। শিবামিশ্র স্নেহস্মিত মুখে বলিলেন—

'ধন্য!'

উল্কা বলিল—'পিতা! দেখলেন?'

শিবামিশ্র কহিলেন—'দেখেছি বৎসে। আজ তোমার ধনুর্বিদ্যা সার্থক হল।'

উল্কা মহানন্দে ধনুক শূন্যে লুফিতে লুফিতে ঘোড়া ছুটাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

নাগবন্ধু স্মরণ-মন্থর কণ্ঠে বলিল—'সেই উল্কা—শ্মশান-কন্যা—গুরুদেব, উল্কা যে আপনার কন্যা নয় তা সে জানে?'

শিবামিশ্র এতক্ষণ স্মিতমুখে বাহিরে চাহিয়া ছিলেন, গম্ভীরমুখে নাগবন্ধুর দিকে ফিরিলেন। বলিলেন—

'না, বলিনি। মহাকাল করুন যেন বলবার প্রয়োজন না হয়।'

শিবামিশ্রের চোখের দৃষ্টি আবার কঠিন হইয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে তিনি বলিলেন—

'নাগবন্ধু, তুমি পাটলিপুত্রে ফিরে যাও—সুযোগের প্রতীক্ষা করবে; সুযোগ যত ক্ষুদ্রই হোক তাকে অবহেলা করবে না। জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। জনতা যখন একবার ক্ষেপে উঠবে তখন আর তোমাদের কিছু করতে হবে না, জনতা নিজের কাজ নিজেই করবে।—জয়ী হও বৎস, এবার যখন আসবে তোমার মুখে যেন চণ্ডের মৃত্যু-সংবাদ পাই—স্বস্তি!'

নতজানু নাগবন্ধুর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া শিবামিশ্র আশীর্বাদ করিলেন।

পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে রাজকীয় মৃগয়া-কানন। কাননে নানা জাতীয় বৃক্ষ—আম্র কণ্টকী জম্বু; নানা জাতীয় পশু পক্ষী—হরিণ, ময়ূর, শশক। কাননের স্থানে স্থানে কৃত্রিম জলাশয়; তাহাতে সারস মরাল ক্রীড়া করিতেছে। দ্বিপ্রহরে স্থানটি নির্জন।

মৃগয়া-কাননের ভিতর দিয়া সেনজিৎ অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছেন। অশ্বের গতি অত্বরিত। সেনজিৎ ইতস্তত বৃক্ষশাখায় দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাঁহার চক্ষু পক্ষীসন্ধানী। আশেপাশে নিশ্চিন্ত হরিণের দল বিচরণ করিতেছে কিন্তু সেদিকে তাঁহার আগ্রহ নাই। তিনি পক্ষী-প্রেমিক।

লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা সেনজিতের দৃষ্টি পড়িল এক বৃক্ষশাখায় একটি পাখির বাসার উপর। বাসার কিনারায় দুইটি অর্ধোদ্গতপক্ষ শাবক বসিয়া আছে। সেনজিৎ মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, বল্গার আকর্ষণে অশ্ব স্থগিত হইল। নূতন পাখি, সেনজিৎ পূর্বে কখনও দেখেন নাই।

পাখির বাসার উপর কুতূহলী চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া সেনজিৎ অশ্ব হইতে নিঃশব্দে নামিয়া পড়িলেন। অশ্ব নিশ্চিন্তভাবে শষ্পাহরণ করিতে করিতে একদিকে চলিয়া গেল। সেনজিৎ পা টিপিয়া টিপিয়া বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মৃগয়া-কাননের প্রধান রক্ষী কুম্ভ দূর হইতে সেনজিৎকে দেখিতে পাইয়াছিল। কুম্ভ কৃষ্ণকায় অনার্য; আকৃতি যেমন ভয়ংকর, প্রকৃতি তেমনি রূঢ়। তাহার মাথায় কংকপত্রের চূড়া। হাতে দীর্ঘ ভল্ল, কটি হইতে শৃংগ ঝুলিতেছে। সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেনজিতের দিকে অগ্রসর হইল।

সেনজিৎ অতি সন্তর্পণে গাছে উঠিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় পিছনে কুম্ভের কটু কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন—

'দাঁড়াও!—কে তুমি?'

সেনজিৎ চকিতে ফিরিয়া ওষ্ঠে অংগুলি রাখিলেন—

'চুপ—শব্দ কোরো না। পাখির বাসায় ছানা আছে, এখনি উড়ে যাবে।'

কুম্ভ কাছে আসিয়া ধৃষ্টতা-ভরা চক্ষে সেনজিৎকে পরিদর্শন করিল, রূঢ় স্বরে বলিল—

'কে হে তুমি? এটা রাজার মৃগয়া-কানন তা জান না!'

সেনজিৎ পাখির বাসার দিকে চোখ তুলিয়া দেখিলেন পাখির ছানাদুটি ভয় পাইয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন হইল। কুম্ভের দিকে চোখ নামাইয়া তিনি বলিলেন—

'মৃগয়া-কানন তা জানি। তুমি কে?'

কুম্ভ সদম্ভে বলিল—'আমি কুম্ভ—এই কাননের প্রধান রক্ষী। তুমি কার হুকুমে রাজার মৃগয়া-কাননে পাখি ধরে বেড়াচ্ছ? রাজার অনুমতিপত্র আছে?'

সেনজিৎ বিরক্ত স্বরে কহিলেন—'অনুমতিপত্র আমার দরকার নেই।'

কুম্ভ ব্যঙ্গভরে বলিল—'বটে! তুমি কি রাজবংশের ছেলে নাকি!'

সেনজিৎ বলিলেন—'হাঁ।'

তিনি গমনোদ্যত হইয়া কুম্ভের দিকে পিছন ফিরিলেন; অমনি কুম্ভ হাত বাড়াইয়া তাঁহার স্কন্ধ ধরিল—

'রাজবংশের ছেলে! আমার সঙ্গে বাক্‌চাতুরী! তোমার নাম কি?'

সেনজিৎ সবলে নিজ স্কন্ধ হইতে কুম্ভের হাত সরাইয়া দিলেন। বলিলেন—'আমার নাম সেনজিৎ।'

কুম্ভের চোখে উত্তেজনা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে ক্ষণেক সেনজিৎকে সবিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করিয়া সহসা কটি হইতে শৃঙ্গ তুলিয়া তাহাতে ফুৎকার দিল। শিঙার শব্দ কাননের চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলিল। তারপর কুম্ভ শিঙা নামাইয়া দন্তবিকাশ করিল—

'তুমি সেনজিৎ! মহারাজ চণ্ড তোমাকে পাটলিপুত্র থেকে নির্বাসিত করেছিলেন—তুমি সেই!'

শৃঙ্গ-নিনাদে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন দিক হইতে কয়েকজন রক্ষী ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহাদেরও হাতে ভল্ল, বেশবাস কুম্ভেরই মতন। সেনজিৎ বিপদ বুঝিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—

'হাঁ, আমি সেই সেনজিৎ। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?'

অন্য রক্ষীরা আসিয়া সেনজিৎকে ঘিরিয়া ধরিল। কুম্ভ সেনজিতের মুখের উপর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—

'তুমি রাজার আদেশ অমান্য করেছ—এখন রাজসভায় চল। ভাই সব, একে রাজার কাছে নিয়ে চল।'

রক্ষীরা সেনজিৎকে ধরিল। সেনজিৎ তাহাদের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন—

'কিন্তু আমি তো পাটলিপুত্র নগরে প্রবেশ করিনি—'

কুম্ভ দন্তবিকাশ করিয়া বলিল—'সে কথা রাজাকে বোলো—'

রক্ষীরা সেনজিৎকে টানিয়া লইয়া চলিল।

পাটলিপুত্রের একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ। কুম্ভ এবং অন্যান্য উদ্যানরক্ষীরা সেনজিতের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

হঠাৎ পাশের একটি রাস্তা দিয়া নাগবন্ধু প্রবেশ করিল এবং এই দৃশ্য দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার চোখে চকিত চিন্তার ছায়া পড়িল—এই সুযোগ! সে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

'সেনজিৎ! সেনজিৎকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!'

সেনজিৎ ঘাড় ফিরাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

'আমি নির্দোষ। আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—'

কুম্ভ ধমক দিয়া বলিল—'চুপ—কথা কোয়ো না!'

তাহারা নাগবন্ধুকে ছাড়াইয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আরও দুই-চারিজন পথচারী আসিয়া জুটিল। নাগবন্ধু দুই হস্ত আস্ফালিত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—

'ভাই সব—শীঘ্র এস! দ্যাখো, আমাদের প্রিয় সেনজিৎকে রাজার রক্ষীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে—'

আরও লোক আশপাশের গলি হইতে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে প্রবেশ করিল; তাহাদের হাতে লাঠি।

জনগণ ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন করিল—'কী হয়েছে! কী হয়েছে?'

নাগবন্ধু বাহু প্রসারিত করিয়া দেখাইল—

'ঐ দ্যাখো—আমাদের প্রিয় বন্ধু সেনজিৎকে রাজরক্ষীরা বিনা দোষে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে—'

অপেক্ষাকৃত জনবহুল পথ। রক্ষীরা সেনজিৎকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, কিন্তু রক্ষীদের মুখে আশঙ্কার ছায়া। বিক্ষুব্ধ জনতা তাহাদের পশ্চাতে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে নাগবন্ধুর উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে—

'সেনজিৎ আমাদের বন্ধু—পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা সেনজিৎকে ভালোবাসে—রাজার জল্লাদেরা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! আর কতদিন আমরা চণ্ডের অত্যাচার সহ্য করব? আর কতদিন একটা রক্তপিপাসু রাক্ষস আমাদের রক্ত শোষণ করবে? মগধবাসি ওঠো! জাগো!'...

রাজপুরীর তোরণ-দ্বার। কয়েকজন সশস্ত্র প্রতীহার তোরণ-দ্বারের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের চোখে-মুখে উদ্বিগ্ন সতর্কতা। দূর হইতে অগ্রসর জনতার গর্জন ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে।

প্রতীহারদের মধ্যে নিম্নস্বরে কথাবার্তা হইল; তারপর তাহারা তোরণ-দ্বার অরক্ষিত রাখিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। বোধহয় রাজসভায় সংবাদ দিতে গেল।

বিপুল জনতা তোরণ-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের মাঝখানে সেনজিৎ। রক্ষীরা পলাইয়াছে। জনতা সেনজিতের হস্তের রজ্জু খুলিয়া বিরাট জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল। সেনজিৎ দুই হাত তুলিয়া জনগণকে শান্ত হইতে বলিলেন। কোলাহল ঈষৎ শান্ত হইলে নাগবন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—

'মগধবাসি! রাজপ্রাসাদের দ্বার থেকে ফিরে যেও না—চণ্ড তোমাদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তার প্রতিশোধ নাও—মারো কাটো—রক্তের স্রোত বইয়ে দাও—'

বিক্ষুব্ধ জনসংঘ একবার দুলিয়া উঠিল, তারপর বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মত তোরণপথে প্রবেশ করিল।

রাজসভার অভ্যন্তর। চণ্ড সিংহাসনে বসিয়া দুলিতেছেন, দুইটি কিংকরী পিছনে দাঁড়াইয়া সিংহাসনে দোল দিতেছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে চণ্ডের মুখাকৃতি আরও কদাকার হইয়াছে। অদূরে ভূমিতে বসিয়া বটুক ভট্ট নিবিষ্ট মনে একাকী অক্ষক্রীড়া করিতেছেন।

সভায় সভাসদ বেশি নাই, যে কয়জন আছে তাহারা তদ্গতচিত্তে মদ্যপান করিতেছে। প্রত্যেকের পাশে একটি ভৃঙ্গার-হস্তা তরুণী দাসী দাঁড়াইয়া।

বাহির হইতে জনতার কল-কোলাহল ক্রমে বর্ধিত হইতেছে শুনিয়া চণ্ড ভ্রূভঙ্গ করিয়া আরক্ত চক্ষু মেলিলেন। এই সময় প্রতীহারগণ দ্রুত প্রবেশ করিল। ভয়ার্তস্বরে চীৎকার করিল—

'পালাও পালাও—পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা ক্ষেপে গেছে—তারা রাজপুরী আক্রমণ করেছে—পালাও—'

কিঙ্করীগণ চীৎকার করিয়া যে যেদিকে পারিল পালাইল। সভাসদেরাও ক্ষণেক হতভম্ব থাকিয়া সহসা কিঙ্করীদের অনুসরণ করিলেন। বটুক ভট্ট লাফ দিয়া সিংহাসনের শৃঙ্খল ধরিয়া ঊর্ধ্বে অন্তর্হিত হইলেন। সভায় চণ্ড ভিন্ন আর কেহ রহিল না।

চণ্ড টলিতে টলিতে সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'আমার খড়্গ—খড়্গ কোথায়!'

এই সময় সভার বিভিন্ন দ্বার দিয়া ক্ষিপ্ত জনতা প্রবেশ করিল; চণ্ডকে নিরস্ত্র দেখিয়া তরক্ষুপালের মত তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। চণ্ড বন্য মহিষের মত যুদ্ধ করিলেন। বটুক ভট্ট ঊর্ধ্বে ঝুলিতে ঝুলিতে ব্যায়তচক্ষে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

রক্ত-পাগল জনতা কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে। চণ্ডকে মাটিতে ফেলিয়া কয়েকজন লোক তাঁহার হস্তপদ মাটির উপর চাপিয়া ধরিয়াছে। তাঁহার চারিদিকে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া জনগণ বুভুক্ষু-চক্ষে চাহিয়া আছে। চণ্ড বন্দী হইয়াছেন বটে, কিন্তু অসহায় অবস্থাতেও তাঁহার প্রকৃতির দুর্দম বন্যতা কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। তিনি মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া হস্তপদ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

নাগবন্ধু দর্শকচক্রের সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া ছিল, সহসা সে চণ্ডের বুকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া ছুরিকা ঊর্ধ্বে তুলিল। ছুরিকা চণ্ডের বক্ষে প্রবেশ করিত—যদি না এক বিপুলকায় ব্যক্তি নাগবন্ধুর মণিবন্ধ ধরিয়া ফেলিত।

বিপুলকায় ব্যক্তি বলিল—'ও কি করছ নাগবন্ধু!'

নাগবন্ধু উন্মত্তের ন্যায় বলিল—'ছেড়ে দাও মল্লজিৎ—আমি প্রতিশোধ চাই। আমার শিশুপুত্রকে রথের চাকার তলায় পিষে মেরেছিল—তার প্রতিশোধ চাই—'

মল্লজিৎ বলিল—'স্থির হও নাগবন্ধু। আমাদের সকলের কাছেই চণ্ড ঋণী, তাকে হত্যা করলে সে-ঋণ শোধ হবে না। মৃত্যু তো মুক্তি। চণ্ডকে আমরা এত সহজে মুক্তি দেব না, তিল তিল করে কড়ায় গণ্ডায় তার অত্যাচারের ঋণ আদায় করে নেব। আমরা চণ্ডকে এমন শাস্তি দেব—! কিন্তু ভেবেচিন্তে সে-শাস্তি ঠিক করতে হবে—এখন নয়। ভাই সব, তোমরা চণ্ডকে বাইরে নিয়ে গিয়ে গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো—'

যাহারা চণ্ডের হস্ত-পদ চাপিয়া বসিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে টানিয়া তুলিল এবং টানিতে টানিতে সভার বাহিরে লইয়া গেল। অধিকাংশ জনতাও কলকোলাহল করিতে করিতে সঙ্গে গেল।

সভার মধ্যে সেনজিৎ নাগবন্ধু মল্লজিৎ ও চার-পাঁচ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ নাই। সেনজিৎ সভাগৃহের একপাশে বিমর্ষভাবে করলগ্নকপোলে বসিয়া আছেন, অন্য সকলে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া মন্ত্রণা করিতেছে। মন্ত্রণাকারীদের মধ্যে মল্লজিৎ অগ্রণী। বটুক ভট্ট অলক্ষিতে মন্ত্রণাকারীদের মাথার উপর ঝুলিতেছেন।

মল্লজিৎ বলিল—'বিপ্লবের কাজ শেষ হয়েছে, এখন আবার গড়ে তুলতে হবে। আবার আমাদের নতুন রাজা চাই—'

নাগবন্ধু বলিল—'রাজার কী দরকার? বৈশালীর মত প্রজাতন্ত্র—'

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে নাগবন্ধুর পানে চাহিল।

একজন বিস্মিত প্রশ্ন করিল—'প্রজাতন্ত্র আবার কি?'

মল্লজিৎ বলিল—'প্রজাতন্ত্র কাকে বলে আমরা জানি না। আমরা জানি যে-রাজ্যে রাজা নেই, সে-রাজ্য অরাজক। অতএব আমাদের রাজা চাই। এখন প্রশ্ন এই—কে রাজা হবে! কাকে আমরা রাজা করব। রাজা হবার যোগ্যতা কার আছে।'

সকলের দৃষ্টি ধীরে ধীরে সেনজিতের দিকে ফিরিল। সেনজিৎ এই মিলিত দৃষ্টির আঘাতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। চকিতস্বরে বলিলেন—

'কী! আমার দিকে চাইছ কেন? আমি রাজা হতে চাই না। না না, তোমরা আর কাউকে—'

মল্লজিৎ হাত তুলিয়া সেনজিৎকে নিরস্ত করিল। ধীরকণ্ঠে বলিল—

'সেনজিৎকে রাজ্যের সকলে ভালবাসে—সেনজিৎ শান্ত প্রকৃতির নিরভিমান হৃদয়বান পুরুষ। আমার অভিমত সেনজিৎ রাজা হোন—'

নাগবন্ধু বলিল—'কিন্তু শিশুনাগ বংশেরই আর একজনকে—'

মল্লজিৎ বলিল—'শিশুনাগ বংশের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই।'

অন্য এক নাগরিক বলিল—'আমাদেরও নেই। চণ্ডই আমাদের শত্রু ছিল।'

সেনজিৎ বিষণ্ণভাবে বলিলেন—'কিন্তু—কিন্তু—সিংহাসনে আমার রুচি নেই। বন্ধুগণ, আমি এ সম্মানের যোগ্য নই—'

মল্লজিৎ বলিল—'সে-কথা জনসাধারণ বিচার করুক।'

সেনজিতের হাত ধরিয়া মল্লজিৎ সভাগৃহের এক প্রান্তে একটি মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাতায়নের বাহিরে পুরভূমির উপর বিক্ষুব্ধ জনমর্দ আবর্তিত হইতেছে, বাতায়নে মল্লজিতের সহিত সেনজিৎকে দেখিয়া তাহারা সোল্লাসে গর্জন করিয়া উঠিল। মল্লজিৎ হাত তুলিয়া তূর্যকণ্ঠে তাহাদের সম্বোধন করিল—

'মগধবাসী জনগণ, আমরা আমাদের প্রিয়বন্ধু সেনজিৎকে চণ্ডের পরিবর্তে সিংহাসনে বসাতে চাই—তোমাদের অভিমত আছে কিনা জানাও।'

জনমর্দ হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। সেই সঙ্গে শঙ্খ ও শৃঙ্গনিনাদ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দিল। সেনজিতের মুখে কিন্তু হাসি নাই। নাগবন্ধুর ললাটও মেঘাচ্ছন্ন।

সেনজিৎকে লইয়া মল্লজিৎ ও অন্য সকলে সভার মধ্যস্থলে গেল এবং সেনজিৎকে সিংহাসনে বসাইল।

'মুকুট—রাজমুকুট কোথায়?'

সকলে ইতস্তত রাজমুকুট খুঁজিতে লাগিল। একজন সিংহাসনের পিছনে চণ্ডের শিরশ্চ্যুত মুকুট দেখিতে পাইল। 'এই যে' বলিয়া সে মুকুট কুড়াইয়া লইয়া সেনজিতের মাথায় পরাইয়া দিল।

এই সময় বটুক ভট্ট শৃঙ্খল-যোগে ঊর্ধ্বলোক হইতে নামিয়া আসিলেন। দুই হাত তুলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

'জয়োস্তু মহারাজ!'

বৈশালীর মন্ত্রভবনে একটি কক্ষে তিনজন কুলপতি বেদীর উপর বসিয়া আছেন, তাঁহাদের বয়স আরও বাড়িয়াছে। তাঁহাদের সম্মুখে পৃথক আসনে শিবামিশ্র হেঁটমুখে বসিয়া আছেন। প্রধান কুলপতি সহানুভূতিপূর্ণস্বরে বলিতেছেন—

'আপনার এত দীর্ঘ সাধনা, এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা—সবই ব্যর্থ হল। আবার শিশুনাগ বংশেরই একজন মগধের সিংহাসনে বসেছে।'

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া শিবামিশ্র মুখ তুলিলেন।

'হাঁ, মগধের প্রজাপুঞ্জ আবার শিশুনাগ বংশের একজনকে সিংহাসনে বসিয়েছে। কিন্তু আমার সাধনা এখনও ব্যর্থ হয়নি। এখনও আমার হাতে একটি অস্ত্র আছে—একটি অমোঘ অস্ত্র আছে। ভেবেছিলাম এ অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে না—কিন্তু আর উপায় নেই।'

দ্বিতীয় কুলপতি প্রশ্ন করিলেন—'কী অস্ত্র—কোন্ অস্ত্রের কথা বলছেন?'

শিবামিশ্র বলিলেন—'মহামান্য কুলপতিগণ, এতদিন আমি আপনাদের কাছে কোনও সাহায্য চাইনি, মনে করেছিলাম আমি একাই শিশুনাগ বংশ নির্মূল করতে পারব। কিন্তু এখন আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা—'

প্রধান কুলপতি বলিলেন—'কি প্রার্থনা বলুন। আমরা তো সর্বদাই সর্বভাবে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

শিবামিশ্র বলিলেন—'ধন্য! (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) মগধের সঙ্গে লিচ্ছবির ভিতরে ভিতরে শত্রুতা থাকলেও প্রকাশ্যে মৈত্রীভাবই আছে—'

কুলপতিগণ সকলেই মৃদু হাস্য করিলেন।

তৃতীয় কুলপতি বলিলেন—'তা আছে।'

শিবামিশ্র বলিলেন—'কিন্তু দীর্ঘকাল লিচ্ছবির কোনও রাষ্ট্রপ্রতিনিধি মগধের রাজসভায় উপস্থিত নেই।'

প্রধান কুলপতি কহিলেন—'না। মগধও আমাদের সভায় প্রতিনিধি পাঠায়নি, আমরাও পাঠাইনি।'

'মগধে এখন নূতন রাজা, সুতরাং প্রতিনিধি পাঠালেও দোষের হবে না। আপনারা প্রতিনিধি পাঠান, শুধু আমার প্রার্থনা, আমি যাকে নির্বাচন করব তাকেই প্রতিনিধি পাঠাবেন।'

কুলপতিগণ পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া সম্মতিসূচক শিরঃসঞ্চালন করিলেন—

'আপত্তি কি? এতেই যদি আপনার কার্যসিদ্ধি হয়—'

শিবামিশ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন—

'আপনারা ধন্য।'

শিবামিশ্রের বাটি-সংলগ্ন ক্রীড়াভূমি। পুরুষবেশা উল্কা একজন বয়স্ক অসি-শিক্ষকের সহিত অসিক্রীড়া করিতেছে। দুজনের হাতে ঋজু অসি, দেহে লৌহজালিক। অসির সহিত অসির সংঘাতে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠিতেছে, অসিফলকে আলো ঝলকিয়া উঠিতেছে। উল্কার অধরেও মাঝে মাঝে হাসির ঝলক খেলিয়া যাইতেছে।

অসি-ক্রীড়া চলিতেছে এমন সময় শিবামিশ্র ক্রীড়াভূমির প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বক্ষ বাহুবদ্ধ, চোখে একাগ্র কঠোর দৃষ্টি। তিনি নীরবে অসিক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে উল্কা শিক্ষককে অসিযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ভূতলশায়ী করিল, তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিল। গুরু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। নতজানু উল্কার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—

'বিজয়িনি! তোমাকে আর আমার কিছু শেখাবার নেই।'

শিবামিশ্র উল্কার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন—

'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী।'

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিবামিশ্রের দিকে ফিরিয়া হাসিল, শিবামিশ্র কিন্তু হাসিলেন না, গম্ভীরভাবে উল্কাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—

'উল্কা, তোমার শিক্ষা শেষ হয়েছে—যাও, স্নান কর গিয়ে। স্নান করে আমার ঘরে যেও—তোমাকে কিছু কথা বলবার আছে।'

উল্কা ঈষৎ বিচলিত হইল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন না করিয়া প্রস্থান করিল।

'যে আজ্ঞা পিতা।'

একটি প্রসাধন কক্ষ। উল্কা স্নান সারিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়াছে, সিক্ত কেশ পৃষ্ঠে লম্বিত। সে একটি ধাতু-নির্মিত দর্পণ বাঁ হাতে ধরিয়া সযত্নে ভ্রূ মধ্যে সিন্দুরের টিপ পরিল।

শিবামিশ্র নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন; তাঁহার মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর।

উল্কা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। শিবামিশ্রকে আত্মস্থ দেখিয়া সে সঙ্কুচিতভাবে বেদীর পাশে আসিয়া বসিল। শিবামিশ্র চিন্তা-জড়িমা হইতে জাগিয়া উল্কার পানে স্নেহ-বিধুর চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, অঙ্গুলি দিয়া তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে বলিলেন—

'কন্যা—আমার কন্যা—'

উল্কা শঙ্কা-বিস্ফারিত চক্ষে বলিল—'কি হয়েছে পিতা?'

শিবামিশ্র আত্ম-সংবরণ করিলেন।

'মা, আজ যে-কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি তা উচ্চারণ করতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তবু বলতে হবে। তোমার জীবনের কাহিনী আজ তোমাকে শোনাব।'

'আমার জীবনের কাহিনী!'

'হাঁ। বড় ভয়ঙ্কর সে কাহিনী। তুমি সহ্য করতে পারবে?'

উল্কা ক্ষণেক নিজের মনের অজ্ঞাত আশঙ্কার সহিত যুদ্ধ করিল, তারপর দৃঢ়স্বরে বলিল—

'বলুন পিতা, আমি সহ্য করতে পারব।'

শিবামিশ্র কুণ্ঠিত নীরবতার পর বলিলেন—

'উল্কা, তুমি আমার কন্যা নও।'

উল্কা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া রহিল, তাহার অধরোষ্ঠ বিভক্ত হইয়া গেল। শেষে সে স্খলিতকণ্ঠে বলিল—

'কন্যা নই—আপনার কন্যা নই! তবে আমি কে?'

'তুমি যখন একদিনের শিশু তখন আমি তোমাকে পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান থেকে তুলে এনেছিলাম।'

'পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান!—(রুদ্ধশ্বাসে) পিতা, সব কথা আমাকে বলুন, কিছু গোপন করবেন না।'

দুইজনেই গভীরভাবে অভিভূত। তারপর শিবামিশ্র নিজের মন দৃঢ় করিয়া বলিলেন—

'বলছি শোনো। উল্কা, কন্যা আমার, যা বলছি সংযতভাবে শোনো, ধৈর্য হারিও না—'

'না পিতা, আমি ধৈর্য হারাব না—আপনি বলুন।'

অতঃপর শিবামিশ্র উল্কার জীবন-কাহিনী বলিলেন। উল্কা সারা দেহ ঋজু ও কঠিন

করিয়া শুনিল; তাহার চোখের দীপ্তি অস্বাভাবিক।

শিবামিশ্র অবশেষে বলিলেন—'বৎসে, এই তোমার জীবনের ইতিহাস। তুমি বিষকন্যা।'

উল্কা মোহাচ্ছন্ন স্বরে বলিল—'বিষকন্যা—'

'হাঁ। বিষকন্যা যে পুরুষের সংসর্গে আসবে তার মৃত্যু হবে। তাই তোমার বিবাহ দিইনি।'

উল্কা নতদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিবার পর চক্ষু তুলিল—

'পিতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই ইতিহাস আমাকে বলবার কি প্রয়োজন ছিল?'

শিবামিশ্র কহিলেন—'যতদিন প্রয়োজন হয়নি বলিনি। আজ প্রয়োজন হয়েছে—উল্কা, প্রতিহিংসা সাধনের জন্য আমি বেঁচে আছি। চণ্ড আর মগধের সিংহাসনে নেই বটে, কিন্তু শিশুনাগ বংশ এখনও সদর্পে রাজত্ব করছে। এর প্রতিবিধান এখন এক তুমিই করতে পার।'

উল্কা চমকিয়া বলিল—'আমি! আমি কি করতে পারি?'

শিবামিশ্র স্থির নেত্রে উল্কার পানে চাহিলেন—

'তুমি বিষকন্যা। শিশুনাগ বংশের উচ্ছেদ তুমিই করতে পার।'

উল্কা তাঁহার কথার ইঙ্গিত বুঝিল। ক্ষণকাল নতমুখে থাকিয়া মুখ তুলিল—'কি করতে হবে বলে দিন।'

'যা বলব—পারবে?'

'পারব।'

শিবামিশ্র তখন বলিলেন—'শোনো—শিশুনাগ বংশের সেনজিৎ এখন মগধের সিংহাসনে। প্রজারা তাকে ভালবাসে, তার বিরুদ্ধে মাৎস্যনায় করবে না। আমরা স্থির করেছি তোমাকে লিচ্ছবি রাজ্যের প্রতিনিধি করে পাটলিপুত্রে পাঠাব। তুমি রাজসভায় আসন পাবে, সর্বদা সেনজিতের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হবে।...সেনজিৎ বয়সে তরুণ, তার ওপর শিশুনাগ বংশের রক্ত তার শরীরে আছে—বুঝতে পারছ?'

উল্কা দৃঢ়স্বরে বলিল—'বুঝেছি পিতা। আর কিছু করতে হবে?'

শিবামিশ্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—'শুনেছি প্রজারা চণ্ডকে হত্যা করেনি। সে যদি বেঁচে থাকে, তোমার মা মোরিকার ঋণ এখনও শোধ হয়নি।'

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল—'সে ঋণ আমি শোধ করব।'

শিবামিশ্রও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; উল্কা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। বলিল—

'পিতা, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। যে দুর্গ্রহের অভিসম্পাত নিয়ে আমি জন্মেছি, আমার মায়ের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তা সার্থক হবে। আপনি আমাকে কন্যার মত পালন করেছেন, সে ঋণও এই অভিশপ্ত দেহ দিয়ে পরিশোধ করব।'

শিবামিশ্র উল্কার দুই স্কন্ধের উপর হাত রাখিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল—

'উল্কা! প্রাণাধিকা কন্যা আমার! আশীর্বাদ করি বিজয়িনী হয়ে আবার আমার কোলে ফিরে এস—'

উল্কা নতজানু হইয়া তাঁহার জানু জড়াইয়া ধরিল।

* *

দিবা দ্বিপ্রহর। পাটলিপুত্র নগরের উপকণ্ঠে মৃগয়া-কাননকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া নির্জন পথ গিয়াছে।

মধ্যবয়স্ক কৃষকশ্রেণীর একটি লোক এই পথ দিয়া আসিতেছে। তাহার মাথায় বৃহৎ ঝাঁকা, ঝাঁকার মধ্যে কয়েকটি কলার কাঁদি রহিয়াছে; মনে হয় লোকটি কদলী লইয়া

পাটলিপুত্র নগরে বিক্রয় করিতে যাইতেছে।

একটি বৃক্ষতলে আসিয়া লোকটি ঝাঁকা নামাইয়া বসিল, গামছা দিয়া নিজেকে বীজন করিতে লাগিল; তারপর এক কাঁদি সুপক্ক কলা বাহির করিয়া নিশ্চিন্তমনে খাইতে লাগিল।

বাঁকের মুখে অনেকগুলি অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। লোকটি গলা বাড়াইয়া দেখিল। একদল অশ্বারোহী আসিতেছে।

অশ্বারোহীদের অগ্রে উল্কা। তাহার পাশে একটু পিছনে উল্কার প্রিয়সখী বাসবী। তাহাদের পশ্চাতে আরও তিনটি তরুণী। সকলেরই পুরুষ-বেশ। তাহাদের পিছনে চারজন পুরুষ রক্ষী।

কদলী-ভক্ষণ নিরত লোকটির পাশ দিয়া যাইবার সময় উল্কা অশ্ব স্থগিত করিল।—

'পথিক, পাটলিপুত্রের পুরদ্বার আর কতদূর বলতে পারো?'

পথিক কদলীচর্বণে বিরতি দিয়া বলিল—'তা পারি বৈকি ঠাকরুণ।—এই রাজপথ দিয়ে যদি যাও, চার ক্রোশ পথ। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছ, পেঁছুতে দু'তিন দন্ড লাগবে।'

উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—'রাজপথ ছাড়াও অন্য পথ আছে নাকি?'

পথিক বলিল—'আছে বৈকি ঠাকরুণ, এই বনের ভিতর দিয়েও যাওয়া যায়। তবে ওটা রাজার মৃগয়া-কানন, সাধারণ লোকের ওর ভিতর দিয়ে যাওয়া বারণ।'

উল্কা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল—'বারণ! তবে আমি বনের ভিতর দিয়েই যাব, দেখি কে বারণ করে। (অন্য সকলকে) তোমরা রাজপথ দিয়ে যাও।'

বাসবী উদ্বিগ্নভাবে বলিল—'ও প্রিয় সখি, তুমি বনের ভিতর দিয়ে একলা যাবে? যদি হারিয়ে যাও।'

উল্কা হাসিয়া বলিল—'ভয় নেই, আমি হারাব না। দেখিস, তোদের আগে পেঁছুব।'

উল্কা ছাড়া আর সকলে পথ দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল, তারপর উল্কা মৃগয়া-কাননে প্রবেশ করিল। পথিক কলা খাইতে খাইতে দেখিল। অর্ধস্ফুটস্বরে বলিল—

'হুঁ। দেবীর দেখছি এবার ঘোটকে আগমন!'

মৃগয়া-কাননের ভিতর দিয়া উল্কা চারিদিকে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে। কোথাও হরিণের দল, কোথাও সরোবরে মরাল সারস ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও ময়ূর নাচিতেছে।

একটি ঝিলের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে উল্কা অশ্ব হইতে অবতরণ করিল, ঝিলের কিনারায় নতজানু হইয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিল।

জলপানান্তে পিছু ফিরিয়া উল্কা দেখিল, ভীষণাকৃতি একটা লোক তাহার অশ্বের বল্গা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকটা মৃগয়া-কাননের রক্ষী কুম্ভ। সে রূঢ়কণ্ঠে বলিল—

'কে রে তুই! তোর কি প্রাণের ভয় নেই?—আরে এ কি—এ যে নারী!!'

উল্কা অধর কুঞ্চিত করিল।

'হাঁ নারী।—তুমি কে?'

কুম্ভের উগ্রভাব তিরোহিত হইল। সে বলিল—'আমি এই বনের রক্ষী। সুন্দরি, তুমি এই পথহীন বনে একলা এসেছ—বুঝেছি—অভিসারে এসেছ। (চোখ টিপিয়া) তোমার নাগর কই?'

উল্কা উত্তর দিল না, বিরক্তিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া রহিল। কুম্ভ লুব্ধভাবে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—

'—তা নাগরিকা, নাই বা এল তোমার নাগর, অভিমান করে চলে যেও না।—এস, কাছেই আমার গুল্ম, চল তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই—(উল্কা ঘৃণাভরে তাহাকে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল)—ও কি, চললে যে! আমিও তো পুরুষ, আমার পানে একবার চেয়েই দেখ না—'

কুম্ভ উল্কার হাত ধরিবার চেষ্টা করিল।

উল্কা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—'আমাকে ছুঁও না—অনার্য !'

কুম্ভের মুখ আরও কালো হইয়া উঠিল—'অনার্য ! বটে ! তবে দেখি আজ অনার্যের হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করে—'

কুম্ভ বাম বাহু দ্বারা উল্কার কটিবন্ধন বেষ্টন করিয়া আকর্ষণ করিল এবং লালসাপূর্ণ মুখ উল্কার মুখের কাছে আনিল।

'বর্বর! জানিস না—আমি বিষকন্যা! আমাকে ছুঁলে মরতে হয়!' বিদ্যুৎবেগে কটি হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া উল্কা কুম্ভের পঞ্জরে বিদ্ধ করিয়া দিল। কুম্ভ কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল। তারপর গলার মধ্যে শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

উল্কা অগ্নিপূর্ণ চক্ষে কুম্ভকে দেখিতে দেখিতে ছুরিকা আবার নিজ কটিতে রাখিল, তারপর এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল।

দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহর। পাটলিপুত্রের উত্তুঙ্গ নগরদ্বার। পথে জন-চলাচল নাই; তোরণদ্বারের দুই পাশে দুইজন করিয়া প্রতীহার প্রাচীরগাত্রে ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছে, তাহাদের হাতে বল্লম।

একটি ফুটি-কাঁকুড়-বোঝাই গরুর গাড়ি বাহির হইতে ভিতর দিকে চলিয়া গেল। তারপর দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া প্রতীহার চতুষ্টয় খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

উল্কা ও তাহার দল আসিতেছে। প্রতীহারগণ ইতিমধ্যে দৃঢ়ভাবে বল্লম ধরিয়া পথ আগলাইয়া সম-ব্যবধানে দাঁড়াইয়াছে। উল্কা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া রাশ টানিয়া অশ্বকে দাঁড় করাইল। তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা কিছুদূর পশ্চাতে দাঁড়াইল।

প্রতীহারদের মধ্যে যে-ব্যক্তি প্রধান তাহার গালপাট্টা ও গোঁফ বড় বড়। সে বলিল—'কে যায়!'

উল্কা গর্বিতস্বরে কহিল—'লিচ্ছবি রাজ্যের প্রতিনিধি।'

'প্রতিনিধি মহাশয় কোথায়?'

উল্কা বলিল—'আমি লিচ্ছবির প্রতিনিধি—পথ ছাড়ো।'

প্রধান প্রতীহার গোলাকার চক্ষু পাশের প্রতীহারের দিকে ফিরাইল, পাশের প্রতীহার চক্ষু গোল করিয়া তৃতীয় প্রতীহারের দিকে ফিরাইল, তৃতীয় প্রতীহার চতুর্থ প্রতীহারকে উত্তরূপে নিরীক্ষণ করিল। উল্কা অধীরভাবে অধর দংশন করিল। তখন প্রধান প্রতীহার গলা খাঁকারি দিয়া বলিল—

'লিচ্ছবি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মহাশয়া, নগরে প্রবেশ করুন।'

নগরের অভ্যন্তর। তোরণদ্বার হইতে কিয়দ্দূরে পথের পাশে একটি জলাধার, প্রস্তর-নির্মিত গো-মুখ হইতে জল নিঃসৃত হইয়া জলাধারে সঞ্চিত হইতেছে। কয়েকটি মৃত্তিকার পান-পাত্র ইতস্তত পড়িয়া আছে।

সহসা অনতিদূর হইতে শুষ্ক কর্কশ কণ্ঠস্বর আসিল—

'জল! জল! জল দাও—'

উল্কার দল মন্থর গতিতে এইদিকেই আসিতেছে। তাহারা জলাধারের পাশ দিয়া যাইবার সময় আবার সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

'জল! জল! জল দাও—'

উল্কা ঘোড়া থামাইল, বাসবীও আসিল। উল্কা আর সকলকে আগে বাড়িতে ইঙ্গিত করিল। তাহারা চলিয়া গেল। উল্কা ও বাসবী অশ্ব হইতে অবতরণ করিল।

রাজপথ হইতে অদূরে একটি কণ্টকগুল্মের আড়ালে প্রস্তর-নির্মিত একটি বেদী: বেদীটি সমচতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দশ হাত। ভূতপূর্ব মগধেশ্বর চণ্ড এই বেদীর উপর পড়িয়া আছেন। তাঁহার হস্ত-পদ শৃঙ্খলাবন্ধ, মাথায় রুক্ষ জটিল কেশ, চোখে তীব্র হিংস্র দৃষ্টি।—

'জল! জল! জল!'

উল্কা ও বাসবী আসিয়া বেদীর পাশে দাঁড়াইল। উল্কার মুখে কোনও বিকার নাই, কিন্তু বাসবী ভয় পাইয়াছে। সে শঙ্কিতস্বরে বলিল—'এ কে, প্রিয়সখি?'

উল্কা চণ্ডকে দেখিতে দেখিতে বলিল—'বোধহয় কোনও অপরাধী।'

তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া চণ্ড মাথা তুলিলেন; দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া ভীষণ স্বরে বলিলেন—

'জল দাও—জল!'

উল্কা অবিচলিত ভাবে চণ্ডের পানে চাহিয়া বলিল—'বাসবী, জলাধার থেকে জল নিয়ে আয়—'

বাসবী যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে চলিয়া গেল।

উল্কা আরও কিছুক্ষণ চণ্ডকে অবিচলিত মুখে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'কোন্ অপরাধে তোমার এই দণ্ড হয়েছে?'

চণ্ড উত্তর দিলেন না, কণ্ঠের মধ্যে ক্রূর ব্যাঘ্রের মত শব্দ করিলেন। বাসবী মৃৎপাত্রে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল কিন্তু চণ্ডের নিকটে যাইতে ইতস্তত করিতে লাগিল। উল্কা তখন মৃৎপাত্র লইয়া চণ্ডের হাতে দিল। চণ্ড দুই হাতে পাত্র ধরিয়া জল পান করিলেন এবং শূন্য পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

উল্কা প্রশ্ন করিল—'কে তোমার এমন অবস্থা করেছে? শিশুনাগ বংশের রাজা?'

চণ্ড বিষাক্ত চক্ষে উল্কার পানে চাহিলেন—'পথের কুকুর সব—দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা—'

বাসবী ভীতভাবে বলিল—'এস প্রিয়সখি, আমরা চলে যাই—'

উল্কা চণ্ডকে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে?'

'আমি কে! তুই জানিস না? হা হা—'

'আমি পাটলিপুত্রে নতুন এসেছি।'

চণ্ড উগ্রস্বরে বলিলে—'যা—দূর হ—দূর হয়ে যা। একদিন তোদের পায়ের তলায় পিষেছি—আবার যেদিন শিকল ছিঁড়ব—যা, এখন দূর হ'।'

উল্কা সহসা প্রজ্জ্বলিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'তোমার নাম কি?'

চণ্ড গর্জন করিলেন—'আমার নাম জানিস না! মিথ্যাবাদিনী। আমার নাম কে না জানে! আমি চণ্ড—মহারাজ চণ্ড! তোর প্রভু—তোর দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর। আমি মগধের ন্যায্য অধিপতি— মহারাজ চণ্ড।'

উল্কার সারা দেহ যেন বিদ্যুৎশিখার মত জ্বলিয়া উঠিল। সে এক পা আগে বাড়িল, অমনি বাসবী পিছন হইতে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

'প্রিয়সখি, চল আমরা যাই। এখানে কেউ নেই—আমার ভয় করছে।'

উল্কা বাসবীর দিকে ফিরিয়া মুখে ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিল। বলিল—'বাসবী, তুই যা। তোরা সকলে ঐ পিপ্পলি গাছের তলায় অপেক্ষা কর, আমি এখনি যাচ্ছি।'

বাসবী একটু দ্বিধা করিল; উল্কা তাহাকে লঘুহস্তে ঠেলিয়া দিল; তারপর চণ্ডের দিকে ফিরিল। বাসবী চলিয়া গেল।

উল্কা গভীর বিরাগ ভরে বলিল—'তুমিই ভূতপূর্ব রাজা চণ্ড!'

চণ্ড বলিলেন—'ভূতপূর্ব নয়, আমিই রাজা। আমি থাকতে মগধে অন্য রাজা নেই।'

উল্কা বলিল—'তোমার প্রজারা তাহলে তোমাকে হত্যা করেনি!'

চণ্ড দম্ভভরে বলিলেন—'আমাকে হত্যা করবে এত সাহস কার আছে? যেদিন শিকল ছিঁড়ব—'

চণ্ড শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টায় দুই বাহু আস্ফালন করিতে লাগিলেন, শিকল কিন্তু ছিঁড়িল না।

উল্কা কুঞ্চিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'মহারাজ চণ্ড, মোরিকা নামে রাজপুরীর এক দাসীকে মনে পড়ে?'

'মোরিকা! কে মোরিকা!'

'মনে করে দেখুন, আপনার অবরোধে মোরিকা নামে দাসী ছিল—মোরিকার এক বিষকন্যা জন্মেছিল—আপনি সেই বিষকন্যার পিতা। মনে পড়ে?'

চণ্ডের ক্রূর চক্ষু সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—

'মনে পড়েছে! সেই বিষকন্যাকে শ্মশানের বালুতে পুঁতেছিলাম—হাঃ হাঃ হাঃ—মন্ত্রী শিবমিশ্রকেও শৃগালে ছিঁড়ে খেয়েছিল—'

উল্কার কণ্ঠে গাঢ় শীৎকার ফুটিয়া উঠিল—

'সে বিষকন্যা মরেনি, শিবমিশ্রকেও শৃগালে ছিঁড়ে খায়নি। মহারাজ চণ্ড, ভাল করে চেয়ে দেখুন—নিজের কন্যাকে চিনতে পারছেন না? (চণ্ড বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন) আমি সেই বিষকন্যা!—মহারাজ, শিশুনাগ বংশের চিরন্তন নিয়তি মনে আছে কি? এ বংশের রক্ত যার শরীরে আছে সে-ই পিতৃহন্তা হবে। তাই বহু দূর থেকে বংশের প্রথা পালন করতে এসেছি।'

উল্কা কটি হইতে ছুরিকা বাহির করিল। কিন্তু উত্তেজনার ঝোঁকে সে চণ্ডের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, চণ্ড শৃঙ্খলিত হস্তে তাহার মণিবন্ধ ধরিয়া ফেলিলেন। উল্কা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, চণ্ডের বজ্রমুষ্টির চাপে ছুরি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। নিঃশব্দে দুজনের মধ্যে টানাটানি চলিতে লাগিল।

এই স্থান হইতে কিয়দ্দূরে নাগবন্ধুকে দেখা গেল। মুহূর্ত মধ্যে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া নাগবন্ধু ছুটিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে চণ্ড দুই হাতে উল্কার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছেন, উল্কার মুখ নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নাগবন্ধু ছুটিয়া আসিয়া উল্কার স্খলিত ছুরি তুলিয়া লইল এবং একটি আঘাতে উহা চণ্ডের কণ্ঠে প্রবিষ্ট করাইয়া দিল।

চণ্ডের হাত শিথিল হইয়া গেল, তিনি চিৎ হইয়া বেদীর উপর পড়িয়া গেলেন। উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কটিলগ্ন হস্তে দেখিতে লাগিল।

চণ্ডের প্রকাণ্ড দেহ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ধড়ফড় করিতে লাগিল। দুইবার তিনি কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না, মুখ দিয়া গাঢ় রক্ত নির্গলিত হইয়া পড়িল। তারপর চণ্ডের দেহ স্থির হইল।

ঊর্ধ্বে বায়সের কর্কশ স্বর শোনা গেল। উল্কা এবং নাগবন্ধু চোখ তুলিয়া দেখিল অদূরে একটি বৃক্ষের শুষ্ক শাখায় বসিয়া কাক ডাকিতেছে।

একটি বকুল গাছের নিষ্পত্র শাখায় নূতন পত্রোদ্গম হইয়াছে, একটা কোকিল শাখায়

বসিয়া ডাকিতেছে।

রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে সেই কোকিলের ডাক শোনা যাইতেছে। কক্ষটি প্রশস্ত ও মহার্ঘ উপকরণে সজ্জিত, রঙীন পক্ষ্মল আস্তরণে ভূমিতল আবৃত, তদুপরি কয়েকটি বৃহৎ উপাধান ন্যস্ত। একটি অর্ধগোলাকৃতি গবাক্ষ হইতে পুরভূমির বৃক্ষাদি এবং অবরোধের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। লৌহজালিকে পিনদ্ধবক্ষ একটি যবনী প্রতিহারী ধনুর্বাণ হস্তে দ্বারে পাহারা দিতেছে।

কক্ষটি মহারাজ সেনজিতের বিশ্রামগৃহ। কক্ষে আছেন স্বয়ং সেনজিৎ, বিদূষক বটুক ভট্ট এবং মহারাজের চারিজন বয়স্য। বটুক ভট্টের চূড়াকৃতি কেশে পাক ধরিয়াছে। তিনি সেনজিতের সহিত পাশা খেলিতেছেন। বয়স্যদের মধ্যে দুইজন বসিয়া তাম্বূল চিবাইতে চিবাইতে খেলা দেখিতেছেন; একটি বয়স্য ভূমি-শয়ান বীণার তন্ত্রীতে অলসভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছেন, চতুর্থ বয়স্য করতালি দিয়া সংগত করিতেছেন। মধু-অপরাহ্ণের আলস্যে সকলেই যেন একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছেন। কক্ষে স্ত্রীলোক কেহ নাই।

সহসা কক্ষের বাহির হইতে নারীকণ্ঠের সংগীত ভাসিয়া আসিল। সকলে সচকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন। কোন্ রমণী গান গায়? বটুক ভট্ট অধরে অঙ্গুলি রাখিয়া সকলকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া দ্বারের কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি মারিলেন।

অলিন্দের এক প্রান্তে বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যবনী প্রতিহারী আপন মনে গান ধরিয়াছে। তাহার নীল চক্ষু দুটির বিষণ্ণ দৃষ্টি দিগন্তের পানে প্রসারিত, যেন সুদূর স্বদেশের স্বপ্ন দেখিতেছে।

যবনীর গান শেষ হইলে কক্ষের মধ্যে রাজ-বয়স্যেরা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। যবনী লজ্জা পাইয়া চকিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং তীর-ধনুক হাতে লইয়া দ্বারের পাশে ঋজু ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল।

বটুক ভট্ট ফিরিয়া গিয়া রাজার সম্মুখে বসিলেন, ভর্ৎসনাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন—

'ধিক্ বয়স্য! শত ধিক্ তোমাকে!'

সেনজিৎ মৃদু বিস্ময়ে বলিলেন—'কী হল বটুক!'

বটুক ভট্ট বলিলেন—'একটা যবনী প্রতিহারী—বসন্তের সমাগমে তার প্রাণেও রঙ ধরেছে—আর তুমি বয়স্য নীরস শকুনির মত বসে বসে পাশা খেলছ! ছিঃ!'

কপট ক্রোধে বটুক ভট্ট পাশার গুটিকাগুলি দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

সেনজিৎ স্মিতমুখে বলিলেন—'কি করতে বলো?'

'যাও, অন্তঃপুরে যাও, নূপুর-নিক্কণ শোনো, কঙ্কণ কিঙ্কিণীর ঝনৎকার শোনো! হায় হতোস্মি—' বটুক ভট্ট ললাটে করাঘাত করিলেন।

সেনজিৎ বলিলেন—'আবার কি হল?'

'ভুলে গিয়েছিলাম। মনে ছিল না যে তোমার অবরোধে স্ত্রীলোক নেই—অন্তঃপুর শূন্য খাঁ খাঁ করছে—কেবল হতভাগ্য কঞ্চুকীটা প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহা, কঞ্চুকীর মুখ দেখলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।' বটুক গভীর নিশ্বাস মোচন করিলেন।

সেনজিৎ বলিলেন—'বয়স্য, দেখছি তোমার গায়েও বসন্তের হাওয়া লেগেছে। মদনোৎসবের আর বিলম্ব কত?'

বটুক ভট্ট কহিলেন—'মদনের সঙ্গে যার মৌখিক পরিচয় পর্যন্ত নেই, মদনোৎসবের সঙ্গে তার কী প্রয়োজন! বিল্বফল পাকলো কিনা তাতে—ইয়ে—পরভৃতের কি লাভ?'

সেনজিৎ হাসিয়া বলিলেন—'ধন্য বটুক, তুমি আমাকে কাক না বলে কোকিল বলেছ। কোকিল কিন্তু ভারী গুণবান পক্ষী—'

একজন বয়স্য বলিলেন—'দোষের মধ্যে পরের বাসায় ডিম্ব প্রসব করে।'

বটুক ভট্ট অঙ্গুলি তুলিয়া বলিলেন—'এ বিষয়ে, বয়স্য, তোমার চেয়ে কোকিল ভাল।'

'কিসে?'

'কোকিল তো তবু পরগৃহে বংশরক্ষা করে, তুমি যে একেবারেই—'

বটুক ভট্ট হতাশাসূচক হস্তভঙ্গী করিলেন। সেনজিৎ ক্ষণকাল বিমনা হইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—

'দেখ বটুক, তোমাদের একটা গোপনীয় কথা বলি—নারীজাতিকে আমি বড় ভয় করি, তাই মদনোৎসবের সময় আমার প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই সময় নারীজাতি অত্যন্ত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে।'

বটুক ভট্ট বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—'সে কথা সত্য। এই সময় স্ত্রীজাতি তাদের অস্ত্রশস্ত্র শানিয়ে পুরুষের দিকে ধাবিত হয়। আমার গৃহিণীর সাতটি সন্তান —বয়সেরও ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি তিনি আমার পানে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করছেন।'

বয়স্যেরা হাসিল, সেনজিৎ হাসি গোপন করিলেন।

'বড় ভয়ানক কথা, বটুক। তবে আর তোমার ঘরে ফিরে গিয়ে কাজ নেই; আমার অন্তঃপুর শূন্য আছে, তুমি সেখানেই থাকো। এ বয়সে গৃহিণীর কটাক্ষ-বাণ খেলে আর প্রাণে বাঁচবে না।'

বটুক আরও মোহ্যমান হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—'তা হয় না বয়স্য। এই নিদারুণ বসন্তকালে দেশসুদ্ধ কোকিল পর-গৃহে ডিম্ব উৎপাদন করবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে এসময় গৃহত্যাগ করলে অন্য বিপদ এসে জুটবে।'

একজন বয়স্য প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিলেন—'মহারাজ, সত্য বলুন, পরিহাস নয়, স্ত্রীজাতির প্রতি আপনার বিরাগ কিসের জন্য। বিশেষ কোনও কারণ আছে কি?'

সেনজিৎ লঘুস্বরে বলিলেন—'রুচির অভাবই প্রধান কারণ। তাছাড়া, এই নারীজাতিই পুরুষের সকল দুঃখের মূল। ভেবে দেখ শ্রীরামচন্দ্রের কথা—স্মরণ কর কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী। এইসব উদাহরণ দেখে স্ত্রীজাতির কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল।'

বয়স্য প্রশ্ন করিলেন—'কিন্তু মহারাজ—বংশধর!'

সেনজিতের মুখ হইতে লঘুতার সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া গেল, তিনি গভীর ক্ষোভপূর্ণ চক্ষে বয়স্যের পানে চাহিলেন—

'বংশধর! ভানুমিত্র, শিশুনাগ বংশে বংশধরের কথা চিন্তা করতে তোমার ভয় হয় না? এই অভিশপ্ত বংশে যে জন্মেছে সে-ই নিজের পিতাকে হত্যা করেছে।—শুনেছি এ বংশে আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। আমার ঐকান্তিক কামনা, আমার সঙ্গেই যেন এ বংশের শেষ হয়।'

বয়স্যেরা নতমুখে নিরুত্তর রহিলেন।

এই সময় বাহিরে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ হইতে তূর্যধ্বনি হইল; এই তূর্যধ্বনির অর্থ—কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজদর্শনে আসিয়াছেন। সেনজিৎ ঈষৎ বিরক্তভাবে চক্ষু তুলিলেন—

'এ সময় কে দেখা করতে চায়?—বটুক, তুমি দেখ গিয়ে—বলবে আমি এখন বিশ্রাম করছি, কাল রাজসভায় দেখা হবে।'

রাজকীয় কার্য করিতে যাইতেছেন তাই বটুক ভট্টের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; তিনি উত্তরীয়টি স্কন্ধে রাখিয়া মর্যাদাপূর্ণ পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। সেনজিৎ উঠিয়া গবাক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স্য চারিজন সঙ্কোচ বোধ করিয়া ঘরের চারিদিকে ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িলেন।

এই সময় বটুক ভট্ট প্রায় মুক্তকচ্ছ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন এবং আর্তকণ্ঠে 'মহারাজ!' বলিয়া সেনজিতের আড়ালে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন।

সেনজিৎ সবিস্ময়ে বলিলেন—'এ কি বটুক! কি হয়েছে?'

'মহারাজ, জঙ্ঘাবল প্রদর্শন করছি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু পালিয়ে এলে কেন? কে এসেছে?'

বটুক ভট্ট ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন—'তা ঠিক বলতে পারি না। বোধ হয় দিব্যাঙ্গনা।'

সেনজিৎ বিস্মিত হইলেন—'দিব্যাঙ্গনা! স্ত্রীলোক?'

বটুক ভট্ট সবেগে মুণ্ড নাড়িলেন—'কদাচ নয়। উর্বশী হলেও হতে পারে, নচেৎ নিশ্চয় তিলোত্তমা। কিন্তু তার বক্ষে লৌহজালিক, রণরঙ্গিণী মূর্তি!'

এই সময় যবনী প্রতিহারী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেনজিৎ তাহার পানে সপ্রশ্ন চক্ষু ফিরাইলেন।

প্রতিহারী বলিল—'বৈশালী থেকে এক রাষ্ট্রদূতী এসেছেন—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।'

সেনজিৎ ক্ষণেক নির্বাক থাকিয়া বলিলেন—'রাষ্ট্রদূতী!—নিয়ে এস।'

যবনী প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকাল পরে উল্কাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

উল্কা দ্বারপথে দাঁড়াইয়া প্রথমেই সেনজিতের দিকে চাহিল; উভয়ের দৃষ্টি ক্ষণেক পরস্পর আবদ্ধ হইয়া রহিল। সেনজিৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই উল্কার নিকটবর্তী হইলেন, সহজ সৌজন্যের সহিত গাম্ভীর্যমিশ্রিত স্বরে কহিলেন—

'ভদ্রে, শুনলাম তুমি বৈশালী থেকে আসছ, তোমার কী প্রয়োজন?'

উল্কা চিনিয়াছিল ইনিই সেনজিৎ, সে একটু অভিনয় করিল; সম্ভ্রমপূর্ণ অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—

'আমি পরমভট্টারক শ্রীমন্‌মহারাজ সেনজিতের দর্শনপ্রার্থিনী, তাঁর কাছেই আমার প্রয়োজন নিবেদন করব।'

সেনজিৎ শান্তভাবে বলিলেন—'আমিই সেনজিৎ।'

উল্কার বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষু ক্ষণেকের জন্য অর্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল; সে দুই পদ অগ্রসর হইয়া মহারাজের পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া যুক্ত-করপুট ললাটে স্পর্শ করিল। তারপর নিজ অঙ্গত্রাণের ভিতর হইতে জতুমুদ্রালাঞ্ছিত পত্র বাহির করিয়া মহারাজের হাতে দিল। বলিল—

'মহারাজ, আমি চিনতে পারিনি, ক্ষমা করুন। এই আমার পরিচয়-পত্র—'

সেনজিৎ বলিলেন—'স্বস্তি—স্বস্তি—'

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল, সেনজিৎ জতুমুদ্রা ভাঙিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বটুক ভট্ট সেনজিতের পিছনে লুকাইয়া ছিলেন, সন্তর্পণে গলা বাড়াইয়া দেখিলেন উল্কা একাগ্র-চক্ষে সেনজিৎকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তিনি আবার মুণ্ড টানিয়া লইলেন। অন্য বয়স্যেরা বিমুগ্ধ নেত্রে উল্কার পানে চাহিয়া রহিল।

সেনজিৎ লিপি পাঠ করিয়া বলিলেন—'দেখছি, মিত্ররাজ্য লিচ্ছবি তোমাকে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি করে মগধের রাজসভায় পাঠিয়েছেন। তা ভাল। আমি তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। (ঈষৎ হাসিয়া) বৈশালীর রাষ্ট্রনায়কেরা একটি পুরাঙ্গনাকে প্রতিভূরূপে পাঠিয়েছেন এটা তাঁদের প্রীতির নিদর্শন সন্দেহ নেই, তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এ রীতি কিছু নূতন।'

উল্কা বলিল—'মহারাজ, লিচ্ছবির প্রজাতন্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের কোনও প্রভেদ নেই—সকলে সমান।'

বটুক ভট্ট এইবার আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদূষক-সুলভ চপলতা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—

'শুধু তাই নয়, বৈশালীতে নিশ্চয় পুরুষের অভাব ঘটেছে, তাই তারা এই সুন্দরীকে পুরুষ সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। বয়স্য, বৈশালী যখন মিত্ররাজ্য, তখন তোমারও উচিত মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ কিছু পুরুষ পাঠিয়ে দেওয়া। তাতে মিত্রতার বন্ধন আরও দৃঢ়

হবে।'

উল্কা অবজ্ঞাভরে বটুকের পানে চাহিল—'মগধে পুরুষ প্রতিনিধির প্রয়োজন নেই বলেই বোধহয় মহামান্য কুলপতিরা এই পুরকন্যাকে পাঠিয়েছেন, নচেৎ লিচ্ছবিদেশে প্রকৃত পুরুষের অভাব নেই।'

বটুক গম্ভীরভাবে দক্ষিণে-বামে মাথা নাড়িলেন—

'বৈশালিকে, লিচ্ছবিদেশে যদি প্রকৃত পুরুষ থাকত তাহলে কখনই তোমাকে মগধে আসতে দিত না।'

উল্কা উত্ত্যক্ত হইয়া সেনজিতের পানে চাহিল। বলিল—'মহারাজ, এই বিদূষক কি আপনার বাক্-প্রতিভূ?'

সেনজিৎ উত্ত্যক্ত স্বরে বলিলেন—'আঃ বটুক, চপলতা সংবরণ কর, এখন চপলতার সময় নয়।'

বটুক ভট্ট যেন রাজার তিরস্কারে ভয় পাইয়াছেন এরূপ অভিনয় করিয়া দূরে একটি উপাধানে ঠেস দিয়া বসিলেন। সেনজিৎ উল্কার দিকে ফিরিলেন—

'ভদ্রে—'

উল্কা মৃদু হাসিয়া বলিল—'আয়ুষ্মন্, আমার নাম উল্কা।'

বটুক ভট্ট ভয়ার্তভাবে চক্ষু ঘূর্ণিত করিলেন—

'ওফ্—!'

সেনজিৎ বলিলেন—'ভাল—উল্কা, আবার তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কাল থেকে সভায় অন্য পাত্রমিত্রদের সঙ্গে তোমার আসন হবে।'

উল্কা সরল উৎকণ্ঠার অভিনয় করিয়া সেনজিতের কাছে সরিয়া আসিল—

'মহারাজ, সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা কি আমার অবশ্য-কর্তব্য? রাজসভার শিষ্টতা আমি কিছুই জানি না, এই আমার প্রথম দৌত্য।'

সেনজিৎ বলিলেন—'সভায় উপস্থিত থাকা-না-থাকা পাত্রমিত্রের প্রয়োজন আর অভিরুচির ওপর নির্ভর করে। তোমার যখন ইচ্ছা হবে তখন সভায় আসতে পার।'

'ভাল মহারাজ।'

'যা হোক, বহুদূর পথ এসে তুমি আর তোমার পরিজন নিশ্চয় ক্লান্ত হয়েছ, আগে তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু—পূর্বাহ্ণে সংবাদ না পাওয়ায় তোমাদের সমুচিত বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়নি—'

বটুক অমনি চট্ করিয়া বলিলেন—

'তাতে কী হয়েছে! মহারাজের অন্তঃপুর তো শূন্য, সেইখানেই অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হোক না।'

সেনজিৎ বিরক্ত মুখে বটুক ভট্টের পানে চাহিলেন। উল্কার চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—

'মহারাজের অন্তঃপুর শূন্য! তবে কি—!'

বটুক ভট্ট সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন—

'কিছু নেই—রাণী উপরাণী কিছু নেই!'

উল্কা চোখের বিজয়োল্লাস গোপন করিয়া ক্লান্তির অভিনয় করিল। বলিল—

'মহারাজ, আমরা সত্যই পথশ্রান্ত; যদি বাধা না থাকে আমি আর আমার সখীরা অবরোধেই আশ্রয় নিতে পারি। আমরা নারী, মহারাজের আশ্রয়ে থাকাই আমাদের পক্ষে শোভন হবে।'

প্রস্তাব সেনজিতের খুব মনঃপূত হইল না, তিনি মস্তকের উপর দিয়া একবার করতল সঞ্চালিত করিয়া যবনী প্রতিহারীর দিকে ফিরিলেন—

'যবনি, কঞ্চুকীকে ডেকে আনো।'

কঞ্চুকী বোধহয় দ্বারের বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিল।

কঞ্চুকীকে পূর্বে চণ্ডের সভায় আমরা দেখিয়াছি, এখন বয়স আরও বাড়িয়াছে।

'এই যে মহারাজ, আমি উপস্থিত।'

সেনজিৎ বলিলেন—'তুমি এসেছ! কাছেই ছিলে মনে হচ্ছে।—যাহোক, ইনি আর এঁর সখীরা আপাতত অবরোধে থাকবেন, তার ব্যবস্থা কর।'

কঞ্চুকী মহানন্দে বলিল—'ধন্য মহারাজ। (উল্কাকে) দেবি, আসুন—আসুন আমার সঙ্গে—'

উল্কা গমনোদ্যতা হইয়া হাসিমুখে সেনজিতের দিকে ফিরিল এবং দুই করতল যুক্ত করিয়া বলিল—

'জয়োস্তু মহারাজ।'

দ্বারের পাশে যবনী প্রতিহারী দাঁড়াইয়া আছে, উল্কা কঞ্চুকীর অনুসরণ করিয়া দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইল। এই সময় বটুক ভট্ট পশ্চাৎ হইতে একটি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিলেন—

'বৈশালিকে, রাজকার্য তো বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হল, এখন একটি কথা জানতে পারি কি?'

উল্কা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ তুলিল—

বটুক ভট্ট বলিলেন—'বৈশালীর সকল সীমন্তিনীই কি সদাসর্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে থাকেন? ভ্রূকুটির ভল্ল আর বক্ষের লৌহজালিক কি তাঁরা একেবারেই ত্যাগ করেন না?'

উল্কার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; সে ক্ষিপ্রহস্তে যবনী প্রতিহারীর তূণীর হইতে একটি তীর লইয়া ভল্লের ন্যায় বটুক ভট্টের শির লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল, বলিল—

'তোমার মত কদাকার কিম্পুরুষ দেখলে বৈশালীর নারীরা অস্ত্রত্যাগ করে।'

বটুক ভট্ট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। উল্কা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কঞ্চুকীর সহিত প্রস্থান করিল। উল্কার নিক্ষিপ্ত শরটি বটুক ভট্টের চূড়াকৃতি কেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আটকাইয়া গিয়াছিল, বটুক শর ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন।

সেনজিৎ হাসিলেন—'তোমার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। বৈশালীর মেয়েদের লক্ষ্যবেধ দেখছি অব্যর্থ। তুমি আর ওর সঙ্গে রসিকতা করতে যেও না।'

বটুক ভট্ট কাতরস্বরে বলিলেন—'না বয়স্য, আর করব না—এ বয়সে আগুন নিয়ে খেলা আর সহ্য হবে না। এখন দয়া করে তীরটা বার করে নাও—'

সেনজিৎ হাসিতে লাগিলেন, বয়স্যেরাও যোগ দিল।

রাজ অবরোধ। পৌর ভবনের একটি অংশ প্রাচীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত; ভিতরে বিস্তৃত ভূমির মধ্যস্থলে সুন্দর একটি ভবন। তাহাকে ঘিরিয়া নানা জাতীয় বৃক্ষ, পুষ্পোদ্যান, জলাশয়। একটি সুদৃশ্য সেতু পার হইয়া অবরোধে প্রবেশ করিতে হয়, অন্য পথ নাই।

কঞ্চুকী সেতু-মুখে দাঁড়াইয়া উল্কা ও তাহার সখীদের অভ্যর্থনা করিল, কয়েকটি কিংকরী মালা পানপাত্র লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা উল্কা ও সখীদের গলায় মালা পরাইয়া দিল, সোনার পাত্রে স্নিগ্ধ পানীয় দিয়া সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করিল। পুলকিত কঞ্চুকী সহর্ষে দুই হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে পরিদর্শন করিতে লাগিল।

উল্কা ও বাসবী উদ্যানের একদিকে চলিল, সখীরা অন্যদিকে চলিল। সকলেরই চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দ।

উল্কা ও বাসবী সরোবরের পাষাণ-তটে আসিয়া দাঁড়াইল। জলে অসংখ্য কমল ফুটিয়াছে। বাসবী ভিতরের কথা কিছু জানিত না, সে উল্কাকে নানা কৌতূহলী প্রশ্ন করিতেছে।

'প্রিয় সখি, মহারাজকে কেমন দেখলে বল না!'

উল্কার অধরে অর্থপূর্ণ কুটিল হাসি খেলিয়া গেল—

'মহারাজ সেনজিৎ! কেমন আর দেখবো? সাধারণ মানুষ—দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহারাজ বলে মনেই হয় না।'

'চেহারা কেমন?'

'সুকুমার যুবাপুরুষ।'

'কেমন কথা বলেন?'

'বেশ মিষ্টি। মানুষটি খুব নিরীহ—ক্ষাত্র-তেজ কিছু দেখলাম না।'

'আচ্ছা প্রিয় সখি, ওঁকে তোমার বেশ লেগেছে?'

উল্কা চকিত হইয়া বাসবীর দিকে চাহিল—

'কেন বল্ দেখি?'

বাসবী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—'না—অমনি—জানতে ইচ্ছে হল। বল না।'

উল্কার ভ্রূর মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম রেখা পড়িল, সে যেন ভাবিতে ভাবিতে বলিল—

'মন্দ লাগল না—শিশুনাগ বংশের যে খ্যাতি শুনেছিলাম, সে রকম নয়। (মুখ কঠিন হইল) কিন্তু তা বলে আমার কর্তব্য আমি ভুলব না।'

বাসবী না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল—'তোমার কর্তব্য! কোন্ কর্তব্য?'

উল্কা আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—'এই—আমার রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। মগধের রাজসভায় আমি বৈশালীর প্রতিনিধি, মহারাজ সেনজিতের সঙ্গে আমার তার বেশী সম্বন্ধ নেই।'

বাসবী মনে মনে কল্পনার জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে একটু নিরাশ হইল, বলিল—

'ও হাঁ—তা বটে।'

বাসবীর মুখ দেখিয়া উল্কা মনে মনে হাসিল। একটু দুষ্টামির সুরে বলিল—

'আর একটা খবর জানিস? মহারাজ এখনও বিয়ে করেননি!'

বাসবী আবার কুতূহলী হইয়া উঠিল—

'ওমা সত্যি! একটিও রাণী নেই?'

'একটিও রাণী নেই।'

বাসবী অমনি জল্পনা সুরু করিল—

'বোধহয় মনের মতন সুন্দরী পাননি তাই বিয়ে করেননি—'

'তা হবে।'

বাসবী উল্কার প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষপাত করিল—

'এবার বোধহয় মহারাজের বিয়ের ফুল ফুটবে।'

উল্কা বলিল—'তাই নাকি! কি করে জানলি?'

বাসবী হাসিয়া উঠিল, তারপর উল্কার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—

'মগধের তরুণকান্তি মহারাজ যদি আমার প্রিয় সখীকে ভালবেসে ফেলেন—আর নিজের রাণী করেন তাহলে কিন্তু বেশ হয়! না প্রিয় সখি?'

উল্কা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। সহসা তাহার গণ্ডদুটি রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল।

* * *

দুই-তিন দিন পরে।

মগধের রাজসভায় সেনজিৎ সিংহাসনে আসীন। সভাসদগণ নিজ নিজ আসনে বসিয়াছেন। একজন মন্ত্রী রাজার পাশে দাঁড়াইয়া গত অহোরাত্রের প্রধান প্রধান সংবাদগুলি নিবেদন করিতেছেন। সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য চলিতেছে। কেবল বটুক ভট্ট সিংহাসনের পাশে নিম্নাসনে বসিয়া সিংহাসনে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন।

সেনজিৎ বলিলেন—'আর কোনও সংবাদ আছে?'

মন্ত্রী ইতস্তত করিয়া বলিল—'আর—ভূতপূর্ব মহারাজ চণ্ড—কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁকে—'

সেনজিৎ সংক্ষেপে বলিলেন—'শুনেছি।—আর কিছু?

মন্ত্রী বলিলেন—'আর বিশেষ কোনও সংবাদ নেই আর্য।—শুধু—রাজহস্তী পুষ্কর—'

সেনজিৎ চকিতে মুখ তুলিলেন—'পুষ্কর! কী হয়েছে তার?'

মন্ত্রী বলিলেন—'কাল থেকে পুষ্কর একটু চঞ্চল হয়েছে। তাকে হস্তিশালায় বেঁধে রাখতে হয়েছে—'

বটুক ভট্ট পুষ্করের নাম শুনিয়া চক্ষু মেলিয়াছিলেন, এখন সেনজিতের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন—

'উঃ—কী দুরন্ত এই বসন্তকাল! হাতীরও মন চঞ্চল হয়েছে!'

এই সময় সভাসদগণের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাঁহারা সভায় একটি বিশেষ প্রবেশদ্বারের দিকে যুগপৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সভাধ্যক্ষ রাজপুরুষ দ্রুত দ্বারের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বটুক ভট্ট চকিতে সেই দিকে চাহিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বসিলেন। মহারাজ সেনজিৎও ঘাড় ফিরাইলেন।

উল্কা আসিতেছে। তাহার পরিধানে পুরুষবেশ, কিন্তু রণসজ্জা নয়। পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সহিত সদর্পে পা ফেলিয়া সে সভায় প্রবেশ করিল। সভাধ্যক্ষ সসম্ভ্রমে তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন—

'এই যে এদিকে—ইদো ইদো অজ্জা।'

উল্কা সভাধ্যক্ষের কথা গ্রাহ্য করিল না, একেবারে রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। যুক্তকরপুটে রাজাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখ পংক্তির একটি আসনে গিয়া বসিল।

সেনজিৎ হাত তুলিয়া বলিলেন—'স্বস্তি।'

সভাসদগণ কানাকানি করিতে করিতে অপাঙ্গদৃষ্টিতে উল্কাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একজন স্থূলকায় সভাসদ ঘাড় বাঁকাইয়া উল্কাকে দেখিতে গিয়া আসন হইতে পড়িয়া গেলেন। বটুক ভট্ট দেখিলেন—উল্কা যেখানে বসিয়াছে সে-স্থান তাঁহার নিকট হইতে বেশী দূর নয়। তিনি হামাগুড়ি দিয়া সিংহাসনের পশ্চাতে অদৃশ্য হইলেন।

সভাধ্যক্ষ রাজপুরুষ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

'মিত্ররাষ্ট্র লিচ্ছবির প্রতিনিধি।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তারপর মন্ত্রী আবার গলা খাঁকারি দিয়া অন্যান্য সংবাদ শুনাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় একজন দৌবারিক দ্রুতপদে সভায় প্রবেশ করিল; রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ত্বরান্বিত স্বরে বলিল—

'মহারাজ, বাইরে বড়ই বিপদ উপস্থিত, রাজহস্তী পুষ্কর হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—শিকল ছিঁড়ে সে মাহুতকে পদদলিত করেছে—'

সভাসদগণ সভায় নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

দৌবারিক বলিল—'পুষ্কর এখন সভা-প্রাঙ্গণে ছুটে বেড়াচ্ছে, যাকে সামনে পাচ্ছে তাকে আক্রমণ করছে।'

বটুক ভট্ট সিংহাসনের পিছন হইতে গলা বাড়াইলেন—

'আরে সর্বনাশ। যদি সভায় ঢুকে পড়ে!'

সভাসদেরা আরও ভয় পাইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। উল্কা কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, নিজ আসনে স্থিরভাবে বসিয়া সেনজিতের আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সেনজিৎ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাত তুলিয়া সভাসদগণকে আশ্বাস দিলেন—

'ভয় নেই, পুষ্কর সভায় প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো—আমি

দেখছি—'

সিংহাসন হইতে নামিয়া সেনজিৎ দ্বারের দিকে চলিলেন। উদ্বিগ্ন মন্ত্রী রাজার পিছনে আসিতে আসিতে বলিলেন—

'আয়ুষ্মন্, আপনি কোথায় যাচ্ছেন!'

বটুক ভট্ট ছুটিয়া আসিয়া রাজার হাত ধরিলেন—

'বয়স্য, ক্ষ্যাপা হাতীর সামনে যেও না। পুষ্কর ক্ষেপেছে, এখন তোমাকে চিনতে পারবে না—'

সেনজিৎ বটুক ভট্টের স্কন্ধে হাত রাখিয়া মৃদু হাসিলেন।

'ছি বটুক, এত ভয়! তোমরা বাতায়ন থেকে দেখ, পুষ্কর এখনি শান্ত হবে।'

সেনজিৎ সভার দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থান করিলেন। উল্কা আসন ছাড়িয়া বাতায়নের দিকে চলিল।

* * *

রাজসভার পুরঃপ্রাঙ্গণ। উন্মত্ত রাজহস্তী পুষ্কর বৃংহণধ্বনি করিতে করিতে অঙ্গনময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার পায়ে শৃঙ্খলের ছিন্নাংশ, গণ্ড হইতে মদস্রাব হইতেছে। মৃত হস্তীপকের দলিত-পিষ্ট দেহ অঙ্গনের মাঝখানে পড়িয়া আছে। জীবন্ত মানুষ একজনও অঙ্গনে নাই।

সেনজিৎ অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন, ধীরপদে পুষ্করের দিকে অগ্রসর হইলেন। সভাগৃহের বাতায়ন হইতে উল্কা রুদ্ধনিশ্বাসে দেখিতে লাগিল। সভাসদগণও অন্য অন্য বাতায়নে দাঁড়াইয়া পাণ্ডুর মুখে রাজার অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

সেনজিৎ কোমল তিরস্কারের কণ্ঠে ডাকিলেন—

'পুষ্কর! পুষ্কর!'

মত্ত হস্তী গর্জন করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তাহার ক্ষুদ্র আরক্ত চক্ষু ঘুরিতে লাগিল। সেনজিৎ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।—

'ছি পুষ্কর! দুরন্তপনা করতে নেই।'

সভার বাতায়ন হইতে উল্কা নিস্পন্দ স্থিরচক্ষু হইয়া দেখিতে লাগিল। সেনজিৎ পুষ্করের আরও কাছে আসিলেন, পুষ্কর শুঁড় উদ্যত করিল। সেনজিৎ মৃদুকণ্ঠে হাসিলেন।—

'পুষ্কর! আমাকে চিনতে পারছিস না?'

তিনি পুষ্করের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। পুষ্কর একটু দ্বিধা করিল, তারপর শুঁড় নামাইল।

দুই চোখে অবিশ্বাস-ভরা বিস্ময় লইয়া উল্কা বাতায়ন হইতে দেখিতেছে। সেনজিৎ মৃদুকণ্ঠে পুষ্করের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, পুষ্কর শান্ত হইয়া শুনিল। সেনজিৎ আগে আগে হস্তীশালার দিকে চলিলেন, পুষ্কর দুলিতে দুলিতে তাঁহার পিছনে চলিল। সভাগৃহের বাতায়ন হইতে সভাসদগণের হর্ষধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

* * *

দুই দণ্ড পরে। সভাগৃহ শূন্য হইয়া গিয়াছে, কেবল উল্কা একাকিনী নিজ আসনে বসিয়া আছে।

সেনজিৎ প্রবেশ করিলেন এবং উল্কাকে দেখিয়া বিস্ময়ভরে তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন।—

'এ কি! সভা অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে—তুমি এখনও এখানে!'

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল, লজ্জিত নতমুখে বলিল—'আপনাকে একটি কথা বলবার জন্যে অপেক্ষা করছি মহারাজ।'

সেনজিৎ ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন—'কী কথা?'

উল্কা আবেগভরে বলিল—'মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন; আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।'

'চিনতে পারনি!'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি নিরীহ—পৌরুষহীন—কিন্তু আজ আমার ভুল ভেঙেছে। আজ যা দেখলাম তা জীবনে কখনও ভুলব না। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে এমন অটল নির্ভীকতা—'

সেনজিৎ স্মিতমুখে বলিলেন—'মৃত্যুকে আমি ভয় করি না উল্কা।'

উল্কা উদ্দীপ্তস্বরে বলিল—'শুধু মৃত্যুকে! মহারাজ, জগতে এমন কিছু আছে কি—যাকে আপনি ভয় করেন?'

সেনজিৎ বলিলেন—'আছে বৈকি!'

উল্কা অবিশ্বাস-ভরা কৌতুকে প্রশ্ন করিল—'সে কী বস্তু মহারাজ?'

'সে বস্তু—নারী।' বলিয়া সেনজিৎ প্রস্থান করিলেন। উল্কার মুখের কৌতুক-দীপ্তি নিবিয়া গেল; সে দাঁড়াইয়া অধর দংশন করিতে লাগিল।

* * *

রাত্রিকাল। বৈশালীতে শিবামিশ্রের গৃহ। একটি কক্ষে প্রদীপ সম্মুখে রাখিয়া শিবামিশ্র অজিনাসনে বসিয়া আছেন, যেন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দ্বারে শব্দ হইল। শিবামিশ্র সেই দিকে ফিরিলেন। অন্ধকারে একটি হাত তাঁহার হাতে একটি কুণ্ডলিত লিপি দিয়া অপসৃত হইল। শিবামিশ্র লিপিটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, তারপর জতুমুদ্রা ভাঙিয়া পাঠ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার অধরে ক্রূর হাসি দেখা দিল। তিনি মনে মনে বলিলেন—

চণ্ড মরেছে—একটা ঋণ শোধ হল। আর একটা বাকি—

লিপি পাকাইয়া তিনি প্রদীপশিখার উপর ধরিলেন। লিপি মশালের মত জ্বলিয়া উঠিল, তারপর ভস্মে পরিণত হইল।

* * *

প্রভাতের রবিকরোজ্জ্বল আকাশ। চঞ্চল-মধুর যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দে বাতাস পরিপূর্ণ।

রাজার পক্ষী-ভবন। দীর্ঘ অলিন্দের মত একটি কক্ষ, তাহার দুই ধারে সারি সারি গবাক্ষ। প্রত্যেক গবাক্ষে একটি করিয়া সুন্দর পাখি ঝুলিতেছে, কেহ দাঁড়ে, কেহ খাঁচায়। একটি দীর্ঘ-পুচ্ছ ময়ূর সোনার দাঁড়ে বসিয়া আছে।

মহারাজ সেনজিৎ পক্ষীগুলিকে একে একে সন্দর্শন করিতেছেন। কাহাকেও ফল বা ধান্যশীর্ষ খাইতে দিতেছেন: শিস্ দিয়া কাহাকেও শিস্ দিতে শিখাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার মন পক্ষীতে নিবিষ্ট নয়, অবরোধের দিক হইতে যে চঞ্চল সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে তাহাই তাঁহার মন আকৃষ্ট করিয়া লইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে সঙ্গীতের সঙ্গে করতালি দিয়া তাল দিতেছেন, আবার সচেতন হইয়া পক্ষীদের পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন। মনে হয় তাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়গুলি সঙ্গীতের অনুসরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

সঙ্গীতধ্বনি আসিতেছিল অবরোধের সরোবর-তীর হইতে। উল্কা ও বাসবী আবক্ষ

জলে নামিয়া জল-ক্রীড়া করিতে করিতে স্নান করিতেছিল; তিনটি সখী ঘাটের পৈঠায় বসিয়া বীণা মৃদঙ্গ সহযোগে বসন্তরাগের চর্চা করিতেছিল।

সেনজিৎ অবশ্য পক্ষী-ভবন হইতে এ দৃশ্য দেখিতে পাইতেছিলেন না, বাতায়নপথে কেবল অবরোধ-প্রাচীরের পরপারে তরুশীর্ষগুলি দেখিতে পাইতেছিলেন।

একটি গবাক্ষে শুকপক্ষীর দাঁড় ঝুলিতেছিল। সেনজিৎ বিমনাভাবে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; হরিদ্বর্ণ পাখিটার মুখের কাছে একটি ধান্যশীর্ষ ধরিতেই সে হঠাৎ ভয় পাইয়া ঝটপট করিয়া উঠিল। তাহার পায়ের শিকলি কোনও ক্রমে খুলিয়া গিয়াছিল, সে উড়িয়া গিয়া অবরোধ-প্রাচীরের ওপারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেনজিৎ উদ্বিগ্নভাবে গবাক্ষের বাহিরে চাহিয়া আছেন এমন সময় পক্ষী-ভবনে বটুক ভট্টের আবির্ভাব হইল। তিনি রাজাকে গবাক্ষ-পথে অবরোধের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিলেন।

'এহুম্—জয়োস্তু মহারাজ—জয়োস্তু। এই সুন্দর প্রভাতকালে বাতায়ন থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই রমণীয়—না বয়স্য?'

সেনজিৎ ফিরিয়া ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে তাকাইলেন—

'আমার শুক পাখিটা শিকলি কেটে উড়ে গেছে।'

বটুক ভট্ট অবহেলাভরে বলিলেন—'যাক গে, আরও অনেক পাখি আছে। বনের পাখি বনে উড়ে গেছে তাতে দুঃখ কি!'

সেনজিৎ বলিলেন—'বনে উড়ে যায়নি, অবরোধের ঐ আমলকী গাছটায় গিয়ে বসেছে।'

বটুক ভট্ট বলিলেন—'বাঃ! ভারি রসিক পাখি তো! তোমার পাখি এত রসিক হল কি করে তাই ভাবছি।'

সেনজিৎ হঠাৎ বটুক ভট্টের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—

'ঠিক হয়েছে—তুমি যাও, পাখিটাকে ধরে নিয়ে এস।'

বটুক ভট্ট পশ্চাৎপদ হইলেন—

'অ্যাঁ! পাখি আমলকী গাছে বসেছে, আমি তাকে ধরব কি করে! আমি কি কাষ্ঠ-মার্জার—কাঠবেড়ালী—যে গাছে উঠব।'

সেনজিৎ বলিলেন—'তুমি যে ভাবে সিংহাসনেব শিকল ধরে ওঠা-নামা করতে পারো কাঠবেড়ালী তোমার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু। যাও যাও, আর দেরি কোরো না, এখনি হয়তো পাখিটা কোথায় উড়ে যাবে।'

বটুক ভট্ট বিপাকে পড়িয়া বলিলেন—'অ্যাঁ—কিন্তু আমি—'

'নিতান্তই যদি গাছে চড়তে লজ্জা করে, উদ্যানপালিকাকে বোলো, সে ধরে দেবে। যাও।'

সেনজিৎ বটুক ভট্টের পৃষ্ঠে লঘু করাঘাত করিতে করিতে তাঁহাকে দ্বারের দিকে প্রচালিত করিলেন। বটুক ভট্টের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল তাঁহার যাইবার একটুও ইচ্ছা নাই। তিনি বলিলেন—

'অবশ্য রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু অনাহূতভাবে রাজ-অবরোধে প্রবেশ করা কি উচিত হবে? লোকে যদি নিন্দা করে—'

'কেউ নিন্দা করবে না, তুমি যাও।'

'অকলঙ্ক-চরিত্র ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সর্বদা সাবধানে থাকতে হয়—'

সেনজিৎ ঘাড় ধরিয়া বটুক ভট্টকে নিজের দিকে ফিরাইলেন।

'তোমার এত ভয়টা কিসের?'

'এঁ—এঁ—যদি আবার তীর ছোঁড়ে!'

সেনজিৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—

'ভয় নেই—রসিকতা করতে যেও না, তাহলেই আর কোনও বিপদ ঘটবে না।'

'মানে—যেতেই হবে?'

'হ্যাঁ—রাজার আদেশ।'

গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বটুক ভট্ট দ্বারের দিকে চলিলেন, আপন মনে বিড়বিড় করিতে লাগিলেন—

'এই জন্যেই তো প্রজারা মাৎস্যন্যায় করে—সামান্য একটা টিয়া পাখির জন্যে—'

দ্বার পর্যন্ত গিয়া বটুক ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।—

'বয়স্য, আমি বলি, তুমিও আমার সঙ্গে চল না! দু'জনে থাকলে বিপদে আপদে দু'জনকে রক্ষে করতে পারব!'

সেনজিৎ তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

'মূর্খ, আমিই যদি যাব তাহলে তোমাকে পাঠাচ্ছি কেন!'

বটুক এবার ব্যাকুলভাবে হাত জোড় করিলেন।—

'বয়স্য, ক্ষমা কর, আমাকে একলা পাঠিও না। ঐ—ঐ বিদেশিনী যুবতীটাকে আমি বড় ভয় করি। মিনতি করছি, তুমিও চল।'

সেনজিৎ একবার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—'না, তুমি একাই যাও, আমি যাব না।'

বটুক ভট্ট এবার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। বলিলেন—'কেন, তোমার এত ভয় কিসের!'

সেনজিৎ ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে বলিলেন—'ভয়! কোন্ পাষণ্ড এ কথা বলে! আমি কি তোমার মত শিখা-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ!'

বটুক ভট্ট নীরবে মিটিমিটি চাহিতে লাগিলেন। সেনজিৎ তখন অধীরস্বরে বলিলেন—

'বেশ, একলা যেতে ভয় পাও আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। নারী-ভয়ে মুক্তকচ্ছ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করাও সম্ভবত রাজধর্ম।'

সেনজিৎ বটুকের বাহু ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে এক সময় বটুকের গলা হইতে চাপা হাসির মত একটা শব্দ বাহির হইল। রাজা সন্দিগ্ধভাবে চাহিলেন, কিন্তু বটুকের মুখে হাসির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না।

অবরোধের সরোবর-তীরে উল্কা ও বাসবী স্নান সারিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়াছে। বাসবী গা-মোছা দিয়া চুলের জল ঝাড়িতেছে; উল্কা একটি রক্ত-কুরুবক বৃক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া অর্ধ-বিকশিত কুরুবকের কলি কানে পরিতেছে। অন্য সখীরা জলে নামিয়া স্নানের উপক্রম করিতেছে।

সহসা বাসবী বাহিরের দিকে তাকাইয়া গলার মধ্যে অস্ফুট শব্দ করিল—ও মা! উল্কা শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল।

অনতিদূরে এক আমলকী বৃক্ষের নিকটে সেনজিৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া বৃক্ষের একটা শাখা দেখাইতেছেন। বটুক ভট্ট সঙ্গে আছেন। স্নানের ঘাটের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই।

এদিকে সখীরা উল্কার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। উল্কার চোখে বিদ্যুৎ। সে হ্রস্বকণ্ঠে সখীদের বলিল—

'তোরা যা—'

বাসবী ও সখীরা চুপি চুপি অপসৃত হইল। উল্কা সেনজিতের উপর চক্ষু রাখিয়া নতজানু হইল, হাতের কাছে নূপুর পড়িয়াছিল, নিঃশব্দে দুই পায়ে পরিল, কয়েকটি ফুল ঝরিয়া পড়িয়া ছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। উল্কার মুখ দেখিয়া মনে হয় সে নিজের সঙ্গেই যেন ষড়যন্ত্র করিতেছে।

উল্কার দিকে প্রায় পিছন ফিরিয়া সেনজিৎ ও বটুক ভট্ট আমলকী বৃক্ষে পক্ষী

অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ঝিম্‌ঝিম্‌ নূপুরের শব্দে চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। উল্কাকে সেনজিৎ পূর্বে স্ত্রী-বেশে দেখেন নাই; যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। বটুক ভট্টও ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

নূপুরের ছন্দে বরতনু লীলায়িত করিয়া উল্কা রাজার দিকে অগ্রসর হইল; রাজা মোহগ্রস্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। উল্কা হাসিমুকুলিত মুখে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, ফুলগুলিকে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে রাজার দিকে বাড়াইয়া দিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—

'প্রভাতে রাজদর্শন পেলাম—আজ আমার সুপ্রভাত। দেবপ্রিয়, দাসীর অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।'

সেনজিৎ নির্বাক চাহিয়া রহিলেন।

বটুক ভট্ট ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'দেখছ কি বয়স্য? আশীর্বাদ কর—জয়োস্তু জয়োস্তু —প্রজাবতী হও—চিরায়ুষ্মতী হও। ইতি বটুকভট্টঃ।'

বলিতে বলিতে বটুক ভট্ট পিছু হটিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেনজিৎ ঈষৎ সচেতন হইয়া একটি ফুল উল্কার অঞ্জলি হইতে তুলিয়া লইলেন, সংযত স্বরে বলিলেন—

'স্বস্তি। আয়ুষ্মতী হও।'

উল্কা বলিল—'মহারাজ! এতদিনে বিদেশিনী আশ্রিতার কথা মনে পড়ল! রাজকার্য কি এতই গুরু?'

সেনজিৎ একটু অপ্রতিভ হইলেন। প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন—'আমার একটা টিয়া পাখি উড়ে এসে এই আমলকী গাছে বসেছে—তাকে ধরতে এসেছি।'

উল্কা কলহাস্য করিয়া উঠিল—

'সত্যি! টিয়া পাখি ধরতে এসেছেন! কই, আসুন তো দেখি কোথায় আপনার পাখি।'

দুইজনে আমলকী বৃক্ষের আরও নিকটে গেলেন।

উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার পাখির নাম কি মহারাজ?'

সেনজিৎ বলিলেন—'বিম্বোষ্ঠ।'

উল্কা আনন্দে করতালি দিয়া বলিল—'বিম্বোষ্ঠ! কি সুন্দর নাম। আমারও একটি টিয়া পাখি আছে, কিন্তু—'

সেনজিৎ প্রশ্ন করিলেন—'তুমি টিয়া পাখি কোথায় পেলে?'

উল্কা বলিল—'কঞ্চুকী মশায় আমাকে দিয়েছেন। পাখি এরই মধ্যে আমার নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করেছে; কিন্তু তার নিজের এখনও নামকরণ হয়নি। কি নাম রাখি আপনি বলুন না মহারাজ।'

সেনজিৎ বলিলেন—'বাচাল নাম রাখতে পার।'

উল্কা আবার কৌতুক-বিগলিত কণ্ঠে হাসিল। সেনজিৎও একটু হাসিলেন; তাঁহার অনুসন্ধানী দৃষ্টি আমলকী বৃক্ষের চূড়ায় বিম্বোষ্ঠকে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

ওদিকে বটুক ভট্ট অবরোধ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন। দেখিলেন কঞ্চুকী হন্তদন্তভাবে ভিতরে আসিতেছেন।

বটুক ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—'হন্‌ হন্‌ করে চলেছ কোথায়?'

কঞ্চুকী ব্যস্তসমস্তভাবে প্রশ্ন করিল—'মহারাজ নাকি অবরোধে পদার্পণ করেছেন!'

বটুক ভট্ট বলিলেন—'তা করেছেন—কিন্তু তাই বলে তুমি এখন ওদিকে পদার্পণ কোরো না।'

কঞ্চুকী বলিল—'সে কী! আমি না গেলে মহারাজের পরিচর্যা করবে কে?'

বটুক ভট্ট দৃঢ়ভাবে কঞ্চুকীর বাহু ধরিয়া বাহিরের দিকে প্রচালিত করিলেন। বলিলেন—'পরিচর্যা করবার লোক আছে, তোমাকে ভাবতে হবে না। মহারাজ এখন ব্যস্ত আছেন। তিনি আর ঐ বৈশালীর মহিলাটি—দু'জনে মিলে পাখি ধরছেন। ইতি বটুকভট্টঃ।'

বটুক গম্ভীরভাবে চোখ টিপিলেন।

বৃক্ষতলে উল্কা ও সেনজিৎ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে পক্ষী অন্বেষণ করিতেছেন। সহসা উল্কা একহাতে সেনজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিত চাপা সুরে বলিয়া উঠিল—

'ঐ যে। ঐ দেখুন আপনার ধূর্ত পাখি পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে! ঐ যে! দেখতে পেয়েছেন?'

সেনজিৎ দৃষ্টি নামাইলেন, উল্কার হাত হইতে ধীরে ধীরে নিজের মণিবন্ধ ছাড়াইয়া লইলেন। ভ্রূকুটি করিয়া আবার ঊর্ধ্বে চাহিলেন।

ধমকের সুরে বলিলেন—'বিম্বোষ্ঠ! নেমে আয়!'

পাখিটা পত্রান্তরালে বসিয়া ফল খাইতেছিল, রাজার স্বর শুনিয়া চকিতে ফল ফেলিয়া দিল, সতর্কভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া নীচের দিকে তাকাইল, তারপর পাশের দিকে সরিয়া গিয়া এক শাখার আড়ালে লুকাইবার চেষ্টা করিল। উল্কা কপট ভ্রূকুটি করিয়া পাখিকে ডাকিল—

'ধৃষ্ট পাখি! এত সাহস তোর, মহারাজের আদেশ লঙ্ঘন করিস। এখনও নেমে আয়, নইলে দুই পায়ে শিকল দিয়ে খাঁচায় বন্ধ করে রাখব।'

পাখি কিন্তু উল্কার শাসনবাক্য গ্রাহ্য করিল না।

সেনজিৎ বলিলেন—'বিম্বোষ্ঠ!...না, ডাকলে আসবে না। কী করা যায়!'

উল্কা কপোলে তর্জনী রাখিয়া চিন্তা করিল। সহসা তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—

'এক উপায় আছে। একটু অপেক্ষা করুন—'

উল্কা অন্তঃপুর-ভবনের দিকে কয়েক পা গিয়া ডাকিল—

'বাসবী! ইন্দ্রসেনা! আমার পাখি নিয়ে আয়—পাখি।'

বাসবী ছুটিয়া ভবন হইতে বাহির হইয়া আসিল, আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সেনজিৎ ঈষৎ বিস্ময়ে বলিলেন—'পাখি কি হবে?'

উল্কা গূঢ় হাসিল—'এখনি দেখতে পাবেন মহারাজ।'

বাসবী ফিরিয়া আসিল; তাহার মণিবন্ধে বসিয়া আছে একটি টিয়া পাখি। উল্কা আগাইয়া গেল, টিয়া পাখিটা উল্কাকে দেখিয়া 'উল্কা' 'উল্কা' বলিয়া তাহার মণিবন্ধে আসিয়া বসিল। বাসবী উল্কার পানে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল। উল্কা রাজার কাছে প্রত্যাবর্তন করিল। পাখি দেখিয়া সেনজিৎ উল্কার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি ভ্রূ তুলিলেন।

'পাখি দিয়ে পাখি ধরবে!'

উল্কা হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইল।

'হাঁ। কেন, তা কি অসম্ভব?'

সেনজিৎ শুষ্কস্বরে বলিলেন—'জানি না। চেষ্টা করে দেখতে পার।'

উল্কা তখন বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া কুহক-মধুর স্বরে ডাকিল—

'আয় আয় বিম্বোষ্ঠ! তোর সাথী তোকে ডাকছে। আয় আয়!'

গাছের উপর বিম্বোষ্ঠ কৌতূহলীভাবে নীচের দিকে তাকাইল, ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিল। তারপর উড়িয়া আসিয়া উল্কার স্কন্ধে বসিল।

উল্কা বিজয়দীপ্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'দেখলেন মহারাজ!'

সেনজিৎ নীরসকণ্ঠে বলিলেন—'দেখলাম। এবার আমার পাখি আমাকে দাও—আমি যাই।'

বিম্বোষ্ঠের পায়ে শিকলির ছিন্নাংশ লাগিয়া ছিল, সেনজিৎ কাছে আসিয়া শিকলি ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। অমনি উল্কার পাখি ঝট্‌পট্ করিয়া উড়িয়া গেল। বিম্বোষ্ঠ উড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু সেনজিৎ শিকলি ধরিয়া ফেলিলেন। ভয় পাইয়া বিম্বোষ্ঠ সেনজিতের বুকের উপর গিয়া পড়িল। তাহার তীক্ষ্ন নখ রাজার উন্মুক্ত বক্ষে কয়েকটা আঁচড় কাটিয়া দিল। সেনজিৎ শিকলি ছাড়িয়া দিলেন, বিম্বোষ্ঠ উড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে রাজার বক্ষে রক্ত-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। দুই বিন্দু রক্ত সঞ্চিত হইয়া

ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িল। উল্কা সত্রাসে বলিয়া উঠিল—

'সর্বনাশ! মহারাজ, এ কি হল! (ফিরিয়া) ওরে কে আছিস, অনুলেপন নিয়ে আয় —মহারাজ আহত হয়েছেন। বাসবী! বিপাশা!'

সেনজিৎ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া প্রায় রূঢ়স্বরে বলিলেন—'এ কিছু নয়, সামান্য নখক্ষত মাত্র!'

উল্কা ত্রস্তভাবে বলিল—'সামান্য নখক্ষত! মহারাজ কি জানেন না, পশুপক্ষীর নখে বিষ থাকে!—কই, কেউ আসে না কেন? বিলম্বে বিষ যে শরীরে প্রবেশ করবে—বাসবী! ইন্দ্রসেনা!'

কেহ আসিল না। তখন উল্কা হঠাৎ যেন পথ খুঁজিয়া পাইয়া বলিয়া উঠিল—

'মহারাজ, আপনি স্থির হয়ে দাঁড়ান, আমি বিষ টেনে নিচ্ছি—'

উল্কার অভিপ্রায় মহারাজ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই উল্কা তাঁহার একেবারে কাছে গিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত তাঁহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া ক্ষরণশীল ক্ষতের উপর অধর স্থাপন করিল। মহারাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তারপর দ্রুত পিছু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

উল্কার অধরে মহারাজের বক্ষ-শোণিত, সে অর্ধস্ফুট বিস্ময়ে বলিল—

'কি হল?'

সেনজিৎ ঘৃণাভরে বলিলেন—'স্ত্রীলোকের পুরুষভাব আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু নির্লজ্জতা অসহ্য।'

উল্কার প্রতি আর দৃক্‌পাত না করিয়া সেনজিৎ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। উল্কা স্থির নেত্রে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতে লাগিল। তারপর সে সজোরে দাঁত দিয়া অধর দংশন করিল।

* * • *

সেনজিতের বিশ্রামগৃহ। রাজা একাকী কক্ষের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পাদচারণ করিতেছেন, তাঁহার অশান্ত মুখে অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি প্রতিফলিত। একবার পরিক্রমণ করিতে করিতে তিনি একটি সোনার দর্পণ তুলিয়া লইলেন, নিজের বক্ষস্থলে পাখির নখাঙ্কিত আঁচড়গুলি দেখিলেন। তারপর দর্পণ রাখিয়া দিলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিবার পর তাঁহার মনে হইল বদ্ধ ঘরে নিশ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। তিনি একটি গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

দেখিলেন, অদূরে বলভির উপর কপোত-মিথুন প্রণয়-লীলায় নিমগ্ন, চঞ্চু-চুম্বনের অবসরে কূজন করিতেছে। সেনজিৎ আবার গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিলেন।

অন্তঃপুরে উল্কার শয়নকক্ষ। বাতায়ন বন্ধ, তাই কক্ষটি ঈষদন্ধকার। উল্কা উপাধানে মুখ গুঁজিয়া শয্যায় শুইয়া আছে।

বাসবী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার পিছনে অন্য সখীগণ। সকলের মুখে-চোখে উৎকণ্ঠা। তাহারা নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যা-পাশে দাঁড়াইল।

বাসবী কুণ্ঠিতস্বরে বলিল—'প্রিয়সখি, কী হয়েছে—!'

উল্কা তড়িদ্বেগে উঠিয়া বসিল; তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ ক্রোধে বিকৃত। সে তীব্রস্বরে বলিল—'কী—কি চাও তোমরা? যাও আমার সুমুখ থেকে—যাও—!'

সখীরা উল্কার মূর্তি দেখিয়া পিছু হটিল, উল্কা আবার শুইয়া পড়িল এবং উপাধানে মুখ ঢাকিল। সখীরা শঙ্কিত মুখে পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে উল্কা আবার উঠিয়া বসিল; মুখের উপর হইতে স্খলিত কুন্তল সরাইয়া

জ্বরাক্রান্ত চোখে শূন্যে চাহিয়া রহিল। তারপর শয্যা হইতে নামিল।

কক্ষের একটি প্রাচীরে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল। চর্ম অসি ছুরিকা ইত্যাদি। উল্কা সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ অস্ত্রগুলি নিরীক্ষণ করিয়া ছুরিকাটি হাতে তুলিয়া লইল। তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার ন্যায় ছুরি; উল্কা তাহা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বাম করতলের উপর তাহার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিল। উল্কার কঠিন মুখ আরও কঠিন হইয়া উঠিল। সে ঘাড় ফিরাইয়া পাশের দিকে তাকাইল।

পাশের দেয়ালে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে, বীণা বংশী মৃদঙ্গ। উল্কা সেখানে গিয়া দাঁড়াইল, বীণার তন্ত্রীতে মৃদু অঙ্গুলির আঘাত করিল। তন্ত্রীর ঝঙ্কার শুনিয়া তাহার কঠিন মুখ একটু কোমল হইল, অধরে তিক্ত-তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিল। সে ডাকিল—

'বাসবী—'

বাসবী সাগ্রহ সশঙ্ক মুখে প্রবেশ করিল।—'প্রিয়সখি—

উল্কা বাসবীকে জড়াইয়া ধরিল, বাসবী গলিয়া গেল।

উল্কা বলিল—'তোরা আমার ওপর রাগ করিস্‌নি?'

বাসবী বলিল—'না না—কিন্তু কি হয়েছে প্রিয়সখি? মহারাজ কি—?'

'কিছু হয়নি—বসন্ত-পূর্ণিমা কবে জানিস্‌?'

'বসন্ত-পূর্ণিমা! সে তো আর তিন দিন আছে। কঞ্চুকী মশাই বলছিলেন।'

উল্কা নিজ মনে বলিল—'তিন দিন—যথেষ্ট।'

'কী বলছ—কি যথেষ্ট?'

উল্কা বাসবীর মুখের পানে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—'বাসবী, আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে—বসন্ত-পূর্ণিমার চাঁদ অস্ত যাবার আগে—মহারাজ সেনজিৎ আমার কাছে আসবেন—আমার প্রেম-ভিক্ষা করবেন। এ যদি না হয়, আমার নারী-জন্মই বৃথা।'

প্রভাত কাল। মধুর স্বননে বংশী বাজিতেছে। পাটলিপুত্রের নগর-উদ্যানে গাছে গাছে ফুল ফুটিয়াছে, অশোক চম্পা কর্ণিকার কিংশুক; ফুলে ফুলে ফুলময়।

বেলা বাড়িয়া চলিল। পাটলিপুত্রের গৃহে গৃহে পুষ্প-কেতন উড়িতেছে, দ্বারে দ্বারে আম্রপত্রের মালিকা। নাগরিক নাগরিকাগণ দল বাঁধিয়া পথে বাহির হইয়াছে। গান গাহিতে গাহিতে তাহারা চলিয়াছে, পথিকদের গায়ে কুঙ্কুম ছুঁড়িয়া মারিতেছে। বংশীর কলিত কলস্বনের সহিত যুবতীদের কলহাস্য মিশিতেছে।

চতুষ্পথের মাঝখানে মদন-মন্দির। মন্দিরের প্রাচীর নাই, পঞ্চস্তম্ভের উপর ছাদের চূড়া উঠিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে ধনুর্ধর দেবতার মূর্তি দেখা যাইতেছে। একদল যুবতী নাচিতে নাচিতে মন্দির পরিক্রমা করিতেছে ও প্রতিমার অঙ্গে পুষ্প-নিক্ষেপ করিতেছে। ইহারা নগরের বারনারী। নাচিতে নাচিতে রসে-ভরা যৌবনের গান গাহিতেছে।

সেনজিতের শয়নকক্ষ। রাজা পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছেন।

সহসা বাতায়নের বাহিরে বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের কর্ণবিদারী শব্দ উত্থিত হইল। রাজার ঘুম ভাঙিগয়া গেল। তিনি বিরক্ত মুখে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—

'অভিজিৎ!'

রাজার সন্নিধাতা অভিজিৎ প্রবেশ করিল। তাহার বেশবাস উৎসবের উপযোগী; কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে অঙ্গদ, গলায় ফুলের মালা, পরিধানে পট্টাম্বর ও উত্তরীয়। সে প্রবেশ

করিতেই রাজা রুক্ষস্বরে বলিলেন—

'এ কি! এত শব্দ কিসের?'

সান্নিধাতা বলিল—'আয়ুষ্মন্, আজ দোলপূর্ণিমা—মদনোৎসব!'

রাজা শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন। বলিলেন—

'মদনোৎসব—তা এত গণ্ডগোল কেন?'

সন্নিধাতার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল—

'মহারাজ, আজ আনন্দের দিন—তাই পুরবাসীরা উৎসব করছে!'

সেনজিৎ বাতায়ন খুলিয়া বাহিরে চাহিলেন, আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিলেন—

'উৎসব! কিসের জন্য উৎসব! যাও, এখনি বন্ধ করে দাও—মদনোৎসব হবে না।'

সান্নিধাতা বুদ্ধিভ্রষ্টভাবে বলিল—'মদনোৎসব হবে না—মদনোৎসব হবে না! কিন্তু মহারাজ—'

সেনজিৎ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'আমার আদেশ, মদনোৎসব বন্ধ থাকবে। যাও, নগরে ঘোষণা করে দাও—দাঁড়িয়ে দেখছ কি? যাও।'

'যথা আজ্ঞা মহারাজ—' হতভম্ব অভিজিৎ প্রস্থান করিল।

রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে পুরীর দাসদাসীরা অভিনব বেশে সজ্জিত হইয়া উৎসবে মাতিয়াছে। যুবতী দাসীরা কোমরে কাপড় জড়াইয়া কাঁখে কলস লইয়া নাচিতেছে, ভৃত্যেরা শিঙা বাঁশী ঢোল বাজাইতেছে। যবনী প্রতিহারীরাও স্বদেশের পোষাক পরিয়া যোগ দিয়াছে। উদ্দাম উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

অবরোধের একটি অলিন্দ। উল্কা বাতায়নে দাঁড়াইয়া রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাসাদ-অঙ্গন হইতে বাদ্যযন্ত্রের নিনাদ আসিতেছে। উল্কার চোখেমুখে অসহ্য উৎকণ্ঠা।

বাসবী আসিয়া উল্কার পাশে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বাসবী কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিল—

'প্রিয়সখি, মহারাজ তো আজও এলেন না!'

উল্কা অধর দংশন করিয়া বলিল—'না।'

সহসা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ থামিয়া গেল। উল্কা ও বাসবী বিস্মিতভাবে পরস্পরের পানে চাহিল।

রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে দাসদাসীরা নৃত্য-গীত বন্ধ করিয়া অবাক-বিস্ময়ে রাজ-সান্নিধাতা অভিজিতের পানে চাহিয়া আছে। অবশেষে এক দাসী স্খলিতস্বরে প্রশ্ন করিল—

'মদনোৎসব বন্ধ থাকবে!'

সান্নিধাতা সক্ষোভে বলিল—'মহারাজের আদেশ।'

অবরোধের অলিন্দে উল্কা ও বাসবী পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া আছে। কঞ্চুকী কুণ্ঠিতমুখে প্রবেশ করিল।

বাসবী বলিল—'কঞ্চুকী মহাশয়, গীত-বাদ্য বন্ধ হয়ে গেল যে!'

কঞ্চুকী হতাশভাবে দুই হস্ত প্রসারিত করিল।—

'মহারাজ আদেশ দিয়েছেন—মদনোৎসব হবে না।'

চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও গীত-বাদ্যের শব্দ নাই। সেনজিৎ আপন বিশ্রামগৃহে একাকী বসিয়া আছেন, তাঁহার ললাট ভ্রূবদ্ধ। তিনি দুই হাতে একটি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িতেছেন!

বটুক ভট্ট আসিয়া রাজার কাছে বসিলেন—

'জয়োস্তু মহারাজ!'

সেনজিৎ হাস্যহীন মুখে বটুক ভট্টকে নিরীক্ষণ করিলেন—

'স্বস্তি।'

'শুনলাম, তুমি দোলপূর্ণিমার নৃত্য-গীত আনন্দ-উৎসব বন্ধ করে দিয়েছ! বেশ করেছ, ভাল করেছ, উত্তম কার্য করেছ।'

সেনজিতের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'এইসব অর্থহীন উৎসব আমার ভাল লাগে না।'

বটুক ভট্ট মুণ্ড নাড়িয়া বলিলেন—'বটেই তো, কেন ভাল লাগবে! এবং তোমার যখন ভাল লাগে না তখন প্রজাদেরই বা কেন ভাল লাগবে! কোন্ স্পর্ধায় তারা উৎসব করবে!'

বটুক ভট্টের ব্যঙ্গ বুঝিতে পারিয়া সেনজিৎ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন—

'কী বলতে চাও তুমি?'

'কিছু না বয়স্য। বছরের মধ্যে এই এক উৎসব, যেদিন ধনী-দরিদ্র বালক-বৃদ্ধ একসঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু তুমি যখন নিষেধ করেছ তখন সকলে নীরব থাকবে। কেবল—'

'কেবল—?'

'কেবল তোমার পক্ষীশালার পাখিগুলো অকারণে বড় কিচির-মিচির করছে। যদি অনুমতি দাও এখনি গিয়ে তাদের গলা টিপে নীরব করে দিতে পারি।'

সেনজিৎ কিছুক্ষণ নতমুখে রহিলেন, তারপর ব্যথাক্লিষ্ট মুখ তুলিলেন।

'বটুক, তোমার কথাই সত্য। কিন্তু বয়স্য, আমার বুকের জ্বালা যদি বুঝতে!'

বটুক ভট্ট গাঢ়স্বরে বলিলেন—'আমি সব বুঝেছি বয়স্য।—কিন্তু তুমি মিছে কষ্ট পাচ্ছ!'

'যাক।—সন্নিধাতাকে ডাকো।'

ডাকিতে হইল না, সন্নিধাতা অভিজিৎ নিজেই প্রবেশ করিল। দেখা গেল, তাহার পশ্চাতে পুরীর দাসদাসী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সন্নিধাতা করজোড়ে বলিল—'আজ্ঞা করুন আর্য।'

সেনজিৎ ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিলেন—'আমার আদেশ প্রত্যাহার করছি। যাও, সকলে উৎসব কর গিয়ে।'

দ্বারের কাছে দাসদাসীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—

'মহারাজের জয়—জয় দেবপ্রিয় মহারাজ!'

ভৃত্যেরা আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বটুক ভট্ট বলিলেন—'বয়স্য, আশীর্বাদ করি কন্দর্পদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন।'

সেনজিৎ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'বটুক, দ্বার বন্ধ করে দাও, বাতায়ন বন্ধ করে দাও। উৎসবের শব্দ আমি শুনতে চাই না।'

অবরোধের একটি কক্ষ। উল্কাকে ঘিরিয়া চারিজন সখী বসিয়াছে, তাহারা উল্কাকে ফুলের অলঙ্কার পরাইয়া দিতেছে। কঙ্কণ অবতংস গলায় চন্দ্রহার—সমস্তই ফুলের। উল্কা চোখে-মুখে বিদ্রোহ ভরিয়া বলিতেছে—

'মহারাজ সেনজিৎ যে আদেশই দিন, আমরা বসন্ত-উৎসব করব। তিনি যদি পারেন, নিজে এসে বাধা দিন।'

সখীরা নীরব। সহসা বাহিরে বিপুল বাদ্যোদ্যম শুনা গেল। সকলে হতচকিত হইয়া পরস্পর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এমন সময় কঞ্চুকী মহা-উল্লাসে প্রবেশ করিয়া

বলিল—

'সুসংবাদ! সুসংবাদ! মহারাজ আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। উৎসব হবে—মদনোৎসব হবে—'

কঞ্চুকী প্রায় নাচিতে নাচিতে প্রস্থান করিল। উল্কার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, চোখে আশার আলো ফুটিল।

* * *

বেলা দ্বিপ্রহর। নগরের বিভিন্ন স্থানে আবার উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। পুষ্করিণীর জলে রঙ গুলিয়া নাগরিক নাগরিকারা জলক্রীড়া করিতেছে। বিলাসী নাগরিকেরা নৌকায় চড়িয়া জলবিহার করিতেছে। বনে বনে প্রেমিক প্রেমিকাদের লুকোচুরি খেলা চলিতেছে, গাছে গাছে হিন্দোল দুলিতেছে।

অপরাহ্ণ আসিল। উল্কার শয়নকক্ষে বাতায়নে দাঁড়াইয়া উল্কা প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার পুষ্পভূষা শুকাইয়া গিয়াছে। দূর হইতে উৎসবের মিশ্রিত ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। উল্কার চোখে ব্যর্থতার শুষ্ক জ্বালা। মহারাজ আসেন নাই।

সহসা রূঢ় হস্ত সঞ্চালনে উল্কা নিজের গলার মালা ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, তারপর নিজ শয্যার পাশে আসিয়া বসিল। তীক্ষ্ণ নীরব কণ্ঠে ডাকিল—

'বাসবী!'

বাসবী উদ্বিগ্ন মুখে প্রবেশ করিল।

উল্কা প্রশ্ন করিল—'বেলা কত?'

বাসবী বলিল—'অপরাহ্ণ। কই প্রিয়সখি, মহারাজ তো এখনও এলেন না!'

উল্কা দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—'আসবেন। তুই লেখনী মসীপত্র নিয়ে আয়, মহারাজকে পত্র লিখব—'

বাসবী দ্রুতপদে চলিয়া গেল. উল্কা মুখে বাণ-বিদ্ধ মৃত হাসি লইয়া বসিয়া রহিল।

* * *

সায়াহ্ন। সেনজিৎ বিশ্রামগৃহে একাকী জানালার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। দীর্ঘ অন্তর্যুদ্ধে তাঁহার মুখ ক্ষত-বিক্ষত।

দ্বারের নিকট হইতে মন্ত্রী বলিলেন—

'জয়োস্তু মহারাজ।'

সেনজিৎ মুখ তুলিলেন—'মন্ত্রী! কি প্রয়োজন?'

মন্ত্রী প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মুখে কুণ্ঠা, হাতে কুণ্ডলীকৃত একটি লিপি।

'ক্ষমা করবেন, একটা গুরুতর কথা মহারাজকে জানাবার জন্য এলাম।'

'কী গুরুতর কথা? কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি চলত না?'

'না মহারাজ, বিলম্বে ঘোর অনিষ্ট হতে পারে।—আমরা জানতে পেরেছি যে গোপনে আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা হচ্ছে—'

সেনজিৎ তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন—'কে চেষ্টা করছে?'

মন্ত্রী কহিলেন—'মহারাজ, যাকে আপনি বিশ্বাস করে অবরোধে স্থান দিয়েছেন সে-ই চেষ্টা করছে।'

সেনজিৎ চকিত বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন। বলিলেন—

'বটে! প্রমাণ পেয়েছেন?'

মন্ত্রী লিপি দেখাইয়া বলিলেন—'এই যে প্রমাণ। পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

লিচ্ছবি দেশের এক গুপ্তচর এই লিপি নিয়ে আসছিল, পথে আমাদের গুপ্তচর লিপি চুরি করে এনেছে। এতে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে, সুযোগ পেলেই যেন রাষ্ট্রদূতী আপনাকে হত্যা করে।'

লিপি লইয়া সেনজিৎ নীরবে পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখ অমার্জিত প্রস্তরখণ্ডের মত কর্কশ হইয়া উঠিল।

মন্ত্রী বলিলেন—'মহারাজ, এখন এই বিশ্বাসঘাতিনী রাষ্ট্রদূতীকে—যদি অনুমতি হয়—'

সেনজিৎ পত্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—'যা করবার আমি করব, আপনি চিন্তিত হবেন না।'

মন্ত্রী উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিলেন—'আপনি সাবধানে থাকবেন। সতর্ক থাকবেন!'

সেনজিৎ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'অবশ্য। আপনি এখন আসুন।'

'জয়োস্তু মহারাজ।'

মন্ত্রী মহারাজের এই ঔদাসীন্য বুঝিতে পারিলেন না, একটু যেন অতৃপ্তভাবে প্রস্থান করিলেন। সেনজিৎ তখন আস্তরণে আসিয়া বসিলেন; আবার লিপি খুলিয়া পড়িলেন। তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটি নিশ্বাস পড়িল।

'উল্কা—আমাকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু কেন? কেন?'

দ্বারের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া সেনজিৎ দেখিলেন একটি যুবতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রশ্ন করিলেন—

'কে তুমি?'

বাসবী সলজ্জভাবে বলিল—'আমি উল্কার সখী—বাসবী।'

সেনজিৎ কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।

'কাছে এস।—তুমি উল্কার সখী! কী নাম তোমার?'

'বাসবী।'

'বাসবী। কিছু প্রয়োজন আছে?'

বাসবী মহারাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন কঞ্চুলীর মধ্য হইতে একটি পত্র বাহির করিল।

'মহারাজ, আমার প্রিয়সখী আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।'

পত্র হাতে লইয়া সেনজিৎ কিছুক্ষণ বাসবীর সলজ্জ সরল মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার সখী তাঁর মনের সব কথা তোমাকে বলেন?'

বাসবী আরও লজ্জা পাইয়া নতমুখে বলিল—'হাঁ, বলেন।'

সেনজিৎ ধীরস্বরে বলিলেন—'তিনি আমার প্রতি বিরূপ কেন বলতে পারো?'

লজ্জা ভুলিয়া বাসবী সবিস্ময়ে চাহিল।

'বিরূপ! মহারাজ, আমার প্রিয়সখী আজ তিন দিন আপনার পথ চেয়ে আছেন।'

এবার সেনজিৎ সবিস্ময়ে চাহিলেন; তারপর নীরবে পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে হইল তিনি উল্কার স্বর শুনিতে পাইতেছেন—

'দেবপ্রিয়, আজ বসন্ত-পূর্ণিমার রাত্রে লজ্জাহীনা উল্কা প্রার্থনা জানাইতেছে—একবার দর্শন দিবেন না কি? শুধু একটিবার দেখিব—আর কিছু না।'

পত্র পাঠ করিয়া সেনজিৎ কিছুক্ষণ নির্বাক বসিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে পত্র কুণ্ডলিত করিয়া অন্য পত্রটির পাশে রাখিলেন; তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় তিনি গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছেন।

বাসবী সংকোচভরে বলিল—'মহারাজ, পত্রের উত্তর দেবেন কি?'

সেনজিৎ সচেতন হইয়া বলিলেন—'উত্তর—! হাঁ—এই উত্তর।'

সেনজিৎ অন্য পত্রটি লইয়া বাসবীর হাতে দিলেন। বাসবী ক্ষণেক পত্র-হাতে দাঁড়াইয়া

রহিল, তারপর যুক্তকরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সেনজিৎ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

দিনের আলো ফুরাইয়া আসিতেছে। বটুক ভট্ট আসিয়া রাজার নিকটে বসিলেন। বলিলেন—

'বয়স্য, দিনটা তো উপবাসে কাটল, এবার পারণের ব্যবস্থা হোক।'

সেনজিৎ বলিলেন—'উপবাস! পারণ! বুঝতে পারলাম না।'

বটুক ভট্ট বলিলেন—'বুঝতে পারলে না? আচ্ছা, তবে একটা গল্প বলি শোনো।—পুরাকালে ঘরট্টঘর্ঘর নামে এক উগ্রতপা মুনি ছিলেন—মুনিবর যখন নিদ্রা যেতেন তখন তাঁর নাক দিয়ে—'

সেনজিৎ ক্লান্তস্বরে বলিলেন—'বটুক, আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জানো?'

'কী ইচ্ছা হচ্ছে বয়স্য?'

'তোমাকে শূলে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।'

বটুক ভট্ট লাফাইয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন—

'বয়স্য, ও ইচ্ছা দমন করো, আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরতে চাই—'

বটুক নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেনজিৎ অবিচলিত মুখে বসিয়া রহিলেন।

গভীর রাত্রি। পূর্ণিমার চাঁদ প্রায় মধ্যাকাশে।

অবরোধের সরোবর-তীরে শুভ্র সোপানশ্রেণীর এক পাশে উল্কা বসিয়া আছে। তাহার পরিধানে শুভ্র বেশ, দেহে অলংকার নাই, একটি মাত্র বেণী অংসের উপর দিয়া বুকের মাঝখানে লম্বিত হইয়া আছে।

উল্কার হাতে বীণা। সে খেদ বিগলিত মৃদু কণ্ঠে গান গাহিতেছে—

'ফাগুন রাতি পোহায়—তুমি এলে না!'

সেনজিতের বিশ্রাম-কক্ষ। চতুষ্কোণে দীপ জ্বলিতেছে, মুক্ত বাতায়নপথে জ্যোৎস্না-প্লাবিত বহির্দৃশ্য দেখা যাইতেছে। সেনজিৎ বাতায়নের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন, উল্কার গান মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে—

'চাঁদ মাথা নোয়ায়—তুমি এলে না।'

সহসা সেনজিৎ বাতায়ন হইতে ফিরিলেন। প্রাচীরগাত্রে একটি কোষবদ্ধ ক্ষুদ্র ছুরিকা ঝুলিতেছিল, তাহা লইয়া নিজের কটিবন্ধে বাঁধিলেন। তারপর ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ হইয়াছে।

সরোবরের ঘাটে উল্কা গান গাহিতেছে। তাহার দেহ মন যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে—তুমি এলে না! তুমি এলে না!

হঠাৎ সেনজিতের স্বর শুনিয়া উল্কা চমকিয়া উঠিল—

'উল্কা!'

দীর্ঘ পদক্ষেপে সেনজিৎ আসিতেছেন। উল্কার কোল হইতে বীণা পড়িয়া গেল, সে উদ্ভাসিত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল—

'দেবপ্রিয়—!

সেনজিৎ আসিয়া উল্কার হাত ধরিলেন, আবেগ-রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—

'উল্কা, আমি এসেছি। আর পারলাম না। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারলাম না—'

উল্কার কণ্ঠে গুঞ্জরণ উঠিল—'প্রিয়—প্রিয়তম—'

সেনজিৎ গাঢ়স্বরে বলিলেন—'উল্কা! মায়াবিনি! এ তুমি আমায় কী করেছ? আমার রক্তের সঙ্গে তুমি মিশে গেছ—আমার বুকের স্পন্দনে তোমার নাম ধ্বনিত হচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না? এই শোনো।'

সেনজিৎ উল্কার মস্তক নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে এইভাবে জগৎ সংসার ভুলিয়া রহিলেন। উল্কার চক্ষু আপনি মুদিয়া গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। তাহার একটি হাত সেনজিতের কটির উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, সেখানে কোষবন্ধ ছুরিকার অস্তিত্ব সে অনুভব করিল। সে মাথা তুলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—

'এ কি?'

সেনজিৎ আত্মস্থ হইলেন, কটি হইতে নিষ্কোষিত ছুরিকা বাহির করিয়া উল্কার হাতে দিলেন—

'হাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম।—তুমি নাকি আমাকে হত্যা করতেই মগধে এসেছ? এই নাও, তোমার কাজ শেষ কর।'

উল্কা ছুরিকা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল—

'প্রিয়তম, এ উল্কা আর সে উল্কা নেই—সে উল্কা মরে গিয়েছে—(স্বপ্নাবিষ্টমুখে হাসিল) আমি কে তা নিজেই জানি না। প্রিয়তম, তুমি বলে দাও—'

সেনজিৎ উল্কাকে আবার বাহুবদ্ধ করিলেন—

'উল্কা, তুমি মগধের পট্ট মহাদেবী।'

সহসা মাথার উপর একটি পেচক কর্কশ চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। চমকিয়া উল্কা ঊর্ধ্বে চাহিল, তাহার স্বপ্নাচ্ছন্নতা কাটিয়া গেল; বজ্রনির্ঘোষের মত তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল—তুমি বিষকন্যা! সে যন্ত্রবৎ উচ্চারণ করিল—

'পট্ট মহাদেবী—মগধের পট্ট মহাদেবী—'

সেনজিতের মুখের পানে চক্ষু তুলিয়া উল্কা দেখিল, তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। উল্কার চোখে ধীরে ধীরে ভয়ের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তারপর সে সেনজিতের বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া সত্রাসে পিছু হটিয়া গেল।

'না না না—'

সেনজিৎ ঈষৎ বিস্ময়ে উল্কার দিকে অগ্রসর হইলেন, উল্কা আবার পিছাইয়া গেল; আর্তস্বরে বলিল—

'না না, রাজাধিরাজ, তুমি আমার কাছে এস না—'

সেনজিৎ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—

'ছি উল্কা, এই কি ছলনার সময়!'

উল্কা এবার দেহ ও মুখের ভাব কঠিন করিয়া বলিল—

'মহারাজ, আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি আপনাকে ভালবাসি না।'

সেনজিৎ বলিলেন—'আর মিথ্যে কথায় ভোলাতে পারবে না। এস—কাছে এস—'

উল্কা ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল—'না না, প্রিয়তম, তুমি জানো না—তুমি জানো না—'

কাঁদিতে কাঁদিতে উল্কা বাড়ির দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। সেনজিৎ ক্ষণেক বিমূঢ় হইয়া রহিলেন, তারপর উল্কার অনুসরণ করিলেন।

অন্তঃপুর গৃহের দ্বার। উল্কা ছুটিতে ছুটিতে দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে সেনজিৎ দৌড়িতে দৌড়িতে সেই পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন—

'উল্কা—!'

উল্কার শয়নকক্ষের দ্বার। উল্কা প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার মুখ অশ্রুসিক্ত।

সেনজিৎ আসিয়া দ্বার ঠেলিলেন, দ্বার খুলিল না।

'উল্কা!'

কক্ষের ভিতর উল্কা কবাটে গণ্ড রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রু ঝরিতেছে। সে বলিল—

'রাজাধিরাজ, বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আপনার যোগ্য নারীর অভাব নেই, আপনি উল্কাকে ভুলে যান।'

দ্বারের অপর দিক হইতে সেনজিৎ তিক্তস্বরে বলিলেন—

'হৃদয়হীনা, তবে কেন আমাকে প্রলুব্ধ করেছিলে?'

'আর্য, বুদ্ধিহীনা নারীর প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করুন। আপনি ফিরে যান, দয়া করুন। আমাদের মিলন অসম্ভব।'

'কিন্তু কেন—কেন? কিসের বাধা?'

উল্কা ভগ্নস্বরে বলিল—'সে কথা বলবার নয়।'

সেনজিৎ বলিলেন—'কেন বলবার নয়? তোমাকে বলতে হবে। আমি শুনতে চাই।'

উল্কা ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিল। তারপর বলিল—

'আচ্ছা, কাল সকালে বলব।'

সেনজিৎ দ্বারের কাছে অধর আনিয়া স্নেহ-ক্ষরিত স্বরে বলিলেন—

'উল্কা, আজ এই বসন্ত-পূর্ণিমার রাত্রি—'

উল্কা আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—'না না না—'

সেনজিৎ ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন—'ভাল—কাল সকালে বলবে?'

'বলব।'

আশাহত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেনজিৎ চলিয়া গেলেন। উল্কা দ্বারের কাছে নতজানু হইয়া হৃদয়-বিদারক কান্না কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাত। উল্কা শয়ন ঘরের বাতায়নে দাঁড়াইয়া আছে। মনের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া রাত্রি কাটিয়াছে; উল্কার চোখের কোলে নীলাভ ছায়া তাহার মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কেশ-বেশ শিথিল, কবরীর অর্ধ-শুষ্ক মালা অংসে লুটাইতেছে।

সহসা বাহির হইতে একটি তীর আসিয়া বাতায়নের কাষ্ঠে বিদ্ধ হইল। উল্কা চকিতে তীর বাতায়ন হইতে টানিয়া মুক্ত করিল। দেখা গেল তীরের কাণ্ডে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে! উল্কা সযত্নে লিপি উন্মোচন করিয়া পড়িল। শিবামিশ্রের লিপি, তাহাতে লেখা আছে—

'কন্যা, স্মরণ রাখিও, শিশুনাগ বংশকে নির্মূল করা চাই!'

পত্র হাতে লইয়া উল্কার মুখে একটি তিক্ত হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল—সে পত্রখানি ছিঁড়িয়া দুই খণ্ড করিল, তারপর চারিখণ্ড করিল। এই সময় বাসবী প্রবেশ করিল।

'ওকি প্রিয়সখি, কার চিঠি ছিঁড়ছ?'

উল্কা বলিল—'বৈশালী থেকে পিতা লিখেছেন—'

সে পত্রের ছিন্নাংশগুলি বাতায়নের বাহিরে ফেলিয়া দিল।

'জানিস বাসবী, পিতা একটি ভুল করেছেন। আমার শরীরেও যে শিশুনাগ বংশের রক্ত আছে তা তাঁর মনে নেই।'

বাসবী হতবুদ্ধি হইয়া বলিল—'তোমার শরীরে শিশুনাগ বংশের রক্ত!

উল্কা চমকিয়া আত্মসংবরণ করিল—'ও—না না! আজ আমি কী সব বলছি তার ঠিক নেই।'

ঘরের যে-প্রাচীরে অস্ত্র-শস্ত্র টাঙানো ছিল উল্কা সেখানে গিয়া দুই হাতে দুইটি তরবারি তুলিয়া লইল। উল্কার হাতে ঋজু শাণিত তরবারি দুটি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। সে দুই হাতে তরবারি ঘুরাইতে লাগিল।

'এ কি করছ প্রিয়সখি!'

'দেখছি অসি-বিদ্যা ভুলে গেছি কিনা। আজ মহারাজের অস্ত্র-কৌশল পরীক্ষা করব। বাসবী, তাঁকে অসি-যুদ্ধে কি হারাতে পারব না?'

বাসবী উন্মুক্ত অধরে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—

'তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না!'

উল্কা বলিল—'তুই এখন বুঝতে পারবি না। আমি উদ্যানে যাচ্ছি. মহারাজ যদি আসেন তাঁকে বলবি, আমি মাধবীকুঞ্জে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

উল্কা দুইটি তরবারি লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

উদ্যানের এক প্রান্তে মাধবীকুঞ্জ। পুষ্পিতা মাধবীলতা মাথার উপর বিতান রচনা করিয়াছে।

বিতানতলে উল্কা এক পাশে দাঁড়াইয়া। তাহার দুই হাতে দুই তরবারির প্রান্তভাগ ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে। মুখে চোখে দৃঢ় যুযুৎসা। বিতানের অপর প্রান্তে সেনজিৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার বক্ষ বাহুবদ্ধ. চোখে কোমল ভর্ৎসনা।

'আজ আবার একী নতুন ছলনা?'

উল্কা চকিতে ফিরিয়া সেনজিৎকে দেখিল। তাহার মুখ কোমল হইল. আবার দৃঢ় হইল। সে বলিল—'ছলনা নয়। আমাদের দু'জনের মধ্যে এই তরবারির ব্যবধান।'

সেনজিৎ ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন—'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ অসি-যুদ্ধে পরাজিত করতে না পারলে আমাকে পাবেন না।'

সেনজিতের বিস্মিতমুখে ঈষৎ কৌতুকের ছায়া পড়িল—

'সে কী!'

'এই আমার বংশের প্রথা।'

'কিন্তু তুমি নারী. নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব কি করে!'

উল্কা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল—'মহারাজ কি আমাকে অস্ত্র-বিদ্যায় তাঁর সমকক্ষ মনে করেন না?'

সেনজিৎ হাসিয়া বলিলেন—'তা নয়। তোমার অস্ত্র-বিদ্যার পরিচয় আগেই পেয়েছি, এখনও বুক তোমার অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত—কিন্তু উল্কা. আমি যদি যুদ্ধ না করি?'

'তাহলে আমাকে পাবেন না।'

'যদি জোর করে গ্রহণ করি?'

'তাও পারবেন না—এই তরবারি বাধা দেবে।'

উল্কা ডান হাতের তরবারি তুলিল। সেনজিৎ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার দিকে

অগ্রসর হইলেন—

'বেশ, তোমার তরবারি আমাকে বাধা দিক।'

সেনজিৎ যতই কাছে আসিতে লাগিলেন, উল্কার মুখ ততই বিবর্ণ হইতে লাগিল। শেষে উল্কার অসির অগ্র যখন সেনজিতের বক্ষ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিয়াছে তখন উল্কা কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিল—

'মহারাজ, আর কাছে আসবেন না—'

মহারাজ কিন্তু অগ্রসর হইতে লাগিলেন, উল্কা তখন নিজেই তরবারি টানিয়া লইল। সেনজিৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। উল্কা বাধ্য হইয়া অসি নামাইল। সেনজিৎ তাহার দুই স্কন্ধে হাত রাখিয়া কপট ক্রোধে বলিলেন—

'আজ তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।'

উল্কা কাঁদিয়া ফেলিল—

'নিষ্ঠুর—নির্দয়! তোমার কি কলঙ্কের ভয় নেই? অসহায়া নারীর ওপর অত্যাচার করতে তোমার লজ্জা হয় না?'

সেনজিৎ বলিলেন—'না—হয় না। এস, এবার যুদ্ধ করি। (উল্কা চকিতে সজল চক্ষু তুলিল) পাছে তুমি মনে কর নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতেও আমি ভয় পাই, তাই অসি ধরলাম। এস।'

উল্কা বলিল—'প্রতিজ্ঞা করুন, যদি পরাজিত হন আমাকে স্পর্শ করবেন না।'

সেনজিৎ গর্বিতস্বরে বলিলেন—'প্রতিজ্ঞা করছি যদি পরাজিত হই, কখনও স্ত্রী-জাতির মুখ দেখব না।'

উল্কার হাত হইতে একটি তরবারি লইয়া সেনজিৎ কয়েক পদ পিছু হটিয়া অসি-ক্রীড়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু উল্কা বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিল না, তাহার তরবারি করচ্যুত হইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল।

সেনজিৎ নিজের তরবারি ফেলিয়া দিয়া উল্কার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

'এবার হয়েছে?'

উল্কা ব্যাকুল চক্ষে সেনজিতের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সেনজিৎ তখন তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া কোমলস্বরে বলিলেন—.

'উল্কা, আর তো বাধা নেই।'

উল্কা নিষ্প্রাণকণ্ঠে বলিল—'না, আর বাধা নেই।...আজ মধ্যরাত্রে তুমি এস, তোমার গলায় মালা দেব...আর...রক্তকমল দিয়ে তোমার পূজা করব।'

রাত্রি। অন্তঃপুরের বৃহৎ একটি কক্ষে অসংখ্য দীপ জ্বলিতেছে, চারিদিক পুষ্পমালা পুষ্পস্তবকে সমাকীর্ণ। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বেদীর মত আসন, তাহাতে বধূ-বেশিনী উল্কা বসিয়া আছে। তাহার হাতে এক গুচ্ছ রক্তকমল। চারিজন সখী তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে ও গান গাহিতেছে। উল্কার মুখে স্বপ্নাতুর বেদনা-বিধুর হাসি।

সখীরা গান গাহিল—

> আজি উজল মন-মন্দির সুন্দর এল
> তারে বরণ করিয়া নে লো।
> নয়ন সলিল ধারে
> ভুজ-বন্ধন হারে
> মন-মন্দির দ্বারে
> বরণ করিয়া নে লো।

মোর-মুকুট শিরে—শোভে শিরে
কনক-পীত চীরে—ধীরে ধীরে
সুন্দর এলো
তারে হৃদয়ে বরিয়া নে লো—

নৃত্যগীত শেষ হইলে দেখা গেল, মহারাজ সেনজিৎ দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে বর-বেশ, মুখে আনন্দের উল্লাস। সখীরা তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য দ্বার দিয়া অদৃশ্য হইল।

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্থির আয়ত নয়নে রাজার পানে চাহিল; রক্তকমলগুচ্ছ তাহার বুকের কাছে রহিল। সেনজিৎ আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইলেন। চোখে চোখে অনির্বচনীয় প্রীতির বিনিময় হইল।

'উল্কা!'

সেনজিৎ উল্কার দুই স্কন্ধে হাত রাখিয়া তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করিলেন, তারপর বিপুল আবেগভরে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বক্ষে বক্ষ নিষ্পেষিত হইল। উল্কার মাথা সেনজিতের বুকের উপর এলাইয়া পড়িল।

'উল্কা!'

ঈষৎ উদ্বেগে সেনজিৎ উল্কার মুখের পানে চাহিলেন, উল্কা অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে ম্রিয়মাণ হাসিল। সেনজিৎ তাহাকে দুই বাহু দ্বারা বক্ষ হইতে দূরে সরাইয়া দেখিলেন। রক্তকমলগুলি বুকের মাঝখান হইতে ঝরিয়া পড়িল। সেনজিৎ সভয়ে দেখিলেন, শলাকার ন্যায় সূক্ষ্ম ছুরিকা উল্কার বুকে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

'উল্কা! সর্বনাশী! এ কী!'

উল্কা অস্ফুটস্বরে বলিল—'এখন অন্য কথা নয়, শুধু ভালবাসা—প্রিয়তম, আরও কাছে এস...তোমাকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না—'

সেনজিৎ উল্কাকে দুই বাহু দিয়া বক্ষে তুলিয়া লইলেন। উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন—

'কিন্তু কেন উল্কা—কেন এ কাজ করলে?'

উল্কার চোখের কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গলিয়া পড়িল। সে নির্বাপিত স্বরে বলিল—

'প্রিয়তম, আমি বিষকন্যা—'

উল্কা আরও কিছু বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বলিতে পারিল না; তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। সেনজিৎ তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া হৃদয়-বিদারক স্বরে ডাকিলেন—

'উল্কা—উল্কা—উল্কা—'

বন্ধু

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

মেছুয়াবাজার স্ট্রীট যেখানে সার্কুলার রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে তাহারই কাছাকাছি একটি বড় বাড়ি। বাড়ির বাহিঃকক্ষ—চেয়ার, সোফা, ফুলদান-শীর্ষ টিপাই প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত। পাশে একটি টেবিলের উপর টেলিফোনের সরঞ্জাম

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটা। বাড়ির কর্তা হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় একটি টেবিলের এক পাশে বসিয়া আছে, তাহার বয়ঃক্রম ২৫।২৬, পাতলা সুন্দর চেহারা; অধর ও চিবুকের গড়ন কিছু দুর্বল। তাহার সম্মুখে টেবিলের অন্য পাশে গজাননবাবু বসিয়া আছেন। বয়স ৪০।৪৫, ঘুঘুর মত চেহারা; বেশভূষায় একটা অনভ্যস্ত পারিপাট্য দিবার চেষ্টা আছে। উভয়ের সম্মুখে চায়ের পেয়ালা। ব্যবসায়ের কথা হইতেছে

গজানন। যে দিক দিয়েই দেখুন ঘোড়ার ব্যবসার মত এমন ব্যবসা আর নেই।

হেমন্ত। (এক চুমুক চা খাইয়া) কিন্তু ঘোড়া তো আজকাল উঠে যাচ্ছে। আমার ঠাকুরদা হাঁকাতেন চৌঘুড়ি, আস্তাবলে তেইশটা ঘোড়া ছিল। বাবার আমলে চৌঘুড়ির জায়গায় জুড়ি হল। তারপর আজকাল ঘোড়ার গাড়ির পাটই একেবারে উঠে গেছে, আমার তিনখানা মোটর আছে, কিন্তু ঘোড়া একটাও নেই। সর্বত্রই তাই, মোটর আর ট্যাক্সিতে দেশ ছেয়ে গেছে। এ সময় ঘোড়ার ব্যবসা করলে কি লাভ হবে?

গজানন। হেমন্তবাবু, এবার আপনি হাসালেন। আমি কি ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার কথা বলেছি মশায়? রেসের ঘোড়া—রেসের ঘোড়া। যদি ফলাও করে ব্যবসা ফাঁদতে পারেন তিন মাসের মধ্যে ক্রোড়পতি—বুঝেছেন? ইহুদি সায়েব সলোমন গেল্ডিংএর নাম শুনেছেন তো? টাকার আদিগদি নেই। দেশালায়ের বদলে একশো টাকার নোট জ্বালিয়ে সিগারেট ধরায়। কোত্থেকে এল? স্রেফ ঘোড়া।

হেমন্ত। তাই নাকি? কিন্তু গেল্ডিং সায়েব তো দেউলে নিয়েছে।—সেদিন কাগজে পড়ছিলাম।

গজানন। নেবে না দেউলে? কথায় বলে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো। ঘোড়া ছেড়ে করতে গেল হোটেলের ব্যবসা। দুর্বুদ্ধি আর কাকে বলে! ব্যস্! দুদিন যেতে না যেতেই গণেশ ডিগবাজী খেতে লাগল!

হেমন্ত। ও—তা হলে ঘোড়ার ব্যবসায় গেল্ডিং সায়েবের লোকসান হয় নি?

গজানন। রামঃ, ঘোড়ার ব্যবসায় আজ পর্যন্ত কারুর লোকসান হয়েছে? এই দেখুন না—আগা খাঁ। দি আগা খাঁ। বিলেতজোড়া নাম; সম্রাটের সঙ্গে দেখা হলেই কোলাকুলি করেন। শুধু কি তাই? টাকা! এক একটা ঘোড়া বাজি মারে আর পাউণ্ড শিলিং পেন্সের গাদি লেগে যায়।

হেমন্ত। তা হলে আপনি ঘোড়ার ব্যবসা করবার পরামর্শ দেন?

গজানন। সে কথা বলতে! আজকালকার এই মন্দার বাজারে একমাত্র ব্যবসা হচ্ছে ঘোড়ার ব্যবসা—কত লোক লাল হয়ে গেল। একটি স্টেবল খুলে বসুন; তারপর একটি করে ঘোড়া বাজি মারতে থাকবে আর আপনিও এক পোঁচ লাল হতে থাকবেন।

হেমন্ত। বাস্তবিক আপনার কথা শুনে আমার খুবই উৎসাহ হচ্ছে গজাননবাবু, কিন্তু ঘোড়া সম্বন্ধে আমি যে কিছুই জানি না; কিছু না জেনে শুনে ব্যবসায় নামা ঠিক

হবে কি? অবশ্য ঘোড়ার চারটে পা আছে, টগবগ করে দৌড়োয় এসব জানি—কিন্তু—

গজানন। তার বেশি জানবার দরকার নেই—ওই যথেষ্ট। তা ছাড়া আমি রয়েছি কি করতে? একবার কারবার খুলে বসুন তো, তারপর প্রত্যেকটা ঘোড়ার নামধাম থেকে আরম্ভ করে সাতান্ন পুরুষের কুলুজি পর্যন্ত মুখস্ত করিয়ে ছেড়ে দেব—একেবারে নামতার মত। বুঝেছেন?

হেমন্ত। তা হলে তো কোনও কথাই নেই—আমি রাজি আছি। দেখুন গজাননবাবু, আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশের বড়লোকেরা ব্যবসা করতে চায় না—এতটুকু এন্টারপ্রাইজ নেই; কেবল ঘরে বসে বসে স্ফূর্তি করে টাকা ওড়াবে। অথচ আমাদের শাস্ত্রেই আছে, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। আচ্ছা, গোড়ায় কত টাকা ফেলতে হবে, তার একটা আন্দাজ দিতে পারেন?

গজাননের চোখের দৃষ্টি লোভে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল

গজানন। (যেন চিন্তা করিতে করিতে) বেশি নয়, আমি বলি আপাতত লাখখানেক টাকা নিয়ে কাজ আরম্ভ করুন। তারপর যেমন যেমন কাজ ফলাও হতে থাকবে, আবার টাকা ঢালতে থাকবেন।

হেমন্ত। (একটু ইতস্তত করিয়া) তা—তা বেশ—

গজানন। আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি? আরে মশায়, আপনার মত লোক যদি লাখ টাকা বের করতে ভয় পায় তা হলে বড় ব্যবসা হবে কোত্থেকে? দেখছেন না, এই জন্যেই আমাদের দেশের যত ভাল ভাল ব্যবসা মাড়োয়ারী আর ভাটিয়া এসে একচেটে করে নিয়েছে। সামান্য এক লক্ষ টাকা ফেলতে যদি আপনার সাহস না হয়—

হেমন্ত। না না, সে কথা নয়—

গজানন। হিসেবনিকেশের কথা ভাবছেন? কোনও ভয় নেই, যতক্ষণ গজানন সিংগি বেঁচে আছে আপনার একটি পয়সা গরমিল হতে পাবে না। একেবারে পাকা হিসেব লিখিয়ে দেব—বিশ্বাস না হয় চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টেণ্টকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেবেন।

অশনি প্রবেশ করিল। লম্বা দোহারা চেহারা; বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। চোয়াল ভারি, নাক উঁচু, গৌরবর্ণ—গোঁফদাড়ি কামানো, দেহে অতি সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি; পাঞ্জাবির ভিতরে হইতে পেশী-পুষ্ট মজবুত দেহের পরিচয় পাওয়া যায়। হেমন্ত হঠাৎ অশনিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল

হেমন্ত। এই যে অশনি! গজাননবাবু, আমাদের কথাটা এখন থাক, আর এক সময় হবে।

অশনি। (উপবেশনপূর্বক গজাননকে নিরীক্ষণ করিয়া) ইনি কে?

হেমন্ত। উনি গজাননবাবু, একজন—ইয়ে—ভদ্রলোক। তা গজাননবাবু, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, কাল কোন সময়ে আমাদের কাজের কথাটা হবে। কি বলেন?

গজানন। (সন্দিগ্ধভাবে অশনিকে নিরীক্ষণ করিয়া) ইনি আপনার কে হন?

হেমন্ত। উনি আমার বন্ধু—অশনিবাবু।

গজানন। ও—বন্ধু! (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) মশায়ের কি কলকাতাতেই থাকা হয়?

অশনি। আপাতত তাই বটে।

গজানন। কি করা হয়?

অশনি। এমন কিছু নয়। স্কুলে মাস্টারি করি, আর সময় অসময়ে বড়লোক বন্ধুর মনোরঞ্জন করি।

গজানন। ও—বুঝেছি। (অধর টিপিয়া একটু হাসিলেন)

হেমন্ত। আজ তা হলে—গজাননবাবু—

অশনি। তোমাদের কাজের কথা হোক না। আমি চুপটি করে বসে থাকব, দরকার না হলে একটি কথাও কইব না।

হেমন্ত। অশনি, চা খাবে? যাও না—ভেতরে যাও না—
অশনি। তুমি তো জানো আমি চা খাই না।
হেমন্ত। ও—তাও তো বটে। আচ্ছা, একটা সিগারেট খাও।
অশনি। সিগারেটও খাই না। বিড়ি থাকে তো দিতে পার।
হেমন্ত। বিড়ি? বিড়ি তো নেই—
গজানন। এই নিন—আসুন—(বিড়ি প্রদান)
অশনি। ধন্যবাদ—এবার আপনাদের কাজের কথা আরম্ভ হোক।
গজানন। হ্যাঁ কথা হচ্ছিল—প্রথমে অন্তত এক ডজন ঘোড়া কিনে স্টেবল আরম্ভ করে দিন। আমার জানত গুটিকয়েক ঘোড়া আছে; ঘোড়া নয় মশায়, একেবারে পক্ষীরাজ। সেই কটাকে যদি কোন রকমে যোগাড় করতে পারি—ব্যস্, কাম ফতে!
অশনি। হেমন্ত, তুমি ঘোড়া কিনবে নাকি?
হেমন্ত। হ্যাঁ—এই—ভাবছিলুম—
অশনি। এবার কি ছ্যাকড়া গাড়ির ব্যবসা আরম্ভ হবে?
গজানন। মশায়, আপনিও দেখছি একেবারে গোলা লোক। ছ্যাকড়া গাড়ি নয়—রেসের ঘোড়া। বুঝলেন।
অশনি। ও—রেসের ঘোড়া! তাই বলুন। তা হলে এখন রেসের ব্যবসার পরামর্শ চলছে। আপনি বুঝি হেমন্তকে এক ডজন ঘোড়া বিক্রি করতে চান?
গজানন। না, আমার নিজেব ঘোড়া নেই, তবে আমি কিনিয়ে দিতে পারি। আমি ঘোড়া চিনি।
অশনি। হুঁ। শুধু ঘোড়া নয়, গাধাও যে চেনেন তার পরিচয় পাচ্ছি। কিন্তু আপনার অত জ্ঞান অপব্যয় করবার দরকার নেই। হেমন্ত যদি ঘোড়া কিনতেই চায় আমি কিনে দিতে পারব।
গজানন। আপনি? আপনি তো মাস্টারি করেন—ঘোড়ার আপনি জানেন কি মশায়?
অশনি। জানি না বিশেষ কিছু। তবে মাঝে মাঝে চাবুকের ব্যবসা করে থাকি, এইটুকুই যা ভরসা।
গজানন। চাবুকের ব্যবসা! (উচ্চ হাস্য) যান যান মশায়, আপনি হাসালেন। ঘোড়া কেনা আপনার কম্ম নয়! চাবুকের ব্যবসা! আপনাকে ওয়েলার ঘোড়া কিনতে দিলে আপনি বেবাক্ ফক্করে ঘোড়া কিনে বসে থাকবেন। হাঃ হাঃ হাঃ! ঘোড়া কেনা যার তার কাজ নয় মশায়, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। রীতিমত অভিজ্ঞতা চাই।
অশনি। তা চাই বৈ কি!
গজানন। আপনার কি অভিজ্ঞতা আছে যে ঘোড়া কিনবেন বলছেন?
অশনি। কোনও অভিজ্ঞতা নেই। সত্য কথা বলতে কি আজ পর্যন্ত আমি একটাও ঘোড়া কিনি নি।
গজানন। তবে? ঘোড়া অমনি কিনলেই হল? আপনার মতলব আমি বুঝেছি: আপনি ভাবছেন ভালমানুষ বন্ধুকে যা হোক একটা কিছু বুঝিয়ে দিয়ে—হেং হেং—

ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ টিপিলেন

অশনি। গজাননবাবু, আমার ভালমানুষ বন্ধুকে যা বোঝাবার তা আমি বোঝাবোই, আপনি আটকাতে পারবেন না! কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, আমি ঘোড়া চিনি নে বটে, কিন্তু ঘোড়েল চিনি।
গজানন। তার মানে?
অশনি। তার মানে আপনাকে আমি চিনেছি। (উঠিয়া আসিয়া গজাননের কর্ণধারণপূর্বক) এইবার আপনাকে উঠতে হবে।
গজানন। (চীৎকার করিয়া) ছাড়ুন ছাড়ুন—আস্তে মশায়, জ্বলন্ত বিড়িটা কানের মধ্যে

পুরে দিয়েছেন যে—

হেমন্ত। অশনি, কি করছ? ভদ্রলোক—

অশনি। তুমি থাম। গজাননবাবু, ঐ দরজা খোলা রয়েছে, সোজা বেরিয়ে যান। আর যদি কখনও এ বাড়িতে মাথা গলান তা হলে জ্বলন্ত বিড়ির চেয়েও সাংঘাতিক জিনিস আপনার কানে প্রবেশ করবে।

কান ছাড়িয়া দিল

গজানন। আচ্ছা, আমিও গজানন সিংগি—দেখে নেব—

অশনি। (সহসা গর্জন করিয়া) চোপ রও—

গজানন লাফাইয়া প্রস্থান করিল

(ফিরিয়া বসিয়া) এই মহাপুরুষটিকে কবে যোগাড় করলে? আগে তো দেখি নি।

হেমন্ত। এ তোমার ভারি অন্যায় অশনি!

অশনি। অন্যায়টা কোন্‌খানে দেখলে?

হেমন্ত। ভদ্রলোককে অপমান করার কি দরকার ছিল?

অশনি। অপমানের একটা কথাও তো আমি বলি নি, শুধু ভদ্রলোকের কানটি ধরে তাড়িয়ে দিয়েছি মাত্র। এমন কি যে বিড়িটি তিনি আমায় দিয়েছিলেন সেটি পর্যন্ত তাঁকে ফেরত দিয়েছি।

হেমন্ত। তোমার গায়ে যে জোর আছে, তুমি যে দুবেলা ডাম্বেল ভাঁজ, সেটা সদাসর্বদা লোককে দেখাতে চাও?

অশনি। তাতে দোষটা কি? আমাদের দেশের লোক নিজের রুগ্ন দুর্বলতা দেখিয়ে পরের কৃপা ভিক্ষা করতে ভালবাসে—সেইটেই কি ভাল? ও কথা থাক। কিন্তু তোমাকে নিয়ে তো আমার ভারি মুশকিল হল দেখছি। তুমি যদি একটু সুবিধে পেলেই লাখ টাকা ভেঙে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে দাও, তা হলে তো মহা বিপদ!

হেমন্ত। (অস্থিরভাবে) দেখ অশনি, তুমি এমনভাবে কথা বল—যেন আমি একটা পাঁচ বছরের শিশু আর তুমি আমার অভিভাবক। আমি যদি ব্যবসাই করি তাতে তোমার বিপদটা কি শুনি?

অশনি। আমার বিপদ এই যে, ভগবান আমাকে কর্তব্যজ্ঞান দিয়েছেন, আর তুমি আমার বন্ধু। তোমার পূর্বপুরুষেরা তোমার জন্যে অনেক বিষয়সম্পত্তি রেখে গেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সব রক্ষা করবার উপযুক্ত বিষয়বুদ্ধি তোমাকে দেন নি। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে সে ভার নিতে হয়েছে।

হেমন্ত। ওঃ—আমার বিষয়বুদ্ধি নেই, আর তুমি বিষয়বুদ্ধির জাহাজ। সেইজন্যেই বুঝি বিলেত থেকে আই সি এস পাস করে এসে একশো টাকা মাইনের মাস্টারি করছ?

অশনি। সেটা বিষয়বুদ্ধির অভাবে নয়, কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায়। বিষয়বুদ্ধির চেয়েও একটা বড় জিনিস আছে, সেটা দেশাত্মবোধ। আমাদের দেশে স্কুলের ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে বড় দুঃখ হত—তাই এ কাজ নিয়েছি।

হেমন্ত। অর্থাৎ তুমি একজন মস্ত দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ!

অশনি। মহাপুরুষ কি না বলতে পারি না, কিন্তু দেশপ্রেমিক তো বটেই। দেশের প্রতি প্রেম আমার এত বেশি যে গরীব দুঃখী তো দূরের কথা, বড়লোকের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেগুলোর জন্যেও আমার প্রাণ কাঁদে। আচ্ছা হেমন্ত, ঐ লোকটা যে নির্জলা জোচ্চোর, তোমার মাথায় কাঁটাল ভেঙে খাবার মতলব করেছিল—এ সন্দেহও তোমার হয় নি?

হেমন্ত। না। এবং তোমারই বা সে সন্দেহ হল কি করে তাও বুঝতে পারছি না।

অশনি। কি আশ্চর্য হেমন্ত! ও লোকটা যে জোচ্চোর তা ওর সর্বাঙ্গে নামাবলির মত ছাপমারা রয়েছে যে! তোমার কি চোখও নেই?

হেমন্ত। চোখ আমার আছে। তবে তোমার মত দিব্যচক্ষু নেই, তা স্বীকার করছি।

অশনি। ঘোড়ার ব্যবসা শুনেও তোমার সন্দেহ হল না?

হেমন্ত। ঘোড়ার ব্যবসায় সন্দেহের কি আছে? অনেক বড় বড় লোক ঘোড়ার ব্যবসা করে থাকেন! দি আগা খাঁ—

অশনি। দি আগা খাঁর কথা ছেড়ে দাও—তিনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি; তাঁর মত বিষয়বুদ্ধি যদি দেশের শতকরা একজনের থাকত তা হলে দেশের বরাত ফিরে যেত। কিন্তু তুমি ঘোড়ার ব্যবসা, হাতীর ব্যবসা যা করবে তাতেই যে লোকসান হবে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না কেন?

হেমন্ত। বুঝতে পারছি না যেহেতু বোঝবার মত একটিও কারণ তুমি দেখাতে পার নি। (হঠাৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) আমি ঘোড়ার ব্যবসাই করব। ব্যস্, এই বলে দিলুম।

অশনি। (কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া) ঘোড়ার ব্যবসাই করবে? ছাড়বে না?

হেমন্ত। না।

অশনি। বেশ, আমিও তা হলে বলে দিলুম, তুমি যেদিন ঘোড়া কিনবে সেইদিনই আমি গুলি করে তোমার সব ঘোড়া সাবাড় করে দেব।

হেমন্ত। সব তাতেই তোমার জবরদস্তি! আমি কি তা হলে কিছুই করব না? কেবল চুপটি করে ঘরের মধ্যে বসে থাকব?

অশনি। কেন, বিয়ে কর না! বাঙালীর ছেলের তার চেয়ে বড় বাণিজ্য আর কি আছে? বছর বছর একটি করে মুনাফা পাবে।

হেমন্ত। ছি অশনি, তুমি যে ক্রমে অশ্লীল হয়ে উঠছ!

অশনি। কি করব বল? আমি দেখছি, মনের কথাটি স্পষ্ট করে বলতে গেলেই অশ্লীল হয়ে পড়ে।

হেমন্ত। সে যা হোক, তুমি তা হলে আমাকে ঘোড়ার ব্যবসা করতে দেবে না?

অশনি। শুধু ঘোড়া কেন, কোনও ব্যবসাই করতে দেব না। তোমার ধাতে ব্যবসা সইবে না।

হেমন্ত। (হতাশভাবে সোফায় শুইয়া পড়িয়া) বেশ, আমার যখন স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করবার অধিকার নেই, তখন কি কাজ করব তুমিই বল।

অশনি। বলছি তো বিয়ে কর। বিয়ে করবার উপযুক্ত বুদ্ধি তোমার হয়েছে এমন কথা বলছি না, কিন্তু বয়স হয়েছে। আজ এই কথাটা বলবার জন্যেই এতরাত্রে এসেছিলুম। তোমার জন্যে পাত্রী দেখছি। বাঙালীর মেয়েরা শুনেছি বুদ্ধিমতী, তোমার ভাগ্যে যিনি পড়বেন, তিনি হয়তো তোমাকে এবং তোমার বিষয়সম্পত্তিকে কোনমতে বজায় রেখে চলতে পারবেন। আমি তো আর চিরকাল তোমাকে আগলে নিয়ে বেড়াতে পারব না!

হেমন্ত। আমি এখন বিয়ে করব না।

অশনি। কেন? বাঙালীর ছেলে, বিবাহে অরুচি কেন?

হেমন্ত। আমি যদি বিয়ে করি, কোনও শিক্ষিতা মেয়েকে ভালবেসে, তার ভালবাসা পেয়ে তবে বিয়ে করব—তার আগে নয়।

অশনি। কোন শিক্ষিতা মেয়ে তোমাকে ভালবাসবে এই ভরসায় যদি থাক, তা হলে তোমার বিয়ের কোন সম্ভাবনাই দেখছি না।

হেমন্ত। তুমি মনে কর—কোন শিক্ষিতা মেয়ে আমাকে ভালবাসতে পারে না?

অশনি। তোমার টাকাকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু তোমাকে ভালবাসবে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হেমন্ত। তারা বুঝি কেবল তোমার মত একটি পালোয়ানকে ভালবাসতে পারে?

অশনি। (হাসিয়া) আরে না—আমি একেবারেই ভালবাসার অযোগ্য। তোমার তবু

টাকা আছে, আমার যে তাও নেই।

হেমন্ত। তার মানে শিক্ষিতা মেয়েরা টাকাই ভালবাসে! তাদের সম্বন্ধে তোমার এত বিশ্রী ধারণা কেন?

অশনি। আমার ধারণা বিশ্রী কি সুশ্রী জানি না, কিন্তু অনেক দিন বিলেতে থেকে আমার ঐ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

হেমন্ত। বিলেতের সব শিক্ষিতা মেয়েই টাকা চায়?

অশনি। শতকরা নিরেনব্বই জন।

হেমন্ত। তোমার বিশ্বাস আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েরাও সেইরকম?

অশনি। তা বলতে পারি না। তাদের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করবার আমার সুযোগ হয় নি, তবে দূর থেকে যত দূর দেখেছি, তাদের চালচলন আমার ভাল লাগে না।

হেমন্ত। তাদের চালচলনে নিন্দনীয় কি আছে?

অশনি। মেয়েদের অতটা স্বাধীনতা আর বেপরোয়া ভাব আমার পছন্দ হয় না।

হেমন্ত। তুমি তাদের বোরকা ঢাকা দিয়ে রাখতে চাও? বিলেত গিয়ে তোমার মনের বিশেষ উন্নতি হয় নি দেখছি—বরং গোঁড়ামি আরও বেড়েছে।

অশনি। তা স্বীকার করি। নানা দেশ ঘুরে, নানা আচার-ব্যবহার দেখে গোঁড়ামির প্রকৃত মূল্য বুঝতে পেরেছি।

হেমন্ত। তা হলে এবার টিকি রেখে হরিনামের মালা জপতে শুরু করে দাও—আর কি?

অশনি। আদর্শ রক্ষা করবার জন্যে টিকি অথবা হরিনামের মালা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি না। ও দুটো আদর্শের প্রতীক মাত্র—আদর্শ নয়। দুর্গের মাথায় যেমন পতাকা ওড়ে টিকিও তেমনই—দুর্গটা কার দখলে আছে এই খবরটা সে জানিয়ে দেয়। টিকি না থাকলে মানুষটার কোনও ক্ষতি হয় না। বেদান্ত বলেছেন—শিখা নষ্টে শিখী নষ্টঃ পুরুষো অনষ্টঃ। যাক, বাজে কথায় অনেক রাত হয়ে গেল, আজ আমি উঠলুম। তোমার জন্যে একটি ভাল দেখে পাত্রী শিগ্‌গির খুঁজে বার করব। অবশ্য একেবারে ক-অক্ষর গো-মাংস হবে না, কিছু কিছু লেখাপড়া জানবে—

বাহিরে রাস্তায় গণ্ডগোল শোনা গেল ও রমণী কণ্ঠের চীৎকার উঠিল

কিসের গণ্ডগোল—

প্রস্থান

হেমন্ত। (সোফায় উঠিয়া বসিয়া) তাই তো। এতরাত্রে আবার চেঁচামেচি কিসের? মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ মনে হল! দেখি, আবার অশনি হয়তো এখনই মারামারি আরম্ভ করবে! নিধিরাম!

মন্দা ও ঊর্মিলাকে লইয়া অশনি প্রবেশ করিল। মন্দার বয়স আঠারো-উনিশ; ছোটখাট মোলায়েম গড়ন; সুন্দরী না হইলেও মুখে চোখে বেশ একটি শ্রী আছে। বর্তমানে তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ, চক্ষু বিস্ফারিত—হাঁটু কাঁপিতেছে; সে যেন আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না। ঊর্মিলা মন্দার চেয়ে দু'এক বছরের বড়। দীর্ঘাঙ্গী, গৌরী ও সুন্দরী—চুল স্বভাবতই ছোট কিম্বা বিলাতি ফ্যাশন অনুযায়ী কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা—তাহা বুঝা যায় না। সে মন্দার মত ভীত ও বিহ্বল হইয়া পড়ে নাই, তবু তাহার ঠোঁট দুটিও মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহাদের দুইজনেরই পরিধানে মূল্যবান বারাণসী শাড়ি ব্লাউজ ইত্যাদি

হেমন্ত। একি! এ যে দুটি মহিলা!

অশনি। আপনারা বসুন।

উভয়ে উপবেশন করিল

কি হয়েছিল?

ঊর্মিলা। আমরা একটা পার্টি থেকে ফিরছিলুম। এখানে এসে হঠাৎ ট্যাক্সির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়—

মন্দা। না দিদি, ড্রাইভারটা ইচ্ছে করে ট্যাক্সি থামিয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

অশনি। অসম্ভব নয়। ট্যাক্সি ড্রাইভারটার সঙ্গে বোধ হয় গুণ্ডাদের ষড় ছিল।

ঊর্মিলা। কি জানি! তা সে যাই হোক, ড্রাইভারটা বনেট খুলে ইঞ্জিন দেখতে লাগল, আর কোথা থেকে একদল লোক এসে গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। তারা প্রথমে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগল; তারপর আমাদের গাড়ি থেকে নামতে বললে।—মন্দা, তোর খুব ভয় হয়েছিল—না?

মন্দা। উঃ—কি ভয় যে হয়েছিল! এই দেখ, এখনও আমার হাত কাঁপছে—

হেমন্ত। আপনাদের দু পেয়ালা চা তৈরি করিয়ে দিই। অন্য স্টিমুল্যাণ্ট তো কিছু বাড়িতে নেই। দশ মিনিটে তৈরি হয়ে যাবে। নিধিরাম!

ঊর্মিলা। না না—এতরাত্রে তার দরকার নেই। মন্দা, তুই কি বড্ড ফেণ্ট ফীল করছিস? তা হলে যদি এক শিশি স্মেলিংসল্ট পাওয়া যেত—

হেমন্ত। আছে বৈকি—এই যে—

হেমন্ত শিশি আনিয়া দিল -মন্দা তাহা শুঁকিতে লাগিল

অশনি। তারপর?

ঊর্মিলা। তারপর হঠাৎ একটা লোক মন্দার হাত ধরে টান দিলে—মন্দা চীৎকার করে উঠল—

মন্দা। মা গো! (চক্ষু মুদিয়া শিহরিয়া উঠিল)

ঊর্মিলা। ঠিক সেই সময় আপনি গিয়ে পড়লেন'। আপনি সে সময় না গেলে আমাদের যে কি হত তা জানি না!

অশনি। (ভ্রূবদ্ধ ললাটে) গুণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছনা হত, আর কি? কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আপনাদের সঙ্গে কোনও পুরুষ অভিভাবক ছিল না কেন?

ঊর্মিলা। (কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া) পুরুষ অভিভাবক? আমাদের সঙ্গে পুরুষ অভিভাবক কোন দিনই থাকে না—আজও ছিল না।

অশনি। ও—আপনারা তা হলে খাঁটি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কিন্তু গুণ্ডার হাত থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করবার শক্তি যখন নেই, তখন একজন পরিচিত ভদ্রলোককে সঙ্গে নেওয়া নিরাপদ নয় কি?

ঊর্মিলা। এরকম ঘটনা যে কলকাতা শহরে ঘটতে পারে তা আমরা কল্পনা করি নি।

অশনি। রাত দুপুরে যদি ট্যাক্সিতে চড়ে শহরে ঘুরে বেড়ান, তা হলে এর চেয়ে বেশি আর কি প্রত্যাশা করেন? শহরটা তো স্রেফ সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম নয়।

ঊর্মিলা ক্ষণকাল সবিস্ময়ে অশনির দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর
তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল

ঊর্মিলা। মাফ্ করবেন, আপনিই কি এ বাড়ির গৃহস্বামী?

অশনি। না, ইনি—(অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইল)

ঊর্মিলা। (হেমন্তকে) বিপদের সময় আশ্রয় দিয়েছেন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এবার অনুগ্রহ করে যদি একখানা গাড়ি ডাকিয়ে দেন তা হলে আমরা বাড়ি ফিরতে পারি। রাত অনেক হয়েছে।

মন্দা। দিদি আবার ভাড়াটে গাড়িতে চড়বে?

হেমন্ত। না না, তা দরকার নেই, আমি নিজের গাড়িতে আপনাদের বাড়ি পেঁছে দিচ্ছি। নিধিরাম, কেষ্টকে ক্রাইস্লারখানা বার করতে বল্।

নিধিরাম। যে আজ্ঞে—

প্রস্থান

ঊর্মিলা। ওঠ মন্দা! (যাইতে যাইতে ফিরিয়া অশনিকে) আপনাকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অশনি। কর্তব্য করার জন্যে ধন্যবাদ আমি গ্রহণ করি না।

ঊর্মিলা অধর দংশন করিল

কিন্তু আপনাদের বাড়ির লোকেরা নিশ্চয় উদ্বিগ্ন হবেন। আপনাদের ফোন নম্বরটা পেলে বাড়িতে ফোন করে দিতে পারি।

ঊর্মিলা। (নীরস স্বরে) তার দরকার নেই। বাড়িতে কেবল বাবা আছেন; তিনি আমাদের জন্যে অকারণে উদ্বিগ্ন হন না।

অশনি। সেটা সহজেই কল্পনা করতে পারি।

ঊর্মিলা ক্রুদ্ধ চোখে ফিরিয়া দাঁড়াইল

হেমন্ত। (তাড়াতাড়ি) আসুন—আসুন, গাড়ি এসে গেছে—

সকলে প্রস্থান করিল। অশনি কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

জোড়াসাঁকোর একটি সংকীর্ণ কাণা গলির শেষ প্রান্তে একটি দ্বিতল বাড়ি। দ্বিতলের একটি কক্ষে বহির্দ্বারের দিকে মুখ করিয়া গজানন ও আড্ডাধারী কেবলরাম দুইটি টুলের উপর বসিয়া আছে। কেবলরাম মোটা, লম্বা চেহারা, হাঁটু পর্যন্ত রঙীন পাঞ্জাবি, চোখের কোলে গভীর কালীর দাগ। সে অর্ধনিমীলিত নেত্রে কানে পায়রার পালক দিতেছে। গজানন থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছে

ইহাদের পশ্চাতে খোলা দরজা দিয়া আর একটি ঘরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে; সেখানে নানা প্রকার জুয়া চলিতেছে। তাসের জুয়াই বেশি; প্রায় নিঃশব্দে খেলা চলিতেছে। সময় প্রায় মধ্যরাত্রি

কেবলরাম। (কানে কাঠি দিতে দিতে) তাই তো খুড়ো, অমন শিকারটা ফস্কে গেল!

গজানন। (হুঁকা টানিতে টানিতে) হুঁ—

কেবলরাম। তুমি ঝানু লোক বলে তোমাকে কাজটা দিলুম, আর তুমিই ভেস্তে দিলে?

গজানন। আরে বাবা, আমি ভেস্তে দিলাম, না সেই শালার ব্যাটা শালা বন্ধু এসে সব মাটি করে দিলে! আমি তো বাগিয়ে এনেছিলাম, কোত্থেকে এসে শালা কানের মধ্যে এমন বিড়ি পুরে দিলে যে কানটা একেবারে বোদা মেরে গেছে।

কেবলরাম। খুড়ো, তুমি একজন পরিপক্ক প্রবীণ খেলোয়াড় হয়ে এমন গাধামি করলে কেন, আমি শুধু তাই ভাবছি!

গজানন। গাধামিটা কোথায় দেখ্লে?

কেবলরাম। গাধামি নয় তো কি? এ সব কাজ কি ঢাক পিটিয়ে হয়? বন্ধু আসবামাত্র কথাটা ঢোক গিলে যেতে পারলে না? এ দিকে বলছ, বন্ধুকে দেখে সে নিজেই কথা চাপা দেবার চেষ্টা করছিল—তুমিও গুম খেয়ে গেলে না কেন? তারপর তাক বুঝে আর এক সময় মাছ গেঁথে একেবারে ডাঙায় তুলতে!

গজানন। আরে, সে ব্যাটা যে সত্যিকারের বন্ধু তা কি জানতাম? মাস্টারি করে, বড়লোকের

বাড়িতে এসে আড্ডা মারে—ভেবেছিলাম ব্যাটা মোসায়েব।

কেনারাম প্রবেশ করিল। সে কৃষ্ণদেহ ঝাঁকড়া-চুলবিশিষ্ট যুবক।
প্রধানত আড্ডার দ্বার রক্ষা করাই তাহার কাজ

কেনারাম। মাড়োয়ারী আসচে।

কেবলরাম। আসুক। কাল জিতে গেছে কিনা, আজ তো আসবেই। বনমালীকে বলে দাও, আজও যেন ওকে জিতিয়ে দেয়। এখন আরও দু দিন খেলুক, তারপর একেবারে সাপটে নেওয়া যাবে।

কেনারাম। যে আজ্ঞে—

ভিতরের দিকে প্রস্থান

একজন মাড়োয়ারী প্রবেশ করিলেন, গায়ে সাটিনের কালো কোট, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ি

কেবলরাম। আসুন, আসুন শেঠজি।

মাড়োয়ারী। রাম রাম কেওলারামবাবু। আজ খেল চলছে?

কেবলরাম। চলছে বৈকি। আজও খেলবেন নাকি? কাল তো আপনি সকলকে ফরসা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মাড়োয়ারী। হাঁ হাঁ—কাল কুছু বাজি জিৎলো। আজভি কোশিস্ করবে—দেখে ক্যা হোয়।

কেবলরাম। কেয়া আর হবে—জিতবেন। আপনার টাকার বরাত শেঠজি!

মাড়োয়ারী। (হাস্য) হা হা—আপনে ঠিক বলেছেন কেওলারামবাবু। রূপিয়া ত হাম বহুৎ উপায় করলো—ঘিউমে—তিসিমে—কোয়লামে—যাতে হাঁথ দিলো বিশ-প'চাশ হাজার বানিয়ে নিলো। অব দেখে জুয়ামে কুছু আমদানি হোয় কি না। আজ খেলাড়ী সব জমছে?

কেবলরাম। খেলোয়াড় জমেছে বটে কিন্তু আপনি না হলে কি খেলা জমে শেঠজি! এখন চুনোপুঁটির খেলা চলছে, আপনি গেলে তবে না আসর গরম হবে! যান যান আপনার জন্যে সবাই পথ চেয়ে আছে।

মাড়োয়ারী। হাঁ—যাচ্ছে—

ভিতরের দিকে প্রস্থান

কেবলরাম নির্লিপ্তভাবে কানে কাঠি দিতে লাগিল

গজানন। তা যা কথা হচ্ছিল। সে শালা ইস্কুলমাস্টার যে একেবারে প্রাণের বন্ধু, তা কি করে জানব বল! এমন ভিজে বেরালটির মত এসে বসল—

কেবলরাম। খুড়ো, আসল বন্ধু আর মোসায়েবের তফাৎ যদি এক নজরে বুঝতে না পার, তা হলে এ কাজে নেমেছ কেন? তোমাকে দিয়ে দেখছি আর আমার কাজ চলবে না—বয়স বেড়ে তোমার আক্কেল ক্রমেই তামাদি হয়ে যাচ্ছে। আজকাল বোধ হয় কোকেনের মাত্রা চাড়িয়ে দিয়েছ—না?

গজানন। (কর্কশ স্বরে) কে বলে? কোন্ শালা বলে?

কেবলরাম। খুড়ো!

কেবলরাম গজাননের দিকে তাকাইল; সেই বিষাক্ত সর্পদৃষ্টির
সম্মুখে গজানন কুঁকড়াইয়া গেল

গজানন। না না, বাবা কেবলরাম—এই বলছিলুম—এই কথার কথা বলছিলুম—কোকেন তো আমি খাই না বাবা—মাঝে মাঝে এক আধ চিম্‌টি—

কেবলরাম। হুঁশিয়ার খুড়ো! (পুনরায় কানে কাঠি দিতে দিতে) খোদন সরকার একবার আমার সামনে বেয়াদপি করেছিল, তার কি হল মনে আছে তো?

গজানন। (কম্পিত স্বরে) আমি—আমি—, কেবলরাম, আমায় মাপ কর বাবা, অপরাধ হয়ে গেছে। ঐ জমিদারের ছেলেটাকে আমি যে করে পারি পটিয়ে আনব—তুমি ভেব না

বাবা। আর ঐ শালা মাস্টারকে—

কেনারাম প্রবেশ করিল

কেনারাম। অক্ষয়বাবু আসছে।

কেবলরাম। সেই মাতালটা?

কেনারাম। হ্যাঁ—দরজা বন্ধ করে দেব?

কেবলরাম। না, আসতে দাও, নইলে দোর ঠেলাঠেলি করে হাঙ্গাম বাধাবে।

কেনারাম প্রস্থান করিল

টলিতে টলিতে অক্ষয় প্রবেশ করিল

অক্ষয়। (কেবলরামের পদতলে একটি নোট রাখিয়া) এই রাখলুম—চলে এস আড্ডাধারি!

কেবলরাম। অক্ষয়বাবু, আপনি মদ খেয়েছেন, আজ খেলবেন না।

অক্ষয়। খেলব না? আলবৎ খেলব। আজ বাঘের খেলা খেলব; বৌয়ের তাবিজ বাঁধা দিয়ে একশো টাকা এনেছি। চলে এস—আজ এস্পার কি ওস্পার!

গজানন। (জনান্তিকে কেবলরামকে) বেটা বেহুঁশ মাতাল হয়েছে; নোটটা কেড়ে নিয়ে কান ধরে তাড়িয়ে দাও—জানতেও পারবে না।

কেবলরাম। চুপ কর। অক্ষয়বাবু, আজ আমাদের খেলা হচ্ছে না, আপনি বাড়ি যান।

অক্ষয়। খেলা হচ্ছে না কি বাবা? সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজি! ঐ যে পাশের ঘরে বাবুগুলি সারি সারি বসে রয়েছেন—শেঠজির গেরুয়া পাগড়িও দেখছি—ওঁরা কি বাবা জপে বসেছেন? তবে আমিও জপে বসি গে।

ভিতরের দিকে প্রস্থান

কেবলরাম। জাহান্নামে যাও! যত সব ফোতো কাপ্তেনের দল! মাগের গয়না বাঁধা দিয়ে জুয়া খেলতে এসেছেন! ছুঁচো কোথাকার!

গজানন। যাক গে যাক গে, ওসব ছুঁচো প্যাঁচার কথা ছাড়ান দাও, বাবা কেবলরাম। পিঁপড়ের পালক উঠেছে—দুদিন উড়ুক—তারপর পালক খসে গেলেই আবার যে পিঁপড়ে সেই পিঁপড়ে।

কেবলরাম। তুমি বোঝ না খুড়ো। এই সব পুঁটে খেলোয়াড়েরাই আমাদের ব্যবসার বদনাম করে। যারা মালদার লোক তারা দু-চার হাজার হেরে বেবাক ঢোক গিলে যায়—কীল খেয়ে কীল চুরি করে। কিন্তু এই এরা—যারা মাগের গয়না বিক্রি করে বরাত ফেরাতে আসে—এরা দু পয়সা হারলে এমন চেঁচামেচি শুরু করে দেয় যে চারিদিকে সোরগোল পড়ে যায়।

গজানন। তা তো বটেই রে বাবা, কিন্তু উপায় কি? ওদের ট্যাঁকে যতক্ষণ একটি পয়সা থাকবে ততক্ষণ ওরা খেলবেই। সেই জন্যেই তো বলছিলুম—থাক্ গে। এখন কথা হচ্ছে—সেই হেমন্ত ছোঁড়াকে বাগানো যায় কি করে? আমি না হয় আর একবার চেষ্টা করে দেখি—কি বল? বেশ ভিজিয়ে এনেছিলুম—এখনও চেষ্টা করলে হয়তো—

কেবলরাম। ওদিক দিয়ে আর কিছু হবে না। এখন অন্য রাস্তা ধরতে হবে। দেখি যদি কোনও ফিকিরে আড্ডায় ফাঁসাতে পারি।

ভিতর দিক হইতে অক্ষয় প্রবেশ করিল

অক্ষয়। কুছ পরোয়া নেই! আবার খেলব; এখনও বৌয়ের চুড়ি আছে।—আড্ডাধারি, দশটা টাকা ধার দেবে বাবা? কালই ফেরত দেব।

কেবলরাম। অক্ষয়বাবু, আপনি বাড়ি যান। এখানে ধার দেবার রেওয়াজ নেই।

অক্ষয়। দেবে না?

কেবলরাম। না।

অক্ষয়। কুছ পরোয়া নেই—বৌয়ের গহনা আছে—

টলিতে টলিতে প্রস্থান

গজানন। হ্যা হ্যা—কিন্তু বেশি দিন থাকছে না।
কেবলরাম। হতভাগা! চুলোয় যাক।—খুড়ো, তুমি এবার খুড়ির কাছে যাও, আমি ততক্ষণ হেমন্ত ছোঁড়াকে ফাঁসাবার একটা মতলব বার করি।

কানে কাঠি দিতে দিতে অর্ধমুদিত চক্ষে ভাবিতে লাগিল

তৃতীয় দৃশ্য

হেমন্তর প্রসাধন-কক্ষ। কাল অপরাহ্ণ। বৃহৎ আয়নাযুক্ত শিঙার-মেঝের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হেমন্ত প্রসাধন করিতেছে। কামিজ খুলিয়া ফেলিয়া সিল্কের পাঞ্জাবি পরিধান করিল। তারপর গুনগুন শব্দে গান গাহিতে গাহিতে চুল আঁচড়াইতে লাগিল

হেমন্ত। কোন্ নামটি বেশি মিষ্টি? মন্দা—না ঊর্মিলা? ঊর্মিলাই বেশি মিষ্টি! নাঃ—মন্দা। মন্দা—মন্দাকিনী মন্দালিকা। কিন্তু নাম যাই হোক, ওদের মধ্যে বেশি সুন্দরী কে? বলা বড় শক্ত। একটি যেন আধ-ফুটন্ত গোলাপের কুঁড়ি, আর অন্যটি যেন রজনীগন্ধার শীষ। না—ঠিক হল না—একটি চাঁপা, অন্যটি করবী। (মৃদু কণ্ঠে গান) সহসা ডালপালা তোর উতলা যে—ও চাঁপা, ও করবী! নিধিরাম!
নিধিরাম। আজ্ঞে—

নিধিরাম প্রবেশ করিল

হেমন্ত। জুতো—

নিধিরাম জুতো আনিয়া পায়ের কাছে রাখিল

এটা নয়, অমৃতশরী মখমলের নাগরা দাও।
নিধিরাম। আজ্ঞে—

নাগরা আনিয়া দিল

হেমন্ত। (নাগরার দিকে চাহিয়া থাকিয়া) উঁহু—এটা নয়, গ্রীশিয়ান স্যাণ্ডাল জোড়া দাও।
নিধিরাম। আজ্ঞে—(তথাকরণ)
হেমন্ত। বেশ! কেষ্টকে মিনার্ভাখানা নামাতে বল!

নিধিরাম প্রস্থান করিল

এখনও সময় আছে? ক্লাবে একহাত ব্রিজ খেলে যাওয়া চলবে। একটু আগে বেরিয়ে পড়াই ভাল। এখনি অশনি এসে পড়বে—ওদের বাড়িতে যাচ্ছি শুনলে হয়তো বাগড়া দেবে। সব তাতে বাগড়া দেওয়া অশনির একটা অভ্যাস। ভদ্রমহিলারা নেমন্তন্ন করেছেন, না যাওয়াটা কি ভাল দেখায়! আর যাব নাই বা কেন? শিক্ষিতা মেয়ে সম্বন্ধে অশনির কুসংস্কার থাকতে পারে, আমার নেই। শিক্ষিতা মেয়েদের আমি ভালবাসি—মানে—পছন্দ করি। এরা দুটি বোন কি চমৎকার শিক্ষিতা! আচ্ছা—এদের মধ্যে যদি একটিকে আমি ভালবেসে ফেলি। কোন্‌টিকে ভালবাসব! আর—আর ওরা কেউ যদি আমাকে ভালবাসে? তা হলে বেশ মজা হয় কিন্তু। নাঃ, মহিলাদের সম্বন্ধে এসব কথা ভাবা উচিত নয়। ওরা বোধ হয় সহোদর বোন! চেহারায় কিন্তু একটুও মিল নেই। একটি চাঁপার কলি—অন্যটি রক্তকরবী! (মৃদুগুঞ্জনে) ও চাঁপা, ও করবী!
নিধিরাম। (প্রবেশ করিয়া) গাড়ি সদরে এসেছে।

হেমন্ত। আচ্ছা—

ছড়ি লইয়া গুঞ্জন করিতে করিতে প্রস্থান

অতঃপর নিধিরাম ঘরের বিশৃঙ্খলা অপনোদনে প্রবৃত্ত হইল। জুতা সরাইয়া যথাস্থানে রাখিল; পরিত্যক্ত কামিজটা মেঝেয় পড়িয়া ছিল, তাহার পকেট হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া টয়লেট টেবিলের উপর রাখিল, কামিজটা ধোপার বাড়ির বাক্সে ফেলিল। ঝাড়ন দিয়া আসবাবপত্র ঝাড়িল। টয়লেট টেবিলের উপর এক কৌটা সিগারেট ছিল, তাহা হইতে কয়েকটা লইয়া পকেটে পুরিল। তারপর আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রভুর চিরুনি বুরুশ দিয়া কেশ-বিন্যাস করিতে লাগিল

নেপথ্যে। হেমন্ত! হেমন্ত!

নিধিরাম চিরুনি বুরুশ রাখিয়া সবেগে চারিদিকে ঝাড়ন চালাইতে লাগিল
অশনি প্রবেশ করিল

অশনি। হেমন্ত কোথায়?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তিনি এইমাত্র বেরুলেন।

অশনি। এরই মধ্যে কোথায় বেরুল?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তা তো জানি না।

অশনি। কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে?

নিধিরাম। আজ্ঞে, না—

পিছু হটিয়া নিধিরাম নিষ্ক্রান্ত হইল

অশনি। (অনিশ্চিতভাবে ঘরে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে) কোথায় গেল? এত সকাল সকাল তো কোন দিন বেরোয় না! আমি আসব জেনে তবু বেরিয়ে গেল! আবার কোনও নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের পরামর্শ হচ্ছে না কি? বড়মানুষ হবার ঐ সুখ, পরামর্শদাতা বন্ধুর অভাব হয় না। (টেবিলের উপর চিঠিখানা চোখে পড়িল) হুঁ—ভারি বাহারে খাম দেখছি!

খাম তুলিয়া লইয়া একটু ইতস্তত করিল, তারপর খুলিয়া পড়িল

মাননীয়েষু,

সেদিন আপনারা যে-বিপদ হইতে আমাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আর একবার ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনাদের ঋণ জীবনে ভুলিবার নয়। আজ সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়িতে আসিয়া চা-পান করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আপনার বন্ধুও আপনার সঙ্গে আসিলে সুখী হইতাম। কিন্তু তিনি কর্তব্য কার্য করিয়াছেন বলিয়া হয়তো কৃতজ্ঞের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। ইতি—

বিনীতা—শ্রীঊর্মিলা দেবী

হুঁ—হেমন্তবাবু কোথায় গেছেন এবার বুঝতে পেরেছি। পাছে আমি যেতে না দিই তাই আগে থাকতে পালিয়েছে। ঊর্মিলা দেবী কোনটি? বড়টি নিশ্চয়। চিঠিতে আমাকে বেশ একটু খোঁচা দেওয়া হয়েছে দেখছি। (ঈষৎ হাস্য) সে যা হোক্, কিন্তু এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ উপস্থিত হল যে! না হয় বিপদ থেকে উদ্ধার করাই হয়েছে, তাই বলে এত মাখামাখি কেন? মতলবটা কি? বন্ধুকে ফাঁদে ফেলবার মহৎ উদ্দেশ্য নেই তো? বলা যায় না—দুটি মহিলাই সুন্দরী, অন্তত চেহারার বেশ চটক আছে। তার ওপর শিক্ষিতা! নাঃ—বিশ্বাস করতে পারছি না। (পত্র দেখিয়া) প্রফেসর জ্ঞানাঞ্জন শাস্ত্রী—চিঠির শিরোনামায় ছাপা রয়েছে—ঠিকানা ল্যান্সডাউন রোড। কোন্ জ্ঞানাঞ্জন শাস্ত্রী? বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানাঞ্জন শাস্ত্রী নয় তো? কি জানি! মহিলা দুটি কি অধ্যাপক মহাশয়ের মেয়ে? হতেও পারে। (চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িল) না—তবু বিশ্বাস নেই। হেমন্ত এত সরল যে, এর ভেতর যদি কোনও কারচুপি থাকে তো

কিছুই বুঝতে পারবে না। পরের চিঠি পড়া উচিত নয়, কিন্তু এ চিঠিখানা পড়ে ভালই করেছি দেখাছ—

নেপথ্যে। মাস্টারমশাই আছেন?

অশনি। কে? কানাইয়ের গলা না?

নিধিরাম। (প্রবেশ করিয়া) একটি ছেলে আপনাকে খ‍ুঁজছে।

অশনি। কে, কানাই? এদিকে এস। কি খবর?

কানাই প্রবেশ করিল—খাকি হাফ-প্যাণ্ট ও কামিজপরা—বয়স আঠেরো উনিশ।
স্বাস্থ্য-পূর্ণ দেহ; মনও সর্বদা স্বাস্থ্যের চিন্তায় মগ্ন

কানাই। আজ সন্ধ্যের সময় আমাদের ব্যায়াম সমিতির অধিবেশনে আপনার সভাপতি হবার কথা আছে সার্। আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখলুম—আপনি নেই, তাই এখানে খ‍ুঁজতে এলুম।

অশনি। ঠিক তো, কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম।

কানাই তা হলে চলুন সার্, আর তো সময় নেই।

অশনি। কানাই, আজ তোমাদের সভার অধিবেশনে আমি থাকতে পারব না। একটা ভারি জরুরি কাজ আছে, এখনি বেরুতে হবে।

কানাই। কিন্তু আপনি না গেলে সভা যে একেবারে ভেস্তে যাবে সার্'

অশনি। না না, আর সকলে থাকবেন, তোমরা কোনও রকমে চালিয়ে নিও।

কানাই। আপনি যদি একবারটি গিয়ে দাঁড়াতেন সার্ তা হলেও অনেক কাজ হত। আজ আমাদের লাঠি খেলা আর কুস্তির একজিবিশন আছে।

অশনি। আচ্ছা—চল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারব না। আমার কাজটা বড় জরুরি।

কানাই। আচ্ছা সার্, পাঁচ মিনিটই থাকবেন।

অশনি। চল।

চিঠিখানা পকেট লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল

চতুর্থ দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ড্রয়িং-রুম। চেয়ার, সোফা, টিপাই ইত্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে।
এক পাশে একটি অর্গ্যান। সন্ধ্যাকাল। মন্দা একাকিনী ঘরময় এটা ওটা
নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে

মন্দা। (নিজ মনে) হেমন্তবাবু বোধ হয় খুব বড়মানুষ। ভাগ্যিস সেদিন ওঁর বাড়ির সামনেই ঐ কাণ্ড হল। চমৎকার লোক কিন্তু; নিজে মোটরে করে পেঁৗছে দিয়ে গেলেন। আচ্ছা—ওঁর কি বিয়ে হয়েছে? বোধ হয় হয় নি—হলে সে রাত্রে নিশ্চয় স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতেন। (আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া) আমি কালো -দিদি আমার চেয়ে ঢের সুন্দর। (দীর্ঘ নিশ্বাস) ভগবানের একটুও ওজন-জ্ঞান নেই। জ্যাঠামশায়ের এত টাকা তবু দিদি সুন্দর; আর আমি জ্যাঠার গলগ্রহ বাবা এক পয়সা রেখে যেতে পারেন নি—আমি কালো! একটু সামঞ্জস্য থাকলে কী দোষ হত? (কিয়ৎকাল পরিক্রমণ করিয়া) নাঃ, কিছু ভাল লাগছে না। দিদি তো চা জলখাবারের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত, আমি এখন কি করি—

মিউজিক টুলের উপর গিয়া বসিল, কিছুক্ষণ অনামনে বাজাইল,
তারপর গাহিল—

মম মর্মলীন গোপন ভালবাসা
তুমি জাগো।

মম সুপ্ত-প্রাণ-অন্তরতম আশা
তুমি জাগো॥
দীর্ঘ রজনী শেষে
উষসী-অরুণ বেশে
তুমি কূজনহীন কণ্ঠে ফুটাও ভাষা—তুমি জাগো॥
কম্পিত বন পূর্ণ-পুলক-ছন্দে।
জাগ্রত নব-বিশ্ব-ভুবন বন্দে॥
ফুল্ল যূথী বেলি
চাহে নয়ন মেলি
ঐ জাগে নলিনী সিক্ত-শিশির-বাসা
তুমি জাগো॥

পিছন হইতে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রেমকুমারের আবির্ভাব। তাহার চেহারা শীর্ণ, মাথার চুল কাবুলীর মত বব করা, পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও লেস্-যুক্ত পাঞ্জাবি। গায়ের রং কটা, কিন্তু অত্যন্ত পাংশু। চক্ষু কালিমামণ্ডিত। গলার কণ্ঠা উঁচু, গাল বসা। বয়ঃক্রম উনিশ-কুড়ি। সে কোমরে এক হাত রাখিয়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে মন্দার পিছনে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। ক্রমে মন্দার গান শেষ হইল

প্রেম। ফ্রয়েড—একেবারে নির্জলা ফ্রয়েড।
মন্দা। (চমকিয়া) কে? ও প্রেমকুমারবাবু! কতক্ষণ এসেছেন?
প্রেম। তা হবে পাঁচ মিনিট। আপনার গান শুনছিলাম পিছনে দাঁড়িয়ে। জানেন, আপনার গানের আগাগোড়া শুধু ফ্রয়েড।
মন্দা। সে আবার কি?
প্রেম। নাম শোনেন নি ফ্রয়েডের?
মন্দা। শুনেছি—আপনারই মুখে। কিন্তু তার কথা শোনবার আমার আগ্রহ নেই।
প্রেম। আগ্রহ না থাকলে চলবে কেন? পৃথিবীর সার বস্তু হচ্ছে ফ্রয়েড—জানেন তো?
মন্দা। না।
প্রেম। জানেন না? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।

একটি সোফায় ভঙ্গিমাসহকারে এলাইয়া পড়িল

দেখুন, জীবনের মূল হচ্ছে 'সেক্স'! এইখানেই তার আরম্ভ আর এইখানেই তার শেষ। ফ্রয়েড বলেছেন—
মন্দা। (লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া) প্রেমকুমারবাবু, আমি ওসব বুঝতে পারি না। একটু বসুন—দিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

প্রস্থানোদ্যতা

প্রেম। দরকার কি দিদির? আপনাকেই দিচ্ছি সব বুঝিয়ে; বসুন না—
মন্দা। না, আমার এখন বোঝবার সময় নেই। ঐ দিদি আসছে— (আত্মগতভাবে) বাবা বাঁচলুম! প্রেমকুমারবাবুটা এমন বেহায়া, একটু লজ্জা নেই। দিদির কাছেই ও জব্দ থাকে।

ঊর্মিলা প্রবেশ করিল; সোফায় লম্বমান প্রেমকুমারকে লক্ষ্য করিল না

ঊর্মিলা। বাবা ল্যাবরেটরিতে আছেন, তাঁকে বলে এসেছি, খানিকক্ষণ পরে এসে যেন হেমন্তবাবুর সঙ্গে আলাপ করেন। হেমন্তবাবুর আসতে আর দেরি নেই বোধ হয়। তুই এতক্ষণ কি করছিলি?
মন্দা। প্রেমকুমারবাবু।

মস্তকের ইঙ্গিতে দেখাইল। ঊর্মিলার মুখ অপ্রসন্ন হইল

ঊর্মিলা। ও—আপনি কখন এলেন?

প্রেম। বলতে পারি না তা। ঘড়ির কাঁটায় কি সময়ের পরিমাপ হয়? মন্দা দেবীকে এতক্ষণ ফ্রয়েডের মূলতত্ত্ব বোঝাচ্ছিলাম—

ঊর্মিলা। (উপবেশন করিয়া দৃঢ় স্বরে) প্রেমকুমারবাবু, আপনার বয়স কত হল?

প্রেম। বয়স! কি আসে যায় বয়সে? ফ্রয়েড বলেছেন, সদ্যোজাত শিশু স্তন্যপান করে যে আনন্দ পায় তাও যৌনানন্দ, আর গলিতদন্ত বৃদ্ধ গড়গড়ার নল টেনে যে আনন্দ পায় তাও—

ঊর্মিলা। (আরক্ত মুখে) থাক। মহিলাদের সামনে কোন্ জাতীয় আলোচনা ভদ্রতাসম্মত এ শিক্ষা কি কেউ আপনাকে দেয় নি?

প্রেম। মহিলা! জগতে মহিলা নেই—আছে শুধু নারী আর পুরুষ, আর আছে তাদের চির-অতৃপ্ত লিপ্সা—

ঊর্মিলা। চুপ করুন প্রেমকুমারবাবু, ও প্রসঙ্গে আমাদের রুচি নেই। অল্পবয়সে কুশিক্ষা পেয়ে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

প্রেম। কুশিক্ষা! জানেন আমার গুরু কে? ফ্রয়েড। তিনি বলেছেন, মনের কথা গোপন করতে শিখেই মানুষ তুলেছে তার জীবনকে জটিল করে। পশুদের লজ্জা নেই—

ঊর্মিলা। (প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে) আপনার পরীক্ষার আর দেরি কত? এবার আই এ দেবেন তো?

প্রেম। মানুষের জীবনে পরীক্ষা অতি তুচ্ছ জিনিস। জীবনের সার হচ্ছে—লিবিডো।

ঊর্মিলা। আপনাকে আর কি বলব, কিন্তু আমি যদি আপনার অভিভাবক হতুম, তা হলে কান ধরে বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে রাখতুম।

প্রেম। স্যাডিজম্। ওকে বলে, স্যাডিজম্। ফ্রয়েডবর্ণিত সব লক্ষণই আপনার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে! যে যাকে কামনা করে তাকে দৈহিক পীড়া দেবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। জয়দেব—এমন কি কালিদাস পর্যন্ত একথা জানতেন।

ঊর্মিলা। (অত্যন্ত রুষ্ট স্বরে) প্রেমকুমারবাবু, এত নোংরা মন নিয়ে যে আপনি ভদ্রসমাজে ঘুরে বেড়ান তা আমি জানতুম না। আপনার বয়স অল্প, যা বলেছেন তার অর্থও বোধ হয় ভাল করে বোঝেন না—তাই আপনার এই ধার-করা পাকামি আমরা সহ্য করছি—

প্রেম। আপনার কথায় আমি ব্যথা পাচ্ছি। (উঠিয়া বসিয়া) আপনি একজন আধুনিকা তরুণী হয়ে বলতে পারলেন এ কথা? নোংরা? আমাদের কাছে নোংরা কিছু নেই! জানেন, প্রগতিশীল তরুণ আমি—

হঠাৎ জ্ঞানাঞ্জনবাবু প্রবেশ করিলেন। বেঁটে মোটা—মাথার মধ্যস্থলে টাক, তাহা ঘিরিয়া অর্ধপক্ক বাবরি, অনেকটা ডেভিড হেয়ারের মত চেহারা

জ্ঞানাঞ্জন। তুমি শুয়োর—একেবারে খাঁটি শুয়োর!

প্রেম। (চমকিয়া) কি বললেন?

জ্ঞানাঞ্জন। শুয়োর—তোমার মাথার গড়ন দেখে বুঝতে পারছি—তুমি শুয়োর। ঊর্মিলা, দেখতে পাচ্ছ—খুলির গড়ন ঠিক শুয়োরের মত।

ঊর্মিলা। যেতে দাও, বাবা—

জ্ঞানাঞ্জন। যেতে দেব কি? কখনই না। ছোকরা, তুমি আমার সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে এস, তোমার খুলির ছাঁচ তুলে নেব। এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম—পাই নি। আজ পেয়েছি। তোমার খুলি দিয়েই আমার নতুন থিওরি প্রমাণ করব। এস—

প্রেম। আমি যাই—(পিছু হটিল)

জ্ঞানাঞ্জন। যাবে কি? এস—তোমার খুলি আমার চাই।

অগ্রসর হইলেন, প্রেমকুমার দ্রুত প্রস্থান করিল

আঁ, পালাল? ঠিক তো—পালাবেই, ও যে শুয়োর!

ঊর্মিলা। (হাসি চাপিয়া) প্রেমকুমারবাবুটি লোক ভাল নয়, অকালে অতিরিক্ত কুখাদ্য খেয়ে ওঁর অজীর্ণ হয়েছে—কিন্তু হাজার হোক উনি অতিথি তো! ওঁকে গালাগাল দেওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে?

জ্ঞানাঞ্জন। গালাগাল! কি আশ্চর্য! আমি তো তাকে গালাগাল দিই নি—শুধু শুয়োর বলেছি। আমি একটা নতুন থিওরি বার করেছি তার মূলসূত্র হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ইতর-জন্তুর শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; কেউ কুকুর, কেউ বেরাল, কেউ ভালুক, কেউ উট। এই শ্রেণী-বিভাগের সুবিধা এই যে, একবার একটা লোককে কোন পর্যায়ে ফেলতে পারলে আর ভাবনা নেই, তার চরিত্র জলের মত স্পষ্ট বোঝা যাবে। ঐ ছোকরার মাথার গড়ন দেখেই বুঝলুম—ও শুয়োর, শুয়োরের মত কাদায় পাঁকে গড়াগড়ি দিতে ভালবাসে, তাতেই আনন্দ পায়!

মন্দা। সে কথা সত্যি।

ঊর্মিলা। কিন্তু বাবা, সে কথা কি মুখের ওপর বলা উচিত। লোকে রাগ করবে যে!

জ্ঞানাঞ্জন। রাগ করবে কেন? এতে রাগ করবার কি আছে—এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। মানুষকে বাঁদরের বংশধর বললে তো কেউ রাগ করে না।

ঊর্মিলা। তা করে না। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) কিন্তু ধর, তুমি যদি তোমার বন্ধু প্রফেসার জনার্দন ঘোষকে বল যে তিনি একটি ওরাংওটাং, তা হলে কি তিনি রাগ করবেন না?

জ্ঞানাঞ্জন। একদিন তাঁকে ওরাংওটাং বলেছিলুম! শুনে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল; তিনি উল্টে আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি শিম্পাঞ্জী।' কিন্তু কই, রাগ তো করেন নি।

ঊর্মিলা ও মন্দা হাসিতে লাগিল। জ্ঞানাঞ্জনবাবু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন

যাই, আমার 'অন্ন-নির্যাস' সম্বন্ধে পরীক্ষাটা এবার আরম্ভ করতে হবে—

ঊর্মিলা। বাবা, আর একটু থাক না, হেমন্তবাবু এখনই আসবেন; তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

জ্ঞানাঞ্জন। হেমন্তবাবু কে?

ঊর্মিলা। এই যে এতক্ষণ ধরে বললুম, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? তিনি আর তাঁর এক বন্ধু সেদিন গুন্ডাদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেছিলেন।

জ্ঞানাঞ্জন। মনে পড়েছে। তোমরা গুন্ডাদের সঙ্গে মোটরে করে বেড়াতে যাচ্ছিলে, এমন সময় ওঁরা এসে—হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে।

হেমন্ত প্রবেশ করিল

ঊর্মিলা। আসুন হেমন্তবাবু। বাবা, ইনিই হেমন্তবাবু, সেদিন আমাদের—

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ—বড় খুশি হলুম। আপনি সেদিন এদের হাত থেকে গুন্ডাদের উদ্ধার করেছিলেন, সে জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। বসুন। কিন্তু আশ্চর্য! ঠিক খরগোশ। কোন তফাৎ নেই।

পরম বিস্ময়ের সহিত হেমন্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন

মন্দা। এই সর্বনাশ হল! জ্যাঠামশাই আবার আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলেন!

জ্ঞানাঞ্জন। অবিকল খরগোশের খুলি। অতএব প্রকৃতিও খরগোশের মত হতে বাধ্য। বুদ্ধি-সুদ্ধি বেশি নেই, কিন্তু মন সর্বদাই প্রফুল্ল। সহজেই পোষ মানে অর্থাৎ বিশ্বাস করে—কাউকে সন্দেহ করবার মত কুটিলতা মনে নেই; তাই পদে পদে বিপদেও পড়ে। আবার বিপদ কেটে যেতে না যেতেই প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

হেমন্ত। (ঊর্মিলাকে) উনি কার কথা বলছেন?

ঊর্মিলা। ও কিছু নয়। বাবা, তুমি এবার ল্যাবরেটরিতে যাও।

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ। হেমন্তবাবু, আপনার খুলিটা কিন্তু আমার দরকার। চমৎকার খুলি! একেবারে অবিকল—

ঊর্মিলা। বাবা, তোমার অন্ন-নির্যাসের পরীক্ষা এখনও বাকি রয়েছে যে—

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছি। (হেমন্তকে) আপনি আবার আসবেন তো? বেশ বেশ, পরেই হবে এখন। মোদ্দা আপনার খুলিটা আমার চাইই—

ঊর্মিলা। এস বাবা—

ঊর্মিলা তাহাকে টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল

মন্দা। বসুন হেমন্তবাবু, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

হেমন্ত। (বসিয়া) উনি কি বললেন কিছু বুঝতে পারলুম না। আমার খুলির কথা কি বলছিলেন?

মন্দা। কি জানি। জ্যাঠামশাই একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক কিনা, ওঁর কথা সব সময় বোঝা যায় না।

হেমন্ত। জ্যাঠামশাই! মাফ করবেন, কিন্তু আপনি কি জ্ঞানাঞ্জনবাবুর মেয়ে নন?

মন্দা। (মলিন মুখে) না, আমার মা বাবা কেউ বেঁচে নেই। জ্যাঠামশাই আমাকে প্রতিপালন করেছেন!

হেমন্ত। ওঃ—

কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না কিন্তু তাহার মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল

ঊর্মিলা প্রবেশ করিল

ঊর্মিলা। বেয়ারা!

একজন বেয়ারা প্রবেশ করিল

বেয়ারা। হুজুর!

ঊর্মিলা। চা নিয়ে এস।

বেয়ারা। হুজুর!

প্রস্থান

ঊর্মিলা। (মৃদু হাস্যে হেমন্তকে) আপনার বন্ধুটি বুঝি আসতে পারলেন না? কি তাঁর নাম?

হেমন্ত। অশনি। সে—তাকে খবর দিই নি, আর দিলেও বোধ হয়—

ঊর্মিলা। তিনি আসতেন না! কিছু মনে করবেন না হেমন্তবাবু, আমি আপনার বন্ধুর নিন্দে করছি না—কিন্তু উনি যেন একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক! নয়?

হেমন্ত। (কুণ্ঠিত ভাবে) না—তা ঠিক নয়—

ঊর্মিলা। আচ্ছা, কি করেন বলুন তো?

হেমন্ত। স্কুলের মাস্টারি করে।

বেয়ারা চা ও জলখাবার আনিয়া রাখিল

ঊর্মিলা। (পরিবেশন করিতে করিতে) ও—তাই, স্কুলের ছেলে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ওঁর মেজাজটা রুক্ষ হয়ে পড়েছে, সকলকেই বেত্রাধীন ছাত্র মনে করেন। কিন্তু যাই হোক, তিনি সেদিন আমাদের যে ভাবে সাহায্য করেছিলেন তাতে তাঁর সম্বন্ধে কোনও রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা করা আমাদের অনুচিত। আপনি হয়তো ভাবছেন, আমরা ভারি অকৃতজ্ঞ—

হেমন্ত। না না, সে কি কথা! তবে অশনির মেজাজটাকে ঠিক রুক্ষ বলা চলে না। এমনিতে সে বেশ শান্ত শিষ্ট; কিন্তু ওর কতকগুলো বদ্ধমূল মতামত আছে—তাতে আঘাত লাগলেই ওর আচরণটা একটু কড়া হয়ে পড়ে।

ঊর্মিলা। তাঁর একটা বদ্ধমূল ধারণা বোধ হয় এই যে, মেয়েদের অন্দরমহল থেকে বেরুতে দেওয়া উচিত নয়।

হেমন্ত নীরবে চা পান করিতে লাগিল

আপনার কি মনে হয় না যে, এটা তাঁর কুসংস্কার?

হেমন্ত। কুসংস্কার! হ্যাঁ—তা ছাড়া আর কি বলা যায়! আমার সঙ্গে এই নিয়ে ওর প্রায়ই ঝগড়া হয়।

মন্দা। আপনি বুঝি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করেন?
হেমন্ত। হ্যাঁ—মেয়েদের ঘরে বন্ধ করে রাখা আমি পছন্দ করি না। ভেবে দেখুন দেখি, সেদিন যদি আপনারা স্বাধীনভাবে পার্টিতে না যেতেন, তা হলে আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য কি আমার হত!
মন্দা। দিদি, হেমন্তবাবুকে আরও কেক দাও—
হেমন্ত। না না, আর চাই না। যথেষ্ট খেয়েছি।
মন্দা। কই খেয়েছেন! আচ্ছা, কেক না নেন, আর একটা প্যাটি নিন।
হেমন্ত। আপনি বলছেন—দিন।

পুনশ্চ চা পান করিতে লাগিল

ঊর্মিলা। আপনার বন্ধুর আর কি কি বদ্ধমূল ধারণা আছে বলুন তো!
হেমন্ত। আরও অনেক। ব্যবসা-বাণিজ্যের ভয়ানক বিরোধী। তার বিশ্বাস, ব্যবসা করলেই আমি একেবারে রসাতলে যাব।
ঊর্মিলা। ভারি আশ্চর্য তো! একজন শিক্ষিত লোক—কিন্তু তিনি বোধ হয় বেশি উচ্চশিক্ষা পান নি, তাই মনের সংকীর্ণতা দূর হয় নি।
হেমন্ত। উচ্চশিক্ষা খুবই পেয়েছে। বিলেত গিয়েছিল।
ঊর্মিলা। বিলেত গিয়েছিল! কিন্তু ওঁকে দেখে তো কিছু মনে হয় না!
হেমন্ত। না, দেখে কিছু বোঝবার যো নেই—একেবারে নিরীহ ভালমানুষ লোক। ওকে বিলিতি পোশাক পরতেও কখন দেখি নি।
ঊর্মিলা। কি পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন? ব্যারিস্টারি?
হেমন্ত। না—আই সি এস।
ঊর্মিলা। ও—(একটু নীরব থাকিয়া) ফেল করে ফিরে এসে মাস্টারি আরম্ভ করেছেন বুঝি?
হেমন্ত। না, পাস করেছে। মাস্টারি করা ওর একটা খেয়াল। বলে, আমাদের দেশে ভাল আই সি এস অনেক আছে, কিন্তু ভাল মাস্টার একটিও নেই। তাই সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাস্টারি করছে।
ঊর্মিলা। (কিয়ৎকাল নির্বাক থাকিয়া) আশ্চর্য।

মিনিটখানেক চুপচাপ

মন্দা। আপনার স্মেলিংসল্টের শিশিটা সেদিন হাতে করে নিয়ে এসেছিলুম, আর ফেরত দেওয়া হয় নি—এই নিন—

ম্যান্টল পিস্ হইতে শিশি লইয়া বাড়াইয়া দিল

হেমন্ত। স্মেলিংসল্টের শিশি আমি কি করব?
মন্দা। বাড়ি নিয়ে যাবেন। আপনার কি দরকারে লাগে না?
হেমন্ত। আমাকে দেখে, আমি এখনই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ব বলে মনে হচ্ছে কি? (মন্দা হাসিয়া মাথা নাড়িল)—তবে?
মন্দা। আপনার জিনিস, তাই আপনাকে ফেরত দিচ্ছিলুম।
হেমন্ত। ওটা এমন কি মহামূল্য জিনিস যে ফেরত না দিলে আমি একেবারে দেউলে হয়ে যাব?
মন্দা। তবে থাক। (হেমন্তের পাশে বসিয়া) আপনার বাড়ির যতটুকু দেখলুম, আমার এত ভাল লাগল যে কি বলব! কি চমৎকার সাজান! যেন ছবির মত! সমস্ত বাড়িটি ঘুরে ফিরে দেখবার লোভ হচ্ছিল—
হেমন্ত। লোভ সম্বরণ করলেন কেন? একবার জানালেই তো কৃতার্থ হয়ে যেতুম।
মন্দা। তখন পরিচয় ছিল না।
হেমন্ত। বেশ, কিন্তু এখন তো পরিচয় হয়েছে। এবার একদিন চলুন; দরিদ্রের কুটিরে পদার্পণ করে বন্ধুত্বের পরিচয় দিন।

মন্দা। (সানন্দে) দিদি, হেমন্তবাবু তাঁর বাড়িতে যাবার জন্যে আমাদের নেমন্তন্ন করছেন।

ঊর্মিলা। (চমক ভাঙিয়া) বেশ তো!

মন্দা। বেশ হবে। ওঁর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেও আলাপ হবে।

হেমন্ত। মেয়েদের সঙ্গে? কিন্তু আমার বাড়িতে মেয়েরা তো কেউ নেই। মেয়ে বলুন আর পুরুষ বলুন, একমাত্র আমি আছি।

মন্দা। আর কেউ নেই? আপনার আত্মীয়স্বজন—

হেমন্ত। আত্মীয়স্বজন, পুত্রকলত্র, নাতিপুতি কিছু নেই—আমি একা।

মন্দা। তা হলে—(ইতস্তত)

হেমন্ত। তা হলে কি? আমার বাড়িতে মেয়েরা নেই বলে আপনারা সেখানে যাবেন না? (মন্দা কুণ্ঠিত ভাবে নীরব) দেখুন, তেলা মাথায় তেল দিয়ে কোন লাভ হয় না, তেলের অপচয় হয় মাত্র; বরঞ্চ যে হতভাগা মহিলাদের সংসর্গ থেকে চিরবঞ্চিত তাকে দয়া করাই প্রকৃত পুণ্য।

মন্দা। আপনার মাথায় বুঝি তেল নেই?

হেমন্ত। একদম না। তৈলাভাবে জটা পড়বার উপক্রম হয়েছে। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই জটার দায়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। এখন আপনারাই ভরসা। বলুন—যাবেন?

মন্দা ঊর্মিলার দিকে তাকাইল

ঊর্মিলা। হ্যাঁ, যাব বৈ কি! কেন যাব না!

হেমন্ত। যাক। তা হলে কবে যাবেন? কালই চলুন না!

ঊর্মিলা। কাল? না, বরং এক কাজ করব—

একটি ভৃত্য প্রবেশ করিল

ভৃত্য। একটি বাবু এসেছেন।

ঊর্মিলা। নিয়ে এস এখানে।

ভৃত্যের প্রস্থান। অশনি প্রবেশ করিল। সকলে স্তম্ভিত

হেমন্ত। এ কি—অশনি! তুমি!

অশনি। আমিই বটে। তোমার সন্দেহ হচ্ছে নাকি!

হেমন্ত। তুমি—এখানে?

অশনি। তুমি যেখানে আসতে পার সেখানে আমার আসতে বাধা কি? অবশ্য, তুমি নিমন্ত্রিত অতিথি আমি অনাহূত আগন্তুক—এই যা তফাৎ। (ঊর্মিলার দিকে ফিরিয়া) আপনারা নিশ্চয় আমাকে চিনতে পারছেন না, না পারাই স্বাভাবিক—আমি—

ঊর্মিলা। (ঈষৎ হাসিয়া) পরিচয় দিতে হবে না। আপনার মত স্পষ্টভাষী লোককে আমরা ভুলে যাব, এই কি স্বাভাবিক মনে করেন অশনিবাবু? বসুন।

অশনি। (দূরের একটা চেয়ারে বসিয়া) আমি স্পষ্টভাষী, সে কথা ঠিক। শুধু তাই নয়, সময় সময় আমাকে এমন কাজও করতে হয় যা সকলের রুচিকর হয় না।

ঊর্মিলা। তাই নাকি; যথা?

অশনি। যথা—বিপন্ন বন্ধুকে উদ্ধার করা।

ঊর্মিলা। (কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া) আপনার কথার ইঙ্গিতটা ঠিক বোঝা গেল না। বিপন্নকে উদ্ধার করলে লোকের অরুচিকর হবে কেন?

অশনি। আমি বিপন্নকে উদ্ধারের কথা বলি নি, বিপন্ন বন্ধুকে উদ্ধারের কথা বলেছি। আমার একটা বদ অভ্যাস, বন্ধুকে বিপদে ফেলে আমি পালাতে পারি না।

ঊর্মিলা। ও—(হেমন্ত ও অশনির প্রতি পর পর চাহিয়া সহসা হাস্য করিল) আপনার বন্ধু এখানে এসে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন, তাই আপনি তাঁকে উদ্ধার করতে এসেছেন?

হেমন্ত। আঃ—অশনি, কি বলছ তার ঠিক নেই! ঊর্মিলা দেবী, আপনি ভুল বুঝেছেন—

অশনি। উর্মিলা দেবী ঠিকই বুঝেছেন; ভুল বুঝেছেন বললে শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রতি অসম্মান দেখান হয়।

উর্মিলা। (কৌতুকের ভঙ্গিতে) কিন্তু আপনার বন্ধু তো আমাদের কবলে পড়ে গেছেন। এখন আপনি কি ভাবে তাঁকে উদ্ধার করতে চান?

অশনি। সেটা আগে থাকতে বলে দিয়ে আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই না।

উর্মিলা। (মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিল) যাক। আপনার সঙ্গে অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনা করতে চাই না, আপনি আমাদের অতিথি—

অশনি। অনাহূত অতিথি। সুতরাং দরোয়ান ডেকে আমাকে বার করে দিলেও আমি কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত হব না।

উর্মিলা। আপনি বিস্মিত না হতে পারেন, কিন্তু আমরা শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা বলেই অতটা পারব না।

অশনি। (ছদ্ম বিষণ্ণতায়) তা হলে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার এই অক্ষমতা বড়ই শোচনীয়।

উর্মিলা। আপনি শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার প্রতি এত বিরূপ কেন?

অশনি। অভিজ্ঞতার ফল বলতে পারেন।

উর্মিলা। অর্থাৎ শিক্ষিতা ভদ্রমহিলারা কেউ ভাল লোক নয়—এই আপনার অভিজ্ঞতা?

অশনি। কেউ কেউ ভাল লোক থাকতে পারেন, এ সম্ভাবনা আমি একেবারে অস্বীকার করছি না! শাস্ত্রে আছে—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। পাঁকেও কখনও কখনও পদ্ম ফোটে।

উর্মিলা। (ব্যঙ্গপূর্ণ তিক্তস্বরে) ধন্যবাদ! আপনার অসীম বদান্যতা।

অশনি। না না, বদান্যতা আর কি? সত্যি কথাই বলেছি।

মন্দা। (চাপা ক্রুদ্ধস্বরে) মাফ করবেন অশনিবাবু, কিন্তু আপনার সত্য কথাগুলি শ্রুতিমধুর নয়।

অশনি। সত্য কথাকে শ্রুতিমধুর করে বলতে পারেন কেবল মহাকবিরা। আমি তো মহাকবি নই!

উর্মিলা। যাক। অশনিবাবু, এক পেয়ালা চা খান! আমরা যত মন্দ লোকই হই, আমাদের হাতে চা খেলে বোধ হয় আপনার কোন বিপদ হবে না।

অশনি। আমি চা খাই না।

উর্মিলা। (অধর দংশন করিয়া) ভয় নেই, চায়ে আমি বিষ মিশিয়ে দেব না।

অশনি। সে অপবাদ তো আপনাদের আজ পর্যন্ত কেউ দেয় নি; বরং আপনারা মিষ্টি বেশি দিয়ে লোলুপ পুরুষগুলোকে সহজে বশীভূত করে ফেলেন এই অভিযোগটাই চিরন্তন। কিন্তু আমার আপত্তিটা তা নয়, আমি সত্যিই চা খাই না।

উর্মিলা। কেন—চা খান না কেন?

অশনি। অনাবশ্যক বলে। চায়ের বিষে সুস্থ সহজ শরীরটাকে বিষাক্ত করে তোলা দরকার মনে করি না।

উর্মিলা। ও—

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল

মন্দা। হেমন্তবাবু, তা হলে আমরা কবে আপনার বাড়ি দেখতে যাব বলুন?

হেমন্ত। (অস্বস্তিপূর্ণ আড়চোখে অশনির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনাদের যেদিন ইচ্ছে—

মন্দা। তা হলে কাল যাওয়াই ঠিক, কি বল দিদি?

উর্মিলা। না। তার চেয়ে আমরা একদিন খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে হাজির হব। তাতে আপত্তি নেই তো হেমন্তবাবু?

হেমন্ত। আপত্তি! কিছু না।

কিছুক্ষণ কুণ্ঠিত নীরবতা

অশনি। হেমন্ত, এবার উঠবে নাকি?
হেমন্ত। হ্যাঁ, না—তুমি উঠছ নাকি?
অশনি। সেটা তোমার উপর নির্ভর করছে।
ঊর্মিলা। (তীক্ষ্ণ হাসিয়া) হেমন্তবাবু, বুঝতে পারছেন না? আপনাকে আমাদের মত দুর্জনের হাতে ফেলে আপনার বন্ধু যেতে পারছেন না। উনি তো আর সত্যিই আমাদের মত শিক্ষিতা মহিলাকে বিশ্বাস করতে পারেন না। কি জানি যদি আপনি আর বাড়ি ফিরে না যান!
অশনি। আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করবার চেষ্টা বৃথা। আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া, বিঁধবে না। হেমন্ত, দেখতেই তো পাচ্ছ, মহিলারা আমার সংসর্গে এসে কষ্ট পাচ্ছেন, সুতরাং ওঁদের যদি সুখী করতে চাও চট্‌পট উঠে পড়।
হেমন্ত। (হতাশ ক্রোধে) অশনি, তুমি কি এক দণ্ডের জন্যেও আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না?
অশনি। কেন মিছে রাগারাগি করছ? আমাকে তো জান—তোমার কোনও বিপদ নেই বুঝলেই তোমাকে নিষ্কৃতি দেব। কিন্তু তার আগে নয়।
হেমন্ত। বেশ—ওঠ তা হলে, আর এঁদের নির্যাতন করেও কাজ নেই। চললুম, আমি বড় হতভাগ্য।

দ্রুত প্রস্থান

অশনি। আমার দুর্ভাগ্যও কম নয়! নমস্কার।

প্রস্থান

মন্দা। উঃ লোকটা কি অভদ্র! একটা মিষ্টি কথাও কি বলতে পারে না। দিদি, তুমি ওকে জব্দ করে দিতে পারলে না?
ঊর্মিলা। কই আর পার্‌লুম।
মন্দা। আমার এত রাগ হচ্ছে। হেমন্তবাবু অত ভাল লোক, তাই বন্ধুত্বের ছুতো করে লোকটা ওঁর ওপর অত্যাচার করে। আর কি কথার ছিরি, ঠিক যেন চোয়াড়!
ঊর্মিলা। কিন্তু উনি আমাদের উপকার করেছিলেন, সে কথা ভুলে যেও না মন্দা!
মন্দা। তা হোক। তাই বলে আমাদের অপমান করবার কোনও অধিকার নেই ওঁর। দিদি, তুমি কেন ওঁর মুখের মত জবাব দিলে না?
ঊর্মিলা। (হঠাৎ হাসিয়া) এক মাঘে শীত পালায় না মন্দা। সব তোলা রইল, তুই ভাবিস্ নি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জুয়ার আড্ডাঘর। বেলা দ্বিপ্রহর; লোকজন কেহ নাই। কেবলরাম একটা ইজিচেয়ারে লম্বমান হইয়া কানে পায়রার পালক দিতেছে। গজানন উবু হইয়া বসিয়া নগ্নদেহে হুঁকায় তামাক খাইতেছে। তাহার অর্ধমলিন লংক্লথের পাঞ্জাবি দেয়ালে পেরেক হইতে ঝুলিতেছে। ঘরটি ঈষৎ অন্ধকার

কেবলরাম। খুড়ো, একটা কেঁচো যোগাড় করেছি।
গজানন। কি বললে বাবা—কেঁচো? ভাল শুনতে পেলুম না। বিড়ি গুঁজে দিয়ে অবধি শালা কানের দফা একেবারে সেরে দিয়েছে।
কেবলরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেঁচো। চেহারাটাও ঠিক কেঁচোর মত, খুড়ো—মেরুদণ্ড নেই, কেবল দুমড়ে দুমড়ে পড়ছে।
গজানন। (কাসিয়া) আর একটু খোলসা করে না বললে তো কিছু বুঝতে পারছি না

বাবা!

কেবলরাম। উপমা ধরতে পারলে না খুড়ো? এই জন্যেই তো লেখাপড়া জানা লোক দরকার হয়। বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে মাছ ধরতে হয় জান না? সেই টোপ গাঁথবার কেঁচো একটি যোগাড় হয়েছে।

গজানন। কোথা থেকে যোগাড় করলে বাবা? মাটি খুঁড়ে বার করলে বুঝি?

কেবলরাম। মাটি খুঁড়তে হয় নি, হেদোর ধারে ঘুরপাক খাচ্ছিল তুলে নিয়ে এসেছি।

গজানন। কি রকম?

কেবলরাম। একটা ছোঁড়া। আশ্চর্য খুড়ো—যেমন তার কেঁচোর মত লিকলিকে চেহারা, তেমনই অদ্ভুত কথাবার্তা। থেকে থেকে 'ফ্রয়েড ফ্রয়েড' করে চেঁচিয়ে ওঠে; তার পরে কি যে বলে মাথা মুণ্ডু, কিছুই বোঝা যায় না। একেবারে বেহেড পাগল।

গজানন। তারপর? টাকাকড়ি আছে বুঝি?

কেবলরাম। টাকাকড়ি—অষ্টরম্ভা। আমার মতলবটা এখনও বুঝতে পারলে না খুড়ো। ছোঁড়াটা ভদ্রঘরের ছেলে, কলেজে পড়ে, অনেক মালদার লোকের সঙ্গে জানাশুনো আছে—ওর লড়কানি দেখিয়ে চারে অনেক শাঁসাল শিকার আনা যাবে।

গজানন। ওঃ, এতক্ষণে বুঝেছি বাবা—লড়কানি। বেশ বেশ! তা ছোঁড়াকে বাগালে কি করে?

কেবলরাম। বেশি বেগ পেতে হয় নি। দু' চারবার তার কথায় সায় দিতেই সে বুঝে নিয়েছে যে আমি তার প্রাণের ইয়ার—একেবারে বুজুম্ ফ্রেন্ড। আমিও তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে দুনিয়ায় স্ফূর্তি মারা ছাড়া আমার আর অন্য কাজ নেই। বাস্—একেবারে প্রাণে প্রাণে জোটপাট খেয়ে গেছে।

গজানন। আহা বেশ বাবা কেবলরাম; একটা কাজের মত কাজ করেছ বটে। এইবার এই ছোঁড়াকে দিয়ে হেমন্ত চাটুয্যেকে সাপটে নাও।

কেবলরাম। সে আর বলতে খুড়ো। এত তোড়জোড় তো তারই জন্যে। (ঘড়ি দেখিয়া) কিন্তু তার আসবার সময় হল।

গজানন। এখানে আসবে নাকি সে?

কেবলরাম। আসবে বৈ কি। তুমি ভবিষ্যযুক্ত হয়ে বসো খুড়ো। বেশ মার্জিত ভাবে কথা কইবে—যেন চোয়াড়ে কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে, তা হলে বাছা আমার প্রাণে বড় ব্যথা পাবে।

গজানন। সে আর আমাকে শেখাতে হবে না বাবা কেবলরাম! ভদ্রলোকের সামনে কি করে ভদ্রলোক সাজতে হয় তা এই গজু সিংগি খুব জানে।—রোস, এই জামাটা গলিয়ে নিই।

পাঞ্জাবি পরিধান। হুঁকো সরাইয়া রাখিল, বর্মা চুরুট ধরাইয়া চেয়ারে উপবেশন

প্রেমকুমার প্রবেশ করিল

প্রেমকুমার। আছেন এখানে কেবলরামবাবু?

কেবলরাম। আসুন আসুন প্রেমকুমারবাবু—এই চেয়ারটাতে বসুন।

প্রেমকুমার উপবেশন করিয়া চারিদিকে তাকাইল

প্রেমকুমার। এইটেই কি আপনাদের সংঘ?

গজানন। আজ্ঞে হ্যাঁ—সঙ্গৎ বই কি! পাঁচজন ভদ্রলোক এসে খেলাধুলো করেন, গানবাজনাও হয়—সঙ্গৎ বৈ কি! আমাদের বড় ভাগ্য যে আপনার মত শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়ের পায়ের ধুলো এখানে পড়ল।

কেবলরাম। ইনি গজাননবাবু, ক্লাবের একজন প্রবীণ সভ্য।

প্রেমকুমার। আপনি ফ্রয়েডের শিষ্য তো?

গজানন। অ্যাঁ—কি বলে—শিষ্য বই কি! ঐ যে কি নাম করলেন—ওঁকে আমি মনে মনে খুব ভক্তি করি।

প্রেমকুমার। এখানকার সকল সভ্যই অবশ্য ফ্রয়েডের শিষ্য?
কেবলরাম। তা—প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে তো বটেই।
প্রেমকুমার। কিন্তু প্রকাশ্যেও হওয়া চাই যে। লজ্জা সঙ্কোচ সমস্ত ফেলে দিতে হবে দূরে; উন্মুক্ত উলঙ্গ হয়ে বলতে হবে—আমরা পশু—আমরা জানোয়ার—
কেবলরাম। সে তো বটেই—সে তো বটেই—
গজানন। একশো বার। আমরা বাঁদর—আমরা উল্লুক—
কেবলরাম। প্রেমকুমারবাবু, আপনি যখন আমাদের দলে এসেছেন তখন আর ভাবনা নেই —ও কথাটা এবার সকলেই বুঝতে পারবে।
প্রেমকুমার। নিশ্চয়। আমি বুঝিয়ে দেব তাদের।
কেবলরাম। এক গ্লাস সরবৎ খান প্রেমকুমারবাবু।
প্রেমকুমার। আপত্তি নেই।
কেবলরাম। কেনারাম, সরবৎ। এই নিন সিগারেট—(প্রেমকুমার সিগারেট ধরাইল) ভাল কথা, আপনি তো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে চেনেন নিশ্চয়। তিনি আপনাদের দলের লোক, খুব বড়লোক।
প্রেমকুমার। চিনি তাকে।
কেবলরাম। বেশ বেশ, বড় আনন্দের কথা। আমাদের ইচ্ছে, আপনার মত আরও শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ক্লাবের সভ্য হন। আপনি একটু চেষ্টা করলেই—; আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখন চলুন পাশের ঘরে, আমাদের কত রকম খেলার সরঞ্জাম আছে আপনাকে দেখাই।—কেনারাম, সরবৎ পাশের ঘরে নিয়ে আয়—

সকলে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

অশনির বাসা। অতি সাধারণ মেসের একটি কক্ষ। এক পাশে একটি তক্তপোষের উপর বিছানা গুটান রহিয়াছে, শিয়রে স্বামী বিবেকানন্দের একটি ছবি। ঘরে দুইটি চেয়ার ও একটি টেবিলও আছে; দেয়াল হইতে কয়েকটি ব্যায়ামের যন্ত্র ঝুলিতেছে। অশনি চেয়ারে বসিয়া তাহার প্রিয় কুকুর গামাকে আদর করিতেছে ও তাহার সহিত কথা বলিতেছে

অশনি। মেয়েমানুষ জাতটাকে আমরা বরাবর এড়িয়ে এসেছি, কি বলিস গামা? ওরা সুবিধের লোক নয়—দূরে দূরে রাখাই ভাল। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, ওদের চিরদিন এড়িয়ে চলা অসম্ভব। ওরা যখন আসে তখন কালবোশেখী মেঘের মত সমস্ত আকাশ ছেয়ে আসে। কোথাও একটু ফাঁক রাখে না, সারা মনটা জুড়ে বসে। তাই তো ওদের এতো ভয় করি, নানা রকম সন্দেহও হয়; (গামার মাথা চাপড়াইয়া হাস্য) কিন্তু যে দুটির সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে তারা বোধ হয় ততটা মন্দ লোক নয়। একটি তো দিব্যি নরম-সরম, কম কথা কয়—অথচ বেশ বুদ্ধি আছে; দেখলে আমাদের গেরস্ত ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। আর অন্যটি—একেবারে আগুনের ফুলকি। (স্মিতহাস্যে) খুব চটিয়ে দিয়েছি; কিন্তু কি করব, বন্ধুর স্বার্থ আগে দেখতে হবে তো। চটলে আর উপায় কি? (চিন্তা) অবশ্য ওরা বড় বেশি উচ্চশিক্ষিত আর আধুনিক, এই যা; কিন্তু যতদূর মনে হল, সত্যিই মন্দ নয়। নাঃ, উচ্চশিক্ষা পেলেও মেয়েরা সব সময় বয়ে যায় না; যারা স্বভাবত ভাল, তারা ভালই থেকে যায়, একথা মানতে হবে। কি বলিস গামা? (চিন্তা) ঐ মন্দা মেয়েটির সঙ্গে হেমন্তর বিয়ে হলে মন্দ হয় না; বেশ মেয়েটি, হেমন্তকে সামলে চলতে পারবে বলে মনে হয়। যা হোক্, আরও কিছু দিন দেখি, মাত্র দুবার দেখেই মতামত ঠিক করে ফেলা উচিত নয়। কিন্তু ঊর্মিলা দেবীটি সম্বন্ধে কোনও সংশয় নেই। আশ্চর্য তেজী মেয়ে। রূপ আছে

বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ওর মনের তেজস্বিতা, যেন স্ফটিকের মত জ্বল জ্বল করছে! নাঃ, সেদিন বড় বেশি খোঁচা দিয়ে কথা বলেছি—অতটা উচিত হয় নি। এবার একদিন গিয়ে মাফ চেয়ে ভাব করে ফেলব। হেমন্ত বোধ হয় আর ওদিকে যায় নি! কিম্বা হয়তো গিয়েছে—কে জানে! খোঁজ নিতে হবে। সেদিন থেকে এই দশ-বারো দিন হেমন্তর বাড়িতে যাওয়া হয় নি। (সহসা আত্মচেতন হইয়া) কি আশ্চর্য, এতদিন ধরে কেবল ওদের কথাই মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এ তো ভাল কথা নয়। আমার এত কালের মতগুলো একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে না তো? কিন্তু (চিন্তা করিয়া) তাতে দোষই বা কি? মন তো মনুসংহিতা নয় যে, বদল করা চলবে না। বরং ওরা যদি সত্যি ভাল লোক না হয়, তা হলে ওদের প্রতি অবিচার করাই তো অন্যায়।—ঐ ঊর্মিলা মেয়েটি--ওর প্রতি কি আমি—? (লজ্জিতভাবে) নাঃ, ওসব কথা ভাবব না- গামা, চল তোকে খেতে দিই গে।

'মাস্টারমশাই' বলিয়া ডাক দিয়া খাতা হস্তে কানাই প্রবেশ করিল।
তাহার সঙ্গে তিন-চারিটি ছেলে

অশনি। কি হে, অনেক দিন তোমাদের দেখি নি! কোথায় ছিলে?

কানাই। চাঁদা আদায় করে বেড়াচ্ছি সার্!

অশনি। ও—কিসের চাঁদা?

কানাই। আজ্ঞে, এবার আমাদের সমিতির বার্ষিক উৎসব খুব ভাল করে করব ঠিক করেছি। দল বেঁধে ব্যান্ড বাজিয়ে মার্চ করতে করতে গড়ের মাঠে যাব, সেখানে কুচ-কাওয়াজ হবে; তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বক্সিং যুযুৎসু, আরও অনেক রকম খেলা দেখান হবে। ভাল হবে না সার্?

অশনি। বেশ হবে। স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম সম্বন্ধে দেশের লোকের মনকে সচেতন করে তোলা হবে। কলেজ স্কোয়ারে সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে না কেন? তা হলে আরও ভাল হত।

কানাই। তাও করেছি সার্, জলের খেলা পরদিন দেখান হবে। দুদিন ধরে উৎসব চলবে ঠিক হয়েছে। আমাদের উৎসবের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে সার্—(হাস্য করিয়া) আর এই নিয়ে একটা ভারি মজা হয়েছে।

অশনি। মজা আবার কি হল?

কানাই। আমাদের পাড়ার ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ের কথা জানেন তো সার্? তাদের বার্ষিক উৎসব এই সময়। তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে উৎসব করতে চায়—চিঠি লিখেছিল। (উচ্চহাস্য)

অশনি। তারপর?

কানাই। আমরা খুব কড়া জবাব দিয়ে দিয়েছি—ওসব হবে-টবে না। আজকাল মেয়েগুলোর আস্পর্ধা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়—ওরা যেন আমাদের সমকক্ষ!

অশনি। কানাই, মেয়েরা তোমাদের সমকক্ষ নয়, কারণ ওরা তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি উদার। তোমরা তাদের সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করে ভয়ানক অন্যায় করেছ।

কানাই। (অবাক হইয়া) কিন্তু সার্—

অশনি। ওর মধ্যে কিন্তু নেই—অন্যায় করেছ। তুমি মনে কর, তোমরাই কেবল স্বাস্থ্যের চর্চা করতে পার, আর মেয়েরা স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়! মেয়েদের এমন আলাদা করে দেখবার প্রবৃত্তি কে তোমাদের দিলে?

কানাই। কিন্তু আপনিই তো বলেন সার্, যে মেয়েদের পুরুষ-ভাব আপনি পছন্দ করেন না—

অশনি। বাড়াবাড়ি আমি ভালবাসি না তা ঠিক। কিন্তু এক্ষেত্রে বাড়াবাড়িটা তোমাদেরই হচ্ছে। মেয়েরা অশিক্ষিত এবং রুগ্ন হয়ে থাকুক—এই উপদেশটা কি আমি তোমাদের দিয়েছি?

কানাই। না সার্, তা নয়; কিন্তু তাই বলে ওদের সঙ্গে একসঙ্গে—

অশনি। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে উৎসব করলে তোমাদের জাত যাবে? ঐ ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ে তোমার এক বোন পড়ে না? (কানাই ঘাড় নাড়িল) অর্থাৎ নিজের বোনকেও তুমি ঘৃণা কর, তার সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতেও তোমার লজ্জা বোধ হয়! ছি কানাই!

কানাই। (অনুতপ্ত কণ্ঠে) আমাদের ভুল হয়ে গেছে সার্, কিন্তু এখন তো আর—

অশনি। সে জন্যে ভাবতে হবে না, তোমাদের উৎসব যাতে একসঙ্গে হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। এখন তোমাদের চাঁদার খাতা দেখি। কত চাঁদা উঠল?

কানাই। কই আর বেশি উঠল সার্। এতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি মোটে পঞ্চাশটি টাকা উঠেছে। হেমন্তবাবুর বাড়িতে তিন দিন গিয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর দেখা পাই নি।

অশনি। দেখা পাও নি? কোথায় ছিল সে?

কানাই। কি জানি কোথায় বেরিয়েছিলেন, বাড়ি ছিলেন না।

অশনি। কোন্ সময় গিয়েছিলে তোমরা?

কানাই। বিকেলবেলা।

অশনি। বিকেলবেলা বাড়ি ছিল না—হুঁ (চিন্তায় ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল) যা হোক, তোমাদের চাঁদা আমি পাইয়ে দেব।

কানাই। (আগ্রহে) আপনি যদি হেমন্তবাবুকে একটু বলে দেন সার্, তা হলে তাঁর কাছ থেকে বেশি চাঁদা আদায় হয়। শ'খানেক টাকা তিনি দিলে আর আমাদের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হয় না।

অশনি। একশো টাকা! সে কি! অত টাকা সে দেবে কেন?

কানাই। হেমন্তবাবুর তো অনেক টাকা, আপনি বললেই—

অশনি। কিন্তু আমিই বা এমন অন্যায় অনুরোধ তাকে করব কেন?

কানাই। অন্যায় অনুরোধ কেন হবে সার্? এটা তো দেশের কাজ।

অশনি। দেশের কাজই যদি হয়, তা হলে দেশের লোকের উচিত সে কাজের খরচ ভাগ করে নেওয়া। না না, কানাই, হেমন্ত ভালমানুষ বলে তার ওপর আমি তোমাদের উৎপাত করতে দেব না। তোমরা চাইলেই সে হয়তো একশো টাকা দিয়ে দেবে, কিন্তু আমি তা দিতে দেব কেন? যা ন্যায্য চাঁদা তা অবশ্যই তোমরা পাবে, কিন্তু তার বেশি নয়।

কানাই। (ক্ষুব্ধ স্বরে) আচ্ছা সার্। আপনি যা ভাল বোঝেন।

অশনি। দমে যেও না। তোমাদের তো টাকা নিয়ে দরকার? তা তোমরা তুলতে না পার, আমি দশ জনের কাছ থেকে আদায় করে দেব। আর আমার নামেও দশ টাকা লিখে রাখ।

কানাই। আপনি দশ টাকা দেবেন সার্?

অশনি। হ্যাঁ—কেন, কম হয়েছে?

কানাই। না না, সার্, আমি ভাবছিলুম এত বেশি আপনি দেবেন—

অশনি। (সহাস্যে) বেশি নয়। আমি একশো টাকা মাইনে পাই বটে, কিন্তু আমার খরচও তো তেমনই কম। দশ টাকা দিলে আমার গায়ে লাগবে না।

কানাই। (আবেগভরে) একশো টাকা দিলে হেমন্তবাবুরও গায়ে লাগত না সার্।

অশনি। হয়তো লাগত না। কিন্তু আমি তা পারব না কানাই। আচ্ছা, তোমরা এখন যাও, চাঁদার জন্যে ভেব না। আমি তোমার যা টাকা লাগে তুলে দেব; আর ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গেও কথাবার্তা ঠিক করে রাখব।

কানাই। আচ্ছা, সার্—

ঈষৎ ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থানোদ্যত

অশনি। হ্যাঁ—শোন কানাই, একটা কাজ করতে পারবে?

কানাই। কি কাজ সার্?

অশনি। (ভাবিতে ভাবিতে) তোমরা তো সর্বদা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াও, হেমন্ত রোজ সন্ধ্যেবেলা কোথায় যায় খোঁজ নিয়ে আমাকে খবর দিতে পারবে?

কানাই। (মহোৎসাহে) খুব পারব সার্। গোয়েন্দার কাজ আমরা খুব পারি। এই সেবার আমাদের পাড়ার গোপাল মিত্তিরের ছোট ভাই কমলাদের বাড়িতে ঢিল ফেলতে আরম্ভ করেছিল, তাকে ধরে একদিন আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিলুম। হেমন্তবাবু কি আজকাল বদ্খেয়ালী শুরু করেছেন সার্? যদি বলেন তো তাঁকেও দু-চার ঘা—

অশনি। আরে না না, ওসব নয়। তোমরা শুধু খবরটা এনে দেবে সে কোথায় যায়। খবরদার তার গায়ে হাত দিও না!

কানাই। আচ্ছা, সার্—চল হে।

সদলবলে প্রস্থান করিল

অশনি। (পাদচারণ করিতে করিতে) তাই তো, ভাবিয়ে তুললে হেমন্তটা। কোথায় যায়? জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বাড়িতে যায়, না আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের ফন্দি মাথায় ঢুকেছে? নাঃ, দেখতে হল। (পাঞ্জাবি ও চাদর পরিধান করিয়া জুতা পায়ে দিতে দিতে) ঊর্মিলারা হেমন্তর বাড়িতে আসবে বলেছিল; ইতিমধ্যে এসেছিল না কি?—গামা, তুই ঘর পাহারা দে—আমি বেরুলুম।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর গৃহে ঊর্মিলার বিরাম কক্ষ। ঘরে দুইটি সোফা, ওয়ার্ডরোব, বড় বড় দুটি ভিনিসীয় আয়না ও একটি পিয়ানো আছে। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া বৈকালী রৌদ্র ঘরে প্রবেশ করিতেছে। জানালার দিকে ঈজেল ফিরাইয়া ঊর্মিলা ছবি আঁকিতেছে; তাঁহার বাঁ হাতে প্যালেট, ডান হাতে তুলি। মন্দা অদূরে বসিয়া নীরবে একটা টেবিল-ক্লথে সূচিকার্য করিতেছে ও মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া ঊর্মিলাকে দেখিতেছে

মন্দা। দিদি, ক'দিন থেকে তুই এমন মন-মরা হয়ে আছিস কেন বল তো?

ঊর্মিলা। মন-মরা আবার কখন দেখলি?

মন্দা। কখন আবার! যখনই দেখছি, তখনই মনে হচ্ছে যেন তোর মনে সুখ নেই। কেমন ছবি আঁকলি দেখি?

ঊর্মিলা ঘরের দিকে ঈজেল ফিরাইল

ওমা—এই বুঝি তোর 'প্রভাত অরুণিমা'র ছবি! আকাশ মেঘে ঢাকা, চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে; মাঠের মাঝ দিয়ে একটি সরু পথ, একটি মেয়ে সেই পথ ধরে চলেছে। এ কি ছবি আঁকছিস দিদি?

ঊর্মিলা। প্রভাতের দৃশ্য আঁকব ভেবেছিলুম, কিন্তু আরম্ভ করে আর ইচ্ছে হল না। আসন্ন দুর্যোগের ছবি আঁকছি।

মন্দা। চমৎকার হচ্ছে কিন্তু। কি নাম দিবি ছবিটার?

ঊর্মিলা। 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল।'

মন্দা। এই দেখ, নিজের কথাতেই ধরা পড়ে গেলি! তোর ছবি আঁকা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে তোর মন খারাপ।

ঊর্মিলা। (তুলি ইত্যাদি রাখিতে রাখিতে) মিছে নয় মন্দা, ক'দিন থেকে মনটা সত্যিই ভাল যাচ্ছে না। কেমন যেন একটা অতৃপ্তি একটা অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসেছে।

মন্দার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল

মন্দা। এ রকম তো তোর কখনও হয় না। কেন বল দেখি এমন হল?

ঊর্মিলা। তাও ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন জীবনটা হেসে খেলেই কাটিয়ে

দিলুম। কারুর কোনও কাজে লাগলুম না। ভেবে দেখ, কুড়ি বছর বয়স হতে চলল, আজ পর্যন্ত এমন কি কাজ করেছি যাতে পরের উপকার হয়? স্কুল-কলেজে গেছি, খেয়েছি, ঘুমিয়েছি, থিয়েটার-সিনেমা-পার্টিতে গিয়ে আমোদ করেছি। নিজের সুখ-সুবিধের সন্ধান ছাড়া আর তো কিছুই করি নি।

মন্দা। (ভাবিতে ভাবিতে) তা হতে পারে। কিন্তু নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি রাখা কি অন্যায়? জীবনে কতটুকু সুখ ভোগ করবার সুযোগ পাব তা জানি না। তার ওপর যদি পরের উপকার করতে গিয়ে সেটুকুও বিলিয়ে দিই তা হলে বেঁচে থেকে লাভ কি দিদি? আর মনে করে দেখ, আমরা মেয়েমানুষ, কতটুকু আমাদের ক্ষমতা? স্বাধীন-ভাবে পরের উপকার করতে যাওয়া তো আমাদের পাগলামি।

ঊর্মিলা। (ব্যঙ্গস্বরে) স্বাধীনভাবে আমোদ-আহ্লাদ করাটা পাগলামি নয়, স্বাধীন-ভাবে পরের উপকার করতে গেলেই সেটা পাগলামি হয়ে পড়বে? অর্থাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার যত আরাম সব আমরা ভোগ করব, কেবল দায়িত্বটুকু ঘাড়ে নেব না— এই তো? মন্দা, তোর লজিক একটু একপেশে হয়ে পড়েছে।

মন্দা। আমি লজিক বুঝি না ভাই—

ঊর্মিলা। তা জানি। সেইজন্যেই এবার লজিকে ফেল করেছিস। কত নম্বর পেয়েছিলি?

মন্দা। দুশোর মধ্যে সতেরো। আমি সত্যিই লজিক বুঝি না দিদি; আমি শুধু এইটুকু বুঝি, মেয়েমানুষ যাদের ভালবাসে তাদের সুখী করে যদি নিজে সুখী হতে পারে, তা হলেই তার কর্তব্য শেষ হল, আর কোনও দায়িত্ব তার নেই।

ঊর্মিলা। কিন্তু তাই বা আমরা পারলুম কই? বাবাকে তো এত ভালবাসি, কিন্তু আঙুল নেড়েও তো তাঁর সাহায্য করি না।

মন্দা। জ্যাঠামশাইকে সাহায্য করা কি তোর-আমার কাজ? ওঁকে সাহায্য করতে চাওয়া আমাদের যে ধৃষ্টতা ভাই। তবে এমন লোক হয়তো একদিন পাব যে সত্যিই সাহায্য চায়, যাকে সাহায্য করে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

ঊর্মিলা। ও—(ঈষৎ হাসিয়া) তার মানে তোর একটি বর চাই। বর না পেলে আর কাউকে সাহায্য করবি না। তুই একেবারে সেকেলে মেয়ে মন্দা।

মন্দা। তা কি করব! মন যাকে চায় তার জন্যে আমি সব পারি, কিন্তু তাই বলে পরের জন্যে কেঁদে বেড়ানো আমার ভাল লাগে না।

ঊর্মিলা। মন যাকে চায় তাকে পেয়েছিস নাকি?

মন্দা। দূর! (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার দিকে কে ফিরে তাকাবে বল, আমি তো আর তোর মত সুন্দর নই!

ঊর্মিলা। তোর কথা শুনলে হাসি পায়। তুই কি কুচ্ছিৎ?

মন্দা। (মলিনহাস্যে) না, আমি বেহেস্তের পরী। থাক ভাই, তোর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমারও মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চল, আজ একটা কিছু করি।

ঊর্মিলা। কি করবি? সিনেমায় যাবি?

মন্দা। (ভাবিবার ভান করিয়া) না, তার চেয়ে চল হেমন্তবাবুর বাড়িতে যাই। তাঁকে কথা দেওয়া হয়েছিল, একদিন হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হব, আজই যাওয়া যাক।

ঊর্মিলা! হেমন্তবাবু তো তারপর একবারও এলেন না। তাঁর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?

মন্দা। তাঁকে নিশ্চয় সেই লোকটা আসতে দেয় নি।

ঊর্মিলা। কোন লোকটা?

মন্দা। সেই যে ওঁর বন্ধু—অশনিবাবু!

ঊর্মিলা। (ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে) তা হতে পারে। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে কি আমাদের গায়ে পড়ে যাওয়া উচিত?

মন্দা। কেন উচিত নয়? ওঁকে ঐ অসভ্য বন্ধুর হাত থেকে উদ্ধার করা তো আমাদের

কর্তব্য। উনি ভালমানুষ বলে ওঁর বন্ধুই বা ওঁর ওপর অত্যাচার করবে কেন?

ঊর্মিলা। বন্ধুর অত্যাচার হয়তো হেমন্তবাবু হাসিমুখে সহ্য করেন, কিন্তু আমাদের উৎপাত তিনি সহ্য করবেন কেন? তাঁর ওপর আমাদের জোর কিসের?

মন্দা। জোর আছে। তুই লক্ষ্য করিস নি, উনি আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান, কিন্তু বন্ধুর ভয়ে পারেন না।

ঊর্মিলা। তা হলে হেমন্তবাবুকে অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির লোক বলতে হবে।

মন্দা। তা নয়। বোধ হয় বন্ধুত্বের খাতির এড়াতে পারেন নি। কিন্তু দুর্বল প্রকৃতিই যদি হয়, তা হলে তো আমাদের আরও উচিত তাঁকে দুর্দান্ত বন্ধুর উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা। না দিদি, চল।

ঊর্মিলা। (ক্লান্তভাবে) কিন্তু আজ আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না ভাই। কেমন যেন ক্লান্ত বোধ হচ্ছে।

মন্দা। (সানুনয়ে) চল না ভাই, দিদি। হয়তো সেই অশনিবাবুর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।

ঊর্মিলা। (সচকিতে) তাতে কি হবে?

মন্দা। সেদিন যে তিনি ভদ্রতা করে কতকগুলি মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে গেলেন—তার শোধ নিতে হবে না?

ঊর্মিলা। না! যা বলেছেন বলেছেন, তার জের টেনে ঝগড়া করতে আমি পারব না।

মন্দা। তবে যে সেদিন বলেছিলি, সব তোলা রইল, এক মাঘে শীত পালায় না?

ঊর্মিলা। সে রাগের মাথায় বলেছিলুম। আর সত্যিই তো আমাদের সমাজে ললি রায়, নীলিমা গুপ্তর মত ছ্যাবলা অপদার্থ মেয়েই তো বেশি চোখে পড়ে। তাদের দেখে যদি অশনিবাবু আমাদেরও সেই রকম মনে করে থাকেন, তা হলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

মন্দা। ছি দিদি, তুই ললি-নীলিমার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে পারলি! ওরা তো ডাক-সাইটে ফ্ল্যার্ট, কলেজের ছেলেদের মাথা খাওয়া ওদের পেশা।

ঊর্মিলা। তুলনা আমি করি নি। কিন্তু অন্যলোকে যদি করে, তার সঙ্গে তর্ক করব কোন মুখে?

মন্দা। তাই মুখ বুজে মেনে নিবি? (কিছুক্ষণ ঊর্মিলার দিকে চাহিয়া থাকিয়া) ও—বুঝেছি।

ঊর্মিলা। কি বুঝেছিস?

মন্দা। অশনিবাবুর সঙ্গে তর্কে পাছে আবার হেরে যাস সেই ভয়ে যেতে চাইছিস না। বুঝেছি ভাই, তা হলে গিয়ে কাজ নেই।

ঊর্মিলা। (উত্তপ্তকণ্ঠে) মন্দা!

মন্দা। কি দিদি!

ঊর্মিলা। (উঠিয়া) তুই আমাকে কি মনে করিস? বেশ, যাব হেমন্তবাবুর বাড়িতে। অশনিবাবুকে আমি ভয় করি না।

প্রস্থানোদ্যতা

মন্দা। (হাসি চাপিয়া) দিদি, রাগ করলি ভাই?

ঊর্মিলা। রাগ করি নি। কিন্তু যেতেই যখন হবে তখন বাড়ির কাজগুলো সেরে রাখি গে—

প্রস্থান

মন্দা। (নিজমনে) খোঁচা দিয়ে দিদিকে তো রাজি করালুম। কিন্তু দিদির মনে কি আছে ঠিক বুঝতে পারছি না। দিদির মনও কি হেমন্তবাবুর দিকে ঝুঁকেছে? আশ্চর্য নয়, এ ক'দিন হেমন্তবাবুকে দেখতে পায় নি বলেই হয়তো মনমরা হয়ে আছে। কিন্তু কেন? দিদিরও ওকেই চাই? আরও তো হাজার হাজার লোক রয়েছে! (উঠিয়া পাদচারণ করিল) দিদিকে নিয়ে হেমন্তবাবুর বাড়িতে যাওয়া কি ঠিক

হচ্ছে? কিন্তু একলাই বা যাব কি করে? পাঁচজনে কথা কইবে, দিদিই বা কি মনে ভাববে। না, সে হয় না। কি যে করব বুঝতে পারছি না। কিন্তু হেমন্তবাবু বোধ হয় দিদির দিকে অতটা ঢলে পড়ে নি। বলাও যায় না, সুন্দর মুখ দেখলেই পুরুষের মন ভিজে যায়। (পাদচারণ) নাঃ, প্রথমটা এত আগ্রহ ছিল হেমন্তবাবুর বাড়িতে যাবার জন্যে, কিন্তু আগ্রহ ক্রমেই মিইয়ে যাচ্ছে। ভাল লাগে না—কিছু ভাল লাগে না। কি যে করি—

নীলিমা প্রবেশ করিল। লম্বা শীর্ণ চেহারা, চুল রুক্ষ, দেহের বর্ণও ফর্সা করিবার চেষ্টায় খসখসে ও শ্রীহীন। মুখে অপর্যাপ্ত রুজ-পাউডারের অভিযানে মুখ অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ ও শ্বেতাভা-চিহ্নিত। পায়ে হাই-হীল জুতা, হাতে ভ্যানিটি-ব্যাগ ঝুলিতেছে। চাহনিতে দেহভঙ্গিতে চপল স্বৈরাচার পরিস্ফুট। বয়স পনের কিম্বা ত্রিশ অনুমান করা কঠিন

নীলিমা। কি রে মন্দা, কি হচ্ছে! ঊর্মি কোথায়?

মন্দা। (শুষ্কস্বরে) নীলিমাদি যে! কি খবর?

নীলিমা। এই এলুম! (সোফায় বসিয়া) শুনলুম নাকি মস্ত শিকার ফাঁসিয়েছিস?

মন্দা। ও আবার কি কথা?

নীলিমা। নে নে—ন্যাকামো করিস নি। কে ফাঁসালে? তুই না ঊর্মি?

মন্দা। নীলিমাদি, ও সব কথা আমার ভাল লাগে না।

নীলিমা। তা লাগবে কেন? তোরা যে ডুবে ডুবে জল খেতে ভালবাসিস। আমার ওসব নেই, যা করব খোলাখুলি করব। (আয়না ও রুজ বাহির করিয়া গালে ঘষিতে ঘষিতে) এই সেদিন পর্যন্ত কুমার বীরেন চৌধুরীকে খেলালুম—ললি ধীরা দেখে হিংসেয় ফেটে মরে। তারপর তার ওপর যখন অরুচি ধরে গেল, তখন তাকে বিদায় করে দিলুম। এখন ক্যামাক স্ট্রীটের বিজন মিত্তিরকে নিয়ে পড়েছি। দিব্যি গান গায় আর পয়সাও খরচ করে খুব। থিয়েটার, সিনেমা, পেলিটি, গ্র্যান্ড হোটেল লেগেই আছে—চল না, তোদেরও আজ নিয়ে যাই। একটা নতুন জায়গায় যাব।

মন্দা। আমাদের দরকার নেই।

নীলিমা। তোরা দিন দিন কুনো হয়ে যাচ্ছিস, যেন সেকেলে হিঁদুর ঘরের কনে বৌটি। আজকালকার এই আধুনিকতার যুগে যদি প্রাণ খুলে আমোদই না করলুম, তা হলে নারী-প্রগতি করে লাভ কি? সিগারেট আছে? দে একটা, বড় গলা শুকিয়ে গেছে।

মন্দা। সিগারেট নেই, আমরা তো কেউ সিগারেট খাই না। তবে জ্যাঠামশায় তামাক খান, যদি চাও তো এক কল্‌কে সেজে এনে দিতে পারি।

নীলিমা। হরিড! তামাক খাব কি? তুই একেবারে হোপলেস, একটু সেন্স অব হিউমারও কি নেই—গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে বসলে আমাকে কি রকম দেখাবে বল তো?

ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে সিগারেট লইয়া ধরাইল

মন্দা। মন্দ দেখাবে না। সেকেলে বুড়ী বেগম বলে ভুল হবে।

নীলিমা। বুড়ী! আমাকে বুড়ী দেখাবে? আমার কত বয়স জানিস?

মন্দা। জানি। চিরকালই শুনে আসছি পনের পেরিয়ে ষোলয় পা দিয়েছ।

নীলিমা। আমার বয়স এখন ঊনিশ বছর। তা সে যাক। তোদের নতুন শিকারের নাম বলবি না তো? বলিস নি; বললে আমি কিছু আর তোদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতুম না। আমার নিজের পিছনেই এত ইয়ং ব্লাড ঘুরে বেড়ায় যে তাদের সামলাতে পারি না। বরং তোদের দরকার হলে বলিস দু-চারটে পাঠিয়ে দেব। (রিস্টওয়াচ দেখিয়া) আজ উঠি, বিজনের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট আছে। (যাইতে যাইতে থামিয়া) সেদিন বিজন আমাকে লক্ষ্য করে একটা গান গাইলে, ওঃ, হাউ এক্সক্রুশিয়েটিংলি সুইট! শুনবি?

মন্দা। (অসহায়ভাবে) শোনাও।

নীলিমা পিয়ানোয় বসিয়া গাহিল

খুট খুট পায়—কে গো তরুণী
রুজ পাউডার মেখে রাঙা-বরণী!
আঁচল লুটায়ে পড়ে গো—
বডিস পাগল করে গো—
লাবণ্যে টলমল হেম-তরণী।
ছল ছল বয়ে যায় রূপ বন্যা
কে গো তুমি যৌবন-বন কন্যা
ডালিম আপেল ফলে গো—
তনুমন চঞ্চলে গো—
আগুন লাগায় মনে ফুল-ধরা।

মন্দা গান শুনিতে শুনিতে কানে আঙুল দিয়া রহিল

নীলিমা। (গান শেষ করিয়া) ওকি! কানে আঙুল দিয়ে বসে আছিস যে? কেমন শুনলি? বিজন কি নাট বল তো?

মন্দা। তোমার ও বেহায়া গান আমি শুনি নি।

নীলিমা। বেহায়া গান! হাউ ফানি! তোর প্রাণে দেখছি একটুও রসকস নেই। পুওর থিং! চললুম। দেরি হয়ে গেল, তা হোক। একটু না ভোগালে পুরুষমানুষ বশে থাকে না। ঊর্মিকে বলিস আমি এসেছিলুম।—টা টা!

প্রস্থান

মন্দা। বাবা, হাড়ে বাতাস লাগল। কি অসভ্য লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, ঘরটা যেন নোংরা করে দিয়ে গেল।

কয়েকটি ধূপের কাঠি জ্বালিয়া দিল। কিছু পরে ঊর্মিলা প্রবেশ করিল

ঊর্মিলা। কাপড়চোপড় পরলি না? এই বেশেই যাবি নাকি?

মন্দা। না, এই যে যাই দিদি। নীলিমা এসেছিল।

ঊর্মিলা। পিয়ানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলুম বটে। তারপর?

মন্দা। কিছুতে কি যায়! স্নাব করলেও বোঝে না—গায়ে গণ্ডারের চামড়া। খুব খানিকটা চাল মারলে, তারপর গেল। দেখ না, ঘরে ধূপ জ্বেলে দিয়েছি, তবু যদি ঘরের হাওয়া একটু পরিষ্কার হয়।

ঊর্মিলা। বেশ করেছিস। কিন্তু যদি যেতে চাস তো শিগ্‌গির কাপড়চোপড় পরে নে। নইলে দেরি হয়ে যাবে।

মন্দা। তোর যে হঠাৎ এত চাড় বেড়ে গেল? এই তো বলছিলি—ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, যেতে তোর মন চাইচে না।

ঊর্মিলা। (আনত মুখে) যেতে যখন হবে তখন সময়ে যাওয়াই ভাল। নে—আর দেরি করিস নে।

মন্দা। হুঁ। যাই—

সহসা জ্ঞানাঞ্জন প্রবেশ করিলেন

জ্ঞানাঞ্জন। দেখ, কি একটা কথা তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলুম। মনে পড়েছে। সেই যে সেদিন এক ছোকরা এসেছিল, সে আর আসেটাসে না?

ঊর্মিলা। কার কথা বলছ বাবা?

জ্ঞানাঞ্জন। আরে সেই যে—কি নাম বললে—কৃতান্ত না কি—

মন্দা। কৃতান্ত! সে আবার কে?

জ্ঞানাঞ্জন। আহা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সেই যে যাকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। কি নামটা তার—হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্রীমন্ত।

উর্মিলা। ও, তুমি হেমন্তবাব‌ুর কথা বলছ!

জ্ঞানাঞ্জন। না না, হেমন্তবাব‌ু হতে যাবে কেন, তার নাম শ্রীমন্ত। আমার খ‌ুব ভাল করে মনে আছে। তা—সে আর আসে না ব‌ুঝি?

উর্মিলা। না, তিনি আর আসেন নি। কেন বাবা? আমরা আজ তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি, যদি কোনও দরকার থাকে তাঁকে বলতে পারি।

জ্ঞানাঞ্জন। বেড়াতে যাচ্ছ? বেশ বেশ। দেখ, তার মাথাটা অবিকল খরগোশের মত, যদি কোনও রকমে তার খ‌ুলিটা—

মন্দা। জ্যাঠামশাই কি বলেন তার ঠিক নেই! খরগোশের মত মাথা কেন হতে যাবে—বেশ তো ভদ্রলোকের মত চেহারা—

জ্ঞানাঞ্জন। না না, হ‌ুবহ‌ু খরগোশ। আমার চেয়ে তুমি বেশি জান? ওর খ‌ুলিটা যোগাড় করতে হবে।

উর্মিলা। (ম‌ুখ টিপিয়া হাসিয়া) তা বেশ তো, মাথাটা চেয়ে নিয়ে আসব। সকলেরই যখন ঐ সন্দেহ আর বাবারও যখন দরকার তখন দোষ কি? কি বলিস মন্দা? কিন্তু তিনি যদি রাজি না হন?

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রাজি হবে। শ্রীমন্ত বড় ভাল ছেলে, কখনই অমত করবে না। তার মাথাটা না পাওয়া পর্যন্ত আমার থিওরি ভাল করে প্রমাণ হচ্ছে না। ম‌ুখটা prognathic কি orthognathic তাও মাপজোক করে দেখতে হবে। জ্যান্ত মান‌ুষ বলে একট‌ু অস‌ুবিধা হবে—তা আর উপায় কি? তা ছাড়া ওর ওপর খাদ্য-নির্যাসের একটা এক্সপেরিমেণ্ট করলে ভাল হয়—ওঃ—

হঠাৎ একটা অন্য কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি দ্র‌ুতপদে প্রস্থান করিলেন

উর্মিল। মন্দা, একটা তলোয়ার কিম্বা ভোজালি সঙ্গে নে।

মন্দা। কেন—কি হবে?

উর্মিলা। শ‌ুনলি তো হেমন্তবাব‌ুর ম‌ুণ্ড‌ু বাবার চাইই—যেমন করে হোক আনতে হবে।

মন্দা। তার চেয়ে অশনিবাব‌ুর ম‌ুণ্ড‌ু কেটে আনলে কেমন হয় দিদি? জ্যাঠামশায়েরও কাজে লাগে, আমাদেরও গায়ের ঝাল মেটে। কি বলিস?

উভয়ের হাস্য

উর্মিলা। সে ভাল। আয়—

উভয়ে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল

চতুর্থ দ‌ৃশ্য

হেমন্তের গ‌ৃহের একটি কক্ষ। হেমন্ত বাহিরে যাইবার উপযোগী সাজপোশাক পরিয়া ঘরে পদচারণা করিতেছে ও সিগারেট টানিতেছে। বেলা অপরাহ্ন

হেমন্ত। নাঃ, ভালবেসে ফেলেছি—এতে আর সন্দেহ নেই। মাথার মধ্যে দিন-রাত কেবল তারই কথা ঘ‌ুরছে। রোজ ইচ্ছে করে তাদের বাড়িতে যাই, তাকে দেখি, তার ম‌ুখের দ‌ুটো কথা শ‌ুনি। কিন্তু ভরসা হয় না, অশনি হয়তো আবার গিয়ে হাজির হবে।—অশনিকে নিয়ে বড় ম‌ুশকিলেই পড়েছি। প্রেমকুমারবাব‌ুর সঙ্গে রোজ তাস খেলতে যাই যদি জানতে পারে, তা হলে রক্ষে রাখবে না। প্রেমকুমারবাব‌ুদের ক্লাবটি বেশ উঁচ‌ুদরের ক্লাব, সভ্যরা সকলেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। আর বাজি রেখে তাস খেলা তো আধ‌ুনিক সভ্যতার একটা অঙ্গ। জ‌ুয়া কথাটা শ‌ুনতে খারাপ, কিন্তু জ‌ুয়া কে না খেলে? শেয়ার মার্কেটে জ‌ুয়া চলছে, রেস-কোর্সে জ‌ুয়া চলছে—তাতে তো কেউ কিছ‌ু বলে না! জীবনটাই তো একটা জ‌ুয়া—কিন্তু অশনি তা ব‌ুঝবে না। তার মত অব‌ুঝ লোক দ‌ুনিয়ায় নেই, যা গোঁ ধরবে তা আর ছাড়বে না।—আজ পর্যন্ত কতই বা হেরেছি, বড় জোর হাজার

থানেক টাকা। কি আর এমন বেশি। কথায় বলে Lucky in love. unlucky in cards! (হাস্য) তা ছাড়া জুয়াতে হাত-জিত আছেই, আজ হারছি, কাল আবার সব জিতে নিতে পারি। প্রথম দিন তো জিতেছিলুম।—কিন্তু অশনিকে জানতে দেওয়া হবে না, জানতে পারলেই হাঙ্গামা বাধাবে।

নিধিরাম প্রবেশ করিল

নিধিরাম। বাবু এসেছেন।

হেমন্ত। কোন বাবু? অশনি?

নিধিরাম। না—প্রেমকুমারবাবু।

হেমন্ত। ও—যাক। মোটর বার করতে বল।—আর দেখ, আমি এখন বেরুচ্ছি; অশনি যদি এসে আমার খোঁজখবর নেয়, তাকে বলিস আমি একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছি।

নিধিরাম। যে আজ্ঞে।

নিধিরাম প্রস্থান করিল। হেমন্ত একটা দেয়াল-আলমারি খুলিয়া কয়েক কেতা নোট গণিয়া পকেট লইল। নিধিরাম ফিরিয়া আসিল

গাড়ি সদরে এসেছে।

ছড়ি লইয়া হেমন্ত প্রস্থান করিল

(ঝাড়ন দিয়া আসবাব ঝাড়িতে ঝাড়িতে) বাবু তো জুয়া খেলছেন। রোজ তিন-চারশো টাকা নিয়ে যান, আর খালি পকেটে ফিরে আসেন। বাবুর অঢেল টাকা, দু পাঁচ শো গেলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি? কিন্তু আমার যে গা কর্‌কর্‌ করে। কতকগুলো চোরছ্যাঁচড় মিলে টাকাগুলো লুটেপুটে নেবে। আমার মত গরীব-গুর্‌বোর পেটে গেলেও কথা ছিল, গরীবের ছানা-পোনা খেয়ে বাঁচত। কি করি? চুপ করে থাকাও যায় না। অশনিবাবুকে বলে দেব? কিন্তু বাবু যে মানা করে গেলেন; যদি জানতে পারেন আমি অশনিবাবুকে কিছু বলেছি, আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। বাবু এত ভাল লোক যে তাঁকে রাগাতেও মন চায় না। অথচ—; এই যে অশনিবাবু আসছেন। দেখি. যদি ইসারায় বুঝিয়ে দিতে পারি।

অশনি প্রবেশ করিল

অশনি। হেমন্ত কোথায়, নিধিরাম?

নিধিরাম। আজ্ঞে তিনি—

মাথা চুলকাইতে লাগিল

অশনি। চুপ করে রইলে যে! কোথায় সে?

নিধিরাম। আজ্ঞে. তিনি বেরিয়েছেন। বলে গেলেন. আপনি যদি আসেন আপনাকে বলতে যে তিনি জরুরী কাজে বেরিয়েছেন।

অশনি। (তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া) জরুরী কাজ! তার আবার জরুরী কাজ কী! ইদানীং রোজ বিকেলে বেরোয় শুনেছি. কোথায় যায় তুমি জান?

নিধিরাম। আজ্ঞে. তা তো জানি না। রোজ একজন ভদ্রলোক আসেন. তাঁর সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে বেরোন।

অশনি। টাকাকড়ি নিয়ে বেরোয়! কি করে টাকা নিয়ে?

নিধিরাম। আজ্ঞে. তা জানি না।

অশনি। হুঁ। টাকা ফিরিয়ে আনে কিনা জান?

নিধিরাম। আজ্ঞে. ফিরিয়ে আনতে তো দেখি নি।

অশনি। কত টাকা রোজ নিয়ে যায় বলতে পার?

নিধিরাম। নোটের তাড়া দেখে মনে হয় চার-পাঁচশো টাকার কম নয়।

অশনি। বল কি? রোজ এত টাকা নিয়ে কি করে? আমি এই ক'দিন আসি নি. এরই মধ্যে টাকা ওড়াবার একটা নতুন ফন্দি বার করে ফেলেছে! কি করছে—জুয়াড়িদের পাল্লায় পড়েছে নাকি? আচ্ছা নিধিরাম, সেদিনের পর জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বাড়িতে আর

গিয়েছিল কিনা তুমি জান?

নিধিরাম। আজ্ঞে, কেষ্ট ডেলেবর বলছিল সেদিকে আর যান নি। আজকাল জোড়াসাঁকোর দিকে যান।

অশনি। জোড়াসাঁকোর দিকে কি আছে! না, ভাবিয়ে তুললে, ও অঞ্চলটা তো সুবিধের নয়। যে বাবুটি আসেন বলছিলে, তিনি কে?

নিধিরাম। তাঁর নাম প্রেমকুমারবাবু। সিড়িঙ্গে চেহারা—কাবলি-আলা অনেকদিন খেতে না পেলে যে-রকম দেখতে হয়, সেই রকম দেখতে। কথাবার্তাও এমন উলটো-পালটা বলেন সে কিছুই বুঝতে পারি না, বাবু।

অশনি। দুর্ভিক্ষপীড়িত কাবুলির মত চেহারা! এ রকম মূর্তি আজকালকার তরুণদের মধ্যে দেখা যায় বটে! হেমন্ত কি শেষে তরুণদের দলে ভিড়ল নাকি?

বাহিরে মোটর হর্নের শব্দ হইল

ঐ বোধ হয় হেমন্ত ফিরল।

নিধিরাম। আজ্ঞে না, ও তো আমাদের গাড়ির 'হরেনে'র শব্দ নয়। আর কেউ এসেছেন।

অশনি। কে এসেছেন দেখ।

নিধিরাম প্রস্থান করিল

কানাইয়ের দলকে পেছনে লাগিয়ে ভালই করেছি দেখছি। না, হেমন্তর বিয়ে দেওয়া এবার দরকার হয়ে পড়েছে, বাড়িতে একজন শাসন করবার লোক না থাকলে ওকে সামলান যাবে না।

নিধিরামের পশ্চাতে ঊর্মিলা ও মন্দা প্রবেশ করিল

এ কি!

কিছুক্ষণ উভয় পক্ষ নির্বাক

ঊর্মিলা। (নিধিরামকে) হেমন্তবাবু কোথায়?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তিনি—

অশনি। হেমন্ত বেরিয়েছে, এখনই ফিরবে। আপনারা বসুন। (ঊর্মিলা ও মন্দা অনিশ্চিতভাবে রহিল) আপনারা সংকুচিত হচ্ছেন কেন বলুন তো? এটা হেমন্তর বাড়ি বটে, কিন্তু হেমন্তর বদলে আমি আপনাদের অভ্যর্থনা করলে শিষ্টাচারের কোন ত্রুটি হবে না। আমি হেমন্তর বন্ধু।

উভয়ে উপবেশন করিল। ঊর্মিলার অধরে একটু হাসির আভাস দেখা দিল

ঊর্মিলা। আপনি বোধ হয় প্রকারান্তরে বলতে চান যে হেমন্তবাবুর অবর্তমানে আপনিই এ বাড়ির গৃহস্বামী?

অশনি। অবর্তমানে! না, সে বর্তমানে থাকলেও আমি এ বাড়ির গৃহস্বামী, কোনও তফাৎ নেই। উপস্থিত আমাকেই আপনারা হেমন্ত বলে মনে করতে পারেন।

মন্দা ভ্রূকুঞ্চন করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। ঊর্মিলার মুখের হাসি আর একটু পরিস্ফুট হইল

ঊর্মিলা। ও—তা হলে কি আমরা আপনাকে হেমন্তবাবু বলেই ডাকব?

অশনি। তা আপনাদের যদি ইচ্ছে হয় ডাকুন, আমি আপত্তি করব না। মোট কথা আমার ব্যবহারটা আজ সব দিক দিয়ে হেমন্তবাবুর মতই হবে, অশনিবাবুর মত নয়।

ঊর্মিলা। এরকম অভাবনীয় ব্যাপার ঘটবার কারণ কি?

অশনি। কারণ আজ আমি হেমন্তর প্রতিভূ, তার মান্য অতিথিদের সাদর সম্ভাষণ করাই আমার কাজ।—নিধিরাম, চায়ের ব্যবস্থা কর।

নিধিরাম। যে আজ্ঞে—

প্রস্থান

ঊর্মিলা। (হঠাৎ হাসিয়া) আচ্ছা, অশনিবাবু—থুড়ি—হেমন্তবাবু, আপনি তো ইচ্ছে করলে বেশ মিষ্টি কথা বলতে পারেন।

অশনি। আমাকে কি আপনারা—থুড়ি—অশনিবাবুকে—কি আপনারা স্বভাবতই একটা কটুভাষী পাষণ্ড মনে করেছিলেন?

ঊর্মিলা। এরকম মনে করবার সুযোগ কি অশনিবাবু আমাদের দেন নি?

অশনি। বোধ হয় দিয়েছিলেন। কিছু তার পক্ষে সামান্য একটু সাফাই আছে এবং সেই সাফাইটুকু প্রকাশ করে আজ আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করব। দেখুন, হেমন্ত আর অশনি ছেলেবেলার বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই দুজনে ঝগড়া করেছে—মারামারি করেছে—কিন্তু কেউ কাউকে বিপদে ফেলে সরে দাঁড়ায় নি। একবার ইস্কুলের কতকগুলো ছেলে একজোট হয়ে অশনিকে আক্রমণ করে। অশনি তখন একলা ছিল, কিন্তু হেমন্ত খবর পেয়ে একটা নদী সাঁতরে এসে অশনির সঙ্গে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত দুই বন্ধুরই জয় হল। শত্রুপক্ষ হটে গেল। কিন্তু সে যুদ্ধের চিহ্ন এখনও হেমন্তর গায়ে বিদ্যমান আছে, তার বাঁ হাতখানা যদি ভাল করে লক্ষ্য করেন, দেখবেন সেটা ভাঙা। যাক, আসল কথা, ওরা কেউ কাউকে ছাড়তে পারে না, নিয়তি ওদের দুজনকে এক শিকড়ে বেঁধে দিয়েছেন। একজন যদি কুয়ায় পড়ে, আর একজনকেও সেই সঙ্গে কুয়ায় পড়তে হবে।

কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিল

ঊর্মিলা। আপনার সাফাই কি শেষ হয়ে গেল?

অশনি। না, আর একটু আছে। ভাগ্যক্রমে কুয়ায় পড়ার সুযোগটা অশনির চাইতে হেমন্তর বেশি; কারণ তার পিতৃপুরুষরা তার জন্যে অগাধ ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে রেখে গেছেন এবং তার প্রকৃতিটা এতই সরল যে সে মানুষকে অবিশ্বাস করতে জানে না। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পৃথিবীতে যত লুব্ধ প্রবঞ্চক আছে সকলের মতলব কি করে ওকে ঠকাবে। অশনিকেও তাই সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। অনেকবার অনেক অপ্রীতিকর কাজ তাকে করতে হয়েছে। কিন্তু আপনারা ভেবে দেখুন না, না করেও তার উপায় ছিল না।

ঊর্মিলা। অশনিবাবু তা হলে আমাদেরও লুব্ধ প্রবঞ্চকের পর্যায়ে ফেলেছিলেন?

অশনি। ভুল সকলেই করে, সেও করেছিল। সেজন্যে অশনিরই বকলমে আমি মাপ চাইছি, তাকে মাপ করতে হবে।

ঊর্মিলা। মাপ করবার কিছু নেই। মানুষের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া এবং নিজের সত্যিকার পরিচয় দিতে পারা তো সৌভাগ্যের কথা অশনিবাবু।

অশনি। হেমন্তবাবু। অশনি এখানে নেই।

ঊর্মিলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, হেমন্তবাবু। (হাস্য)

চা ইত্যাদি লইয়া নিধিরামের প্রবেশ। অশনি এক পেয়ালা মন্দাকে দিল, মন্দা পেয়ালা হাতে লইয়া ঘরের আসবাবপত্র দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। অশনির কথাবার্তা তাহার ভাল লাগিতেছিল না

অশনি। (ঊর্মিলাকে চায়ের পেয়ালা বাড়াইয়া দিয়া) নিন!

ঊর্মিলা। (লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া) আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

অশনি। (বিস্মিত) ছেড়ে দিয়েছেন? সে কি! কেন?

ঊর্মিলা। অনাবশ্যক বলে। চায়ের বিষে সুস্থ সহজ শরীরকে বিষাক্ত করে তোলা দরকার মনে করি না।

অশনি। (আনন্দ-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া) আমার কথাটা তা হলে আপনার মনে আছে! সত্যি, কি আনন্দ যে আমার হচ্ছে—

ঊর্মিলা। আপনার আনন্দ হচ্ছে কেন? হলে অশনিবাবুর হওয়া উচিত।

অশনি। ও—ঠিক তো! (হাস্য) কিন্তু অশনির ঐ তুচ্ছ কথাটা যে আপনি মনে করে রেখেছেন—

ঊর্মিলা। অশনিবাবুর কোনও কথাই তুচ্ছ নয়—প্রত্যেকটি কথা ছুঁচের মত গায়ে বেঁধে। কিন্তু যাক, এর পর আর বোধ হয় অশনিবাবুর আমাদের বাড়ি যেতে কোনও বাধা নেই?

অশনি। না, নেই। একটা কাজের জন্যে হয়তো সে শীঘ্রই যাবে আপনাদের বাড়িতে—

ঊর্মিলা। কি কাজ?

অশনি। (মৃদুহাস্যে) চাঁদা। ছেলেদের একটা স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান আছে, আমি তার সভাপতি। তারা বার্ষিক উৎসব করবে, কিছু চাঁদা চাই।

ঊর্মিলা কত চাঁদা আমাকে দিতে হবে?

অশনি। আপনি খুশি হয়ে যা দেবেন। জোর তো কিছু নেই।

ঊর্মিলা। তা বটে। বেশ, চাঁদা দেব। আচ্ছা, আপনি স্কুলের ছেলেদের বড় ভালবাসেন, না?

অশনি। তাদের নিয়েই তো আমার জীবন।

ঊর্মিলা। তাদের উপকার করতে, সাহায্য করতে আপনার খুব ভাল লাগে?

অশনি। তা জানি না। তারা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি, তাই উপকার করা বা সাহায্য করার কথা মনেই আসে না। যেখানে ভালবাসা আছে সেখানে আর কিছুই দরকার হয় না; আর যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে দূর থেকে উপকার করবার চেষ্টা আমার তো মনে হয় ভস্মে ঘি ঢালা।

ঊর্মিলা। মনে করুন আমি যদি দেশের ছেলেদের কিছু উপকার করবার চেষ্টা করি তা হলে কি পারব না?

অশনি। না, পারবেন না। কারণ ভালবাসা তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় পর্যন্ত আপনার নেই। তাদের অভাব অভিযোগ না জানলে, তাদের মনের পরিচয় না পেলে, কি করে তাদের দুঃখ দূর করবেন? তাদের দুঃখটা তো অন্নবস্ত্রের নয়। আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু ঊর্ধ্বে থেকে ভিক্ষাই দেওয়া যায়, সহানুভূতি দেওয়া যায় না।

ঊর্মিলা। তবে কি আমি দেশের কোনও কাজ করবার উপযুক্ত নই?

অশনি। সে কথা আমি বলি নি। আপনিও দেশের এবং দশের কাজ করতে পারেন, কিন্তু তা ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করে।

ঊর্মিলা। ঠিক বুঝতে পারলুম না।

অশনি। দেখুন, মেয়েদের মনের গঠন এমনই যে তাঁরা ব্যাপকভাবে ভালবাসতে পারেন না, তাঁদের প্রেম সর্বদা একটি ব্যক্তিবিশেষকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এটা আমি নিন্দা করবার অভিপ্রায়ে বলছি না; ভেবে দেখুন আমার কথা সত্যি কি না!

ঊর্মিলা। এটা কি শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে বলছেন?

অশনি। না, শিক্ষিতা-অশিক্ষিতার শ্রেণীবিভাগটা কৃত্রিম, আসলে নারীপ্রকৃতি সকল অবস্থাতেই এক।

ঊর্মিলা। তারপর?

অশনি। মেয়েরা যাকে ভালবাসে তার জন্যে প্রাণ দেওয়া তাদের পক্ষে কিছু শক্ত নয়, কিন্তু যেখানে তারা ভালবাসে না সেখানে কড়ে আঙুল নাড়তেও তারা অনিচ্ছুক। এই তাদের প্রকৃতি। তাই কেবল তখনই তারা দেশের কাজ করতে পারে যখন তাদের ভালবাসার পাত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে দেশের সঙ্গে জড়িত, নচেৎ পারে না। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন?

ঊর্মিলা। বোধ হয় পেরেছি। আপনি বলতে চান, মেয়েমানুষ একজনকেই ভালবাসতে পারে, বহুকে নয়; এবং সেই একজন যদি দেশের কাজ করে তবেই তার ভালবাসার খাতিরে মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে দেশের কাজ করতে পারে—না হলে নয়। পুরুষেরা কিন্তু ইচ্ছে করলেই বহুকে ভালবাসতে পারে?

অশনি। তার দৃষ্টান্তও তো ইতিহাসে রয়েছে।

ঊর্মিলা। (ঈষৎ হাসিয়া) তা জানি। ইতিহাসে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, জোয়ান অব আর্কের মত মেয়ের দৃষ্টান্তও আছে। কি সে যাক। তর্ক করলেই তর্ক বেড়ে যাবে। কিন্তু আপনার কথা শুনে বোধ হচ্ছে, শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার মতের কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

অশনি। হয়েছে, স্বীকার করছি। পরিবর্তনই জীবনের নিয়ম। আপনারও তো পরিবর্তন হয়েছে।

ঊর্মিলা। আমার পরিবর্তন কোথায় দেখলেন?

অশনি। আপনি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। সত্যি বলছি আমার যে কত আনন্দ হয়েছে তা কি বলব। ব্যাপারটা অতি সামান্যই, তবু দেখতে পেয়েছি সত্যের আলো আপনার বুকের মধ্যে জ্বলছে—সেখানে অন্ধকার নেই, ফাঁকি নেই। আজ আপনার কাছে স্বীকার করছি যে আপনাকে দেখেই আমার চোখ খুলে গেছে। শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে মত পরিবর্তনের জন্যে আপনিই প্রধানত দায়ী।

ঊর্মিলা। (হৃদয়াবেগ লুকাইবার জন্য লঘুস্বরে) কিন্তু তবু আমি দেশের বা দশের কাজ করবার উপযুক্ত নই? চাঁদা দেওয়ার বেশি অধিকার আমার নেই?

অশনি। সে অধিকার হয়তো আপনার শীঘ্রই জন্মাবে।

ঊর্মিলা। তার মানে?

অশনি। তার মানে—(থামিয়া গিয়া) আগেই তো বলেছি, মানুষ যখন ভালবাসে তখনই সে কাজ করবার অধিকার পায়। কিন্তু তার আগে পদে পদে বাধা—লোকলজ্জা, স্বার্থ, মান-অপমানের ভয়—হাজার রকম বিঘ্ন পথ আগলে দাঁড়ায়। আপনি হয়তো গল্প শুনে থাকবেন স্বামীর প্রাণ বাঁচাবার জন্যে স্ত্রী প্রাণ দিয়েছে, কোনও বাধা মানে নি। কেন মানে নি বলতে পারেন?

ঊর্মিলা। ভালবেসেছিল—তাই।

অশনি। ব্যস্, ঐ এক কথা—omnia vincit amor! আপনিও যেদিন কোন এক ভাগ্যবানের পাশে সগর্বে সগৌরবে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন সেদিন আপনারও আর কোন বাধা থাকবে না।

ঊর্মিলা নত মুখে নীরব হইয়া রহিল, অশনিও আর কথা কহিল না। মন্দা ঊর্মিলার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল

মন্দা। দিদি, হেমন্তবাবু তো এখনও এলেন না?

ঊর্মিলা। (চমক ভাঙিয়া) হ্যাঁ, বড় দেরি হয়ে গেল। আজ আমরা তা হলে উঠি। (গাত্রোত্থান) চাঁদা আনতে যাবেন কিন্তু, অশনিবাবু—

অশনি। হেমন্তবাবু। আপনাদের সমুচিত অতিথি সৎকার করতে পারলুম না, অনেক ত্রুটি রয়ে গেল; সেজন্য মার্জনা করবেন।

কানাই ও তাহার কয়েকজন সহচর প্রবেশ করিল

কি খবর কানাই?

কানাই। একটা খবর ছিল স্যর্।

অশনি। (কাছে গিয়া) কি কথা?

কানাই। হেমন্তবাবুর সন্ধান পেয়েছি। তিনি জোড়াসাঁকোর এক জুয়ার আড্ডায় গিয়েছেন।

অশনি। যা ভয় করেছিলুম তাই। তোমরা দাঁড়াও, এখনই আমি তোমাদের সঙ্গে সেখানে যাব। (ঊর্মিলাকে) আমাকেও বেরুতে হল, কানাই একটা জরুরি খবর এনেছে।

ঊর্মিলা। এরা কারা অশনিবাবু?

অশনি। এরা আমার শিষ্য।

ঊর্মিলা। বাঃ, চমৎকার শরীর তো এদের! আপনি বুঝি এদের ব্যায়াম শিক্ষা দেন?

অশনি। হ্যাঁ। কানাই, এদিকে এস। (কানাই কাছে গিয়া নমস্কার করিল) ইনি তোমাদের

চাঁদা দেবেন স্বীকার করেছেন।

কানাই। (তৎক্ষণাৎ খাতা খুলিয়া) আপনার নামে কত লিখব?

অশনি। আরে অত তাড়াতাড়ি নয়, কত দেবেন সে পরে ঠিক হবে। কানাইয়ের ধৈর্য বলে কোন বালাই নেই।

ঊর্মিলা। আমি দশ টাকা দেব, তোমার খাতায় লিখে নাও—ঊর্মিলা দেবী। (অশনিকে) কেমন, হবে তো?

অশনি। একটু বেশি হল, তা কানাইয়ের বেশিতে অরুচি নেই। কিন্তু আর তো দেরি করা চলে না, এবার আমাকে যেতে হবে।

ঊর্মিলা। বেশ তো, আপনি যান না, আমরাও তো যাচ্ছি।

অশনি। আপনাদের আগেই আমার চলে যাওয়াটা অন্যায় হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কর্তব্য আগে! নমস্কার! দু-চার দিনের মধ্যেই চাঁদার খাতা নিয়ে হাজির হব।

দলবল লইয়া প্রস্থান করিল। ঊর্মিলা কিয়ৎকাল সেই দিকে তাকাইয়া রহিল

ঊর্মিলা। চল মন্দা, আমরাও যাই।

মন্দা। চল। আজ মিছেই আসা হল; হেমন্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

ঊর্মিলা। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ, আর থেকে লাভ নেই। কোথায় গেলেন অশনিবাবু কে জানে! মুখে যেন একটা উৎকণ্ঠার ভাব দেখলুম। আয় মন্দা।

উভয়ে প্রস্থান করিল

পঞ্চম দৃশ্য

জুয়ার আড্ডা। রাত্রিকাল। কয়েকটি চতুষ্কোণ টেবিল ঘিরিয়া জুয়া চলিতেছে। খেলোয়াড়গণের মুখে একাগ্রতা ও সিগারেট জ্বলিতেছে; কথা বড় কেহ কহিতেছে না। মাঝে মাঝে টাকার ঝনৎকার শুনা যাইতেছে! কেহ 'আমার বাজি' বলিয়া টাকা টানিয়া লইতেছে। কেহ পকেট হইতে টাকা ও নোট বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিতেছে। একটা টেবিলে হেমন্ত, গজানন ও দুইজন খেলোয়াড় রানিং ফ্লাশ খেলিতেছে। গজানন ভিন্ন সকলের মুখেই তীব্র উত্তেজনা। হেমন্ত পুনঃ পুনঃ নোট বাহির করিয়া টেবিলে রাখিতেছে—কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহা অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে।

একটি টেবিলে একজন একাকী বসিয়া তাস ভাঁজিতেছে, সেখানে খেলোয়াড় জুটে নাই। প্রেমকুমার শরীরী প্রেতাত্মার মত খেলোয়াড়দের খেলা দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেবলরাম ঘরের দ্বারের কাছে চেয়ারে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কানে পায়রার পালক দিতেছে।

মাড়োয়ারী প্রবেশ করিল

কেবলরাম। (নিম্নস্বরে) আসুন শেঠজি! আজ আপনার দেরি যে!

শেঠ। হোয়ে গেল কুছু দেরি। আপনার ঘর তো ভর্তি!

কেবলরাম। একটা টেবিল খালি আছে, ঐ দিকে যান।

মাড়োয়ারী শূন্য টেবিলে গিয়া বসিল। কেনারাম প্রবেশ করিল

কেনারাম। (নিম্নস্বরে) অক্ষয়বাবু আসতে চায়।

কেবলরাম। আসতে দিও না। বলে দাও আজ নয়।

কেনারাম। যাচ্ছে না—চেঁচামেচি করছে।

কেবলরাম। (একটু চিন্তা করিয়া) এই দুটো টাকা দিয়ে তাকে মদের দোকানে পাঠিয়ে দাও। মদের পয়সা পেলেই চলে যাবে।

কেনারাম। (টাকা লইয়া) আচ্ছা—

কেনারাম চলিয়া গেল। কেবলরাম উঠিয়া হেমন্তর পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ খেলা দেখিবার পর তাহার কানে কানে বলিল—

কেবলরাম। হেমন্তবাবু, এক গ্লাস সরবৎ?
হেমন্ত। বেশ তো!

কেবলরাম বাহির হইয়া গেল ও এক গ্লাস সরবৎ আনিয়া হেমন্তর পাশে রাখিল

এ কিসের সরবৎ?
কেবলরাম। ঘোলের।
হেমন্ত। কিন্তু এর রং যে সবুজ দেখছি।
কেবলরাম। (চুপি চুপি) একটু সিদ্ধি মেশানো আছে।
হেমন্ত। সে কি! সিদ্ধি আমি খাই না।
কেবলরাম। খুব সামান্যই আছে—নেশা হবে না। সিদ্ধি খেলে খেলায় সিদ্ধিলাভ হয়, বুঝলেন না!
হেমন্ত। ও—আচ্ছা তবে থাক।

খেলা চলিতে লাগিল

সাহেববেশী বিজন ও তাহার কনুই ধরিয়া নীলিমা প্রবেশ করিল

প্রেমকুমার তাহাদের দেখিয়া ছুটিয়া আসিল

প্রেমকুমার। আসুন মিস্ নীলিমা।
নীলিমা। হেল্লো প্রেম। তুমিও এখানে যে!
বিজন। যেখানে মধু সেইখানেই ভোমরা—হাঃ হাঃ হাঃ!
প্রেমকুমার। (আবেগভরে) মিস্ নীলিমা, প্রকৃত আধুনিক প্রগতিশীলা নারী আপনি। আপনাকে পাওয়া সৌভাগ্য আমাদের।
বিজন। Not so fast, প্রেম। নীলিমাকে এখনও তুমি পাও নি (কানে কানে) She is mine now. Don't you try to poach.
নীলিমা। Oh, you naughty youngmen! আমাকে নিয়ে ঝগড়া ক'র না। এস, খেলা যাক। বিজন, টাকা এনেছ তো?
বিজন। You bet, এনেছি বইকি!
কেবলরাম। আসুন, এই টেবিলে আসুন।

মাড়োয়ারীর টেবিলে লইয়া গিয়া বসাইল। কিছুক্ষণ খেলা চলিবার পর হেমন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল

হেমন্ত। আমার আর টাকা নেই। আজ আর খেলব না।
কেবলরাম। বিলক্ষণ! টাকা না থাকে আমি দিচ্ছি। কত টাকা চাই বলুন হেমন্তবাবু। এক হাজার দু হাজার—যা দরকার দিচ্ছি।
হেমন্ত। কিন্তু অত টাকা আমাকে বিশ্বাস করে দেবেন?
কেবলরাম। সে কি মশায়! আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে টাকা ধার দেব না তো দেব কাকে? আপনি তো আর এ ক'টা টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবেন না!
হেমন্ত। আচ্ছা, দিন কিছু। আশ্চর্য! আজ ভাল হাত পেয়েও হেরে গেলুম। মাথায় রোখ চড়ে গেছে—আর এক হাত দেখব।
কেবলরাম। বেশ তো, কত দেব বলুন। আমার পকেটেই টাকা আছে।

পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিল

হেমন্ত। দিন পাঁচশো! কালই ফেরত পাবেন।
কেবলরাম। যখন ইচ্ছে দেবেন। সেজন্যে সংকুচিত হবেন না হেমন্তবাবু। কিন্তু আমি বলছিলুম, একেবারে হাজার টাকা নিয়ে বসুন না; তাতে খেলার জুৎ হবে, ইচ্ছে করলে বড় দান দিতে পারবেন। বড় দান না দিলে বড় বাজি তো মারা যায় না।
হেমন্ত। আচ্ছা, হাজারই দিন। (টাকা লইতে লইতে) দেখুন, ধার নেওয়া আমার অভ্যেস নেই, তাই বড় সঙ্কোচ বোধ হয়।
কেবলরাম। ও ক্রমে অভ্যেস হয়ে যাবে। আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন। আপনাকে টাকা

ধার দেওয়া আর ইম্পিরিয়াল ব্যাংকে টাকা জমা রাখা দুই সমান।

কানাইয়ের দল সহ অশনি প্রবেশ করিল। পিছনে হতবুদ্ধি কেনারাম

অশনি। সে কথা ঠিক। বরং তার চেয়েও ভাল; কারণ ইম্পিরিয়াল ব্যাংক এত মোটা সুদ দিতে পারবে না।

কেবলরাম। আপনারা কি চান এখানে? কেনারাম!

কেনারাম। আজ্ঞে, এঁরা জোর করে ঢুকে পড়লেন।

হেমন্ত। অশনি, তুমি—তুমি—

অশনি। তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে। এখন এ আড্ডার আড্ডাধারী কে? (কেবলরামকে) তুমি বোধ হয়?

খেলোয়াড়রা খেলা বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল

কেবলরাম। কি চান আপনি?

অশনি। আমি শুধু তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। আর যাকে ইচ্ছে তোমার জুয়ার আড্ডায় ভুলিয়ে এনে ঠকিয়ে টাকা নাও, আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু এই হেমন্তবাবুটির দিকে নজর দিও না। তা হলে বিপদে পড়বে।

কেবলরাম। (ব্যঙ্গস্বরে) বটে!

কানে পালক দিতে লাগিল

হেমন্ত। তুমি এসব কি বলছ অশনি! কেবলরামবাবু একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, এখানে সকলেই ভদ্রলোক, সখের জন্যে বাজি রেখে তাস খেলেন। এখানে ঠকানোর কথা উচ্চারণ করাও অভদ্রতা। খেলায় হার-জিৎ আছেই—

অশনি। অবশ্য। আজ পর্যন্ত কত হেরেছ শুনি?

হেমন্ত। বেশি নয়।

অশনি। তবু—হাজার খানেক?

হেমন্ত। তা হবে। কিন্তু তাই বলে—

অশনি। কিন্তু তাই বলে এঁরা যে তোমাকে ঠকাচ্ছেন সেটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না—কেমন? কেবলরামবাবু মহাশয় ব্যক্তি, পরদ্রব্যকে উনি লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করেন—কি বল? তোমাকে টাকা ধার দিয়ে সৎকার্যে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। আর একটি মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে ঐ যে দেখতে পাচ্ছ—(গজাননকে নির্দেশ) যিনি নিছক উদারতাবশত তোমাকে ঘোড়া বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। তোমাকে ঠকাবার চিন্তা এঁদের মনের কোণেও ছিল না, কেবল তোমাকে বিশুদ্ধ আনন্দ দেবার জন্যেই এঁদের প্রাণ কাঁদছিল। হেমন্ত, বুদ্ধি কি তোমার কোনও দিন হবে না? একদল জোচ্চোর জুয়াড়ীর পাল্লায় পড়েছ তা এখনও বুঝতে পারছ না?

হেমন্ত। না। আমি এ ক'দিনে হেরে গেছি তা ঠিক, কিন্তু সে আমার লাক্! কেউ জুচ্চুরি করে আমায় হারিয়েছে, এ আমি বিশ্বাস করি না।

অশনি। আজ কত হেরেছ?

হেমন্ত। পাঁচশো।

অশনি। কার কাছে হেরেছ?

হেমন্ত। ঐ ওঁর কাছে—

গজাননকে দেখাইল

অশনি। কোন্ খেলায় হেরেছ?

হেমন্ত। রানিং ফ্লাশ।

অশনি। বেশ। কানাই, তোমরা ঐ লোকটার কাপড়-চোপড় খুঁজে দেখ তো।

গজানন। (বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া) খবরদার, আমার গায়ে হাত দিলে ভাল হবে না।

কেবলরাম। আপনি বে-আইনি কাজ করছেন তা জানেন! জোর করে আমার বাড়িতে

ঢুকেছেন, তারপর—

অশনি। জানি বই কি—সব জানি। তোমার সাহস থাকে পুলিশকে খবর দাও। কানাই, যা বললুম কর।

কানাই ও তাহার সঙ্গিগণ গজাননকে ধরিয়া তাহার বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিল

কানাই। এই যে সার্, আস্তিনের মধ্যে একটা হরতনের টেক্কা আর জোকার রয়েছে।

অশনি। (হেমন্তকে) এবার বিশ্বাস হচ্ছে?

হেমন্ত কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হতবুদ্ধি হইয়া রহিল

হেমন্ত। কেবলরামবাবু, আমি জানতাম না। আপনার টাকা ফেরত নিন, আর কখনও আমি এখানে আসব না।

কানাই। টাকা ফেরত দেবেন না হেমন্তবাবু, ও টাকা তো আপনারই, জোচ্চোরেরা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল।

হেমন্ত ইতস্তত করিতে লাগিল

অশনি। না, ও নোংরা টাকা নিয়ে কাজ নেই হেমন্ত, যা গেল সেটা তোমার নির্বুদ্ধিতার জরিমানা—আক্কেল সেলামি। (হেমন্তর হাত হইতে নোট লইয়া কেবলরামের গায়ে ছুঁড়িয়া দিল) এই নাও। কিন্তু বলে গেলুম, ভবিষ্যতে আর কখনও হেমন্তকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করো না। এস হেমন্ত!

হেমন্ত। অশনি, আমি সত্যই আহাম্মক। ভেবেছিলুম এটা ভদ্রলোকের ক্লাব। আর কখনও আমি—

অশনি। আর কখনও যাতে এ রকম ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়বার সুযোগ না পাও তার ব্যবস্থা আমি করব। এখন এস।

অশনি, হেমন্ত ও কানাইয়ের দল প্রস্থান করিল। একে একে অন্যান্য খেলোয়াড়রাও উঠিয়া গেল। নীলিমা থিয়েটারি ভঙ্গিতে 'শ্যেম!'বিজন আমাকে বাইরে নিয়ে চল' বলিয়া মূর্চ্ছার ভান করিয়া এলাইয়া পড়িল। প্রেমকুমার ও বিজন তাহার দুই হাত ধরিয়া/বাহির করিয়া লইয়া গেল। ঘরে কেবলরাম, গজানন ও আড্ডার দুইজন ভৃত্য ছাড়া আর কেহ রহিল না

কেবলরাম। কেনারাম!

কেনারাম। (প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞে—

কেবলরাম। পিল্লু ওস্তাদকে খবর দাও।

গজানন। বাবা কেবলরাম, ও সেই শালা বন্ধু!

কেবলরাম। বুঝেছি। (ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া) সব চলে গেছে, বোধ হয় আর কেউ আসবে না। আমার আড্ডা ভেঙে দিয়ে গেল। আচ্ছা! কেনারাম, পিল্লু ওস্তাদকে ডেকে আন। কত বড় বন্ধু আমি একবার দেখব।

কেবলরাম কানে পালক দিতে লাগিল কিন্তু তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। কেনারাম নিষ্ক্রান্ত হইল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হেমন্তর বহিঃকক্ষ। হেমন্ত, অশনি ও বামনদাসবাবু আসীন। বামনদাসবাবু হেমন্তর বাপের আমলের স্টেটের প্রবীণ উকিল। দাড়ি ও চশমা আছে; তাহার হাতে দলিল ও পাশে একটি চামড়ার স্যাচেল; মুখ গম্ভীর

বামনদাস। দলিলটা কি পড়ে শোনাব?

হেমন্ত। না না, অতবড় দলিল পড়ে শোনাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। যা যা বলে দেওয়া হয়েছিল সব লিখেছেন তো? তা হলেই হল।

বামনদাস। সবই লিখেছি। এটা খসড়া, তাই একবার পড়ে শোনাতে চাই। আপনারা দুজনেই উপস্থিত আছেন, যদি কিছু অদল-বদল করতে চান—

অশনি। অদল-বদল করবার কিছু আছে কি? কথা তো সামান্যই—হেমন্ত তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিঃশর্তে আমাকে দান করছে। এ কথা লিখেছেন তো?

বামনদাস। হ্যাঁ, লিখেছি।

হেমন্ত। বাস্—তা হলে আর অদল-বদলের দরকার নেই। আদালতের কাজ আপনি সব ঠিক করে রাখুন, কালই রেজিস্ট্রি করে দেব।

বামনদাস। কিন্তু—দেখুন, আমি আগেও বলেছিলুম এখনও বলছি—

হেমন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন আমার মনে আছে। আপনি আমার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী, ভাল বুঝেই বলেছিলেন—সে জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি স্থির করে ফেলেছি বামনদাসবাবু, এখন আর মত বদলাতে পারব না। আপনি আজ তা হলে—

বামনদাস। দেখুন, আপনার বাবার আমল থেকে আমি আপনার স্টেটের উকিল; তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব না হোক, ঠিক উকিল-মক্কেলের সম্পর্ক ছিল না, ঘনিষ্ঠতাই ছিল। সেই সম্পর্কের অধিকারে আজ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি কাজ ভাল করছেন না।

অশনি। আপনি আমার সদভিপ্রায়ে সন্দেহ করছেন?

বামনদাস। অশনিবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না—কিন্তু আমি উকিল, বত্রিশ বছর এই কাজ করছি। মানুষ অনেক দেখেছি. কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মানুষের সদভিপ্রায়ের ওপর আমার বড় বেশি শ্রদ্ধা নেই। আপনার সম্বন্ধে আমি কোনও কথা বলতে চাই না—হয়তো আপনার অভিপ্রায় ভালই। কিন্তু চিরদিন আপনার মন যে এমনই থাকবে তার স্থিরতা কি আছে? সম্পত্তি হাতে পেয়ে আপনি নিজমূর্তি ধারণ করতে পারেন।

হেমন্ত। আপনি ও কি বলছেন বামনদাসবাবু? অশনি আমার বন্ধু; নিজের টাকায় আর আমার টাকায় ও কোনও প্রভেদ দেখে না—আমিও দেখি না।

বামনদাস। খুব উচ্চ অঙ্গের বন্ধুত্বে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে, বন্ধুত্ব যত উচ্চই হোক, টাকার সম্পর্কে এলে আর তা থাকে না। এ ক্ষেত্রেও আমার আশঙ্কা হচ্ছে—

হেমন্ত। (ঈষৎ রুক্ষস্বরে) আপনার আশঙ্কা অমূলক। এ বিষয় নিয়ে আমি আর কোন আলোচনা করতে চাই না।

অশনি। বামনদাসবাবু, আপনি যা বলছেন তা খুবই সত্যি; আমি যে হেমন্তকে ঠকাব না, একথা এখন জোর করে আমিও বলতে পারি না। আমরা দুজনে জেনে শুনেই এ পথে নামছি; টাকার সম্পর্কে এসে আমাদের বন্ধুত্ব টেঁকে কি না একবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক না! মনে করুন, এটা আমাদের বন্ধুত্বের অগ্নিপরীক্ষা।

বামনদাস। (শ্লেষপূর্ণস্বরে) কিন্তু ধরুন, অগ্নিপরীক্ষায় যদি আপনি উত্তীর্ণ হতে না পারেন, তা হলে আপনার কোনও কষ্ট নেই, কিন্তু হেমন্তবাবুর অবস্থাটা কি রকম হবে?

অশনি। পথে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু বামনদাসবাবু, কত বড় মানুষের ছেলে স্ফূর্তি করে পথে দাঁড়াচ্ছে, এ তো আপনি বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় নিশ্চয় দেখেছেন। হেমন্ত যদি বন্ধুত্ব যাচাই করতে গিয়ে পথে দাঁড়ায় তা হলে তার খুব বেশি নিন্দে বোধ হয় হবে না।

বামনদাস। আপনারও কি তাই মত! বন্ধুত্ব যাচাই করবার জন্যে পথে দাঁড়াতেও রাজি?

হেমন্ত। হ্যাঁ—রাজি।

বামনদাস। বেশ। আমার কর্তব্য আমি করলুম, এখন আপনার ইচ্ছে। নাবালক যখন নন তখন আপনার সম্পত্তি আপনি নয়-ছয় করে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কালই তো রেজিষ্ট্রি করে বিষয়-সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়ে যাবে —তারপর খাবেন কি?

হেমন্ত। খাব কি? যা খাচ্চি তাই খাব—ভাত ডাল—

বামনদাস। (চাপা রুদ্ধস্বরে) ভাত ডাল আসবে কোত্থেকে?

অশনি। সে ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে হয়ে গেছে। আমি ওকে এই বাড়িতে থাকতে দেব আর মাসে পাঁচশো টাকা দেব—তাতেই ওর খরচ চলে যাবে।

বামনদাস। ও—মাসহারা দেবেন! (বিকৃত হাস্য) আপনি রসিক বটে! (চিন্তা) তা—এক কাজ করুন না। মাসহারা আর বাড়ির কথাটা দানপত্রে উল্লেখ করে দিন না! তাতে তো কোনও ক্ষতি হবে না। কি বলেন, খসড়াতে ওটা যোগ করে দিই?

অশনি। (বামনদাসের পদধূলি লইয়া) আপনি সত্যিই মহাপ্রাণ ব্যক্তি। আপনাকে সাধারণ উকিল মনে করেছিলুম, সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যথার্থ হেমন্তর হিতৈষী বন্ধু।

বামনদাস। কি বলছেন—আমি তো—

অশনি। (মৃদুহাস্যে) আই সি এস পড়বার সময় আইনও কিছু কিছু পড়তে হয়। দানপত্রে শর্ত থাকলে দানপত্র যে নাকচ হয়ে যায় তা আমি জানি, কণ্ডিসনাল গিফ্‌ট কথাটা এখনও মনে আছে। হেমন্ত, তুমিও এঁকে প্রণাম কর। আমার মতই তোমার বন্ধু যদি কেউ থাকে তো সে ইনি।

হেমন্ত প্রণাম করিল

বামনদাস। (হঠাৎ রাগিয়া) আপনারা কি আমাকে নিয়ে পরিহাস করছেন?

অশনি। ছি ছি, ও কথা বলবেন না বামনদাসবাবু। আমরা আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি যদি কোনও দিন হেমন্তকে ঠকাই, তবে আমার এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে তার একজন অকৃত্রিম বন্ধু এখনও আছেন।

বামনদাস। আমি চল্‌লুম। সম্পত্তির দলিল সব আমার কাছে আছে অশনিবাবু, আপনার উকিলের নাম বলুন, কালই তাঁকে সব বুঝিয়ে দেব।

অশনি। সে কি কথা! আমার উকিল আপনিই থাকবেন।

বামনদাস। আমি এসব গোলমালের মধ্যে থাকতে চাই না, আমাকে মুক্তি দিন।

অশনি। মুক্তি আপনাকে কিছুতেই দিতে পারি না। আপনার মত এমন উকিল আর পাব কোথায় বলুন? (বামনদাস মাথা নাড়িলেন) না না, আমি কোনও কথা শুনব না; দোহাই বামনদাসবাবু, আমাদের জীবনের এই সন্ধিক্ষণে আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না!

বামনদাস। (নরম হইয়া) কিন্তু এরকম ছেলেমানুষি কতদিন চলবে জানতে পারি? চিরজীবন ধরেই চলবে না কি?

অশনি। না। যে দিন হেমন্তকে একটি বুদ্ধিমতী সৎপাত্রীর হাতে সমর্পণ করতে পারব, সেই দিন ওর বিষয় ওকে ফিরিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে নয়। আচ্ছা, আজ আসুন তা হলে। কালই যাতে রেজিস্ট্রি হয়ে যায় সে চেষ্টা করবেন। নমস্কার!

বামনদাস। নমস্কার!

গলা খাঁকারি দিয়া প্রস্থান

অশনি। একেবারে খাঁটি জিনিস—যাকে বলে আকাটা হীরে!

হেমন্ত। হ্যাঁ—বাবার মুখেও শুনেছিলুম, লোক ভাল। যাক, এখন তো আর আমার কোনও বাধা-নিষেধ নেই? যা ইচ্ছে করতে পারি তো?

অশনি। নিজের অবস্থা বুঝে যা ইচ্ছে করতে পার বই কি! স্মরণ রেখ, তোমার আয় পাঁচশো টাকার বেশি নয়।

হেমন্ত। সে আমার স্মরণ থাকবে। অর্থাৎ জুয়া কিম্বা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আর যাচ্ছি না। আমার আক্কেল হয়ে গেছে।

অশনি। সেটা মস্ত সুলক্ষণ। এখন যদি নিজের সম্পত্তি চটপট ফিরিয়ে নিতে চাও, তা হলে একটি বুদ্ধিশ্রীমতী সৎপাত্রীকে বিয়ে করে ফেল।

হেমন্ত। সম্পত্তি ফিরিয়ে নেবার জন্যে আমি মোটেই ব্যগ্র নই ভাই। তবে ঐ যে বললে বুদ্ধিশ্রীমতী—; হ্যাঁ, আজ এক জায়গায় যেতে হবে। নিধিরাম, গাড়ি বার করতে বল।

অশনি। হঠাৎ চললে কোথায়?

হেমন্ত। আবার বাধা দিচ্ছ?

অশনি। আরে না না, বাধা দিই নি। হঠাৎ বলা কওয়া নেই, চললে কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি!

হেমন্ত। কোথায় যাচ্ছি তা এখন বলব না।

অশনি। তাই তো, নানা রকম সন্দেহ হচ্ছে। লক্ষ্মীশ্রীমতী মেয়েটির সন্ধানে বেরুচ্ছ না তো?

হেমন্ত। বলব না।

অশনি। (হঠাৎ) তুমি জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বাড়ি যাচ্ছ?

হেমন্ত। অ্যাঁ—তুমি জানলে কি করে?

অশনি। (হেমন্তর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে) কোন্‌টা।

হেমন্ত। কি বলছ—কোন্‌টা কি?

অশনি। তা বটে, জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য। (ফিরিয়া গিয়া বসিল) হেমন্ত, সত্যি তাকে ভালবেসেছ, না ছেলেমানুষি?

হেমন্ত। ছেলেমানুষি নয় ভাই, সত্যিই ভালবেসেছি। আচ্ছা, তুমিই বল, ভালবাসার মেয়ে কি সে নয়? অবশ্য তোমার নানা রকম প্রেজুডিস আছে—

অশনি। প্রেজুডিস ছিল, এখন আর নেই। তুমি যাঁর কথা বলছ তিনি ভালবাসার যোগ্য পাত্রী—

হেমন্ত। (আনন্দিত) অ্যাঁ, অশনি! সত্যি বলছ, তোমার কোনও আপত্তি নেই? বাঁচা গেল, আমার মনে একটা অস্বস্তি লেগে ছিল। এখন তা হলে নির্ভয়ে যেতে পারি?

অশনি। নির্ভয়ে। (কিছুক্ষণ নীরব) আচ্ছা, তিনিও নিশ্চয় তোমাকে!

হেমন্ত। সেটা ভাই জোর করে বলতে পারি না; তবে ভাবে ইঙ্গিতে মনে হয়—। কাল তিনি এ বাড়িতে এসেছিলেন। ভেবে দেখ, এটা কি কম কথা?

অশনি। ঠিক। ওটা আমি ভেবে দেখি নি।

বাহিরে মোটর-হর্নের শব্দ

হেমন্ত। ঐ গাড়ি এল। চললুম তা হলে—তুমি থাকবে?

অশনি। হ্যাঁ—না—তুমি এগোও, আমি একটু পরে বেরুব। নিধিরামকে দু-একটা কথা বলতে হবে। (ঈষৎ হাসিয়া হেমন্তর পিঠ চাপড়াইয়া) বঁ ভোঁয়াজ্—গুড্ লাক্—শিবাস্তেসন্তু পন্থানঃ—

হেমন্ত। ওরে বাস্ রে, তিনটে ভাষায় শুভেচ্ছাজ্ঞাপন! এ মিথ্যে হবার নয়, আজ একটা কিছু হবেই।

নিধিরাম প্রবেশ করিল

নিধিরাম। বাবু, জলখাবার তৈরি—

হেমন্ত। এখন আর সময় নেই, সেখানে গিয়ে হবে।

প্রস্থান

অশনি। ঊর্মিলাকে হেমন্ত ভালবাসে! কি আশ্চর্য একবারও কথাটা মনে আসে নি! অথচ এইটেই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক! দুজনের প্রকৃতি ঠিক পরস্পরের বিপরীত;

বিপরীতের আকর্ষণ—খুবই স্বাভাবিক। ভালই হবে; হেমন্তকে যদি কেউ চালিয়ে নিয়ে চলতে পারে তো সে ঐ ঊর্মিলা।

নিধিরাম। বাবু, আমাকে কিছু হুকুম আছে?

অশনি। (চমকিয়া) হুকুম! না, এখন তো কোন হুকুম মনে করতে পারছি না। (স্বগত) বিয়েটা যত শিগ্‌গির হয়ে যায় ততই ভাল; হেমন্তকে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ল্যাবরেটরি। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত। কয়েকটা করোটির ছাঁচ তাকের উপর সাজানো রহিয়াছে। জ্ঞানাঞ্জনবাবু বুন্‌সেন বার্নার জ্বালিয়া একটা টেস্টটিউব উত্তপ্ত করিতেছেন ও বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলিতেছেন। ঊর্মিলা তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছে

জ্ঞানাঞ্জন। ভেবে দেখ, পৃথিবীতে সমস্ত দুঃখের কারণ হচ্ছে খাদ্য! খাদ্য না হলে মানুষের চলে না। অথচ টাকা না হলে খাদ্য পাওয়া যায় না। তাই টাকার জন্য মানুষ দিবারাত্র হাহাকার করে বেড়াচ্ছে—শান্তি নেই, আনন্দ নেই, সর্বদাই দুশ্চিন্তা, আর তার আনুষঙ্গিক জাল জুচ্চুরি ফেরেব্বাজি; সুতরাং এমন আবিষ্কার যদি করতে পারা যায়, যে লজেন্সের মত একটি বড়ি খেলে সাত দিন আর ক্ষিদে পাবে না, তা হলে সংসারে আর দুঃখ থাকবে না।

ঊর্মিলা। সে তো ঠিক কথা বাবা, কিন্তু আমি বলছিলুম—

জ্ঞানাঞ্জন। ঠিক কথা নয় তো কি? সেই জন্যেই তো রাতদিন এক্সপেরিমেণ্ট করছি। মানুষের আর দুঃখ থাকবে না, সর্বদাই হেসে খেলে বেড়াবে। আফিস থাকবে না, আদালত থাকবে না, হাটবাজার থাকবে না, চাষারা চাষ করবে না, মেছোরা মাছ ধরবে না। সাত দিন পরে ক্ষিদে পাবে, অমনিই শিশি থেকে একটি লবণ্ডুস বার করে খাবে—বাস্‌, আবার চাঙ্গা।

ঊর্মিলা। কিন্তু—

জ্ঞানাঞ্জন। কিন্তু কি! শক্ত মনে করছ? কিছু না—প্রায় বার করে ফেলেছি। (সগর্বে একটি বড়ি তুলিয়া ধরিয়া) এই যে বড়ি দেখছ—ইনিই হচ্ছেন তিনি। এইটুকু বড়ির মধ্যে এক টন খাদ্যের সারবস্তু ঠাসা আছে। একটি খেলে সাত দিনের মধ্যে পেট বলে একটা অঙ্গ আছে তা মনেই আসবে না। যদি দুটি বড়ি খাও—উদরাময় কিম্বা অম্লশূল অনিবার্য। আর যদি কেউ হঠকারিতা করে তিনটি বড়ি একসঙ্গে উদরসাৎ করে তা হলে তাকে বাঁচানো শক্ত—

ঊর্মিলা। বড় ভয়ানক বড়ি তো! কারুর ওপরে পরীক্ষা করে দেখেছ নাকি বাবা?

জ্ঞানাঞ্জন। (দুঃখিতভাবে) না। চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কেউ রাজি হল না। আমার সহকর্মী জনার্দনকে দিলুম, সে বললে তার বাড়িতে বড় ইঁদুর হয়েছে, তাদের দিয়ে দেখবে—মরে কি না! জনার্দনটা একটা আস্ত ওরাংওটাং—বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নেই।

ঊর্মিলা। ভালই তো হল বাবা। বড়ি খেয়ে ইঁদুরেব যদি ক্ষিদে মরে যায়, তা হলে তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে; খাবার লোভেই না বাড়িতে ইঁদুর আসে! এ বেশ হল—প্রাণীহত্যাও হল না, অথচ ইঁদুরের উৎপাতও গেল।

জ্ঞানাঞ্জন। তা বটে। কিন্তু ইঁদুরের কল্যাণে তো আমি এই অমূল্য বড়ি আবিষ্কার করি নি—করেছি মানুষের কল্যাণে। মানুষের ওপর এর গুণাগুণ পরীক্ষা করা দরকার। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে—তুমি একটা বড়ি খাও।

ঊর্মিলা। (হাসিয়া) না বাবা, বড়ি তুমি আর কাউকে খাইও। এখন যা বলতে এসেছিলুম, শোন—হেমন্তবাবুকে জান তো?

জ্ঞানাঞ্জন। হেমন্তবাবু। কই নাম শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

ঊর্মিলা। কি আশ্চর্য বাবা! কাল আমরা যাঁর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তুমি বললে তাঁর মাথাটা—

জ্ঞানাঞ্জন। ও—কৃতান্তবাবু! তাই বল। তার কথা মনেই ছিল না। খুলিটা এনেছ না কি?

ঊর্মিলা। না, তিনি বাড়ি ছিলেন না তাই সুবিধে হল না।

জ্ঞানাঞ্জন। ঠিক হয়েছে। তাকেই বড়ি খাওয়াব।

ঊর্মিলা। তা খাইও। কিন্তু আমি বলছিলুম মন্দার সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ করলে ভাল হয়! খুব চমৎকার লোক, আর টাকাও যথেষ্ট—মন্দা সুখী হবে। আমার মনে হয়, মন্দা মনে মনে তাঁর প্রতি—

জ্ঞানাঞ্জন। বেশ বেশ, এ তো খুব ভাল কথা। ছেলেটি বড় সুবোধ, বড়ি খেতে আপত্তি করবে না। আর খুলির ছাঁচও সেই সঙ্গে—

ঊর্মিলা। আসল কথাটা ভুলে যেও না যেন! কাল আমরা তাঁর বাড়ি গিয়েছিলুম, দেখা পাই নি, আজ নিশ্চয় তিনি আসবেন। প্রস্তাবটা তুলো, আমার বিশ্বাস তিনি অমত করবেন না।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হেমন্তবাবু এসেছেন।

ঊর্মিলা। ঐ বলতে বলতেই এসেছে। এই ঘরে ডেকে নিয়ে আয়।

ভৃত্যের প্রস্থান

আমিও যাই। এখানে বেশ নিরিবিলি, তুমি প্রস্তাব ক'র। ভুলে যাবে না তো?

জ্ঞানাঞ্জন। কখনই না।

ঊর্মিলার প্রস্থান

অন্যদিক দিয়া হেমন্ত প্রবেশ করিল

হেমন্ত। এ যে দেখছি জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ল্যাবরেটরি। ওঁরা বোধ হয় বাড়ি নেই। নমস্কার জ্ঞানাঞ্জনবাবু।

জ্ঞানাঞ্জন। এস এস, কৃতান্তবাবু।

হেমন্ত। আজ্ঞে, আমার নাম হেমন্ত।

জ্ঞানাঞ্জন। হেমন্ত! (নিকটে গিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন) কিন্তু তোমার চেহারা ঠিক কৃতান্তবাবুর মত—এমন কি খুলি পর্যন্ত। তুমি তা হলে নিশ্চয় কৃতান্তবাবুর যমজ ভাই।

হেমন্ত। আজ্ঞে না, কৃতান্ত বলে আমার যমজ ভাই নেই।

জ্ঞানাঞ্জন। তাই নাকি! ভারি আশ্চর্য তো। তা—কোন ক্ষতি নেই, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। এই গুলিটা খেয়ে ফেল।

হেমন্ত। গুলি?

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ, খাদ্যনির্যাস গুলি নম্বর এক। এটি খেলে সাত দিনের মধ্যে আর ক্ষিদে পাবে না!

হেমন্ত। কি ভয়ানক।

জ্ঞানাঞ্জন। ভয়ানক কি বলছ? এ গুলি মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ—পৃথিবীতে আর দুঃখ থাকবে না। নাও—টপ করে গিলে ফেল।

হেমন্ত। সেরেছে! বিষ-টিষ নয় তো! শেষে কি—কিন্তু বৃদ্ধকে চটানো ঠিক নয়। আজ্ঞে, দিন—বাড়ি গিয়ে খাব।

জ্ঞানাঞ্জন। আরে না না, বাড়ি যেতে যেতে এর অর্ধেক গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। নাও—হাঁ কর,

আমি মুখে ফেলে দিই।

হেমন্ত। কি বিপদেই পড়লুম! যা থাকে বরাতে—মন্দার জ্যাঠামশাই, চটালে চলবে না। দিন। (গুলি ভক্ষণ)

জ্ঞানাঞ্জন। বাস্, সাত দিনের জন্যে নিশ্চিন্দি। তুমি রোজ এসে আমাকে খবর দিয়ে যাবে ক্ষিদে পায় কি না! ক্ষিদে পেলেই আর এক গুলি ঝাড়ব।

হেমন্ত। ঝাঁঝালো গুলি। আজ আমি তা হলে যাই।

জ্ঞানাঞ্জন। যাবে কি! তোমার সঙ্গে এখনও আমার অনেক কাজ বাকি আছে।

হেমন্ত। কাজ?

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজ, ভয়ানক জরুরি কাজ। তুমি বস। (পিছনে হাত দিয়া পায়চারি) জীবজন্তু বুদ্ধির নিম্নস্তর থেকে যতই উচ্চস্তরে উঠতে থাকে, ততই তার মস্তিষ্কও ঊর্ধ্বে আরোহণ করে। জীবের নিম্নাবস্থায়—মস্তিষ্ক—যাকে মাথার ঘিলু বলে—সেটা থাকে তার মুখের পিছনে—যেমন গাধা উট শুয়োর। কিন্তু মস্তিষ্কের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ঘিলু চড়ে যায় ব্রহ্মতালুতে—যেমন মানুষের। মানুষের মধ্যেও সব জাতি সমান নয়—নিগ্রোর মস্তিষ্কভান্ড এখনও অনেকখানি পোঁছিয়ে; আর আর্যজাতির—

হেমন্ত। কি কাজের কথা বলছিলেন?

জ্ঞানাঞ্জন। মনে কর না—আর্যজাতির সকল মানুষেরই মস্তিষ্ক মুখের সমান সমান এগিয়ে এসেছে—মোটেই তা নয়। যেমন ধর তুমি। অবশ্য তুমি পরিপূর্ণ আর্য নও। তোমার চোয়ালের গড়নে মাঙ্গোলিয়ন রক্তের প্রভাব দেখতে পাচ্ছি; তা ছাড়া আদিম মুন্ডা জাতির প্রভাব যে একেবারে নেই তা বলতে পারি না। হয়তো কাফ্রির রক্তও কিছু কিছু আছে।

হেমন্ত। সর্বনাশ! বলেন কি?

জ্ঞানাঞ্জন। তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। তোমার পূর্বপুরুষেরা সকলেই এক জাতির লোক ছিলেন না। হয়তো কোনও আর্য যোদ্ধা কোন স্ত্রীলোককে হরণ করে এনেছিল, তার ফলে এক মিশ্র-রক্ত বালকের জন্ম হয়; সেই বালক কালক্রমে বয়স্থ হয়ে কোনও মগ স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তাদের সংযোগে হয়তো একটি কন্যা উৎপন্ন হয়; কালক্রমে এক কাফ্রি দস্যু এসে সেই বালিকাকে বলপূর্বক—

হেমন্ত। আজ্ঞে, ও কি কথা বললেন!

জ্ঞানাঞ্জন। এই হচ্ছে মোটামুটি তোমার বংশের ইতিহাস। আসল কথা, তোমার জন্মের ঠিক নেই—

হেমন্ত। অ্যাঁ—তবে তো—(হতভম্ব)

জ্ঞানাঞ্জন। কিন্তু সেজন্যে লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই। সকলের অবস্থাই প্রায় সমান। আমার নিজের বংশানুক্রম খুঁজে দেখলেও—

হেমন্ত। আপনাব বংশেও এই রকম কেচ্ছা আছে না কি?

জ্ঞানাঞ্জন। আছে। আমার বিশ্বাস আমার রক্তে হূণ প্রভাবই বেশি। কিন্তু সে যাক, মূল কথা হচ্ছে, মানুষের মস্তিষ্ক ক্রমেই উঁচুতে উঠছে বটে, কিন্তু তবু সে তার জন্তু-জীবনের প্রভাব এড়াতে পারছে না। যেমন ধর—তুমি। তোমার খুলির গড়ন অবিকল খরগোশের মত—

হেমন্ত। আমার? না না—

জ্ঞানাঞ্জন। আমি বলছি খরগোশের মত—আর আজই আমি তা প্রমাণ করে দেব।

দেরাজ খুলিয়া হাতড়াইতে লাগিলেন

হেমন্ত। মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি খরগোশ! না, আর এখানে নয়। জ্ঞানাঞ্জনবাবু, আজ আমি উঠি—আমার একটা কাজ—

জ্ঞানাঞ্জন। কাজ! হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার একটা ভারি জরুরি কাজ আছে, ঊর্মিলা

বলে গিয়েছিল। দাঁড়াও, ভেবে দেখি! মনে পড়েছে। (নিকটে আসিয়া) ঊর্মিলা বলছিল, তুমি খুব চমৎকার লোক, আর তোমার টাকাও আছে যথেষ্ট। অতএব তোমাকে একটি কাজ করতে হবে।

হেমন্ত। আজ্ঞে, বলুন।

জ্ঞানাঞ্জন। সে কাজ কেবল তোমার দ্বারাই সম্ভব। (অত্যন্ত গম্ভীরভাবে) ঊর্মিলা তোমাকে বিয়ে করতে চায়, আর তার বিশ্বাস তোমার কোনও আপত্তি হবে না। সুতরাং তাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।

হেমন্ত। (দিগ্‌ভ্রান্ত) আজ্ঞে, আজ্ঞে, অর্থাৎ কি না—এ আপনি কি বলছেন? এ যে একেবারেই—মানে আমি—

জ্ঞানাঞ্জন। বেশ বেশ, তোমার যে আপত্তি হবে না, এ আমি জানতুম। কিন্তু এ কথা এখন থাক। তুমি বস, তোমার মাথার একটা ছাপ তুলে নিই।

আবার দেরাজের মধ্যে অনুসন্ধান

হেমন্ত। আমি কি পাগল হয়ে গেলুম নাকি? না, জ্ঞানাঞ্জনবাবুই—? ঊর্মিলা দেবী আমাকে বিয়ে করতে চান! আমি এখন কি করি! কি কুক্ষণেই আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম—ইঃ! পেটের মধ্যে এমন খামচে উঠল কেন? গুলি খেয়ে হল নাকি? আরে, এ যে ক্রমে বেড়েই চলেছে! ক্ষিদে পেলে যেমন পেটের মধ্যে ইঁদুরে আঁচড়ায় ঠিক তেমনই আঁচড়াচ্ছে! গেলুম—আজ সব দিক দিয়েই গেলুম! হাত-পা যেন এলিয়ে আসছে—

হেমন্ত শিথিল দেহে চেয়ারে বসিয়া পড়িল; ক্ষুর লইয়া জ্ঞানাঞ্জন তাহার কাছে আসিলেন

জ্ঞানাঞ্জন। বেশ। তুমি ঠিক এই ভাবে বসে থাক—আমি তোমার মাথাটা কামিয়ে দিই।

হেমন্ত। (চমকাইয়া) মাথা নেড়া করে দেবেন?

জ্ঞানাঞ্জন। বস—চুপটি করে বস, অমন চম্‌কালে চলবে না। মাথা না কামালে ছাঁচ তুলব কি করে? তুমি যে খরগোশ তা প্রমাণ করা চাই তো!

হেমন্ত। তাও তো বটে। আমি যে খরগোশ তা তো প্রমাণ হয় নি, কেবল অনুমান মাত্র। (দীর্ঘশ্বাস) করুন প্রমাণ? আর দেখুন, যদি প্রমাণ হয়ে যায় তা হলে খরগোশকে দুটি ঘাস কিম্বা যা হোক কিছু খেতে দেবেন। পেটের মধ্যেটা বেজায় চুঁই চুঁই করছে।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু ক্ষুর চালাইতে লাগিলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্কুপের বাড়ি; সম্মুখে রাস্তা। উন্মুক্ত ফটকের ভিতর দিয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যায়ামভূমি ও ব্যায়ামনিরত বালকবালিকাদের দেখা যাইতেছে। অশনি তাহাদের শিখাইতেছে, পরিচালনা করিতেছে।

পথে জন সমাগম হইয়াছে; তাহারা বাহির হইতে এই দৃশ্য দেখিতেছে; পিল্লু ওস্তাদ ও প্রেমকুমার প্রবেশ করিল। ওস্তাদের মাথা নেড়া, গজস্কন্ধ; হাঁড়ির মত মুখে প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ—গোঁফের অন্তরাল হইতে বড় বড় দাঁত সর্বদাই বিকশিত। তাহার পরিধানে লুঙ্গি ও রঙীন গেঞ্জি

প্রেমকুমার। ওস্তাদ, আমি কেবল দূরে থেকে লোকটাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে যাব! এসব ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না, নেহাৎ কেবলরামবাবু অনুরোধ করলেন—

পিল্লু। আরে দোস্ত, ভোয় কিসের? থোড়া খাড়া হোকে তামাসা তো দেখো।

প্রেমকুমার। না ওস্তাদ, তামাসা দেখবার আমার সময় নেই। আমাকে যেতে হবে নীলিমার সঙ্গে সিনেমায়।

পিল্লু। নীলিমা কৌন আছে? আওরৎ?

প্রেমকুমার। হ্যাঁ, আওরৎ। যেমন তেমন আওরৎ নয় ওস্তাদ, ফ্রয়েডের বাণী বলতে না বলতে বুঝে নেয়—এমন আওরৎ সে! একেবারে অতি-আধুনিকা প্রগতি-প্রীতি-চটুলা ফ্রয়েড-রসিকা তরুণী! বাংলা দেশে তার জোড়া নেই।

পিল্লু। বহুৎ খুপ্‌সুরৎ আছে?

প্রেমকুমার। সুন্দরী! পুরুষের চোখে নারীর যৌবনই সুন্দর। সে যুবতী—সুতরাং সুন্দরী।

পিল্লু। (পিঠ চাপড়াইয়া) হেঃ হেঃ দোস্ত, তুমি তো বহুৎ বুধ্‌গর্ লোক আছে, তোমার বোলিচালি হামি সব বুঝে না—কুছু কুছু—বুঝে—হেঃ—হেঃ—

প্রেমকুমার। বুঝবে ওস্তাদ, তোমাকে আমি ফ্রয়েডের সমস্ত ফিলসফি দেব বুঝিয়ে। ঐ আসছে, একটু আড়ালে সরে এসে দেখ। ঐ যে লোকটা—হাফ-শার্ট পরা, লম্বা-চওড়া চেহারা, ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে—ওই সে। ভাল করে চিনে নাও ওস্তাদ। চিনেছ তো? আমি তা হলে এবার—

পিল্লু। আরে ঠহরো, ইয়ার, অভি ভাগতা ক'হা?

কথা কহিতে কহিতে কানাই ও অশনি ফটকের কাছে আসিল

অশনি। তুমিই যাও কানাই, আমার যাবার দরকার হবে না। তুমি গেলেই তোমাকে তিনি চাঁদা দিয়ে দেবেন।

কানাই। কিন্তু সার্, তিনি বলেছিলেন আপনার যাওয়া চাই।

অশনি। সেটা মুখের শিষ্টাচার। যদি তিনি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন—খুব সম্ভব করবেন না—তুমি ব'ল যে আমার ছুটি নেই তাই যেতে পারলুম না।

কানাই। আচ্ছা সার্।

অশনি। তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে ব'ল যে, সময় পেলে আমি নিশ্চয় যেতুম।

কানাই। আচ্ছা।

প্রস্থান

অশনি ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল

পিল্লু। এহি বাবু আছে?

প্রেমকুমার। হ্যাঁ।

পিল্লু। আচ্ছা আদমি মালুম হোচ্ছে—বড়া তন্-দুরুস্ত চেহ্‌রা।

প্রেমকুমার। কেবলরামবাবু বলে দিয়েছেন—

পিল্লু। হাঁ হাঁ, সো হামারা খেয়াল আছে। কেবলরামবাবু রুপা দেবে, হাম কাম করবে। মগর, বাবুঠো আচ্ছা আদমি আছে।

প্রেমকুমার। চল এবার। দেখা হয়ে গেছে তো?

পিল্লু। হাঁ—চলো, মোকামাফিক কাম হাসিল করবে। আজ চলো।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ড্রয়িং-রুম। মন্দা উদাসভাবে অর্গানে গান গাহিতেছে

নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কি সুখ পেলি?
শাখাতে ফুটিল যে ঐ যুঁই-চামেলি—
তারা তো ফিরবে না আর, কাননে মরণ-ছায়ায়
মিলাবে পাখনা মেলি।
ওরা যে কানন-বালা—ছল জানে না,

বুকেতে উছল মধু, মন মানে না।
তুই কি তাদের মতই বিলাবি আপনাকে সই?
কে'দে তোর জনম যাবে—নয়নের অশ্রু ফেলি?

ঘরের কোণে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। মন্দা অলসভাবে
উঠিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিল

মন্দা। কে?...হ্যাঁ, আমি মন্দা...আপনি? (মন্দার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল) হেমন্ত-বাবু!...আজকাল আপনি নিশ্চয় খুব ব্যস্ত আছেন...সেদিন আমি—আমরা—আপনার বাড়িতে গিয়েছিলুম...আপনি তারপর এলেন না...ভেবেছিলুম—অ্যাঁ, আপনি এসে-ছিলেন? কই, আমি তো...জ্যাঠামশাইএর ল্যাবরেটরিতে...সে কি! না না—লাঞ্ছনা... অশেষ দুর্গতি...কি বলছেন আপনি? জ্যাঠামশাই আপনাকে—?...উঃ, আর বলবেন না হেমন্তবাবু, লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। জ্যাঠামশাই যে এমন ব্যবহার করতে পারেন ...কি প্রস্তাব করেছিলেন তিনি?..বলতে পারবেন না? একবার যদি আসতেন এখানে!...পারবেন না? সঙ্কোচ! কিসের সঙ্কোচ?...কি বললেন ভাল শুনতে পেলুম না, মনে হল যেন বললেন—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে...আছেন কি? হেমন্তবাবু, আছেন কি?...নাঃ, ছেড়ে দিয়েছেন...

মন্দা কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর টেলিফোন রাখিয়া দুই
হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। এই সময় ঊর্মিলা প্রবেশ করিল

ঊর্মিলা। ও কি মন্দা! অমন করে মুখ ঢেকে বসে আছিস যে!
মন্দা। (মুখ তুলিয়া) দিদি, সেদিন হেমন্তবাবু এসেছিলেন?
ঊর্মিলা। হ্যাঁ এসেছিলেন, তা কি হয়েছে?
মন্দা। আমাকে বল নি কেন?
ঊর্মিলা। সব কথাই তোকে বলতে হবে! বলি নি একটা খুব গোপনীয় কারণ ছিল।
মন্দা। কি গোপনীয় কারণ?
ঊর্মিলা। তা এখন বলব না, সময় উপস্থিত হলেই জানতে পারবি।

মন্দা কাঁদিয়া ফেলিল

ও কি! তোর হল কি মন্দা?
মন্দা। আমি বুঝেছি।
ঊর্মিলা। বুঝেছিস! তবে কাঁদছিস কেন? ও—হেমন্তবাবুকে তুই বিয়ে করতে চাস না?
মন্দা। (চকিতে মুখ তুলিয়া) কি বললে?
ঊর্মিলা। বাবাকে বলেছিলুম তোর সঙ্গে হেমন্তবাবুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে। তা তোর যখন পছন্দ নয়—বেশ, সম্বন্ধ ভেঙে দেব।
মন্দা। (ঊর্মিলার কণ্ঠলগ্না হইয়া) কি যে তুই বলিস দিদি! (বুক হইতে মুখ তুলিয়া থামিয়া থামিয়া) আচ্ছা দিদি, তুই—আমি ভেবেছিলুম তুই—মনে মনে—ওঁকেই ভালবেসে ফেলেছিস।
ঊর্মিলা। দূর পাগল! গলা ছাড়। তা হলে আপত্তি নেই তো? বাঁচলুম। বাবা সব ঠিক করে ফেলেছেন।
মন্দা। কিন্তু—কিন্তু দিদি, তিনি এখনই ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন, জ্যাঠামশাই সেদিন তাঁকে ভারি অপমান করেছেন।
ঊর্মিলা। অ্যাঁ, সে কি! তবে যে বাবা বললেন হেমন্তবাবু মত দিয়েছেন, খুব খুশি হয়ে রাজি হয়েছেন।
মন্দা। কি জানি দিদি, উনি বললেন, জ্যাঠামশাই ওঁর অশেষ লাঞ্ছনা করেছিলেন, সেই সঙ্কোচে উনি এ বাড়িতে আসতে চাইছেন না।

ঊর্মিলা। তাই তো, কি হল? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু প্রবেশ করিলেন

জ্ঞানাঞ্জন। দেখ, কৃতান্তর ঠিকানাটা মনে পড়ছে না। সেদিন বলেছিলে তিপ্পান্ন কি চুয়ান্ন নম্বর—

ঊর্মিলা। বাবা, তুমি সেদিন হেমন্তবাবুকে অপমান করেছিলে?

জ্ঞানাঞ্জন। অপমান! নাঃ, কই মনে পড়ছে না তো।

ঊর্মিলা। তবে কি হল! আচ্ছা, তোমাকে যে প্রস্তাব করতে বলেছিলুম, তা করেছিলে?

জ্ঞানাঞ্জন। নিশ্চয় করেছিলুম। প্রস্তাব না করে আমি ছাড়ি! প্রথমে তাকে একটি গুলি খাইয়ে তারপর প্রস্তাব করলুম।

ঊর্মিলা। তিনি রাজি হয়েছিলেন?

জ্ঞানাঞ্জন। রাজি হবে না আবার! তার মাথা মুড়িয়ে মাথার ছাপ তুলে নিলুম, তবু একটি কথা বললে না। চুপটি করে বসে রইল।

ঊর্মিলা। কি সর্বনাশ! তাঁর মাথা মুড়িয়ে দিয়েছ! তা হলে আর তাঁর দোষ কি! মাথা মুড়িয়ে দিলে কার না রাগ হয়?

জ্ঞানাঞ্জন। আরে না না, সে রাগ করে নি। ওজর আপত্তির একটি কথাও বলে নি।

ঊর্মিলা। কিন্তু কোথায় যেন একটা গোলমাল রয়েছে। বাবা, তুমি ঠিক বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে তো? ভুলে যাও নি?

জ্ঞানাঞ্জন। ভুলি নি। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

ঊর্মিলা। কি বলেছিলে বল তো?

জ্ঞানাঞ্জন। বলেছিলুম, তুমি চমৎকার লোক আর তোমার যথেষ্ট টাকা আছে; সুতরাং ঊর্মিলা তোমাকে বিয়ে করতে চায়।

ঊর্মিলা। অ্যাঁ, তুমি—তুমি এই কথা তাঁকে বলেছিলে!

জ্ঞানাঞ্জন। শুধু কি তাই! আরও বলেছিলুম, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে, কিছুতেই ছাড়ব না। তাই শুনে সে চুপ করে বসে রইল, আর আমি অমনই তার মাথা—

ঊর্মিলা। উঃ! আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। ছি ছি ছি বাবা, আমি যে মন্দার সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করতে বলেছিলুম।

জ্ঞানাঞ্জন। তাই নাকি! মন্দার সঙ্গে? এ হে হে, তবে তো একটু ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষতি আর এমন কি হয়েছে! যার সঙ্গে হোক বিয়ে হলেই তো হল।

ঊর্মিলা। তুমি কিছু বোঝ না বাবা! কি লজ্জা! হেমন্তবাবু ভাবছেন—এখন আমি কি করি! মন্দা, তুই বল না, কি করি?

মন্দা। (লজ্জামৃদুকণ্ঠে) জ্যাঠামশাইএর ভুল বুঝিয়ে দিলে তিনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ, সেই কথাই ভাল। তাকে ডেকে পাঠাও, আমি সব ভাল করে বুঝিয়ে দেব। আর সেই সঙ্গে, গুলি খেয়ে কেমন আছে তাও জানতে পারা যাবে।

ঊর্মিলা। বাবা, তুমি ল্যাবরেটরিতে যাও, যা করবার আমরা করব। আর তোমাকে হেমন্তবাবুর কাছে যেতে দেওয়া হবে না; এখনই সব ভণ্ডুল করে দেবে।

জ্ঞানাঞ্জন। ভণ্ডুল! না না, ভণ্ডুল করব কেন? আমি তো সব ঠিকঠাক করে এনেছিলুম।

ঊর্মিলা। বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, ল্যাবরেটরিতে যাও।

জ্ঞানাঞ্জন। ল্যাবরেটরিতে! ও, হ্যাঁ ঠিক তো, নম্বরটা তো লিখে রেখেছিলুম—

প্রস্থান

ঊর্মিলা। বাবা যে জট পাকিয়েছেন, এখন কি করে ছাড়াই বল দেখি মন্দা?

মন্দা। ঐ তো বললুম বাড়িতে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বললে—

ঊর্মিলা। তা তো বুঝলুম, কিন্তু বলবে কে?

মন্দা। কেন, তুমি?

ঊর্মিলা। আমি? আমি আর হেমন্তবাবুকে মুখ দেখাতে পারব না। তার চেয়ে তোরই বলা উচিত, তুই তাঁকে ভালবাসিস, তিনিও তোকে ভালবাসেন।
মন্দা। তাঁর মনের কথা তুই জানলি কি করে?
ঊর্মিলা। জানি, জানি। আমাকে বিয়ে করতে হবে শুনে তিনি যে রকম পালিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।
মন্দা। তা হোক, কিন্তু আমিও বলতে পারব না। আমার বুঝি লজ্জা করে না?
ঊর্মিলা। তোকে কিছু বলতে হবে না; তুই গেলে তিনি নিজেই সব বলবেন অখন।
মন্দা। কিন্তু আমি কি একলা যাব।
ঊর্মিলা। তা—দোষ কি। যাকে বিয়ে করবি তাকে এত ভয় কিসের?
মন্দা। তাকে ভয় নয় দিদি, কিন্তু—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি স্কুলের ছেলে দেখা করতে এসেছে।
ঊর্মিলা। স্কুলের ছেলে! ওঃ, একলা এসেছে? সংগে কেউ নেই?
ভৃত্য। না। হাতে খাতা আছে।
ঊর্মিলা। এখানে পাঠিয়ে দাও।

ভৃত্যের প্রস্থান

মন্দা। দেখি ভেবে।

প্রস্থান

কানাই প্রবেশ করিল

ঊর্মিলা। তোমার নাম কানাই, না?
কানাই। আজ্ঞে হ্যাঁ।
ঊর্মিলা। এস, বস। (উভয়ে উপবেশন) হাতে খাতা দেখছি, চাঁদা নিতে এসেছ বুঝি?
কানাই। (সহাস্যে খাতা দিয়া) হ্যাঁ।
ঊর্মিলা। (খাতা নাড়িতে নাড়িতে) তোমাদের মাস্টারমশাই অশনিবাবু বুঝি আসতে পারলেন না?
কানাই। তিনি ভয়ানক কাজে ব্যস্ত, সব তো তাঁকেই করতে হচ্ছে কিনা, তাই কাজ ছেড়ে আসতে পারলেন না। আমাকে বললেন—
ঊর্মিলা। আর এটা কাজ নয়? আমার সামান্য চাঁদা না হলেও কাজ আটকাবে না, তাই নিজে না এসে তোমাকে পাঠিয়েছেন?
কানাই। (লজ্জিতভাবে) তিনি—তিনি—আমি তাঁকে বলেছিলুম—
ঊর্মিলা। তবু তিনি আসতে পারলেন না?

কানাই ক্ষুব্ধ নিরুত্তর

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কানাই, তাঁকে ব'লো, আমার চাঁদা খুবই অকিঞ্চিৎকর, তবু তিনি নিজে না এলে চাঁদা পাবেন না। আর—আর ব'লো, তিনি যদি না আসেন তা হলে বুঝব তিনি এখনও আমাকে—আমাদের—ঘৃণা করেন।

সশব্দে খাতাটা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ড্রয়িং-রুম। মন্দা বাহিরে যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে

মন্দা। আমি যাব। লোকে শুনলে নিন্দে করবে—তা করুক। নিজের কাজ নিজে না করলে কেউ করে দেয় না। আমি যাকে চাই তাকে যদি না পাই—কার কি ক্ষতি! আর হাত গুটিয়ে বসে থাকলে পাবও না, আর একজন হয়তো ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যাবে! না, সে আমি পারব না। 'আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া'—কাব্যেই শুনতে মিষ্টি লাগে; নিজের হলে কারুর ভাল লাগে না।

উর্মিলা প্রবেশ করিল

যাচ্ছি দিদি।

উর্মিলা। যাচ্ছিস? হেমন্তবাবুকে ধরে আনতে হবে কিন্তু; পারবি তো?

মন্দা। তা এখন কি করে বলব?

উর্মিলা। না পারলে চলবে কেন? সেকালে তেজস্বিনী আর্যনারীরা কি করতেন জানিস? স্বামীর গলায় বরমাল্য দিয়েই টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে আসতেন; সুভদ্রা তো অর্জুনকে রথে তুলে রথ হাঁকিয়ে পালিয়েছিলেন। আর তুই, বরমাল্য না হোক, গলায় রুমাল দিয়ে টেনে আনতে পারবি না?

মন্দা। যাও, তুমি ঠাট্টা করছ!

উর্মিলা। তা ঠাট্টার সম্পর্ক কি নয়? বেচারার যে দুর্দশা বাবা করেছেন—আহা, ভাবলেও কষ্ট হয়। নেড়া মাথা নিয়ে বিয়ে করতে আসবে কি করে বল দেখি?

মন্দা। ঠাট্টা নয় দিদি, বড্ড ভয় করছে। এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা।

উর্মিলা। মন্দা, তুই হাসালি। তোর সমস্যা এখন খালি দিন স্থির করা; তা ভাবিস নি, এই অঘ্রাণ মাসেই—

মন্দা। বড় থাকতে ছোটর তো হয় না দিদি! আগে তোমার হোক, তবে তো আমার।

উর্মিলা। দূর, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। এখন তুই যা, আর দেরি করিস নি। সন্ধ্যের আগেই ফিরিস।

মন্দা প্রস্থান করিল

এরাই সুখী। দুজনেই দুজনকে মনে মনে পছন্দ করে—মিলনের কোনও অন্তরায় নেই। (দীর্ঘশ্বাস) কিন্তু যেখানে কেবল এক পক্ষ ভালবাসে, অন্য পক্ষের মনের ভাব বোঝা যায় না—সেইখানেই বিপদ—

ভৃত্য প্রবেশ করিল

ভৃত্য। চা আনব?

উর্মিলা। চা—কি হবে? আমি তো ছেড়ে দিয়েছি, মন্দাও বাড়িতে নেই। আর—তিনি যদি আসেন—তিনিও চা খান না। না—চায়ের দরকার নেই। তুমি বামুনের মেয়েকে বল, ভাল করে সরবৎ তৈরি করে রাখুক, আর জলখাবারের রেকাবি সাজিয়ে রাখে যেন। হয়তো ভদ্রলোক আসতে পারেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে—

প্রস্থান

উর্মিলা। আজও কি আসবেন না? কানাই নিশ্চয় তাঁকে বলেছে। তবু আসবার সময় হল না! বেশ তো, তাতে আর ক্ষতি কি, কিন্তু কেন? না আসবার কোনও কারণ আছে কি? (চিন্তা) পুরুষমানুষের মন এক অদ্ভুত জিনিস, যতই বোঝবার চেষ্টা কর ততই জট পাকিয়ে যায়। সেদিন হেমন্তবাবুর বাড়িতে এমন ব্যবহার করলেন

যেন আলাদা মানুষ—আবার এখন—কানাইকে ওকথা বলা আমার উচিত হয় নি; রাগের মাথায় বলে ফেললুম; উনি যদি সত্যিই না আসেন—তা হলে—এ তো আমাকে অপমান করা! আমাকে ঘৃণা করেন সেই কথা পরিষ্কার করে প্রকাশ করা। ছি ছি, কানাইয়ের কাছেও আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল! ঘৃণা না ঔদাসীন্য! দুইই এক—বরং ঔদাসীন্যের চেয়ে স্পষ্ট ঘৃণাও ভাল! বেশ তো, তিনি যদি উদাসীন হতে পারেন, আমিই বা পারব না কেন? মাত্র তিন দিনের তো আলাপ! (চোখে জল) কিন্তু আমি কি এতই অবহেলার পাত্রী!

অশনি প্রবেশ করিল

অশনি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

ঊর্মিলা সহসা তাহাকে দেখিয়া দুই হাতে চোখ ঢাকিল

ও কি?

ঊর্মিলা। (মুখ তুলিয়া) কিছু নয়, চোখে কি পড়েছিল। (হাসিবার চেষ্টা) ক্ষমা চাইতে এসেছেন, না চাঁদা চাইতে এসেছেন?

অশনি। দুইই। তবে ক্ষমাটা আগে।

ঊর্মিলা। ক্ষমা কিসের জন্যে?

অশনি। আপনি রাগ করেছিলেন বলে।

ঊর্মিলা। কে বললে আমি রাগ করেছিলুম?

অশনি। কানাইয়ের কথা শুনে মনে হল—

ঊর্মিলা। কানাই ভুল বুঝেছে।

অশনি। আচ্ছা বেশ, রাগ যদি নাও করে থাকেন তবু ক্ষমা চাইতে তো দোষ নেই।

ঊর্মিলা। শুধু শুধু কেউ ক্ষমা চায় না। নিশ্চয় আপনার মনে পাপ আছে।

অশনি। (চমকিয়া) পাপ?

ঊর্মিলা। হ্যাঁ। নিশ্চয় আপনি মনে মনে আমার প্রতি অন্যায় করেছিলেন, তাই ক্ষমা চাইছেন।

অশনি। (একটু নীরব থাকিয়া) অন্যায়—হয়তো করেছিলুম। কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে তা সংশোধন করে নিয়েছি।

ঊর্মিলা। (সাগ্রহে) সত্যি অন্যায় করেছিলেন? কি অন্যায় করেছিলেন, বলুন না অশনিবাবু?

অশনি। ও কথা যাক। আপনি শুনে সুখী হবেন ছেলেমেয়েদের উৎসবের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অবশ্য সেজন্য আমাকেই খাটতে হয়েছে সব চেয়ে বেশি।

ঊর্মিলা। এবং সেই জন্যেই চাঁদা আদায় করতে আসতে পারেন নি।

অশনি। তা ঠিক নয়—হয়তো অন্য কারণও ছিল।

ঊর্মিলা। অন্য কারণটি কি?

অশনি। আপনি নাই শুনলেন।

ঊর্মিলা। (মুখ অন্ধকার করিয়া) যদি আপনার আপত্তি থাকে—

অশনি। আমার গোপনীয় কথা থাকতে পারে তো!

ঊর্মিলা। ও—তা হলে কাজ নেই। (সহসা আবেগভরে) কিন্তু আপনার গোপনীয় কথাটি আমি বুঝতে পেরেছি—আপনি এখনও আমাদের প্রতি মন থেকে বিদ্বেষ দূর করতে পারেন নি।

অশনি। (শান্ত স্বরে) তা নয় ঊর্মিলা দেবী।

ঊর্মিলা। নিশ্চয় তাই। আপনি আমাকে—আমাদের ঘৃণা করেন।

অশনি। না। আমি তো সেদিন হেমন্তর বাড়িতে বলেছিলুম যে, আমার সে মনোভাব আর নেই। আপনাকে দেখেই আমার আজন্মের সংস্কার বদলে গেছে।

উর্মিলা। সেদিন আপনি হেমন্তবাবুর প্রতিভূস্বরূপ যে কথা বলেছিলেন সে আপনার মনের কথা নয়, হেমন্তবাবুর মনের কথা।

অশনি। আপনি যদি আমার মনটা দেখতে পেতেন তা হলে বুঝতেন আমার মনের কথা কি না। কিন্তু মন যে দেখা যায় না এটা ভগবানের একটা আশীর্বাদ। যাক, আজ তা হলে উঠি। হেমন্তর ওখানে ক'দিন যাওয়া হয় নি—

উত্থানোন্মুখ

উর্মিলা। বসুন—খেয়ে যেতে হবে—

উর্মিলা উঠিয়া গেল ও অবিলম্বে জলখাবারের রেকাবি ও জলের গ্লাস আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল

নিন, আরম্ভ করুন।

অশনি। আমি একাই আরম্ভ করব! আপনি?

উর্মিলা। আমার পরে হবে।

অশনি। (খাইতে খাইতে) দেখুন, আমাদের দেশে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় ইতর ব্যক্তিকে মিষ্টান্ন খাওয়াবার রীতি আছে। আমার ভাগ্যে মিষ্টান্নটা আগেই হয়ে গেল। কিন্তু পরে তাই বলে যেন বঞ্চিত না হই!

উর্মিলা। অশনিবাবু, আপনি বড় ঝগড়াটে, এসে পর্যন্ত আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়া করছেন।

অশনি। তাই নাকি! কই, আমি তো তা বুঝতে পারি নি। বরং আমার মনে হচ্ছিল যে আপনিই—

উর্মিলা। আমি ঝগড়া করছি! তা তো বলবেনই।

অশনি। আমি তা বলি নি—

উর্মিলা। বলেছেন। আবার কি করে লোকে বলে? বেশ, আমি ঝগড়াটে। আর কি কি দোষ আমার আছে বলুন তো! ও কি, সন্দেশটা খেলেন না! ভাল নয় বুঝি?

অশনি। না—ভাল। আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমি কিছুই ফেলব না। ভাল জিনিস অবহেলা করা আমার স্বভাব নয়।

উর্মিলা। (ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া) ও—তার মানে, যা ভাল নয় তাকে আপনি অবহেলা করেন—যথা আমরা। এই কথাই ঘুরিয়ে বলতে চান তো?

অশনি। কি আশ্চর্য! ও ইঙ্গিত আমার মনের কোণেও—

উর্মিলা। অশনিবাবু, পরের খুঁত ধরতে আপনার জোড়া নেই। আপনার মনে জিলিপির প্যাঁচ।

অশনি। বেশ, আমার মনে জিলিপির প্যাঁচ, আর আপনার মনে জিলিপির মাধুর্য। কেমন, এবার খুশি হয়েছেন তো?

উর্মিলা। কি করে খুশি হব। জিলিপির মাধুর্য আর এমন কি বেশি! তার চেয়ে সন্দেশ রসগোল্লা কি রসমালাই যদি বলতেন তা হলেও না হয়—

উভয়ে হাস্য করিল

অশনি। নাঃ, প্রশংসা করে মেয়েদের খুশি করা মানুষের সাধ্য নয়।

উর্মিলা। তা বই কি! কিন্তু মেয়েদের আপনি যত উপহাসই করুন, তারা আপনাদের চেয়ে ভাল। তারা আপন-পর বোঝে।

অশনি। সে কথা সসম্ভ্রমে স্বীকার করছি। উর্মিলা দেবী, আজ আমার বন্ধু হেমন্তর কথা ভেবে এই আনন্দ হচ্ছে যে, আমি তার সম্বন্ধে যা কায়মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিলুম তা বিফল হবে না। তার প্রাণটা সমুদ্রের মত দরাজ, উন্মুক্ত; কিন্তু অত উন্মুক্ত বলেই বোধ হয় সে অত অসহায়। তাই যিনি তার গলায় মালা দেবেন তিনি যদি তাকে চালিয়ে নিয়ে না চলতে পারেন—

ঊর্মিলা। আমার বিশ্বাস, আপনার বন্ধুর গলায় যে মহিলাটি মালা দেবেন তিনি তাঁকে সহজেই চালাতে পারবেন।

অশনি। আমারও তাই বিশ্বাস।

ঊর্মিলা। কিন্তু ও কথাটা যে চাপা পড়ে গেল! ঝগড়াটে স্বভাব ছাড়া আমার আর কি কি দোষ আছে বললেন না তো?

অশনি। আর? রসুন, ভেবে দেখি। আর আপনি যার সঙ্গে ঝগড়া করেন তাকেই মিষ্টান্ন খাওয়াতে ভালবাসেন; আর—তাকে চাঁদা দিতে ভালবাসেন; আর—

ঊর্মিলা। আর দরকার নেই, বুঝতে পেরেছি। (গম্ভীর হইয়া) কিন্তু অশনিবাবু, কেবল চাঁদা দিয়েই কি আমার সমস্ত দায়িত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে? দেশের ছেলেমেয়েদের জন্যে আমি কি আর কিছুই করতে পারব না?

অশনি। আর কি করতে চান?

ঊর্মিলা। তা জানি না। আপনি যা করেন তা যদি আমি করবার চেষ্টা করি তা হলে কি ধৃষ্টতা হবে?

অশনি। আমি কি করি?

ঊর্মিলা। আবার তর্ক করছেন! সত্যি বলুন— পারি না?

অশনি। সত্যি বলব? না, পারেন না।

ঊর্মিলা। কেন?

অশনি। এ আলোচনা তো একদিন হয়ে গেছে।

ঊর্মিলা। সে এলোমেলো আলোচনা আমি বুঝতে পারি নি।

অশনি। আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি যদি হঠাৎ পীড়িত হয়ে অসহায় অবস্থায় আমার বাসায় পড়ে থাকি, আপনি একলা গিয়ে আমার সেবা করতে পারবেন? (ঊর্মিলা নীরব) পারবেন না। হয়তো আমার অবস্থা দেখে আপনার দয়া হবে; তবু পারবেন না। কিন্তু মনে করুন, যাকে আপনি ভালবাসেন—তার অসুখের কথা শুনে আপনি চুপ করে থাকতে পারবেন কি? না, আপনি ছুটে গিয়ে পড়বেন তার কাছে; লোকলজ্জা সঙ্কোচ কিছুই আপনাকে ধরে রাখতে পারবে না। ভালবাসা এবং সেবা করবার ইচ্ছের মধ্যে এই প্রভেদ ঊর্মিলা দেবী। বুঝেছেন?

ঊর্মিলা। এই নিন আপনার চাঁদা—(নোট দিল)

অশনি। ধন্যবাদ! কিন্তু আপনি রাগ করলেন না কি?

ঊর্মিলা। (অধর দংশন) রাগ করি নি; রাগ করবার আমার অধিকার কি? তবে আপনি যে ভুল করেছেন একথা হয়তো একদিন বুঝতে পারবেন।

অশনি। কি ভুল?

ঊর্মিলা। (দুরন্ত আবেগভরে) সব ভুল—আগাগোড়া ভুল। কিন্তু আপনার মত অবুঝ লোককে বসে বসে তা বোঝাবার আমার ধৈর্য নেই।

অশনি। (আহতভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া) আচ্ছা, আজ আমি যাই। দেখুন, আপনি সত্যি কথা জানতে চাইলেন তাই বললুম, নচেৎ আপনাকে উত্যক্ত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। নমস্কার—

অশনি চলিয়া গেল। ঊর্মিলা হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। অশনি আবার ফিরিয়া আসিল

অশনি। একটা কথা। ও কি! আবার চোখে কিছু পড়ল না কি?

ঊর্মিলা। হ্যাঁ। ফিরে এলেন যে?

অশনি। একটা কথা বলা হয় নি। হেমন্ত তার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দানপত্র করে দিয়েছে, নিশ্চয় আপনি জানেন। কিন্তু সেজন্য কোনও দুশ্চিন্তা নেই; তার বিয়ের

রাত্রেই তার স্ত্রীর হাতে আমি দলিলখানা ফেরত দেব।

ঊর্মিলা অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল

আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাঁর হাতে দায়িত্ব পড়বে তিনি সর্বতোভাবে তার যোগ্য। তাই আজ আমার কোনও ক্ষোভ নেই, বরং মুক্তির আনন্দই আমি অনুভব করছি। নমস্কার।

অশনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। ঊর্মিলা তেমনই বসিয়া রহিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্কের নির্জন অংশ

বাউলের গান

মন, তুই পাতলি আসন ধুলোয় রে
এই ভাল—এই ভাল!
গেছে তোর তরুর শিরে শাখার ভিড়ে
পাতায় ঢাকা কুলায় রে—
এই ভাল—এই ভাল।
মন, তোর সজ্জা যা ছিল,
ওরে লোকলজ্জা যা ছিল
হল সব জীর্ণ মলিন ধুলোতে লীন,
কাঁটায় ছিঁড়িল।
এখন বসলি নেমে—
পথের পরে মাটির প্রেমে;
মন-গড়া তোর গবব-মালা
গেল সে কোন্ চুলায় রে—
এই ভাল—এই ভাল।

অশনি প্রবেশ করিল

অশনি। 'সব ভুল—আগাগোড়া ভুল'—মানে কি? তবে কি আমি ভুল করেছি! হেমন্তকে কি ঊর্মিলা? না, তাই বা কি করে হবে? আমি তো স্পষ্টই ইঙ্গিত করলুম, কই, অস্বীকার করলে না তো? (বেঞ্চিতে উপবেশন) কানাইকে এখানে আসতে বলেছি, একটু বসি। কে একটা ভিখিরি গান গাইছিল না—'মন-গড়া তোর গরব-মালা গেল সে কোন্ চুলায় রে'—ঠিক বলেছে। এই ভাল—এই ভাল। আমার পক্ষে ওসব ভাবতে যাওয়াও পাগলামি। ইচ্ছে করে ভাবি নি, তবু সমস্ত মনটা জুড়ে বসেছিল—যাক, এই ভাল এই ভাল। বিদ্যুতের আলো রাজপ্রাসাদেই শোভা পায। কিন্তু মনটাকে ভেঙে পিষে নতুন করে গড়তে হবে—বন্ধুপত্নীর প্রতি যেন তিলমাত্র আকর্ষণ না থাকে।

পিছনে পিল্লু গুণ্ডার আবির্ভাব

কানাই এখনও এল না?

পিল্লু আক্রমণ করিল; কিছুক্ষণ উভয়ের যুদ্ধ; তারপর পিল্লু অশনির বুকে ছুরি মারিয়া প্রস্থান করিল, অশনি মাটিতে পড়িয়া গেল

অশনি। (বেঞ্চি ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল) বুকে মেরেছে। বোধ হয় সাংঘাতিক আঘাত; বাঁচব না। কানাই যদি আসত—

কানাই প্রবেশ করিল

কানাই। মাস্টারমশাই—(কাছে গিয়া) এ কি! কি সর্বনাশ। কে এমন করলে?

অশনি। গুণ্ডা। কানাই, শোন একটা ভয়ানক জরুরি কাজ করতে হবে। হয়তো বাঁচব না—কিন্তু সে কাজ না করে যদি মরি, বিষম অবিচার হবে—হেমন্ত পথে বসবে।

তুমি একটা কাজ কর—

কানাই। আগে আপনাকে ডাক্তারের হাতে দিয়ে তবে অন্য কাজ করব সার্। ফার্স্ট এড দিতে জানি—দেখি আগে—(ফার্স্ট এড দিতে প্রবৃত্ত)

অশনি। না না, কানাই, তুমি আগে ঊর্মিলা দেবীকে খবর দাও—

কানাই। পরে হবে সার্। আগে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাই।

অশনি। কিন্তু এখানে তো কেউ নেই—আমাকে নিয়ে যাবে কি করে?

কানাই। তুলে নিয়ে যাব সার্। তা যদি না পারি, এতদিন আপনার সাকরেদি করলুম কি জন্যে?

অশনি। কিন্তু—কিন্তু তাঁকে খবর না দিলেই যে নয় কানাই—

অশনিকে তুলিয়া লইয়া কানাই প্রস্থান করিল

তৃতীয় দৃশ্য

হেমন্তর গৃহের একটি কক্ষ। হেমন্ত দাঁড়াইয়া ভোজন করিতেছে
চারিদিকে টেবিলে নানাবিধ ভোজনপাত্র রহিয়াছে

হেমন্ত। যা খাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে হজম—আবার ক্ষিদে! বাপ—কি সাংঘাতিক বড়ি!—নিধিরাম, রসগোল্লা নিয়ে এস।

নিধিরাম রসগোল্লার হাঁড়ি রাখিয়া গেল

এই বড়ি যদি দেশের সবাই খায় তা হলে সাত দিনের মধ্যে দেশে মন্বন্তর। বুড়োকে গুম্ খুন করা উচিত—বললে কিনা গুলি খেলে সাত দিনে আর ক্ষিদেই পাবে না। বাবা, একে যদি ক্ষিদে না পাওয়া বলে তা হলে ক্ষিদে পাওয়া কি জিনিস? পাঁচ মিনিট মুখ কামাই দিয়েছি কি অমনই পাকস্থলী একেবারে হাহাকার করতে থাকে।—নিধিরাম, পান্তুয়া যে রেটে খাচ্ছি তাতে পাঁচশো টাকা আর কদ্দিন! না, বরাদ্দ বাড়িয়ে নিতে হবে। অশনির পায়ে কেঁদে পড়ব; বলব—আরও টাকা দাও, নইলে শুকিয়ে মরে যাব। অশনি হয়তো ভাববে, আবার জুয়া খেলবার মতলব আঁটছি—না, একবার খাওয়ার বহর দেখলেই বুঝে যাবে। নিধিরাম, বাড়িতে আর কিছু আছে? যা আছে নিয়ে এস—লজ্জা ক'রো না। মুড়ি মুড়কি? তাই সই। নিয়ে এস এক ধামা। একটা নির্লজ্জ জীবন্ত রাক্ষসে পরিণত হয়েছি। (মুড়ি মুড়কি ভক্ষণ) বিয়ের কল্পনাও মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মন্দা কি একটা পেটসর্বস্ব রাক্ষসকে বিয়ে করবে? সব গেল, আমার সব গেল। নিধিরাম—

মন্দা প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল

কে—মন্দা দেবী! এসেছেন! আসুন—(হৃদয়বিদারক স্বরে) স্বচক্ষে দেখে যান, আমি কত বড় হতভাগ্য!

মন্দা। কি হয়েছে হেমন্তবাবু!

হেমন্ত। কি হয়েছে? বলছি—(রাজভোগ ভক্ষণ) মন্দা দেবী, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ কখনও দেখেছেন? বিরাট শূন্যতা দেখেছেন? অতলস্পর্শ গভীর গহ্বর দেখেছেন? দেখুন—আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অনির্বাণ ক্ষুধার মূর্তিমান অবতার আমি; রাক্ষস আমার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু—আমি খোক্কোসের পিতামহ। (কাটলেট ভক্ষণ)

মন্দা। কিন্তু এ যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

হেমন্ত। আপনার জ্যাঠামশাই আমার সর্বনাশ করেছেন।

মন্দা। সে কথা শুনেছি—আর শুনে অবধি—

হেমন্ত। শুনেছেন—এখন চোখে দেখুন। তাঁর একটি গুলিতে আমার এই দুরবস্থা হয়েছে। অহর্নিশি কেবল খাচ্ছি—ক্ষিদের শেষ নেই। রাত্রে ঘুমুতে পারি না, পেটের

জ্বালায় ঘুম ভেঙে যায়। এমন হৃদয়বিদারক ক্ষিদে আর কখনও দেখেছেন?

মন্দা। সত্যি? জ্যাঠামশায়ের গুলি খেয়ে এই রকম হয়েছে?

হেমন্ত। হ্যাঁ। ওষুধের গুলি নয়—সে কামানের গোলা, আমাকে ধনে প্রাণে মেরেছে। তিনি আমার মাথা নেড়া করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এর তুলনায় সে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। (বিমর্ষভাবে ভোজন)

মন্দা। জ্যাঠামশায়ের এ ভারি অন্যায়। কেন আপনি গুলি খেতে গেলেন।

হেমন্ত। না খেয়ে উপায় ছিল! তিনি নাছোড়বান্দা, তাঁকে চটাতে সাহস হল না। তা ছাড়া গুলির যে এমন মারাত্মক ফল তা তো তখন জানতুম না।

নিধিরাম প্রবেশ করিল

নিধিরাম। বাবু, টেলিফোন বাজছে—

হেমন্ত। বাজুক, আমার সময় নেই। খাবার নিয়ে এস। বাড়িতে না থাকে বাজার থেকে নিয়ে এস। যাও, দেরি ক'রো না, সব ফুরিয়ে এসেছে!

নিধিরামের প্রস্থান

মন্দা। (কোমল স্বরে) হেমন্তবাবু—

হেমন্ত। মন্দা দেবী, আমার কি হবে? চিরজীবন ধরে কি আমি এমনই খেতে থাকব?

মন্দা। না না, তা কখনও হয়? ও সেরে যাবে।

হেমন্ত। কিন্তু আমি যে সারবার কোনও লক্ষণই দেখছি না।

মন্দা। আপনি ভাববেন না—নিশ্চয় সেরে যাবে।

হেমন্ত। (আশান্বিত হইয়া) সত্যি বলছ সারবে?

মন্দা। সারবে বই কি! গুলির তেজ কি চিরদিন থাকে?

হেমন্ত। (আনন্দবিহ্বলভাবে) সারবে? সারবে? মন্দা, আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রাণের চেয়েও ভালবাসি—(সহসা থমকিয়া) কিন্তু—

ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়া আহার করিতে লাগিল, মন্দা আনন্দোজ্জ্বল মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর হেমন্তর পিছনে গিয়া তাহার বাহু স্পর্শ করিল

মন্দা। কিন্তু কি?

হেমন্ত। কিন্তু—তোমাকে বিয়ে করতে পারি না—না, কিছুতেই নয়।

মন্দা। (মৃদু কণ্ঠে) কারণটি জানতে পারি না?

হেমন্ত। বুঝতে পারছ না? বিয়ে করে তোমাকে খাওয়াব কি? নিজেই তো সব খেয়ে ফেলব।

মন্দা। এই? (হাস্য) বললুম না সেরে যাবে!

হেমন্ত। (ফিরিয়া) যদি না সারে? যদি সারা জীবন এই রকম খেতে থাকি! পাঁচশো টাকা তো আমার একলারই নস্যি—তুমি খাবে কি?

মন্দা। আমি কিছু খাব না। কিন্তু পাঁচশো টাকা কেন?

হেমন্ত। ধর হাজার; অশনিকে কাকুতি মিনতি করলে সে হয়তো আরও পাঁচশো টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে দেবে! কিন্তু তাতেই কি কুলোবে?

মন্দা। এ যে হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। অশনিবাবু বরাদ্দ বাড়িয়ে দেবেন, তার মানে কি?

হেমন্ত। ও—তুমি জান না। অশনিকে আমি আমার সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়েছি। সে আমাকে মাসে মাসে—

মন্দা। (রাগিয়া) কিন্তু এ কি অত্যাচার! তিনি বন্ধু বলে তোমার সম্পত্তি দখল করবার তাঁর কি অধিকার আছে? এ আমি কিছুতেই হতে দেব না!

হেমন্ত। মন্দা, মন্দা, তবে কি তুমিও আমাকে ভালবাস? এই নেড়া মাথা, এই বিরাট ক্ষিদে দেখেও আমাকে বিয়ে করবে? বল—বল—(নতজানু হইয়া)

মন্দা। ওঠ—তা কি এখনও বুঝতে পারছ না? কিন্তু ঐ রক্তচোষা বন্ধুর হাত থেকে আমি তোমায় উদ্ধার করব।

হেমন্ত। অশনি রক্তচোষা নয়—সে বন্ধু। কিন্তু মন্দা, তুমি—তুমি আমার (আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল)

নিধিরাম প্রবেশ করিল

নিধিরাম। রসগোল্লা—

হেমন্ত। অ্যাঁ—রেখে যাও—

নিধিরাম। আবার টেলিফোন বাজছে—

হেমন্ত। বাজতে দাও—(নিধিরামের প্রস্থান) সানাই তো নেই, টেলিফোনই বাজুক। বস মন্দা, আমার পাশে বস।

দুইজনে পাশাপাশি বসিল

তোমার দিদিকে বিয়ে করতে হবে শুনে কি ভয়ই সে দিন হয়েছিল।

মন্দা। (চটুল কণ্ঠে) কেন, দিদি কি বাঘ না ভাল্লুক?

হেমন্ত। না না, তিনিও খুব চমৎকার মানুষ। কিন্তু তোমার কাছে তিনি—(বিগলিত হাসি)—আচ্ছা, তিনি কি সত্যিই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, না তোমার জ্যাঠামশাই আমার মাথাটি কামাবার মতলবে ক্লোরোফর্মের বদলে ঐ কথাটি বলে আমাকে অসাড় করে দিয়েছিলেন?

মন্দা। জ্যাঠামশাই ভুল করেছিলেন। সে সব মজার কথা পরে বলব। কিন্তু এখন আমি তোমার ঐ বন্ধুটির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

হেমন্ত। অশনির সঙ্গে? তা বেশ তো—সে হয়তো এখানেই আসবে। চল মন্দা, তুমি যে বাড়ি দেখবে বলেছিলে, দেখবে না?

মন্দা। কিন্তু তাঁকেও আজই আমি দেখব।

হেমন্ত। (উঠিয়া) আরে, ভারি আশ্চর্য! আর তো কই তত ক্ষিদে পাচ্ছে না! মানে—তোমাকে পেয়ে অবধি ক্ষিদে অনেক কমে গেছে—

মন্দা। (মৃদুহাস্যে) ভয় নেই—ক্রমে আরও কমে যাবে।

হেমন্ত। নিধিরাম! (নিধিরাম আসিল) আমরা বাড়ির ভিতর চললুম; যদি কেউ আসে বা ডাকাডাকি করে, বলবে—আমি বাড়ি নেই!

নিধিরাম। যদি জানতে চায় কোথায় গেছেন?

হেমন্ত। যেখানে ইচ্ছে বলে দেবে। আচ্ছা, ব'লো আমি অশনির বাসায় গেছি।—এস মন্দা।

মন্দার হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান

নিধিরাম। ইনিই দেখছি আমাদের মাঠাকরুণ হবেন! তা—বেশ মানাবে। আর যদি ভালমানুষের মেয়ে হন তা হলে আমাদের কারুর দুঃখ থাকবে না।

সহসা জ্ঞানাঞ্জন প্রবেশ করিলেন

জ্ঞানাঞ্জন। এইটেই তো কৃতান্তর বাড়ি! হ্যাঁ—নিশ্চয়, ঠিকানা যখন মিলে গেছে তখন তার বাড়ি হতে বাধ্য।—ওহে কৃতান্ত!

নিধিরাম। আজ্ঞে, বাবু বাড়ি নেই।

জ্ঞানাঞ্জন। বাড়ি নেই? তাই তো—কথাটা জানা বিশেষ দরকার ছিল।—তুমি কে?

নিধিরাম। আমি এ বাড়ির চাকর।

জ্ঞানাঞ্জন। ও—তা হলে তুমি জানতে পার। আচ্ছা, বল দেখি, তোমার বাবু কি খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন?

নিধিরাম। আজ্ঞে, কি বললেন? ছেড়ে দিয়েছেন?

জ্ঞানাঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ। বলি, গত তিন-চার দিন তিনি কোনও খাদ্য মুখে দিয়েছেন কি?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তা মুখে দিয়েছেন। যা সামনে পেয়েছেন তাই মুখে দিয়েছেন। দশ জনের খাদ্য একাই মুখে দিয়ে ফেলেছেন।

জ্ঞানাঞ্জন। বল কি! কিন্তু এরকম হবার তো কথা নয়।

নিধিরাম। আজ্ঞে, নিজের চোখেই দেখুন না—(শূন্য পাত্রগুলি দেখাইল) এগুলি সব বাবুই শেষ করেছেন।

জ্ঞানাঞ্জন। তাই তো। এ তো ভারি আশ্চর্য! কিন্তু—না, বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার দীর্ঘ সাধনার ফল ঐ গুলি—নিষ্ফল হবে! কখনই না—বাপু, তোমার মালিক কোথায় গেছে বল তো?

নিধিরাম। আজ্ঞে, তিনি অর্শনিবাবুর বাসায় গেছেন।

জ্ঞানাঞ্জন। সে কোথায়?

নিধিরাম। আসুন, বাৎলে দিচ্ছি—

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

জ্ঞানাঞ্জনবাবুর ড্রয়িং-রুম। ঊর্মিলা বসিয়া ফুলদানি হইতে একটি একটি ফুল লইয়া ছিঁড়িতেছে ও মাঝে মাঝে অনাহূত অশ্রু অধীরভাবে মুছিয়া ফেলিতেছে। ললি রায় প্রবেশ করিল। বেঁটে শীর্ণ কুৎসিত, কিন্তু পরিচ্ছদের চটক দেখিয়া সহসা সুন্দরী বলিয়া ভ্রম হয়—চোখে চশমা

ললি। ওরে ঊর্মিলা, নতুন খবর শুনেছিস?

ঊর্মিলা। (অপ্রসন্ন মুখে) ললি, কি মনে করে?

ললি। চারিদিকে যে ঢি-ঢি পড়ে গেছে— খবর শুনিস নি?

ঊর্মিলা। না—পরচর্চা করবার আমার সময় নেই।

ললি। তোরা এখন নিজেদের চর্চাতেই ব্যস্ত আছিস—তাও শুনেছি। (হাস্য) তা পরের খবরও একটু আধটু রাখতে হয়। জানিস, নীলিমা ইলোপ করেছে!

ঊর্মিলা। সে কি! কার সঙ্গে?

ললি। আন্দাজ কর দেখি। পারবি না? প্রেমকুমারের সঙ্গে। (হাস্য)

ঊর্মিলা। অ্যাঁ! কিন্তু সে যে নীলিমার চেয়ে বয়সে ছোট।

ললি। যার সঙ্গে যার মজে মন—নীলিমা সেই মড়াখেগো ছোঁড়াকে নিয়েই পালিয়েছে—(অপরিমিত হাস্য) শুনে তো আমি হেসে মরি! কি ঘেন্নার কথা বল দেখি? চাল চুলো নেই, একটা হাঘরে ছোঁড়া তার সঙ্গে ইলোপমেণ্ট! ছি ছি ছি. নীলিমার গলায় দড়ি জুটল না!

ঊর্মিলা। এইবার হয়তো জুটবে।

ললি। আর প্রেমকুমারটাই বা কি! শেষে নীলির সঙ্গে! ঐ তো নীলির চেহারা, বয়সের গাছ-পাথর নেই—তাকে নিয়ে এই ঢলাঢলি! শুনলুম দেওঘরে না মধুপুরে গিয়ে দুজনে আছে! পুরুষমানুষ জাতটাই ঐ—ঘেন্নাপিত্তি নেই; যা হোক একটা হলেই হল—

ঊর্মিলা। (অর্ধ স্বগত) নিষ্ঠুর—পুরুষজাতটা নিষ্ঠুর!

ললি। যা বলেছিস! দেখ না, দুদিন পরেই নীলিকে ফেলে পালাবে অখন। নীলির তখন শ্যাম কুল দুই যাবে! (হাস্য) আর বসব না ভাই. এখনও অনেক জায়গায় যেতে হবে। (যাইতে যাইতে) তোরাও একটু সাবধান হ'স ঊর্মি. তোদের নামে যা সব শুনছি তার সিকিও যদি সত্যি হয় তা হলে—(হাস্য) দেখিস. নীলির মত কেলেংকারি করিস না যেন!

ঊর্মিলা। (বিরক্তস্বরে) আমাদের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

ললি। না হলেই ভাল। চললুম—

মুখভঙ্গি করিয়া প্রস্থান

ঊর্মিলা। নীলিমার দোষ কি! পুরুষজাতটাই নিষ্ঠুর—ওদের ছোট-বড় ইতর-ভদ্র নেই। সবাই সমান। মেয়েমানুষের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ওদের জাত-ব্যবসা। (ফুল ছিঁড়িল) আমি কারুর কোনও কাজে লাগব না, কারুর উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই! উদাহরণ দেওয়া হল—উনি যদি অসুখ করে বাসায় পড়ে থাকেন, আমি ওঁর সেবা করতে পারব না। (অধর স্ফুরিত হইল) পারবই না তো। কেন পারব? উনি আমার কে যে আমি ওঁর সেবা করতে যাব?

কানাই দ্রুত প্রবেশ করিল

ঊর্মিলা। (চমকিয়া) কানাই! তুমি এ সময়ে? কি হয়েছে কানাই? তোমার মুখ অত শুকনো কেন?

কানাই। মাস্টারমশাই এখান থেকে ফিরে যাবার পথে একটা গুন্ডা তাঁর বুকে ছুরি মেরেছে। তিনি আপনাকে খবর দিতে বললেন।

ঊর্মিলা। ছুরি মেরেছে? (ব্যাকুল বিস্ফারিত চক্ষে) কেন?

কানাই। মাস্টারমশাই হেমন্তবাবুকে জুয়ার আড্ডা থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সেই আক্রোশে তারা গুন্ডা লাগিয়েছিল! কিন্তু আমি যাই, আমাকে এখনই সেখানে ফিরতে হবে।

ঊর্মিলা। (উঠিয়া) কানাই, তিনি কি—তিনি কি বেশি আহত হয়েছেন? (গলা কাঁপিয়া গেল)

কানাই। তা জানি না। (প্রস্থানোদ্যত)

ঊর্মিলা। (ছুটিয়া গিয়া কানাইয়ের হাত চাপিয়া ধরিল) কানাই, তিনি বেঁচে আছেন তো?

কানাই। হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিন—

ঊর্মিলা। সত্যি বলছ তিনি বেঁচে আছেন? মিথ্যে বলে তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ না?

কানাই। না, এখনও বেঁচে আছেন, তবে—আমাকে ছেড়ে দিন।

ঊর্মিলা। কোথায় আছেন তিনি?

কানাই। তাঁকে বাসায় নিয়ে গেছি; কিন্তু সেখানে আর কেউ নেই। ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আপনাকে খবর দিতে এসেছি—

ঊর্মিলা। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

কানাই। আপনি যাবেন? কিন্তু—

ঊর্মিলা। আর দেরি ক'রো না কানাই। তিনি আমাকে ডেকেছেন—শিগ্‌গির—একটা ট্যাক্সি।

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

অশনির বাসা; অশনি বিছানার উপর ব্যান্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় শয়ান। ডাক্তার কর্তব্য শেষ করিয়া হাত ধুইতেছেন। তাঁহার একজন সহকারী ব্যাগ গুছাইতেছে। অশনির বিছানার পাশে দুইটি কাগজ পড়িয়া আছে

ডাক্তার। সিকি ইঞ্চির জন্যে হার্ট বেঁচে গেছে, আপনিও বেঁচে গেছেন। কিন্তু নড়াচড়া মানসিক উত্তেজনা একেবারে নিষিদ্ধ। চললুম, আমার আবার একটা জরুরি অপারেশন আছে। আপনার শিষ্য এখনই এসে পড়বে বোধ হয়; প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটা আনিয়ে নেবেন। তিন ঘণ্টা অন্তর ওষুধ চলবে। আর বিষয়সম্পত্তির কথা ভেবে মনকে উদ্বিগ্ন করবেন না। উইল করেছেন তাতে দোষ নেই, কিন্তু না করলেও ক্ষতি ছিল না। আচ্ছা—চললুম—

সহচরসহ প্রস্থান

অশনি। উইল করা হয়ে গেছে, এখন আমি নিশ্চিন্ত। হয়তো মরব না, কিন্তু সাবধানের

মার নেই। ঊর্মিলা বোধ হয় এতক্ষণ খবর পেয়েছে। তাকে খবর না দিলেই ভাল হত। কিন্তু তখন, কেন জানি না মনে হল, খবর পাঠানো একান্ত দরকার। সে অবশ্য আসবে না, আসা উচিতও নয়। তবু এলে বোধ হয় ভাল হত, তার সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। শরীরটা ঝিম ঝিম করছে। ঘুমের মধ্যে ডুবে মিলিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে—এমনই ভাবে মহাসুপ্তি যদি আসে, মন্দ কি! কাজ তো কিছু বাকি নেই—

তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল

নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া ঊর্মিলা ও কানাই প্রবেশ করিল। অশনিকে সুপ্ত দেখিয়া ঊর্মিলা কানাইকে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। কানাই চলিয়া গেল। ঊর্মিলা অশনির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, নিজের চোখের জল মুছিল, তারপর লঘুহস্তে অশনির মস্তক স্পর্শ করিল

অশনি। (অর্ধমুদিত নেত্রে) কে—কানাই!
ঊর্মিলা। না, আমি ঊর্মিলা।
অশনি। (ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে চাহিয়া) ঊর্মিলা—তুমি এসেছ এখানে?
ঊর্মিলা। (অবরুদ্ধ স্বরে) আমি আসব না তো কে আসবে?
অশনি। তুমি—তুমি আসবে তা ভাবতে পারি নি।
ঊর্মিলা। তবে ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?
অশনি। কেন—তা জানি না—
ঊর্মিলা। জান। আমাকে ডাকবার তোমার অধিকার আছে তাই ডেকেছিলে; আর আমার আসবার অধিকার আছে তাই আমি এসেছি। আজই কি উদাহরণ আমাকে শুনিয়ে এসেছ মনে নেই! (চোখ মুছিয়া কম্পিত স্বরে) ডাক্তার কি বললেন?
অশনি। ভাল—বোধ হয় বাঁচব। কিন্তু তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়েছে।
ঊর্মিলা। এখন বোঝবার দরকার নেই, সেরে উঠে বুঝো।

পাশে উপবেশন

অশনি। সেরে উঠে? আচ্ছা। (কিয়ৎকাল পরে) এই নাও।

কাগজ তুলিয়া ধরিল

ঊর্মিলা। কি এগুলো?
অশনি। তুমি তো বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, থাকা উচিতও নয়। যাবার সময় দলিলগুলো নিয়ে যেও। বলা তো যায় না—
ঊর্মিলা। কিসের দলিল?
অশনি। আমার উইল আর হেমন্তর দানপত্র। তাকে তার সম্পত্তি ফেরত দিলুম। তুমি নিয়ে যাও, নিজের কাছে রেখ—
ঊর্মিলা। এসব আমি রাখব কেন?
অশনি। তোমার রাখাও যা হেমন্তর রাখাও তাই—বরং তোমার কাছে নিরাপদ থাকবে।
ঊর্মিলা। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া) ও—কিন্তু আমি তো এখন যাব না—তোমার কাছে থাকব।
অশনি। থাকবে?
ঊর্মিলা। হ্যাঁ—যতদিন না তুমি সেরে ওঠ ততদিন এখানেই থাকব।
অশনি। কিন্তু সেটা কি ভাল দেখাবে? হেমন্ত—
ঊর্মিলা। আর হেমন্তবাবুর দলিল মন্দাকে ফেরত দেব।
অশনি। মন্দাকে? (সংশয় আকুল দৃষ্টিতে চাহিল)

ঊর্মিলা। হ্যাঁ—কিন্তু আর কথা নয়, একটু ঘুমুবার চেষ্টা কর। আমি তোমার পাশে বসে রইলুম।

অশনি। (কাতর স্বরে) কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না ঊর্মিলা!

ঊর্মিলা। পারছ না--বুঝতে পারছ না? (অশনির বুকের উপর মাথা রাখিল) এখনও বুঝতে পারছ না?

কিছুক্ষণ উভয়ের এইভাবে অবস্থান

অশনি। পেরেছি। ঊর্মি, আর আমি মরব না। ডাক্তার বলেছেন সিকি ইঞ্চির জন্যে হার্ট ফস্কে গেছে। (হাস্য) শরীরে যেন নতুন বল সঞ্চার হচ্ছে। আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেবে?

ঊর্মিলা। পারবে?

অশনি। পারব।

ঊর্মিলা অতি যত্নে তাহাকে পিঠে বালিশ দিয়া বসাইয়া দিল

অশনি। (ঊর্মিলার হাত ধরিয়া) ঊর্মি, সত্যি?

ঊর্মিলা। সত্যি।

অশনি। কবে থেকে?

ঊর্মিলা। প্রথম যেদিন চোখোচোখি হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে তখন থেকে।

অশনি। আমি ঝগড়া করেছিলুম, না তুমি ঝগড়া করেছিলে?

ঊর্মিলা। (হাসিয়া) সে মীমাংসা আর একদিন হবে। আজ আর ঝগড়া ক'রো না।

অশনি। ঝগড়া কই করলুম।

ঊর্মিলা। হ্যাঁ, করেছ। এখন চুপটি করে থাক, নইলে আমি ঘর থেকে চলে যাব।

অশনি। না না, এই চুপ করলুম।

ঊর্মিলা অশনির গায়ে ভাল করিয়া চাদর ঢাকা দিয়া দিল

ঊর্মিলা। জল দেব?

অশনি। দাও।

ঘরের কোণে জলের কুঁজো হইতে ঊর্মিলা কাচের গেলাসে জল ঢালিয়া আনিয়া দিল, অশনিকে পান করাইয়া গেলাস লইয়া গিয়া আবার জল ঢালিয়া নিজে আলগোছে পান করিল।

দ্রুত মন্দা প্রবেশ করিল: পশ্চাতে ব্যস্ত কানাই

মন্দা। অশনিবাবু, এ আপনার কি রকম ব্যবহার! আপনি—

ঊর্মিলা। মন্দা!

মন্দা। একি! দিদি, তুমি এখানে?

ঊর্মিলা। হ্যাঁ, আমি এখানে, চেঁচামেচি ক'রো না, উনি অসুস্থ।

মন্দা। (বিস্মিতভাবে উভয়ের দিকে তাকাইয়া) দিদি, কি হয়েছে? তুমি এখানে কেন?

ঊর্মিলা। তুই এখানে কেন?

মন্দা সহসা উত্তর দিতে পারিল না

অশনি। মন্দা, আমার কাছে এস। হেমন্তর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে? (মন্দা নতমুখী) বেশ, তা হলে এই দলিল নাও—তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন থেকে তুমিই তার রক্ষক হলে। কিন্তু সে গাধাটা কোথায়? তার সঙ্গে আমারও বোঝাপড়া আছে যে!

মন্দা। তিনি আমাকে নাবিয়ে দিয়ে চলে গেছেন।

হেমন্ত প্রবেশ করিল

হেমন্ত। না না, যাই নি। গিয়েছিলুম খানিক দূর, আবার ফিরে আসতে হল। তোমাকে ছেড়ে—(অশনিকে দেখিয়া লাফাইয়া তাহার পাশে গেল) এ কি অশনি?

অশনি। কিছু নয়—একটু চোট লেগেছে।

হেমন্ত। (ঊর্মিলাকে দেখিয়া) আপনি! এ সব ব্যাপার কি? অশনি, কি হয়েছে

তোমার? বিছানায় শুয়ে কেন?

ঊর্মিলা। আপনাকে জুয়ার আড্ডা থেকে উদ্ধার করেছিলেন তাই তারা গুণ্ডা লাগিয়ে ছুরি মেরেছে।

হেমন্ত। অ্যাঁ! অশনি—ভাই—। ডাক্তার! ডাক্তার! আমি এখনই যাচ্ছি নীলরতন—

প্রস্থানোদ্যত

অশনি। হেমন্ত, আমার কাছে এসে বসো—মন্দার পাশে বসো। ডাক্তার এসেছিলেন, ভয় নেই—তিনি ড্রেস করে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গেছেন। একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনও দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা দরকার হয় নি—ঊর্মিলা আসার পর ওষুধ আর দরকার মনে হচ্ছে না—

ঊর্মিলা। অ্যাঁ—প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের কথা বল নি তো? কি মানুষ তুমি? তোমাকে নিয়ে—; কানাই, এক্ষুনি ওষুধ তৈরি করিয়ে নিয়ে এস, আর আউন্স চারেক ব্র্যান্ডি—

হেমন্ত। টাকা নাও—

টাকা লইয়া কানাইয়ের প্রস্থান

অশনি। তুমি মাথায় রুমাল বেঁধেছ কেন?

হেমন্ত। সে অনেক কথা, পরে বলব। অশনি, তা হলে ভয়ের কোন কারণ নেই?

অশনি। ভয়ের একটা কারণ এই যে, শিগ্‌গির হয়তো আমাদের বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে।

হেমন্ত। কেন?

অশনি। বিয়ে করলে শুনেছি বাল্যবন্ধুত্ব আর থাকে না।

হেমন্ত। কে বলে থাকে না? মন্দা আমাকে বিয়ে করবে বলে তুমি যদি মনে কর—

অশনি। শুধু তাই নয়। আমাকেও যে একজন বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। (ঊর্মিলার দিকে তাকাইল)

হেমন্ত। অ্যাঁ! ঊর্মিলা দেবী! সত্যি?

মন্দা। দিদি, সত্যি? (জড়াইয়া ধরিল)

হেমন্ত। (মহানন্দে) আমি এখন কি করি! আমার—, মন্দা, আনন্দের উত্তেজনায় আবার যে আমার ক্ষিদে পাচ্ছে? অশনি, তোমার ঘরে কিছু খাবার আছে?

জ্ঞানাঞ্জনবাবু প্রবেশ করিলেন

জ্ঞানাঞ্জন। এই যে কৃতান্ত! ঠিক ধরেছি।

হেমন্ত। আজ্ঞে আজ্ঞে—দোহাই জ্ঞানাঞ্জনবাবু, আমাকে আর গুলি খেতে বলবেন না। ঊর্মিলাদিদি, আপনার বাবাকে সামলান।

ঊর্মিলা। বাবা!

মন্দা। জ্যাঠামশাই!

জ্ঞানাঞ্জন। তাই তো! ঊর্মিলা, মন্দা এরা এখানে এল কি করে! ভারি আশ্চর্য! তা সে যাক, ও-কথা পরে ভাবলেই হবে। কৃতান্ত, গুলি খেয়ে তুমি কেমন আছ বল দেখি?

হেমন্ত। আজ্ঞে, ভাল নয়, অবস্থা যায় যায় হয়ে উঠেছিল!

জ্ঞানাঞ্জন। মানে ক্ষিদে আর পাচ্ছে না তো?

হেমন্ত। আজ্ঞে, সত্যি কথা বললে স্বীকার করতে হয় যে ক্ষিদে পাচ্ছে, এত বেশি পাচ্ছে যে সে আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না। যা খাচ্ছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে হজম হয়ে যাচ্ছে; আবার খাচ্ছি, আবার হজম।

জ্ঞানাঞ্জন। তাই তো! এ কি রকম হল? ভারি আশ্চর্য! আমার এতদিনের দীর্ঘ গবেষণা ব্যর্থ হয়ে গেল!

অশনি। আজ্ঞে না, ব্যর্থ হয় নি। আমাদের দেশে ঐ রকম হজমি গুলিই দরকার। দেশ থেকে যদি অজীর্ণ আর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া তাড়াতে পারেন তা হলে আর আমাদের দুঃখ থাকবে না। আপনি ও গুলিটা পেটেন্ট করে নিন।

ঊর্মিলা। মন্দা, আয় বাবাকে প্রণাম করি।

উভয়ের প্রণাম

জ্ঞানাঞ্জন। (অন্যমনস্কভাবে) বেশ বেশ—কিন্তু গুলিটা।

ঊর্মিলা। বাবা, হেমন্তবাবুর সঙ্গে মন্দার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

জ্ঞানাঞ্জন। বাঃ—বেশ বেশ, আমি তো প্রায় ঠিক করেই এনেছিলুম—বেশ বেশ।

মন্দা। আর দিদির সঙ্গে অশনিবাবুর—

জ্ঞানাঞ্জন। অশনিবাবু? তিনি কে?

হেমন্ত। এই যে অশনি—আমার বন্ধু।

জ্ঞানাঞ্জন। (নিকটে গিয়া) তাই তো! এ যে একেবারে সিংহের খুলি! বাঃ চমৎকার! (ঘুরিয়া ফিরিয়া দর্শন) এ রকম আশ্চর্য খুলি আমি আর কখনও দেখি নি! অশনিবাবু, আপনার খুলি আমার চাই—

হেমন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, চাই বই কি! সে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। (ঊর্মিলার কানে কানে) দুই বন্ধুরই এককক্ষুরে—কি বলেন ঊর্মিলাদিদি?

মন্দা। (হেমন্তকে) জ্যাঠামশাই এখনও কিছু বুঝতে পারেন নি, ওঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

জ্ঞানাঞ্জন। বুঝিয়ে দেবে? (সচেতন ভাবে চারিদিকে চাহিয়া) বুঝেছি—বুঝেছি, আর বোঝাতে হবে না! প্রেম! ভালবাসা! The primordial instinct! একদিকে পুরুষ, আর একদিকে নারী—আর তাদের হৃদয় নিয়ে প্রকৃতির এই চিরন্তন লীলা বিলাস! তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙা-গড়া—তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠা-পড়া—এই লীলা চলেছে!

ঊর্মিলা। বাবা, তুমি বস।

জ্ঞানাঞ্জন। না না—এখানে prognathic নেই, orthognathic নেই, আর্য অনার্য হূন—মোঙ্গল—দ্রাবিড় নেই—সব সমান। মিশরের পিরামিড্ যখন মানুষের কল্পনায় আসে নি, মহেঞ্জোদারোর নগর যখন—

জ্ঞানাঞ্জন বক্তৃতা দিতে লাগিলেন যবনিকা পড়িয়া গেল

ঔষধ লইয়া কানাইয়ের প্রবেশ *

কানাই। স্কুলের ছেলেমেয়েরা খবর পেয়ে আপনাকে দেখতে এসেছে সার্।

ঊর্মিলা। (ঔষধ ঢালিতে ঢালিতে) না কানাই, এখানে হট্টগোল হবে না—তাদের বরং বলে দাও—

অশনি। আহা, আসুক না। হট্টগোল আমার বেশ ভাল লাগছে।

ঊর্মিলা। আচ্ছা—আসুক। কিন্তু দু মিনিট।

কানাই কয়েকটি বালকবালিকাকে লইয়া আসিল, তাহারা অশনিকে ঘিরিয়া ধরিয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল

একটি মেয়ে। মাস্টারমশাই, আপনি না গেলে কে আমাদের শেখাবে?

ঊর্মিলা ও অশনির চোখাচোখি হইল

ঊর্মিলা। উনি যতদিন সেরে না ওঠেন, আমি তোমাদের ভার নেব। কেমন তাতে হবে তো?

সকলে আসিয়া ঊর্মিলাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল

একটি বালিকা। হ্যাঁ—হবে।

অশনি। তোমরা সেই গানটা গাও—

ঊর্মিলা। এখন গান নয়—

অশনি। আমার বড্ড তোমাকে শোনাতে ইচ্ছে করছে ঊর্মিলা।

ঊর্মিলা। তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

* অভিনয়কালে এই অংশ পরিত্যক্ত হয়।

অশনি। একটুও না।
ঊর্মিলা। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না!
অশনি। একটুও না।
ঊর্মিলা। বেশ—তবে গাও।

ঊর্মিলা অশনির শিয়রে গিয়া দাঁড়াইল। জ্ঞানাঞ্জন, মন্দা ও হেমন্ত ঘরের এক কোণে মৃদুস্বরে আলাপ করিতে লাগিলেন
বালকবালিকাগণ গাহিল

দেহে বল, চিত্তে বল!
চল্ পথিক, এগিয়ে চল্।
নাই পিছন, নাই নীচু, বিঘ্ন নাই, পথ ঋজু
বক্ষে বল, মন উছল
চল্ পথিক, এগিয়ে চল্।
পিছল পথ অন্ধ রাত? বন্ধু তোর ধরবে হাত
ধরার গায়, তোদের পায়
এগিয়ে চলা চরণ যায়
ফুটবে লাল থল-কমল
চল্ পথিক, এগিয়ে চল্।

যবনিকা

রাজদ্রোহী

এক

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরের উপকূলে কাথিয়াবাড় প্রদেশ, যেখানে বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ—অহিংসার পূর্ণাবতার—জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সেখানে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। ছোট ছোট রাজারা সাবেক পদ্ধতিতে রাজ্য ভোগ করিতেন। তাঁহারা আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকিতেন; পাত্রমিত্র সচিবেরা নিজেদের লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিতেন; মহাজনেরা অর্থ শোষণ করিতেন।

গিরি-প্রান্তর বিচিত্র দেশ। পিছনে শুষ্ক নগ্ন গিরিমালা, সম্মুখে মরুভূমির মত পাদপ-বিরল শিলা-বন্ধুর ভূমি, তাহার ভিতর দিয়া অসমতল কুটিল পথের রেখা। এই দেশ আমাদের কাহিনীর রঙ্গভূমি। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও এই দেশে এক জাতীয় বীর দস্যুর আবির্ভাব হইত যাহাদের রবিন হুডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দেশের লোক তাহাদের বলিত—বারবটিয়া!

যুগে যুগে দেশে দেশে প্রবলের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দুর্বলের মনুষ্যত্ব বিদ্রোহ করিয়াছে; এই বীর দস্যুরা সেই বিদ্রোহের জীবন্ত বিগ্রহ। যখনই ধর্মের গ্লানি হইয়াছে, অন্যায়ের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে তখনই ইঁহারা আর্তের পরিত্রাণের জন্য আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে ইঁহাদের সমাজদ্রোহী বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু যুগে যুগে ইঁহারাই সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন, ন্যায়ের শাসন প্রবর্তন করিয়াছেন। কখনও দস্যুর বেশে, কখনও দিগ্বিজয়ীর বেশে, কখনও কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর বেশে।

নিকটতম নগর হইতে প্রায় ক্রোশ তিনেক দূরে যেখানে সমতল ভূমি শেষ হইয়া পাহাড়ের চড়াই শুরু হইয়াছে, সেইখানে নির্জন গিরিপথের পাশে ক্ষুদ্র একটি প্রপা বা জলসত্র। জলসংকটপূর্ণ মরুদেশের ইহা একটি বিশেষ অঙ্গ, সর্বত্র পথের ধারে দুই তিন ক্রোশ অন্তর একটি করিয়া প্রপার ব্যবস্থা আছে; ইহা রাজকীয় ব্যবস্থা, আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। দেশের লোক ইহাকে বলে—পরপ্। সংস্কৃত প্রপা শব্দটি এই অপ-ভ্রংশের মধ্যে এখনও বাঁচিয়া আছে। প্রতি প্রপার একটি করিয়া প্রপাপালিকা রমণী থাকে; পিপাসার্ত পথিক ক্ষণেক দাঁড়াইয়া জলপান করিয়া আবার গন্তব্য পথে চলিয়া যায়।

জলসত্র গৃহটি অতি ক্ষুদ্র; অসংস্কৃত-পাথরের টুকরা দিয়া নির্মিত একটি ছোট ঘর, সম্মুখে একটুখানি বারান্দা। বারান্দায় সারি সারি জলের কুম্ভ সাজানো আছে। চারিদিকে জংলী ঝোপঝাড়, পাথরের চাঙড়া; অন্য কোনও লোকালয় নাই। পিছনে পোয়াটাক পথ দূরে পার্বত্য-ঝরনার জল জমিয়া একটি জলাশয় তৈয়ার হইয়াছে, সেই সরোবর হইতে জল আনিয়া প্রপাপালিকা জলসত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

এই সত্রের প্রপাপালিকাটি বয়সে যুবতী; তাহার নাম চিন্তা। সে দেখিতে অতিশয় সুশ্রী, কিন্তু তাহার সুকুমার মুখখানি সর্বদাই যেন ম্লান ছায়ায় আচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। একদিন অপরাহ্ণে সে বারান্দার কিনারায় বসিয়া টাকুতে সুতা কাটিতেছিল আর উদাসকণ্ঠে গান গাহিতেছিল। এ পথে অধিক পান্থের যাতায়াত নাই, তাই চিন্তা অধিকাংশ সময় তকলি কাটিয়া ও গান গাহিয়া কাটায়। সঙ্গিহীন প্রপায় আর কিছু করিবার নাই। যে তরুণ শিকারীটি মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দেখা দিয়া তাহার প্রাণে বসন্তের হাওয়া বহাইয়া দিয়া যায় সে আজ আসিবে কিনা চিন্তা জানে না, তবু তাহার চোখ দুটি থাকিয়া থাকিয়া পথের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত অন্বেষণ করিয়া আসিতেছে, কান দুটিও একটি পরিচিত অশ্ব-ক্ষুরধ্বনির জন্য সতর্ক হইয়া আছে।—

দরশ বিনে মোর নয়ন দুখায়
দূর পথের পানে চেয়ে থাকি
কভু ঝরে আঁখি, কভু শুকায়;
বুকের আঁধারে প্রদীপ-শিখা
কাঁপে আশার বায়ে
রহি শ্রবণ পাতি—
ঐ নূপুর বাজে রুঝুঝু রাঙা পায়ে—
মরি হায় রে!
কোন বৈরাগী খঞ্জনি বাজায়ে যায় রে
মোর আশার দামিনী মেঘে লুকায়।

গানে বাধা পড়িল। পথের যে-প্রান্তটা পাহাড়ের দিকে উঠিয়াছে সেই দিকে হুম্‌হুম্‌ শব্দ শুনিয়া চিন্তা চাহিয়া দেখিল, একটি ডুলি নামিয়া আসিতেছে। সামনে পিছনে তিনজন করিয়া বাহক, দুই পাশে দুইজন বল্লমধারী রক্ষী। ডুলি জলসত্রের সম্মুখে পৌঁছিতেই ডুলির ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ রমণী-সুলভ কণ্ঠের আওয়াজ বাহির হইল—'ওরে, থামা থামা—এটা 'পরপ' না?'

বাহকেরা তৎক্ষণাৎ ডুলি নামাইল। ডুলির মুখ রৌদ্র ও ধূলি নিবারণের জন্য পর্দা দিয়া ঢাকা ছিল। এখন পর্দা সরাইয়া যিনি মুখ বাহির করিলেন, তিনি কিন্তু রমণী নয়, পুরুষ। প্রৌঢ় শেঠ গোকুলদাসের কণ্ঠস্বর রমণীর মত এবং চেহারা মর্কটের মত, কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক তাঁহাকে ভয় করিত। দেশে সুদখোর মহাজনের অভাব ছিল না কিন্তু এই গোকুলদাসের মত এমন বিবেকহীন হৃদয়হীন 'সাহুকার' আর দ্বিতীয় ছিল কিনা সন্দেহ।

ঘটনাচক্রে চিন্তা গোকুলদাসকে চিনিত, তাই তাঁহাকে দেখিয়া তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। গোকুলদাস তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

'ওরে ঐ! পটের বিবির মত বসে আছিস—চোখে দেখতে পাস না? জল নিয়ে আয়।'

চিন্তা কোনও ত্বরা দেখাইল না, ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া একটি লম্বা আকৃতির ঘটিতে জল ভরিয়া ডুলির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

গোকুলদাস গলা বাড়াইয়া নিজের দক্ষিণ করতল মুখের কাছে অঞ্জলি করিয়া ধরিলেন, চিন্তা তাহাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। জল পান করিতে করিতে গোকুলদাস চক্ষু বাঁকাইয়া কয়েকবার চিন্তাকে দেখিলেন, তারপর জলপান শেষ হইলে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—

'আরে এ মেয়েটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে! বীর গ্রামের সেই রাজপুতটার মেয়ে না?'

ডুলির এ-পাশে যে বল্লমধারী রক্ষীটা দাঁড়াইয়া ছিল তাহার নাম কান্তিলাল; সে এতক্ষণ নির্লজ্জ লোলুপ চক্ষু দিয়া চিন্তার রূপ-যৌবন নিরীক্ষণ করিতেছিল, এখন প্রভুর প্রশ্নে গোঁফে একটা মোচড় দিয়া বলিল,—

'হ্যাঁ শেঠ, চৈৎ সিংয়ের মেয়েই বটে। দেখছো না মুখখানা হাঁড়িপানা করে রয়েছে—একটু হাসছেও না।'

গুজরাত কাথিয়াবাড়ে আপনি বলিবার রীতি নাই—সকলে সকলকে নির্বিচারে তুমি বা তুই বলে।

ভৃত্যের এই রসিকতায় গোকুলদাস কৃষ্ণ-দন্ত বাহির করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসিলেন—

'হি হি হি—তুই চৈৎ সিংয়ের মেয়ে! শেষে পরপে কাজ করছিস?'

চিন্তার চোখে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতে লাগিল। সে চাপা স্বরে বলিল,—'হ্যাঁ। দেনার দায়ে তুমি আমার বাবার যথাসর্বস্ব নিলেম করে নিয়েছিলে, সেই অপমানে বাবা মারা গেলেন। তাই আজ আমি জলসত্রের দাসী!'

গোকুলদাস বলিলেন,—'তোর বাপ টাকা ধার নিয়েছিল কেন? আর এতই যদি মানী লোক, তোকে বিক্রি করে আমার টাকা ফেলে দিলেই পারত। তাহলে তো আর তোকে দাসীবৃত্তি করতে হত না।'

কান্তিলাল রসান দিয়া বলিল,—'দাসীবৃত্তি! রানীর হালে থাকত শেঠজী। খরিদ্দার ওকে মাথায় করে রাখত।'

চিন্তা তাহার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু পরপওয়ালীর অগ্নিদৃষ্টি কে গ্রাহ্য করে? কান্তিলাল গোঁফে চাড়া দিতে দিতে কদর্য ভঙ্গীতে হাসিতে লাগিল। চিন্তা আর কোনও কথা না বলিয়া নিবিড় ঘৃণাভরে ফিরিয়া চলিল।

ডুলির বাহকেরা এতক্ষণ ঘর্মাক্ত-দেহে দাঁড়াইয়া গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন অনুনয়ের কণ্ঠে চিন্তাকে বলিল,—

'বেন, আমাদের এক গণ্ডূষ জল দাও না—বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

কান্তিলাল শুনিতে পাইয়া লাফাইয়া উঠিল—

'কি বল্‌লি—তেষ্টা পেয়েছে? নবাবের নাতি সব! উৎরাই-পথে ডুলি নামিয়েছিস তাতেই তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। নে চল্‌—ডুলি কাঁধে নে—'

গোকুলদাস ইতিমধ্যে ডুলির পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছেন; ভিতর হইতে তীক্ষ্ণস্বর আসিল—

'ডুলি তোল্‌—চাকা ডোববার আগে গদিতে পেঁছানো চাই—গদিতে অনেক কাজ—'

চিন্তা দাঁড়াইয়া রহিল, ডুলি চলিয়া গেল। যতদূর দেখা গেল, ডুলির সহগামী কান্তিলাল ঘাড় ফিরাইয়া চিন্তার দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহারা একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেলে চিন্তা হাতের ঘটি রাখিয়া পূর্বস্থানে আসিল; কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া থাকিবার পর একটা উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া টাকু তুলিয়া লইল। অস্ফুটস্বরে বলিল,— 'জানোয়ার সব! ঠগ—জোচ্চোর—ডাকাত—'

পাহাড়ের ভিতর দিয়া পথের যে-অংশটা গিয়াছে সেই পথ দিয়া এক তরুণ অশ্বারোহী নামিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহীর নাম প্রতাপ সিং, তাহার পরিধানে যোধপুরী পায়জামা ও বড় বড় পকেট-যুক্ত ফৌজী কুর্তা, পিঠে একনলা গাদা বন্দুক ঝুলিতেছে। প্রতাপ শিকারে বাহির হইয়াছিল; পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জঙ্গল আছে। তাহাতে হরিণ ময়ূর খরগোশ পাওয়া যায়। কিন্তু আজ শিকারীর ভাগ্যে কিছুই জোটে নাই, প্রতাপ রিক্ত হস্তে ফিরিতেছিল।

ঘোড়াটি স্বচ্ছন্দ-মন্থরপদে চলিয়াছে। একস্থানে পথ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে, এইখানে পেঁছিয়া প্রতাপ বল্‌গা টানিয়া ঘোড়া দাঁড় করাইল, চোখের উপর করতল রাখিয়া নিম্নে উপত্যকার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। এখান হইতে প্রতাপের বাসস্থান ক্ষুদ্র শহরটি ধোঁয়াটে বাতাবরণের ভিতর দিয়া দেখা যায়। এখনও অনেক দূর—ঘোড়ার পিঠে এক ঘণ্টার পথ।

এই সময়ে প্রতাপের পকেটের মধ্যে চিঁ চিঁ শব্দ হইল। প্রতাপ প্রথম একটু চমকিত হইয়া তারপর মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। পকেটের উপর সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া বলিল,—

'আহা বেচারা! খিদে পেয়েছে বুঝি? আর একটু চুপ করে থাক্‌, আস্তানায় পেঁছুতে আর দেরি নেই। আমারও তেষ্টা পেয়েছে। মোতি, চল্‌ বেটা—'

বল্‌গার ইঙ্গিত পাইয়া মোতি নিম্নাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। এবার তাহার গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত।

চিন্তা পূর্ববৎ বসিয়া সুতো কাটিতেছে, দূর হইতে অশ্বক্ষুরধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। চকিতে মুখ তুলিয়া চিন্তা উৎকর্ণভাবে শুনিল, ক্ষুরধ্বনি কাছে আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে তাহার বিষণ্ণ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মোতির ক্ষুরধ্বনিতে হয়তো পরিচিত কোনও বিশিষ্টতা ছিল, চিন্তা চিনিতে পারিল কে আসিতেছে। সে দ্রুত বেশবাস সংবরণপূর্বক মুখখানি বেশ গম্ভীর করিয়া আবার তক্‌লি কাটিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রতাপ প্রপার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাস টানিল. ঘোড়ার পিঠ হইতে লাফাইয়া অবতরণপূর্বক চিন্তার দিকে চাহিল. দেখিল চিন্তা পরম মনোযোগের সহিত তক্‌লি কাটিয়া চলিয়াছে, পথিকসুজন যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সেদিকে লক্ষ্যই নাই। প্রতাপের মুখে একটু চাপা হাসি খেলিয়া গেল, সে মোতির বল্‌গা ছাড়িয়া দিয়া চিন্তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বন্দুকটা কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখিয়া গূঢ়-কৌতুকে তাহার সুতা-কাটা নিরীক্ষণ করিল, তারপর পরম সম্ভ্রমভরে হাত জোড় করিয়া বলিল,—

'প্রপাপালিকে, পরিশ্রান্ত এবং পিপাসার্ত পথিক একটু জল পেতে পারে কি?'

চোখোচোখি হইলেই আর হাসি চাপা যাইবে না, তাই চিন্তা চোখ না তুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সুতা কাটিতে কাটিতে বলিল,—

'পরিশ্রান্ত এবং পিপাসার্ত পথিক, পিপাসা নিবারণের আগে এইখানে বসে খানিক বিশ্রাম কর।'

এই বলিয়া সে একটু সরিয়া বসিল, যেন ইঙ্গিতে নিজের পাশে প্রতাপের বসিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দিল। প্রতাপ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিল, মহা আড়ম্বরে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল,—

'ভদ্রে, তোমার সুমধুর ব্যবহারে আমার ক্লান্তি আপনি দূর হয়েছে—তৃষ্ণাও আর নেই। তোমার অধর-সুধা পান করে—'

চিন্তা ভ্রূভঙ্গি করিয়া তাহার পানে তাকাইল।

'—অর্থাৎ তোমার অধরক্ষরিত বাক্যসুধা পান করে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে, জলের আর প্রয়োজন নেই।'

চিন্তা বলিল,—'প্রয়োজন আছে বৈ কি। মাথায় জল না ঢাললে তোমার মাথা ঠান্ডা হবে না।'

উভয়ের মিলিত উচ্চহাস্যে অভিনয়ের মুখোশ খসিয়া পড়িল। প্রতাপ হাত ধরিয়া চিন্তাকে কাছে টানিয়া লইল, তারপর গাঢ়স্বরে বলিল,—

'চিন্তা, এস বিয়ে করি—আর ভাল লাগছে না। শিকারের ছুতোয় এসে দু-দণ্ডের জন্যে চোখে দেখা—একি ভাল লাগে? বল—একটিবার মুখের কথা বল, কালই আমি তোমাকে ডুলিতে তুলে ঘরে নিয়ে যাব।'

চিন্তার চোখ দুটি চাপা বাষ্পোচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই প্রস্তাবটিই সে অনেকদিন হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, আবার মনের কোণে একটু আশঙ্কাও ছিল। সে ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—

'তুমি গণ্যমান্য লোক—পরপের মেয়েকে বিয়ে করবে?'

প্রতাপ বলিল,—'আমি রাজপুত, তুমি রাজপুতের মেয়ে—এর বেশী আর কি চাই? আমি মা'কে বলেছি, তিনি খুব খুশি হ'য়ে রাজি হয়েছেন।'

চিন্তা বলিল,—'লোকে কিন্তু ছি ছি করবে।'

'করুক—লোকের কথায় কি আসে যায়? তোমার মন আছে কিনা তাই বল।—চিন্তা, আমার ঘরে যেতে তোমার ইচ্ছে করে না?'

চিন্তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কত ইচ্ছা করে তাহা সে কি করিয়া বুঝাইবে? সে স্খলিত স্বরে বলিল,—

'করে—'

প্রতাপ আবেগভরে চিন্তার স্কন্ধে বাহু দিয়া জড়াইয়া তাহাকে কাছে আকর্ষণ করিল—

'ব্যস্—আর কিছুই চাই না—'

প্রতাপের পকেটের মধ্যে—সম্ভবত দুই জনের দেহের চাপ পাইয়া—অতি ক্ষীণ চিঁ চিঁ শব্দ উত্থিত হইল। প্রতাপের কণ্ঠোদ্‌গত আনন্দ-বিহ্বলতা আর শেষ হইতে পাইল না! সে থামিয়া গেল; তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল—

'আরে—ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই নাও তোমার জন্যে সওগাত এনেছি।'

সুপরিসর পকেট হইতে প্রতাপ সন্তর্পণে দুইটি কপোত-শিশু বাহির করিল। কৃষ্ণবর্ণ বন-কপোতের শাবক, এখনও ভাল করিয়া পালক গজায় নাই; চিন্তা সাগ্রহে তাহাদের হাতে তুলিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল,—

'কী সুন্দর পায়রার ছানা, আমি পুষব।—কোথায় পেলে এদের?'

'কোথায় আবার—গাছের মগডালে বাসার মধ্যে বসেছিল, তুলে নিয়ে এলাম।'

'অ্যাঁ—মায়ের বাছাদের বাসা থেকে কেড়ে নিয়ে এলে?'

'কি করি? দেখলাম একটা বাজপাখি ওদের বাসা ঘিরে উড়ছে, ওদের মা-বাপ প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে। শেষে বাজের পেটে যাবে, তাই পকেটে করে নিয়ে এসেছি।'

চিন্তা ছানা দুটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল। অত্যাচারী পৃথিবীর উপর তাহার অভিমান স্ফুরিত হইয়া উঠিল—

'কি হিংস্র নিষ্ঠুর সবাই! ডাকাত—ডাকাত সব।'

'সে কি, আমিও ডাকাত হলাম?'

'হ্যাঁ, তুমিও ডাকাত।'

প্রতাপ ঈষৎ হাসিল! বলিল,—

'আমি যদি ডাকাত হতাম চিন্তা, তাহলে আগে তোমাকে হরণ করে নিয়ে যেতাম।'

উৎফুল্লনেত্রে চিন্তা প্রতাপের পানে চাহিল।

'নিয়ে গেলে না কেন? আমি তোমাকে আঁচড়ে দিতাম, কামড়ে দিতাম, তারপর যেতাম—'

চিন্তা প্রণয়ভঙ্গুর হাসিল। প্রতাপ আঙুল দিয়া তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া চোখের মধ্যে চাহিল।

'রাজপুতের মেয়ে, হরণ করে নিয়ে না গেলে বিয়ে করেও সুখ হয় না। বেশ, তাই হবে। কাল লোকলস্কর নিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে এসে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে যাব।—কেমন, তাহলে মন ভরবে তো?'

দু'জনে উদ্বেল আনন্দভরে পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রায় সায়ংকাল। অবসন্ন সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা পশ্চিম দিঙ্‌মণ্ডলকে অরুণায়িত করিয়াছে।

শহরের এক অংশ; বঙ্কিম সংকীর্ণ পথ দুর্গম নির্জন। এইখানে প্রতাপের প্রাচীন পৈতৃক বাসভবন। সম্মুখে একটি সিংদরজা আছে, ভিতরে খানিকটা মুক্ত স্থান। বাড়িটি আকারে বৃহৎ, কিন্তু বহুদিন সংস্কারের অভাবে কিছু জীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে।

বাড়ির সাবেক ভৃত্য লছমন উঠানের চিকু গাছতলায় শয়ন করিয়া বোধকরি ঘুমাইতেছিল; সে বৃদ্ধ হইয়াছে, ঘুমাইবার সময়-অসময় নাই। প্রতাপের বিধবা মাতা অস্থিরভাবে বার বার বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেছেন এবং আবার ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি ঈষৎ স্থূল কলেবরা; দেহের মাংস অকালে লোল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র অতিশয় দুর্বল, মনটিও উদ্বেগপ্রবণ, সহজেই উৎকণ্ঠিত হইয়া ওঠে। বিশেষত আজ তাঁহার

উৎকণ্ঠার গুরুতর কারণ ঘটিয়াছে।

তিনি বারান্দায় আসিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন,—

'লছমনভাই, ও লছমনভাই, এই ভর্-সন্ধ্যেবেলা তুমি ঘুমুলে?'

লছমন চেটাইয়ের উপর উঠিয়া বসিল।

'ঘুমোব কেন বাঈ, ঘুমোব কেন—একটু গড়াচ্ছিলাম।'

'সূয্যি পাটে বসতে চলল, এখনও প্রতাপ ফিরল না লছমনভাই।'

লছমন চিকু তলা হইতে উঠিয়া আসিল। বলিল,—

'ফিরবে বৈ কি বাঈ, ফিরবে বৈ কি। তোমার জোয়ান ছেলে শিকারে বেরিয়েছে, ফিরবে বৈ কি।—সেকালে কর্তারা শিকারে বেরুতো, তা রাত দুপুরের আগে কেউ ঘরে ফিরতো না। কথায় বলে শিক্রে বাজ আর প্যাঁচা দুইই শিকারী—কেউ দিনে কেউ রাত্তিরে।'

মা কানের কাছে হাত তুলিয়া উৎকর্ণভাবে কিছুক্ষণ শুনিলেন।

'ঐ বুঝি প্রতাপ এল, মোতির ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি—'

'আসবে বৈ কি বাঈ, আসবে বৈ কি।'

বাহিরে প্রতাপের গৃহের সিংদরজা। সিংদরজার থামে একটুকরা কাগজ লটকানো রহিয়াছে।

প্রতাপকে পিঠে লইয়া মোতি হাঁটা-পায়ে আসিয়া সিংদরজায় প্রবেশ করিল; এই সময় কাগজের টুকরার উপর প্রতাপের নজর পড়িলে সে ঘোড়া থামাইয়া হাত বাড়াইয়া কাগজের টুকরা তুলিয়া লইল; ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া কাগজের লেখা পড়িতে লাগিল।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া মা প্রতাপকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি দুহাতে বুক চাপিয়া উদ্বেগভরা মুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কাগজের লেখা পাঠ করিয়া প্রতাপ তাচ্ছিল্যভরে সেটা মুঠির মধ্যে গোলা পাকাইয়া লইল; তারপর অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া লাফাইয়া মোতির পিঠ হইতে নামিয়া লছমনের হাতে রাস ফেলিয়া দিল। লছমনকে বলিল,—

'লছমনভাই, মোতিকে দানা-পানি দাও।'

'দেব বৈ কি ভাই, দেব বৈ কি। আজ বুঝি শিকার কিছু পেলে না?'

'পেয়েছি—পরে বলব।'

হাসিয়া পিঠ হইতে বন্দুক নামাইতে নামাইতে প্রতাপ বারান্দায় গিয়া উঠিল। বারান্দার দেয়ালে পাশাপাশি দুটি খোঁটা পোঁতা ছিল, তাহার উপর বন্দুক রাখিয়া দিয়া প্রতাপ মা'র দিকে ফিরিল।

মা উদ্বিগ্ন স্বরে বলিলেন,—'প্রতাপ, চিঠি পড়লি?'

প্রতাপ তাচ্ছিল্যভাবে বলিল,—'চিঠি? ও শেঠ গোকুলদাসের রোকা! ও কিছু নয়।'

মা বলিলেন,—'না না বাবা, তুই গোকুলদাসের চিঠি তুচ্ছ করিস নে! গোকুলদাস বড় ভয়ানক সাহুকার—কত লোকের সর্বনাশ করেছে তার ঠিক নেই—'

প্রতাপ এক হাতে মায়ের স্কন্ধ জড়াইয়া লইল, বলিল,—

'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন মা? বাবা তো মাত্র পাঁচশো টাকা ধার করেছিলেন—যখন ইচ্ছে শোধ করে দেব।'

মা বলিলেন,—'ওরে না না, গোকুলদাস নিজে এসে চিঠি টাঙিয়ে গেছে, আর শাসিয়ে গেছে সুদে-আসলে তার দশ হাজার টাকা পাওনা হয়েছে; আজই নাকি মেয়াদের শেষ দিন; যদি শোধ না হয়, তোর জমি-জমা বাড়ি-ঘর সব বাজেয়াপ্ত করে নেবে।'

তিনি আবার নিজের স্পন্দমান বুক চাপিয়া ধরিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—

'সে কী! পাঁচশো টাকা দশ হাজার টাকা হবে কি করে?'

লছমন তখনও মোতিকে আস্তাবলে লইয়া যায় নাই, অঙ্গনে দাঁড়াইয়া মাতা-পুত্রের কথা শুনিতেছিল; সে উত্তর দিল—

'হয় বৈ কি ভাই, হয় বৈ কি। মহাজনের সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে কিনা।'

প্রতাপ হতবুদ্ধি ভাবে বলিল,—'মহাজনের সুদ—হ্যাঁ—কিন্তু এ যে অসম্ভব! দশ হাজার টাকা...আমি এখনই যাচ্ছি গোকুলদাসের কাছে—নিশ্চয় তোমাদের বুঝতে ভুল হয়েছে—'

প্রতাপ ত্বরিতে গিয়া আবার ঘোড়ার পিঠে উঠিল, ঘোড়ার মুখ বাহিরের দিকে ফিরাইয়া বলিল,—

'মা, তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সে বাহির হইয়া গেল।

প্রাচীর-বেষ্টিত চতুষ্কোণ-ভূমির উপর শেঠ গোকুলদাসের দ্বিতল প্রাসাদ। সম্মুখে লৌহকবাটযুক্ত সিংদরজা; দুইজন তকমাধারী সান্ত্রী সেখানে পাহারা দিতেছে।

বাড়ির দ্বিতলের একটি জানালা খোলা রহিয়াছে। জানালার কবাট লৌহময় কিন্তু গরাদ নাই; সুতরাং এই পথে আমরা গোকুলদাসের তোশাখানায় প্রবেশ করিতে পারি।

তোশাখানা ঘরটি ঈষদন্ধকার; একটি মাত্র দরজা ও একটি জানালা আছে। দরজার দুই পাশে দুটি গাদা পিস্তল দেয়ালে আটকানো রহিয়াছে। গোকুলদাস ধর্মে জৈন কিন্তু নিজের ঐশ্বর্য রক্ষার জন্য তিনি যে প্রাণীহত্যায় পরাঙ্মুখ নয়, পিস্তল দুটি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

ঘরের চারিটি দেয়াল জুড়িয়া সারি সারি লোহার সিন্দুক। ঘরের মাঝখানে মোটা গদির উপর হিসাবের বহি খাতা ও একটি কাঠের হাত-বাক্স।

গোকুলদাস ঘরেই আছেন। প্রকাণ্ড চাবির থোলো হইতে একটি চাবি বাছিয়া লইয়া তিনি সিন্দুকের ছিদ্রমুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, তারপর সতর্কভাবে দ্বারের দিকে একবার তাকাইয়া চাবি ঘুরাইলেন।

সিন্দুকের কবাট খুলিলে দেখা গেল, তাহার থাকে থাকে অসংখ্য সোনা ও জহরতের গহনা সাজানো রহিয়াছে, তাছাড়া মোটা মোটা মোহরের থলি ও মূল্যবান দলিলপত্র আছে। গোকুলদাস সন্তর্পণে একটি জড়োয়া-হার তুলিয়া লইয়া সতৃষ্ণভাবে সেটি দেখিতে লাগিলেন। কাবুলী মটরের মত কয়েকটা হীরা স্বল্পালোকেও ঝলমল্ করিতে লাগিল। গোকুলদাসের কণ্ঠ হইতে একটি লুব্ধ ঘুৎকার বাহির হইল।

এই সময় নিঃশব্দে দ্বার ঠেলিয়া একটি যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল। চম্পা গোকুলদাসের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। গোলগাল গড়ন, মিষ্ট ছেলেমানুষী ভরা মুখ, সে পা টিপিয়া টিপিয়া গোকুলদাসের পিছনে গিয়া সিন্দুকের মধ্যে উঁকি মারিল; যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মুখ দিয়া হর্ষোল্লাসসূচক শীৎকার বাহির হইল। স্বামীর সিন্দুকের অভ্যন্তরভাগ সে আগে কখনও দেখে নাই।

পলকমধ্যে গোকুলদাস সিন্দুকের কবাট বন্ধ করিয়া সিন্দুকে পিঠ দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যেন কোণ-নেওয়া বিড়াল। কিন্তু চম্পাকে দেখিয়া তাঁহার ভয় দূর হইল। তিনি বলিলেন,—

'ও চম্পা! আমি ভেবেছিলাম—'

চম্পা হাসিয়া বলিল,—'ডাকাত?'

হীরার হারটি গোকুলদাসের হাতেই রহিয়া গিয়াছিল, এখন তিনি আবার সিন্দুক খুলিয়া উহা ভিতরে রাখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

চম্পা লুব্ধ স্বরে বলিল,—'ওটা কি, দেখি দেখি! উঃ, কী সুন্দর হার!'

চম্পা হারটি লইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল, গোকুলদাস তাড়াতাড়ি উহা সরাইয়া লইলেন। বলিলেন,—

'আরে না না, এতে হাত দিও না।'

চম্পা বলিল,—'কেন দেব না? আমি তোমার বৈরী কি না? তৃতীয় পক্ষের বৈরী কি বৈরী নয়? তবে আমি তোমার জিনিসে হাত দেব না কেন?'

সংসার-প্রাজ্ঞ গুজরাতিরা স্ত্রীকে 'বৈরী' বলিয়া থাকেন।

গোকুলদাস হার সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া চাবির গোছা কোমরে ঝুলাইলেন। বলিলেন,—

'আহা, বুঝলে না চম্পা, ওটা এখনও আমার হয়নি—বন্ধকী মাল। তবে একবার যখন আমার সিন্দুকে ঢুকেছে তখন আর বেরুচ্ছে না!'

গোকুলদাস হুঁ হুঁ করিয়া হাসিলেন। চম্পা একটু বিমনাভাবে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

'এই সিন্দুকগুলোকে তুমি বড্ড ভালবাস—না?'

গোকুলদাস উত্তরে কেবল আনুনাসিক হাসিলেন।

'এর সিকির সিকি যদি বৌদের ভালবাসতে তাহলে তারা হয়তো সুখী হত।'

গোকুলদাস ক্ষুদ্র ইন্দুর-চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন।

'কেন, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে তুমি সুখী হও নি?'

চম্পা মুখে একটা ভঙ্গী করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'ওমা, হই নি আবার। তোমার মত মানুষ দেশে আর কটা আছে? দেশসুদ্ধ লোক তোমার ভয়ে কাঁপে, স্বয়ং রাজা তোমার খাতক! তোমাকে বিয়ে করে সুখী হই নি এমন কথা কে বলে!—নাও চল এখন, খাবার বেড়ে রেখে এসেছি—এতক্ষণে বোধহয় সূর্য ডুবল।'

জৈনগণ সূর্যাস্তের পূর্বেই নৈশ আহার সমাধা করেন।

এই সময় বাহিরের জানালার নীচে হইতে গণ্ডগোলের আওয়াজ আসিল। চম্পা দ্রুত জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, গোকুলদাস তাহার পশ্চাতে গিয়া সতর্কভাবে উঁকি মারিলেন।

নীচে সিংদরজার বাহিরে অশ্বারূঢ় প্রতাপের সহিত দ্বাররক্ষী সান্ত্রীদের বচসা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সান্ত্রীদ্বয় সিংদরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রতাপকে প্রবেশ করিতে দিতেছে না।

প্রতাপ বলিতেছে,—'শেঠের সঙ্গে এখনি আমার দেখা না করলেই নয়—'

সান্ত্রী বলিল,—'শেঠ এ সময় কারুর সঙ্গে দেখা করে না। যাও—কাল সকালে এস।'

'কিন্তু আজ আমাকে দেখা করতেই হবে—বড় জরুরী দরকার—'

চম্পা জানালায় গোকুলদাসের দিকে ফিরিল।

'হ্যাঁগা, কে ও নওজোয়ান? ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কেন?'

গোকুলদাস বলিলেন,—'চুপ—আস্তে। ও একটা রাজপুত—আমার খাতক। বোধ হয় টাকা শোধ দিতে এসেছে—'

'তাহলে?'

'চুপ—তুমি ওসব বুঝবে না।'

নীচে সান্ত্রীরা লোহার কবাট বন্ধ করিয়া দিতেছে।

প্রতাপ বলিল,—'আজ কিছুতেই দেখা হবে না?'

সান্ত্রী বলিল,—'না, আজ রাজা এলেও দেখা হবে না।'

ক্রুদ্ধ-হতাশ-চক্ষু ঊর্ধ্বে তুলিতেই জানালার উপর প্রতাপের দৃষ্টি পড়িল। গোকুলদাস ঝটিতি জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রতাপ কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ক্রোধতপ্ত একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইল।

দুই

পরদিন প্রভাত। পাখিরা কলরব করিতেছে, দূরে মন্দির হইতে প্রভাত-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টারব আসিতেছে।

প্রতাপ তাহার শয়নকক্ষে শয্যায় ঘুমাইতেছে। তাহার পালঙ্কের শিয়রে দুইটি পট দেয়ালে টাঙানো রহিয়াছে; একটি রানা প্রতাপ সিংহের, অপরটি ছত্রপতি শিবাজীর।

অঙ্গনের দিকের জানালা দিয়া সূর্যের নবারুণ আলোক ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, সহসা কয়েকজনের কলহ-রুক্ষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রতাপ ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল, তারপর ঈষৎ বিস্ময়ে শয্যাপাশে উঠিয়া বসিল। ঘুমের জড়তা তখনও ভাল করিয়া ভাঙে নাই—

অকস্মাৎ বারান্দা হইতে তাহার মাতার মর্মান্তিক কাতরোক্তি কানে আসিল।

'হা রণছোড়জী, এ কি করলে—এ কি করলে—'

প্রতাপ এক লাফে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। জানালা দিয়া প্রাঙ্গণের সমস্তটাই দেখা যাইতেছে। শেঠ গোকুলদাস এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহার সঙ্গে জন দশ-বারো লাঠিয়াল অনুচর। একজন অনুচর মোতির লাগাম ধরিয়া বাহিরের দিকে লইয়া যাইতেছে এবং বৃদ্ধ লছমন তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

গোকুলদাস বলিতেছেন,—'যাও—নিয়ে যাও আমার আস্তাবলে—'

লছমন বলিল,—'না না—ছেড়ে দাও মোতিকে—আমার মালিকের ঘোড়া আমি নিয়ে যেতে দেব না—'

যে লোকটা মোতিকে লইয়া যাইতেছিল সে লছমনকে সজোরে একটা ঠেলা দিল, লছমন ছিটকাইয়া গিয়া চিকু গাছের তলায় পড়িল।

জানালায় প্রতাপের মা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—

'ওরে প্রতাপ—কি হবে বাবা—'

ক্রোধে বিস্ময়ে প্রতাপের কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল, সে এক হাতে মা'কে সরাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

বাহিরের বারান্দায় যেখানে বন্দুকটা দেয়ালে টাঙানো ছিল, ঠিক সেই স্থানে গোকুলদাসের অনুচর কান্তিলাল দাঁড়াইয়া ছিল, প্রতাপ তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া গেল। গোকুলদাসের সম্মুখীন হইয়া কঠোর স্বরে কহিল,—

'কি হয়েছে? কী চাও তুমি আমার বাড়িতে?'

গোকুলদাস ব্যঙ্গভরে বলিলেন,—'ওহে, ঘুম ভেঙেছে এতক্ষণে! যারা মহাজনের টাকা ধারে তাদের এত ঘুম ভাল নয়। এখন গা তোলো—আমার বাড়ি ছেড়ে দাও।'

'তোমার বাড়ি!'

'হ্যাঁ, আমার বাড়ি। তোমার বাপ টাকা ধার করেছিল, কাল তার মেয়াদ ফুরিয়েছে। আজ আমি সমস্ত সম্পত্তি দখল করেছি; এ বাড়ি এখন আমার।'

'আদালতের হুকুম এনেছ?'

গোকুলদাস মিহি সুরে হাস্য করিলেন—

'আদালতের হুকুম আমার দরকার নেই। আমার হক, আমি দখল করেছি। তোমার যদি কোনও নালিশ থাকে তুমি আদালতে যাও।'

প্রতাপ এতক্ষণ অতি কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া কথা বলিতেছিল, এখন আর পারিল না। তাহার পায়ের কাছে একটা চেলাকাঠ পড়িয়াছিল, সে তাহাই তুলিয়া লইল। আরক্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল,—

'বটে! আমার সম্পত্তি তুমি গায়ের জোরে দখল করবে! পাজি বেনিয়ার বাচ্চা, বেরোও

আমার বাড়ি থেকে, নইলে—'

প্রতাপ হিংস্রভাবে চেলাকাঠ গোকুলদাসের মাথার উপর তুলিল, গোকুলদাস সভয়ে মস্তক রক্ষা করিবার জন্য হাত তুলিলেন।

এই সময় বারান্দা হইতে কান্তিলালের কণ্ঠস্বর আসিল,—

'খবরদার!'

সকলে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কান্তিলাল প্রতাপের বন্দুক লইয়া তাহার দিকেই লক্ষ্য করিয়া আছে। গোকুলদাস এবার নির্ভয় হইয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন।

কান্তিলাল বলিল,—'লাঠি ফেলে দাও—'

প্রতাপ নিষ্ফল ক্রোধে ফুলিতে লাগিল কিন্তু হাতের লাঠি ফেলিল না।

কান্তিলাল আবার বলিল,—'লাঠি ফেল দাও—নইলে—'

বন্দুকের ঘোড়া টানার কট্ করিয়া শব্দ হইল। এই সময় আলুথালু বেশে প্রতাপের মা ভিতর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার চেহারা দেখিলেই বোঝা যায় তাঁহার মানসিক বিপন্নতা চরমসীমায় পোঁছিয়াছে।

'প্রতাপ—ওরে প্রতাপ, লাঠি ফেলে দে বাবা! আয়, আমার কাছে আয়—'

প্রতাপ দেখিল, মা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া টলিতেছেন, এখনি পড়িয়া যাইবেন। সে হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া মা'কে ধরিয়া ফেলিল।

'মা—! কি হয়েছে মা?'

মা কম্পিত নিশ্বাস টানিয়া বলিলেন,—'কিছু না বাবা, বুকটা বড় ধড়ফড় করছে! চল্ বাবা, আমরা চলে যাই—'

গোকুলদাস বলিলেন,—'হ্যাঁ, ভাল চাও তো ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে যাও—আমার কাছে চালাকি চলবে না।'

মা বলিলেন,—'চল্ বাবা—এখান থেকে আমায় নিয়ে চল্—'

মাতা-পুত্র হাত ধরাধরি করিয়া এক পা অগ্রসর হইলেন, তারপর মায়ের বক্ষ ভেদ করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল—

'উঃ—আমার স্বামীর ভিটে—শ্বশুরের ভিটে—'

চাপা কান্নার দুর্নিবার উচ্ছ্বাস তাঁহার কণ্ঠে আসিয়া আটকাইয়া গেল, শিথিল অঙ্গে ধীরে ধীরে তিনি মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। প্রতাপ সভয়ে ডাকিল—

'মা—'

মা সাড়া দিলেন না। প্রতাপ নতজানু হইয়া তাঁহার বুকে কান রাখিয়া শুনিল, বুকের শেষ দুর্বল স্পন্দন ধীরে ধীরে থামিয়া যাইতেছে।

মুখ তুলিয়া প্রতাপ পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—

'মা—! মা—! মা—!'

রাত্রি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

শ্মশানে চিতার উপর প্রতাপের মাতার দেহাবশেষ পুড়িতেছে। অদূরে প্রতাপ একটি শিলাখণ্ডের উপর করলগ্নকপোলে বসিয়া একদৃষ্টে চিতার পানে চাহিয়া আছে। তাহার কয়েকজন শ্মশানসঙ্গী প্রতিবেশী আশে-পাশে বসিয়া আছে—সকলেই নীরব। তাহাদের মুখের উপর চিতার অস্থির আলো খেলা করিতেছে।

প্রতাপের মুখ পাথরের মত নিশ্চল, আলো ছায়ার চঞ্চল খেলা তাহার মুখে কোনও ভাবান্তর আনিতে পারিতেছে না।

নিকটবর্তী গাছের ডালে একটা শকুন কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। সকলে মুখ তুলিয়া সেইদিকে চাহিল, কিন্তু প্রতাপ মুখ তুলিল না, যেমন অপলক চক্ষে চিতার পানে চাহিয়া

ছিল তেমনি চাহিয়া রহিল।

শ্মশান হইতে বহু দূরে জলসত্রের ক্ষুদ্র কক্ষে বাতায়ন দিয়া ঐ চাঁদের আলো মেঝের উপর পড়িয়াছে। ভিতর হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ, ঘরের কোণে স্তিমিত দীপশিখা জ্বলিতেছে। মেঝের উপর উপুড়-করা একটি বেতের টুক্‌রির ভিতর হইতে মাঝে মাঝে সুপ্তোত্থিত পক্ষিশাবকের তন্দ্রাক্ষীণ কিচিমিচি শব্দ আসিতেছে।

কাঠের একটি সুপরিসর হিচ্‌কা বা দোলনার উপর চিন্তা বসিয়া আছে। এই দোলনাই তাহার শয্যা। আজ চিন্তার চোখে নিদ্রা নাই; প্রতাপ আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর আসে নাই। কেন আসিল না? তবে কি তাহার অনুরাগ শুধু মুখের কথা? দু'দণ্ডের চিত্ত-বিনোদন? ভাবিয়া ভাবিয়া চিন্তা কূলকিনারা পায় নাই; মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় গড়াইয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যা মধ্যরাত্রের নিথর নিষ্ফলতায় ভরিয়া গিয়াছে। কেন সে আসিল না? আজ প্রতাপ আসিবে বলিয়া চিন্তা বন্যকুসুম তুলিয়া দুটি মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিল—সে-মালা চিন্তা কাহার গলায় দিবে?

ব্যথাবিষণ্ন সুরে সে নিজমনেই গাহিতেছিল—

> আমার মনে যে-ফুল ফুটেছিল
> আকাশের সূর্য তারে শুকিয়ে দিল রে।
> ধূলাতে পড়ল ঝরে সে
> বাতাসের নিদয় পরশে
> বুকে মোর কাঁটার বেদনা
> বুক দুখিয়ে দিল রে।
> আমার মনে চাঁদ—
> আমার মনে চাঁদ যে উঠেছিল
> ও তারে প্রলয় মেঘে লুকিয়ে দিল রে।
> মরমের মৌন অতলে
> নিরাশার ঢেউ যে উথলে—
> জীবনের পাওনা-দেনা মোর
> কে চুকিয়ে দিল রে।

গুনগুন করিয়া গাহিতে গাহিতে চিন্তা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইল, টুক্‌রি তুলিয়া কপোতশিশু দুটিকে দেখিল, জানালায় দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না নিষিক্ত বহিঃপ্রকৃতির পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহার সংশয়পীড়িত মন শান্ত হইল না।

ওদিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে; প্রতাপ ও তাহার সঙ্গীগণ জল ঢালিয়া চিতা নিভাইতেছে।

চিতা ধৌত করিয়া সকলে চিতার উপর এক মুষ্টি করিয়া ফুল ফেলিয়া দিল, তারপর সরিয়া আসিয়া একত্র দাঁড়াইল। সঙ্গীদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া প্রতাপ বলিল,—

'অম্বুভাই, তোমরা আমার দুর্দিনের বন্ধু। আমি আর তোমাদের কী বলব, মা স্বর্গ থেকে তোমাদের আশীর্বাদ করবেন। শ্মশানের কাজ তো শেষ হয়েছে, এবার তোমরা ঘরে ফিরে যাও।'

অম্বুভাই প্রশ্ন করিল,—'আর—তুমি?'

প্রতাপ বলিল,—'আমি আর কোথায় যাব অম্বুভাই, আমার তো যাবার স্থান নেই।'

অম্বুভাই বলিল,—'ও কথা বোলো না প্রতাপ। আমার কুঁড়েঘর যতদিন আছে ততদিন তোমারও মাথা গুঁজবার স্থান আছে। চল, আজ রাত্রিটা বিশ্রাম কর, তারপর কাল যা হয় স্থির করা যাবে।'

প্রতাপ বলিল,—'আমার কর্তব্য আমি স্থির করে নিয়েছি। তোমরা ঘরে ফিরে যাও অম্বুভাই। আমি অন্য পথে যাব!'

অম্বুভাই বলিল,—'অন্য পথে? কোথায়? কোন্ পথ?'

প্রতাপ বলিল,—আমি যে-পথে যাব সে পথে আজ তোমরা যেতে পারবে না, তাই তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। হয়তো আবার কোনোদিন দেখা হবে।—বিদায় বন্ধু, বিদায় ভাই সব। নমস্কার, তোমাদের নমস্কার।'

প্রতাপ যুক্তকরে সকলকে বিদায়-নমস্কার করিল। সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

শেঠ গোকুলদাসের প্রাসাদ মধ্যরাত্রির চন্দ্রালোকে ঘুমাইতেছে। কিংবা হয়তো ঘুমায় নাই। দ্বিতলে তোশাখানার জানালাটি খোলা আছে এবং সেখান হইতে মৃদু প্রদীপের আলোক নির্গত হইতেছে; মনে হয় প্রাসাদ ঘুমাইলেও তাহার একটি চক্ষু জাগিয়া আছে।

সিংদরজার সম্মুখে সশস্ত্র সান্ত্রিগণ কিন্তু দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ঘুমাইতেছে। না ঘুমাইবার কোনও কারণ নাই, শেঠ গোকুলদাসের দেউড়িতে চোর ঢুকিবে এত বড় সাহসী চোর দেশে নাই।

সিংদরজার দুইপাশে দীর্ঘ প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকের দেয়াল যেখানে মোড় ঘুরিয়া পিছন দিকে গিয়াছে, সেই কোণের কাছে সহসা একটি মাথা উঁকি মারিল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল—প্রতাপ। সে শ্মশানে সঙ্গীদের বিদায় দিয়া সটান এখানে আসিয়াছে। গোকুলদাসের সহিত তাহার হিসাব-নিকাশ এখনও শেষ হয় নাই।

প্রতাপ দেয়ালের কোণ হইতে গলা বাড়াইয়া দেখিল প্রহরীরা ঘুমাইতেছে। তখন সে দেয়ালের গা ঘেঁষিয়া পিছন দিকে ফিরিয়া চলিল। বাড়ির পশ্চাদ্দিকে যেখানে পাঁচিল শেষ হইয়াছে সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রতাপ দেখিল পাঁচিলের গায়ে একটি দরজা রহিয়াছে। ইহা চাকর-বাকরদের ব্যবহার্য খিড়কি দরজা।

খিড়কি দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। কিন্তু পাঁচিল বেশী উঁচু নয়। প্রতাপ লাফাইয়া পাঁচিলের কিনারা ধরিয়া ফেলিল, তারপর বাহুর বলে শরীরকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া পাঁচিলের উপর উঠিয়া বসিল। ভিতরে কেহ কোথাও নাই, শষ্পাকীর্ণ ভূমির উপর শিশিরকণা ঝিকমিক করিতেছে। বাড়িটি সবুজ জলে ভাসমান এক চাপ বরফের মত দেখাইতেছে। পিছনের দেয়াল ঘেঁষিয়া একসারি ঘর, ইহা গোকুলদাসের আস্তাবল ও গোহাল।

প্রতাপ নিঃশব্দে নিজেকে পাঁচিল হইতে ভিতর দিকে নামাইয়া দিল। খিড়কির দরজা কেবল অর্গলবদ্ধ ছিল, প্রথমেই সেটি খুলিয়া দিল; প্রয়োজন হইলে পলায়নের রাস্তা খোলা চাই।

তারপর সে সতর্কপদে পিছনের ঘরগুলির দিকে চলিল। মানুষ কেহ নাই; একটি ঘরে কয়েকটি গরু রহিয়াছে। এইরূপ কয়েকটি ঘর পার হইবার পর একটি ঘরের সম্মুখীন হইতেই ভিতরের অন্ধকার হইতে ঘোড়ার মৃদু হ্রেষাধ্বনি আসিল। প্রতাপ চিনিল—মোতি।

ঘরের সম্মুখে দ্বার নাই, কেবল দুটি বাঁশ পাশাপাশি অর্গল রচনা করিয়াছে। প্রতাপ বাঁশ দুটি সন্তর্পণে সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আস্তাবলের মধ্যে মোতি প্রভুকে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রতাপ তাহার গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিল, তারপর দেয়ালে-টাঙানো লাগাম লইয়া তাহার মুখে পরাইল। জিনের পরিবর্তে একটি কম্বল তাহার পিঠে বাঁধিল, লাগাম ধরিয়া বাহিরে লইয়া আসিল।

এই সব ব্যাপারে একটু শব্দ হইল বটে কিন্তু ভাগ্যক্রমে কেহ জাগিল না। প্রতাপ মোতিকে লইয়া খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইল; কিছুদূর একটা গাছের তলায় লইয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল,—

'মোতি, এইখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাক্। যতক্ষণ না ফিরে আসি শব্দ করিস নি।'

মোতি সম্মতিসূচক শব্দ করিল। তখন প্রতাপ তাহার গলা চাপড়াইয়া আবার ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। এইবার আসল কাজ।

প্রতাপ দুই হাত ধীরে ধীরে ঘষিতে ঘষিতে ঊর্ধ্বে প্রাসাদের দিকে চাহিল।

তোশাখানার গদির উপর বসিয়া গোকুলদাস মোহর গণিতে ছিলেন। তাঁহার হাতবাক্সের পিঠের উপর সারবন্দী সিপাহীর মত থাকে থাকে মোহরের স্তম্ভ গড়িয়া উঠিতেছিল। চম্পা গদির এক পাশে অর্ধ-শয়ান অবস্থায় চিবুকের নিচে করতল রাখিয়া নিদ্রালুনেত্রে দেখিতেছিল।

পিতলের দীপদণ্ডে তৈলপ্রদীপ মৃদু আলো বিকীর্ণ করিতেছিল। ঘরে আর কেহ নাই। ভারী মজবুত দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

ঘুম-জড়ানো চোখে চম্পা ছোট্ট একটি হাই তুলিল।

'আর কত মোহর গুণবে? এবার শোবে চল না।'

গোকুলদাস থলি হইতে আরও এক মুঠি মোহর বাহির করিয়া গণিতে গণিতে বলিলেন,—

'হুঁ হুঁ—এই যে—হ'ল—'

এই সময় খোলা জানালার বাহিরে প্রতাপের মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা গেল; গোকুলদাস মোহর গণনায় মগ্ন; চম্পার পিঠ জানালার দিকে; সুতরাং কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

প্রতাপ নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল, তাহার সতর্ক চক্ষু একবার ঘরের চারিদিক ঘুরিয়া আসিল। বন্ধ দরজার দুই পাশে দুটি পিস্তলের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে দেয়াল ঘেঁষিয়া ছায়ার মত সেই দিকে অগ্রসর হইল।

ইতিমধ্যে গোকুলদাস ও চম্পার মধ্যে অলস বাঙ্-বিনিময় চলিয়াছে।

চম্পা বলিতেছে,—'আচ্ছা, বার বার মোহর গুণে কি লাভ হয়? মোহর কি গুণলে বাড়ে?'

গোকুলদাস একটি সন্দেহজনক মোহর আলোর কাছে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে নাকিসুরে হাস্য করিলেন।

'হুঁ হুঁ হুঁ—তুমি কি বুঝবে! মেয়েমানুষ আর টাকা—দুইই সমান, কড়া নজর না রাখলে হাতছাড়া হয়ে যায়—হুঁ হুঁ হুঁ—'

কথাটা চম্পার গায়ে লাগিল। সে উঠিয়া বসিয়া স্থিরনেত্রে স্বামীর মুখের পানে চাহিল।

'টাকার কথা তুমি বলতে পার, কিন্তু মেয়েমানুষের কি জানো তুমি? তিনবার বিয়ে করলেই হয় না।'

গোকুলদাস হাসিলেন—হুঁ হুঁ হুঁ—

চম্পার চক্ষু প্রখর হইয়া উঠিল।

'কড়া নজর না রাখলে মেয়েমানুষ হাতছাড়া হয়ে যায়! আমার ওপর কত নজর রাখো তুমি? তার মানে কি আমি মন্দ?'

গোকুলদাস বলিলেন,—'শাস্ত্রে বলে পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র—হুঁ হুঁ হুঁ—'

চম্পা অধর দংশন করিল।

'দ্যাখো, স্বামীর নিন্দে করতে নেই, স্বামী মাথার মণি। কিন্তু তুমি—তুমি মহাপাপী! একদিন বুঝবে আমি সতীলক্ষ্মী কি না—যেদিন তোমার চিতায় আমি সহমরণে যাব। সেদিন যখন আসবে—'

বন্ধদ্বারের নিকট হইতে গম্ভীর আওয়াজ আসিল—

'সেদিন এসেছে।'

চম্পা ও গোকুলদাস একসঙ্গে দ্বারের দিকে ফিরিলেন; দেখিলেন প্রতাপ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার দুই হাতে দুটি পিস্তল।

কিছুক্ষণ জড়বৎ থাকিয়া গোকুলদাস জাঁতিকলে পড়া ইঁদুরের মত একটি শব্দ করিয়া দুই হাতে হাতবাক্সটি আগ্‌লাইয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন। চম্পা একেবারে পাথরের মূর্তিতে পরিণত হইয়াছিল, সে তেমনি বসিয়া রহিল।

প্রতাপ আসিয়া তাহাদের নিকট দাঁড়াইল; তাহার চোখে কঠিন কাচের মত দৃষ্টি—

'গোকুলদাস, আমাকে চিনতে পার?'

গোকুলদাস ভয়ে ভয়ে একটু মাথা তুলিলেন। বলিলেন,—

'অ্যাঁ—হ্যাঁ—প্রতাপভাই—'

প্রতাপ বলিল,—'মহাজন, আজ তোমার দিন ফুরিয়েছে তা বুঝতে পারছ?'

গোকুলদাসের কণ্ঠস্বর ভয়ে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—

'না না না, প্রতাপভাই, তুমি বড় ভাল ছেলে—বড় সাধু ছেলে—তোমাকে আমি সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দেব—'

প্রতাপ ডান হাতের পিস্তলটা তাহার রগের কাছে লইয়া গিয়া বলিল,—

'চুপ—আস্তে। চেঁচিয়েছ কি গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।'

গোকুলদাস ঢোক গিলিয়া নীরব হইলেন। এমন সময় চম্পা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই প্রতাপের বাঁ হাতের পিস্তল তাহার দিকে ফিরিল।

প্রতাপ বলিল,—'বেন্, তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু গোলমাল করলে তুমিও মরবে।'

চম্পার সুন্দর মুখখানি বিচিত্র উত্তেজনায় আরও সুন্দর দেখাইতেছিল, সে চাপা গলায় বলিল,—

'না, আমি গোলমাল করব না। কিন্তু, ওকে তুমি ছেড়ে দাও—প্রাণে মেরো না।'

প্রতাপ বলিল,—'প্রাণে মারব না! ও আমার কি করেছে তা জানো?'

চম্পা বলিল,—'জানি। ও তোমার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, ওর জন্যেই তোমার মা'র মৃত্যু হয়েছে। ও মহাপাপী। কিন্তু তবু ভাই, তুমি ওকে ছেড়ে দাও। আমি ওর জন্যে বলছি না, তুমি আমাকে বহিন বলেছ, আমার মুখ চেয়ে ওর প্রাণ ভিক্ষা দাও—'

চম্পা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইখানেই নতজানু হইয়া বলিল,—

'ভাই, আমার দিকে চেয়ে দ্যাখো—আমার কুড়ি বছর বয়স, আমাকে বিধবা কোরো না—'

গোকুলদাস চিঁ চিঁ শব্দে যোগ করিয়া দিলেন—

'শুধু ও নয়, আরও দুজন আছে—'

প্রতাপ বলিল,—'চোপরও!'

গোকুলদাস আবার কাঠের পুতুলের মত নিঃসাড় হইয়া রহিলেন। চম্পা বলিল,—'ভাই—প্রতাপভাই—!'

প্রতাপ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিল। গোকুলদাসকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া তাহার পক্ষে বড় মর্মান্তিক ব্যর্থতা; এখনও তাহার বুকে মায়ের চিতার আগুন জ্বলিতেছে। কিন্তু এদিকে এই নিরপরাধী যুবতী বিধবা হয়। প্রতাপ তিক্তদৃষ্টিতে গোকুলদাসের পানে চাহিল।

চম্পা আবার বলিল,—'ভাই—! প্রতাপভাই—!'

প্রতাপ বলিল,—'ছেড়ে দিতে পারি—যদি—'

উদ্ভাসিত মুখে চম্পা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—

'তুমি আর যা বল্‌বে তাই করব।—কী করব বল?'

প্রতাপ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিল। গোকুলদাসের পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও বড় শাস্তি আছে। সে বলিল,—

'প্রথমে চাবি নিয়ে সব সিন্দুক খুলে দাও।'

গোকুলদাস আঁকুপাঁকু করিয়া উঠিলেন।

'অ্যাঁ—তবে কি?'

প্রতাপ দুইটি পিস্তল গোকুলদাসের দুই চোখের অত্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া বলিল,—

'চুপ করে থাক্ বেইমান হারামী; কথা কয়েছিস কি মরেছিস।' চম্পাকে বলিল,—'যা বললাম কর।'

চম্পা ত্বরিতে গোকুলদাসের কোমর হইতে চাবির গোছা লইয়া একে একে সব সিন্দুক-গুলি খুলিয়া দিল। প্রত্যেকটির জঠরে বহু দলিল, মোহরের থলি ও বন্ধকী গহনা দেখা গেল।

চম্পা বলিল,—'এই যে প্রতাপভাই, এবার কি করব বল?'

প্রতাপ বলিল,—'এবার বেশ ভারী দেখে দুটো মোহরের থলি নাও।—নিয়েছ?'

'হ্যাঁ ভাই, এই যে নিয়েছি—'

গলায় দড়ি বাঁধা দুটি পরিপুষ্ট থলির মুঠ ধরিয়া চম্পা দেখাইল।

প্রতাপ বলিল,—'আচ্ছা, এবার থলি দুটোকে জানালার বাইরে ফেলে দাও।'

চম্পা ভারী থলি দুটি বহিয়া জানালার কাছে লইয়া গেল, তারপর একে একে তুলিয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল। নীচে ধপ্ ধপ্ করিয়া শব্দ হইল।

নীচে সিংদরজার সম্মুখে সান্ত্রীরা পূর্ববৎ ঘুমাইতেছিল, ধপ্ ধপ্ শব্দে চমকিয়া জাগিয়া তাহারা সন্দিগ্ধভাবে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিল।

এদিকে তোশাখানার জানালায় চম্পা ভিতর দিকে ফিরিয়া সপ্রশ্নচক্ষে প্রতাপের পানে চাহিল। প্রতাপ সন্তোষসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—

'এবার সিন্দুক থেকে দলিলের কাগজ বার করে নিয়ে এস—'

গোকুলদাস আর একবার আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিতেই প্রতাপের পিস্তল তাঁহার ললাট স্পর্শ করিল, তিনি আবার তুষ্ণীভাব ধারণ করিলেন। চম্পা ছুটিয়া গিয়া সিন্দুক হইতে দুই মুঠি ভরিয়া দলিলের পাকানো কাগজ লইয়া প্রতাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতাপ নীরবে শুধু চোখের সঙ্কেতে প্রদীপশিখা দেখাইয়া দিল। ইঙ্গিত বুঝিতে চম্পার বিলম্ব হইল না, সে দলিলগুলি আগুনের উপর ধরিল।

দলিলগুলি জ্বলিয়া উঠিলে চম্পা সেগুলি মেঝের উপর রাখিয়া দিল। প্রতাপ আবার তাহাকে মস্তকের ইঙ্গিত করিল, সে ছুটিয়া পাঁজা ভরিয়া দলিল আনিয়া আগুনের উপর ঢালিয়া দিতে লাগিল। চম্পার ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে এই কাজ বেশ উপভোগ করিতেছে। ক্রমে একটি বেশ বড় গোছের ধুনি জ্বলিয়া উঠিল।

গোকুলদাস পঙ্কে-পতিত হাতির মত বসিয়া নিজের এই সর্বনাশ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু রগের কাছে পিস্তল উদ্যত হইয়া আছে, তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার মুখগহ্বর কেবল নিঃশব্দে ব্যাদিত এবং মুদিত হইতে লাগিল।

সমস্ত দলিল অগ্নিতে সমর্পিত হইলে, প্রতাপ পিস্তল দুটি নিজ কোমরবন্ধে রাখিল, শুষ্ক-কঠিন হাসিয়া বলিল,—

'মহাজন, তোমার বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছি, এখন যত পারো ছোবল মারো। একটা দুঃখ, তোমার সিন্দুক লুঠ করে ন্যায্য অধিকারীদের সোনাদানা ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। হয়তো আবার আসতে হবে। বেন, তোমার বৈধব্য কামনা করি না, কিন্তু স্বামীকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও তাহলে ওকে সৎপথে চালিও।—চললাম।'

প্রতাপ জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। চম্পা জোড়হস্তে তদ্‌গত কণ্ঠে বলিল,—

'ভাই, তোমাকে প্রণাম করছি। তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, যতদিন বাঁচব তোমার গুণ গাইব—'

এই সময় দ্বারের বাহিরে বহু কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল—পুরী জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রতাপ এক লাফে জানালা ডিঙাইয়া বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। দরজায় করাঘাত পড়িতেই গোকুলদাস লাফাইয়া উঠিয়া উন্মত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিলেন,—

'চোর চোর—ডাকাত! আমার সর্বনাশ করে গেল। ওরে হতভাগা মেয়েমানুষ, দরজা খুলে দে না—'

চম্পা হাসিয়া বলিল,—'তুমি খোলো না। আমি অবলা মেয়েমানুষ, ঐ জগদ্দল দরজা খোলা কি আমার কাজ!'

গোকুলদাস মুক্তকচ্ছভাবে ছুটিয়া গিয়া লোহার দরজার হুড়কা খুলিতে খুলিতে চেঁচাইতে লাগিলেন,—

'গুন্ডার বাচ্চা পালিয়েছে—পাকড়ো পাকড়ো—ফটক বন্ধ করো—'

জানালার নীচে মোহরভরা থলি দুটি পড়িয়াছিল। প্রতাপ দেয়াল বাহিয়া নামিয়া আসিয়া থলি দুটি মুঠ ধরিয়া দু'হাতে তুলিয়া লইল।

সিংদরজার প্রহরীরা থলি পতনের শব্দে জাগিয়া উঠিয়াছিল। শব্দটা তাহাদের সন্দেহ-জনক বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাই তাহারা উঠিয়া কবাটের তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ-পূর্বক অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে পুরীর সকলে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জানালার নীচে পতিত থলি দুটা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। সিংদরজার কবাট খোলা রহিয়াছে কিন্তু সেখানে কেহ নাই। প্রতাপ শিকারী শ্বাপদের মত নিঃশব্দে পা ফেলিয়া সেইদিকে চলিল। খিড়কি দরজার বাহিরে মোতি আছে কিন্তু সেদিকে যাওয়া আর নিরাপদ নয়, চারিদিক হইতে সজাগ মানুষের হাঁক-ডাক আসিতেছে।

সিংদরজায় পেঁছিতে প্রতাপের আর কয়েক পা বাকি আছে এমন সময় বাড়ির কোণ ঘুরিয়া এক দল লাঠি-সড়কিধারী লোক আসিয়া পড়িল—তাহাদের আগে আগে কান্তিলাল। প্রতাপকে দেখিয়াই তাহারা হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল, সঙ্গে-সঙ্গে জানালা হইতে গোকুলদাসের তীক্ষ্ণ তারস্বর শোনা গেল,—

'ধর্ ধর্—ঐ পালাচ্ছে—'

প্রতাপ তীরবেগে সিংদরজা দিয়া বাহির হইয়া দক্ষিণদিকে ছুটিয়া চলিল। ঐ দিকে মোতি আছে; যদি সে কোনও রকমে একবার মোতির পিঠে চড়িয়া বসিতে পারে তবে আর তাহাকে ধরে কে? কিন্তু কান্তিলাল ও তাহার সহচরেরাও দৌড়ে কম পটু নয়, তাহারা সবেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। বিশেষত একটা লোক এত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল বলিয়া।

দুই হাতে ভারী দুটি থলি, সুতরাং প্রতাপ অতি দ্রুত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল; অবশেষে পলায়নের আর কোনও উপায় না দেখিয়া সে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। যে লোকটা সর্বাগ্রে তাড়া করিয়া আসিতেছিল, সে নাগালের মধ্যে আসিতেই প্রতাপ ডান হাতের থলিটি ঘুরাইয়া গদার মত তাহার মস্তকে প্রহার করিল। লোকটা আর্তনাদ করিয়া সেইখানে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে মোহরের থলি ফাটিয়া গিয়া চারিদিকে মোহর ছড়াইয়া পড়িল। প্রতাপ আর সেখানে দাঁড়াইল না, আবার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ দৌড়াইয়া সে একবার পিছু ফিরিয়া দেখিল, কেহ তাহাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে কিনা। সে দেখিল তাহার পশ্চাদ্ধাবনকারীরা সকলেই মাটিতে হামাগুড়ি দিয়া ও পরস্পর কাড়াকাড়ি করিয়া মোহর কুড়াইতেছে। প্রতাপ তখন দৌড়াইতে দৌড়াইতে ডাকিতে লাগিল,—

'মোতি—মোতি—'

তাহার কণ্ঠস্বরে কান্তিলাল ও অনুচরগণের হুঁশ হইল যে চোর পলাইতেছে, তখন তাহারা উঠিয়া আবার তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

কিন্তু চোরকে তাহারা ধরিতে পারিল না। প্রভুর আহ্বান মোতির কানে গিয়াছিল;

সে ক্ষণেক উৎকর্ণ থাকিয়া সহসা হ্রেষাধ্বনি করিয়া প্রভুর কণ্ঠস্বর অনুসরণপূর্বক দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রতাপ শুনিল পিছনে মোতির ক্ষুরধ্বনি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সে আবার ডাকিল,—

'মোতি! মোতি! আয় বেটা!'

মোতির ক্ষুরধ্বনি আরও স্পষ্ট হইতে লাগিল। সে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের ছাড়াইয়া প্রতাপের পাশে পৌঁছিল। দু'জনে পাশাপাশি দৌড়াইতেছে। তারপর প্রতাপ একলম্ফে ধাবমান মোতির পিঠে চড়িয়া বসিল।

কান্তিলাল ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; বেগবান্ অশ্ব ও আরোহী জ্যোৎস্না-কুহেলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

জলসত্রের প্রকোষ্ঠে চিন্তা ঝুলার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও বোধ করি প্রতাপের কথা তাহার মন জুড়িয়াছিল—ঠোঁট দুটি অল্প-অল্প স্ফুরিত হইতেছিল। অবহেলা-ম্লান মালা দুটি বুকের কাছে গুচ্ছাকারে পড়িয়া তাহার তপ্ত নিশ্বাসের সহিত নিজের ব্যর্থ সুগন্ধ মিশাইতেছিল।

সহসা অর্গলবদ্ধ দ্বারে করাঘাত হইল। চিন্তা চমকিয়া চক্ষু মেলিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল।

আবার দ্বারে করাঘাত হইল। চিন্তা নিঃশব্দে উঠিল; দ্বারের পাশে একটি ঝক্‌ঝকে ধারালো কাটারি ঝুলিতেছিল, সেটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কড়া সুরে প্রশ্ন করিল,—

'কে তুমি?'

বাহির হইতে চাপা গলায় আওয়াজ আসিল—

'চিন্তা, দোর খোলো—আমি প্রতাপ—'

তাড়াতাড়ি কাটারি রাখিয়া চিন্তা দ্বারের হুড়কা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল—

'তুমি—তুমি—এত রাত্রে—'

দ্বার খুলিতেই প্রতাপ ভিতরে প্রবেশ করিল। কপালে ঘাম, চুলের উপর ধুলো পড়িয়াছে, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহার মূর্তি দেখিয়া চিন্তা শংকা-বিস্ময়ে তাহার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—

'এ কি—কী হয়েছে?'

প্রতাপ প্রথমে দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল; তারপর চিন্তার দিকে ফিরিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া ভগ্নস্বরে বলিল,—

'চিন্তা, কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর আমার দুনিয়া ওলট্-পালট্ হয়ে গেছে। আমি এখন সমাজের বাইরে—ডাকাত—বারবটিয়া—'

চিন্তা সত্রাসে প্রতিধ্বনি করিল,—

'ডাকাত! বারবটিয়া! কেন, কি করেছ তুমি?'

প্রতাপ মোহরের থলি চিন্তার হাতে দিয়া ক্লান্ত হাসিল, তারপর ঝুলার উপরে গিয়া বসিল।—

'বলছি। কিন্তু বেশী সময় নেই, এতক্ষণে আমার নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে, সকাল হবার আগেই পালাতে হবে—'

চিন্তা ঝুলার পাশে নতজানু হইয়া ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল,—

'ওগো, কী হয়েছে সব আমায় বল।'

'বলব। তার আগে তোমার কর্তব্য কর।'

'কর্তব্য?'

'পানিহারিন্, পিপাসার্ত পথিককে আগে একটু জল দাও।'

ত্বরিতে জলভরা ঘটি আনিয়া চিন্তা প্রতাপের হাতে দিল। প্রতাপ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া ঘটির জল গলায় ঢালিয়া দিতে লাগিল।

ওদিকে পরপের বাহিরে মোতি দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখের লাগাম একটি খুঁটিতে বাঁধা ছিল। মোতি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার কান পর্যন্ত নড়িতেছিল না। প্রয়োজন হইলে সে এমনি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে—যেন পাথরে কোঁদা মূর্তি।

অদূরে ঝোপের আড়াল হইতে একটি মুণ্ড গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিল। তাহার দৃষ্টি মোতির দিকে। কিছুক্ষণ একাগ্রদৃষ্টিতে মোতিকে নিরক্ষণ করিয়া সে নিঃশব্দে ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। চাঁদের আলোয় লোকটিকে পরিষ্কার দেখা গেল—চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের একটি ক্ষীণকায় দীর্ঘগ্রীবা যুবক। তাহার মুখে ধূর্ততা মাখানো, পাতলা গোঁফজোড়া সর্বদাই খরগোশের গোঁফের মত অল্প অল্প নড়িতেছে। সে মোতির উপর অবিচলিত দৃষ্টি রাখিয়া এক পা এক পা করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যুবকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মোতি সম্বন্ধে তাহার মনোভাব সততার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না।

ইত্যবসরে ঘরের মধ্যে প্রতাপ ও চিন্তা পাশাপাশি ঝুলার উপর বসিয়াছে, প্রতাপ তাহার কাহিনী বলা শেষ করিয়াছে। চিন্তার চোখে জল, সে দুই হাতে প্রতাপের একটি হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া আছে।

প্রতাপ বলিল,—'সব তো শুনলে। আমি আমার রাস্তা বেছে নিয়েছি। এখন তুমি কি করবে বল।'

চিন্তা বলিল,—'তুমি যা বলবে তাই করব।—আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল—'

নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতাপ মাথা নাড়িল।

'তা হয় না,—আমার সঙ্গে তুমি থাকলে—'

চিন্তা বলিল,—'আমার কষ্ট হবে ভাবছ? তুমি সঙ্গে থাকলে আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারব।'

প্রতাপ বলিল,—'আমি তা জানি চিন্তা। সে জন্যে নয়। তবে বলি শোন। আমি এখন ডাকাত—বারবটিয়া, মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার উপায় আর আমার নেই। পাহাড়ে গুহায় জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় জীবন কাটাতে হবে। অথচ শহরে বাজারে মহাজনদের মহলে কোথায় কি ঘটছে তার খবর না জানলেও আমার কাজ চলবে না। মেঘনাদের মত মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আমাকে এই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে চিন্তা।'

চিন্তা বলিল,—'তবে আমাকে কি করতে হবে হুকুম দাও।'

প্রতাপ বলিল,—'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তুমি যেমন প্রপাপালিকা আছ তেমনি থাক।'

'আমি তোমার কোনো কাজেই লাগব না?'

'তুমি হবে আমার সব চেয়ে বড় সহকারিণী। তোমার সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ তা কেউ জানে না। তুমি এখানে যেমন আছ তেমনি থাকবে। এই পথ দিয়ে কত লোক আসে যায়, তাদের মুখে অনেক টুক্‌রো-টাক্‌রা খবর তুমি পাবে। এই সব খবর তুমি আমার জন্যে সঞ্চয় করে রাখবে। আমি মাঝে মাঝে লুকিয়ে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব আর দুনিয়ার খবর নিয়ে যাব—'

চিন্তা কিয়ৎকাল নীরব হইয়া রহিল, প্রস্তাবটা প্রথমে তাহার মনঃপূত হয় নাই কিন্তু ক্রমে তাহার সংশয় কাটিয়া গিয়া মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

'বেশ, তাই ভাল। তবু তো মাঝে মাঝে তোমায় চোখে দেখতে পাব।'

প্রতাপ চিন্তাকে কাছে টানিয়া লইয়া গাঢ়স্বরে বলিল,—

'চিন্তা, আজ পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই—তোমাকে এখানে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যে কত মর্মান্তিক তা তো তুমি বুঝতে পারছ? কোথায় ভেবেছিলাম তোমাকে বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাব—'

চিন্তা অবহেলা-ম্লান মালা দুটি ঝুলার উপর হইতে তুলিয়া লইল; একটি মালা প্রতাপের হাতে দিয়া অন্যটি তাহার গলায় পরাইয়া দিল, গম্ভীর শান্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল,—

'এই আমাদের বিয়ে। ভগবান যদি দিন দেন তখন সুখে-স্বচ্ছন্দে তোমার ঘর করব।'

চিন্তার গলায় হাতের মালা পরাইয়া দিয়া প্রতাপ তাহার দুই হাত ধরিয়া গভীর আবেগভরে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল—

'চিন্তা—'

এই সময় দ্বারে খুটখুট করিয়া শব্দ হইল। প্রতাপের কথা শেষ হইল না, তাহাদের দুইজোড়া সন্ত্রস্ত চক্ষু দ্বারের উপর গিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ নীরব; তারপর বাহির হইতে একটি করুণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

'ও মশায় ঘোড়ার মালিক, একবার দয়া করে বাইরে আসবেন কি?'

কণ্ঠস্বরের কাতরতা আশ্বাসজনক। তবু কিছুই বলা যায় না। প্রতাপ ও চিন্তা দৃষ্টি বিনিময় করিল। প্রতাপ কোমর হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া নিঃশব্দে দ্বারের কাছে গিয়া কান পাতিয়া শুনিল, তারপর হঠাৎ দ্বার খুলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান লোকটির বুকের উপর পিস্তল ধরিয়া কর্কশস্বরে বলিল,—

'কি চাও? কে তুমি?'

অতর্কিত আক্রমণে লোকটি প্রায় উল্‌টিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, কোনও রকমে সাম্‌লাইয়া লইল। সে আর কেহ নয়, সেই ক্ষীণকায় যুবক। চক্ষু চক্রাকার করিয়া সে প্রতাপের পানে ও পিস্তলটার পানে পর্যায়ক্রমে তাকাইয়া শেষে বলিল,—

'ওটা সরিয়ে নিলে ভাল হয়—আমি কিঞ্চিৎ ভয় পেয়েছি।'

প্রতাপ পিস্তল নামাইল না, চিন্তাকে ডাকিয়া বলিল,—

'চিন্তা, প্রদীপটা নিয়ে এস!'

প্রদীপ হাতে লইয়া চিন্তা প্রতাপের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতাপ এখন লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিল—সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এবং দৈহিকশক্তির দিক দিয়াও উপেক্ষণীয়। লোকটিও ইহাদের দু'জনকে দেখিয়া বুঝিয়া লইল যে ইহারা গুপ্তপ্রণয়ী; সে একটু লজ্জার ভান করিয়া ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—

'এ হে হে—আমি দেখছি কিঞ্চিৎ দোষ করে ফেলেছি—এমন চাঁদনি রাত্রে প্রণয়ীদের মিলনে বাগড়া দেওয়া—কিঞ্চিৎ—'

প্রতাপ প্রশ্ন করিল,—'তুমি কে?'

যুবক করুণভাবে বলিল,—'বলতে নেই আমার অবস্থাও প্রায় একই রকম। মামুদপুরের বড় মহাজন রতিলাল শেঠের মেয়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রেম হয়েছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা-শুনা হচ্ছিল, হঠাৎ বাগড়া পড়ে গেল। সবাই মার মার করে তেড়ে এল। কাজেই এখন আমি পলাতক—ফেরারী আসামী।'

প্রতাপ ও চিন্তার মধ্যে চকিত দৃষ্টি-বিনিময় হইল।

প্রতাপ বলিল,—'তুমিও ফেরারী?'

প্রতাপ ও চিন্তা বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

যুবক বলিল,—'ফেরারী না হয়ে উপায় কি? রতিলাল শেঠ কিঞ্চিৎ কড়া-পিত্তির লোক, ধরতে পারলে কোনো কথা শুনতো না, সটান টাঙিয়ে দিত। তাই পলায়নের রাস্তা যতদূর সুগম করা যায় তারই চেষ্টায় আছি। আপনার ঘোড়াটি—'

যুবক লোলুপ দৃষ্টিতে মোতির পানে ফিরিয়া চাহিল।

প্রতাপ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—'আমার ঘোড়া? মোতি?'

যুবক বলিল,—'এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম ঘোড়াটি চোখে পড়ল। তা ভাবলাম ঘোড়ার মালিক নিশ্চয় কাছে-পিঠে আছেন, তিনি যদি ঘোড়াটি উচিত মূল্যে বিক্রি করেন তাহলে আমার কিঞ্চিৎ উপকার হয়।'

'বিক্রি করব? মোতিকে বিক্রি করব!'

যুবক বলিল,—'দেখুন, আমি বড়লোক নই কিন্তু গরজ বড় বালাই। আপনাকে না হয় উচিত মূল্যের কিঞ্চিৎ বেশীই দেব—'

প্রতাপ একটু হাসিল, এই কৌতুকপ্রিয় অথচ কূটবুদ্ধি যুবকটিকে তাহার ভাল লাগিল। বিপদের মুখেও যাহার মন হইতে হাস্যরস মুছিয়া যায় না তাহার ভিতরে পদার্থ আছে। প্রতাপ প্রশ্ন করিল,—

'তোমার নাম কি?'

যুবক সবিনয়ে উত্তর দিল,—

'বলতে নেই আমার নাম ভীমভাই অর্জুনভাই শিয়াল।'

প্রতাপ বলিল,—'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার ঘোড়াটি একলা পেয়ে তুমি চুরি করলে না কেন?'

ভীমভাই একটু সলজ্জ হাসিল। তাহার গোঁফজোড়া নড়িতে লাগিল—

'বলতে নেই সে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনার ঘোড়াটি কিঞ্চিৎ বেশী প্রভুভক্ত, লাগামে হাত দিতেই ঘ্যাঁক্ করে কামড়ে দিল। এই দেখুন—'

ভীমভাই হাত বাহির করিয়া দেখাইল; হাতের পোঁচায় ঘোড়ার দাঁতের দাগ রহিয়াছে, তবে রক্তপাত হয় নাই।

ভীমভাই বলিল,—'এখন ফেরারী আসামীর প্রতি দয়া করে ঘোড়াটি বিক্রি করবেন কি?'

প্রতাপ বলিল,—'মোতিকে কিনতে পারে এত টাকা কাথিয়াবাড়ে নেই। তাছাড়া আমিও তোমার মত ফেরারী, মহাজনের টাকা লুঠ করেছি।'

ভীমভাই বিপুল বিস্ময়ে হাঁ করিয়া কিছুক্ষণ প্রতাপের মুখের পানে চাহিয়া রহিল—

'বলতে নেই কিঞ্চিৎ রোমহর্ষণ ব্যাপার মনে হচ্ছে—আমিও ফেরারী, আপনিও ফেরারী। এমন যোগাযোগ বলতে নেই সহজে ঘটে না!'

প্রতাপ পিস্তল কোমরে রাখিয়া ভীমভাইয়ের কাঁধের উপর হাত রাখিল, মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল,—

'ভীমভাই, তোমার মত মানুষ আমার দরকার। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?'

ভীমভাই প্রশ্ন করিল,—'বলতে নেই—কোথায়?'

প্রতাপ বলিল,—'তোমার আমার জন্যে কেবল একটি পথ খোলা আছে, ডাকাতির পথ, বারবটিয়ার পথ। আসবে এ পথে?'

মহানন্দে ভীমভাই প্রতাপকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল।

'আসব না? বলতে নেই আসব না তো যাব কোথায়? আজ থেকে তুমি আমার গুরু—আমার সর্দার।'

প্রতাপ ভীমের আলিঙ্গন মুক্ত হইল। বলিল,—

'আজ আমাদের নবজীবনের ভিত্তি হল।—চিন্তা, আজ আমরা মাত্র তিনজন বিদ্রোহী দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করলাম। ক্রমে আমাদের দল বেড়ে উঠবে—দেশে বিদ্রোহীর অভাব নেই। ভীমভাই, আমরা তিনজন মিলে যে আগুন জ্বালব—'

ভীমভাই বলিল,—'তিনজন নন—চারজন। বলতে নেই আমার একটি সাথী আছে—'

'সাথী? কই—কোথায়?'

'অকস্মাৎগতিকে কিঞ্চিৎ আড়ালে আছে।—এই যে ডাকছি।'

ভীমভাই মুখের মধ্যে দুইটি আঙুল পুরিয়া দিয়া তীব্র শিস্ দিল, তারপর ডাকিল,—

'তিলু! তিলোত্তমা।'

যে ঝোপের আড়াল হইতে কিছুকাল পূর্বে ভীমভাই উঁকি মারিয়াছিল, তাহার পিছন হইতে একটি হাস্যমুখী তরুণী বাহির হইয়া আসিল। পরিধানে ঘাগরা ও ওড়নি, হাতে একটি ছোট্ট পুঁটুলি, তিলোত্তমা দৌড়িয়া আসিয়া ভীমভাইয়ের পাশে দাঁড়াইল।

ভীমভাই বলিল,—'তিলু, আজ থেকে আমরা ডাকাত—(গলার মধ্যে হুংকার শব্দ করিল) ইনি আমাদের সর্দার।'

তিলুর চোখ দুটি ভারি চঞ্চল আর দাঁতগুলি মুক্তাশ্রেণীর মত উজ্জ্বল, সে চঞ্চল কৌতুকভরা চক্ষে চিন্তা ও প্রতাপকে নিরীক্ষণ করিয়া দশনচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া হাসিল। প্রতাপ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল,—

'ইনি কে ভীমভাই?'

ভীমভাই বলিল,—'চিনতে পারলে না সর্দার? বলতে নেই রতিলাল শেঠের মেয়ে—তিলু। কিঞ্চিৎ একগুঁয়ে মেয়ে, কিছুতেই শুনল না, আমার সংগে পালাল। ওর জন্যেই তো আমার এই সর্বনাশ।'

প্রতাপ স্মিতমুখে চিন্তার পানে চাহিল। তিলু কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। চিংতা প্রদীপ রাখিয়া হাসিতে হাসিতে গিয়া তিলুকে জড়াইয়া লইল।

ভোর হইতে আর বেশী দেরি নাই। চন্দ্র অস্ত যাইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া দু'একটা কোকিল কুহরিয়া উঠিতেছে।

জলসত্রের সম্মুখে পথের উপর মোতি দাঁড়াইয়া। তাহার পিঠের উপর সারি দিয়া তিনজন আরোহীঃ সর্বাগ্রে প্রতাপ লাগাম ধরিয়া বসিয়া আছে. তাহার পিছনে ভীমভাই প্রতাপের কাঁধে হাত দিয়া বসিয়া আছে, সর্বশেষে তিলু একহাতে ভীমভাইয়ের কোমর জড়াইয়া তাহার পিঠের উপর গাল রাখিয়া পরম সুখে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তিলু ও ভীমভাইয়ের গলায় বনফুলের মালা দুটি ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারাও এখন গন্ধর্বমতে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী।

চিন্তা পথের উপর দাঁড়াইয়া তাহাদের বিদায় দিতেছে। কোনও কথা হইল না, প্রতাপ একবার ঘাড় ফিরাইয়া চিন্তার পানে চাহিয়া একটু হাসিল। তারপর তাহার বল্‌গার ইশারা পাইয়া মোতি ধীর পদে পাহাড়ের অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

তিন

এক শহরের একটি প্রাচীর-গাত্রে বেশ বড় গোছের একটি ইস্তাহার আঁটা রহিয়াছে—

১০০০৲ টাকা পুরস্কার।
বারবটিয়া প্রতাপ সিংকে
যে-কেহ রাজসকাশে ধরাইয়া দিতে পারিবে
সে এক হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে।

ইস্তাহারের ঠিক পাশেই একটি দারুনির্মিত পায়রার খোপের মত ক্ষুদ্র পানের দোকান। দোকানদার দোকানের মধ্যে বসিয়া পান সাজিতেছে. সম্মুখে দুইজন গ্রাহক দাঁড়াইয়া পান
:।

একজন খরিদ্দার ইস্তাহারটি দেখিয়া দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিল,—

কী লেখা রয়েছে?'

পানের খিলি খরিদ্দারকে দিয়া নীরসকণ্ঠে বলিল,—

'লেখা আছে, প্রতাপ বারবটিয়াকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে সে হাজার টাকা ইনাম পাবে।'

লোকটি পান চিবাইতে চিবাইতে কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ নেত্রে ইস্তাহারটি নিরীক্ষণ করিল, তারপর ঘৃণাভরে ইস্তাহারের উপর পানের পিক্ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় খরিদ্দারটি শীর্ণাকৃতি এবং অপেক্ষাকৃত ভীরু প্রকৃতির। সে পান মুখে দিয়া একবার সতর্কভাবে এদিক্ ওদিক্ তাকাইল, তারপর হঠাৎ ইস্তাহারের উপর পিচকারীর বেগে পিক্ ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

দোকানদার একটু গম্ভীর হাসিল। সে আর কেহ নয়, বৃদ্ধ লছমন।

আর একটি শহর। একটা তক্‌মাধারী লোক ঢোল পিটাইয়া রাস্তায় রাস্তায় হুলিয়া দিয়া বেড়াইতেছে—

'সরকারী পুরস্কার বাড়িযে দেওয়া হল—শোনো সবাই—দেশের শত্রু সমাজের শত্রু রাজার শত্রু প্রতাপ বারবটিয়াকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে সে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে—'

একটা গলির মোড়ে কয়েকজন বালক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে গুল্‌তি। বালক গুল্‌তিতে একটি প্রস্তরখণ্ড বসাইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। তারপর বালকের দল হৈ হৈ করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

তক্‌মাধারী ঘোষক ঘোষণা শেষ করিয়া ঢোলে কাঠি দিতে গিয়া দেখিল ঢোল ফাঁসিয়া গিয়াছে। রাস্তার লোক বিদ্রূপভরে হাসিয়া উঠিল।

চিন্তার জলসত্রে অসমতল দেয়ালে একটি ইস্তাহার আঁটা রহিয়াছে—

১০০০৲ টাকা

প্রতাপ বারবটিয়াকে যে-কেহ ইত্যাদি।

প্রতাপ দাঁড়াইয়া এক টুকরা কয়লা দিয়া পুরস্কারের অঙ্কের পিছনে আরও কয়েকটা শূন্য যোগ করিয়া দিতেছে। তাহার মুখে মৃদু ব্যঙ্গ-হাসি।

পায়রার বক্‌বকম শব্দ শুনিয়া প্রতাপ ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিল। একটি দীর্ঘ বংশদণ্ডের আগায় কণ্ডির কামানি দিয়া ছত্র রচনা হইয়াছে, তাহার উপর দুটি কপোত। প্রতাপ যে কপোতশিশু দুটি চিন্তাকে উপহার দিয়াছিল, তাহারা আর শিশু নহে, সাবালক ও স-পালক হইয়াছে।

তাহাদের দিকে চাহিয়া প্রতাপের মুখের ব্যঙ্গ হাসি স্নেহে কোমল হইয়া আসিল। এই সময় চিন্তা ঘরের ভিতর হইতে বারান্দায় আসিয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল,—

'ও কি, সদরে দাঁড়িয়ে আছো? কেউ যদি এসে পড়ে! মোতি কোথায়?'

প্রতাপ বলিল,—'মোতিকে ওদিকে লুকিয়ে রেখেছি, কেউ দেখতে পাবে না।'

চিন্তা বলিল,—'তবে ওখানে দাঁড়িয়ে কি কাজ? এস, ভেতরে এস, তোমার খাবার দিয়েছি—'

প্রতাপ আসিয়া বারান্দায় চিন্তার সহিত যোগ দিল, বলিল,—'‘চুনি-মুনি’কে দেখছিলাম। ওদের যখন বাসা থেকে তুলে এনেছিলাম তখন কে ভেবেছিল ওরা এত কাজে লাগবে!'

চিন্তা বলিল,—'আমাদের ভাগ্যবিধাতা জানতেন, তাই আগে থেকে আয়োজন করে রেখেছিলেন।'

প্রতাপ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল মেঝেয় পিঁড়ি পাতা হইয়াছে, সম্মুখে প্রকাণ্ড পিতলের থালি; থালিতে নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জন সজ্জিত রহিয়াছেঃ গমের ফুলকা রুটি, শিং দিয়া তুরের ডাল *; মুঠিয়া পকৌড়ি, ধোক্‌ড়া, দহি-বড়া, শ্রীখণ্ড—আরও কত কি। প্রতাপ

* সজিনার ডাঁটা (শিং) দিয়া অড়র ডাল।

সহর্ষে পিঁড়ির উপর বসিল।

'ভাগ্যবিধাতা আমার জন্যেও আজ কম আয়োজন করেন নি—'

প্রতাপ পরম আগ্রহে আহার আরম্ভ করিল, চিন্তা সলজ্জ তৃপ্তির সহিত বসিয়া দেখিতে লাগিল।

'রান্না ভাল হয়েছে?'

প্রতাপ বলিল,—'ভাল? অমৃত। সত্যিই বলছি চিন্তা, ডাকাত হবার আগে যদি তোমার রান্না খেতাম তাহলে হয়তো—'

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল, তাহার কৌতুক-চটুল মুখ সহসা গম্ভীর হইল। সে হাতের অর্ধভুক্ত ধোক্‌ড়া নামাইয়া রাখিল।

চিন্তা বলিল,—'কি হল?'

প্রতাপ বলিল,—'কিছু না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমি এখানে বসে দিব্যি চর্বচোষ্য খাচ্ছি, আর ওরা—ভীম নানা প্রভু তিলু—নুন দিয়ে বাজরি রুটি চিবচ্ছে।'

চিন্তা ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'তা হোক—তুমি খাও।'

প্রতাপ বিষণ্নমুখে উঠিবার উপক্রম করিল—

'না চিন্তা, এত ভাল খাবার আর আমার গলা দিয়ে নামবে না।'

'উঠো না, উঠো না। ওদের জন্যেও আমি খাবার তৈরি রেখেছি—তুমি নিয়ে যাবে। ঐ দ্যাখো।'

ঘরের কোণে একটি আধমনী চটের থলি আভ্যন্তরিক পরিপূর্ণতায় পেট ফুলাইয়া ধনী মহাজনের মত বসিয়া ছিল, দেখিয়া প্রতাপের মুখ আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কৃতজ্ঞতা-তদ্‌গত স্বরে চিন্তাকে বলিল,—

'চিন্তা, তুমি একটি আস্ত জলজ্যান্ত দেবী—এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

প্রতাপ আহারে মন দিল। এই সময় পায়রা দুটি উড়িয়া আসিয়া জানালায় বসিল। চিন্তা একমুঠি শস্য লইয়া মেঝেয় ছড়াইয়া দিল, চুনি-মুনি অমনি নামিয়া আসিয়া দানাগুলি খুঁটিয়া খাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব আহারে কাটিল।

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল,—'খবব কিছু আছে নাকি?'

চিন্তা কহিল,—'না, নতুন খবর কিছু পাই নি।'

'আমি বোধ হয় এখন কিছুদিন আর আসতে পারব না। যদি জরুরী খবর কিছু পাও—' প্রতাপ অর্থপূর্ণভাবে চুনি-মুনির পানে তাকাইল।

চিন্তা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—'হ্যাঁ।'

সহসা বাহিরে ডুলি বাহকের হুম্‌ হুম্‌ শব্দ শোনা গেল। প্রতাপ ও চিন্তা সচকিতে মুখ তুলিল।

বাহিরে রাস্তার উপর শেঠ গোকুলদাসের ডুলি আসিয়া থামিয়াছে। এবার সঙ্গে রক্ষীর সংখ্যা বেশী, কান্তিলাল ও পাঁচজন বন্দুকধারী সিপাহী। হতভাগা প্রতাপ সিং ধরা না পড়া পর্যন্ত মহাজন সম্প্রদায়কে সাবধানে পথ চলিতে হয়।

গোকুলদাস ডুলি হইতে মুণ্ড বাহির করিয়া হাঁকিলেন,—

'ওরে, জল নিয়ে আয়।'

ঘরের মধ্যে চিন্তা ও প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চিন্তা পাণ্ডুরমুখে প্রতাপের পানে চাহিয়া নিঃশব্দে অধরোষ্ঠের সংকেতে বলিল,—গোকুলদাস।

আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইয়া প্রতাপের চক্ষু প্রখর হইয়া উঠিল, সে চিন্তাকে কাছে টানিয়া বলিল—

'যাও, ওদের জল দাও গিয়ে, ভয় পেয়ো না। যদি জিজ্ঞাসা করে বোলো ঘুমিয়ে পড়েছিলে—'

বাহির হইতে গোকুলদাসের স্বর আসিল—

'আরে কোথায় গেল পরপওয়ালী ছুঁড়িটা? কাজের সময় হাজির থাকে না! কান্তিলাল, দ্যাখ্ তো ঘরে আছে কিনা।'

চিন্তার হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর বিলম্ব করিলে সর্বনাশ। সে কোনও ক্রমে মুখে একটু ঘুম-ঘুম ভাব আনিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

কান্তিলাল ঘরের দিকে আসিতেছিল, চিন্তাকে জলের ঘটি লইয়া বাহির হইতে দেখিয়া আর অগ্রসর হইল না। আকর্ণ দন্ত বাহির করিয়া হাসিল, বলিল,—

'এই যে ধনী বেরিয়েছেন!'

চিন্তা গোকুলদাসের সম্মুখীন হইতেই তিনি বিষাক্ত চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—

'কোথায় ছিলি? সরকারের পগার * নিস্ না তুই; কাজে হাজির থাকিস না কেন?'

চিন্তা জড়িতকণ্ঠে বলিল,—'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—'

গোকুলদাস বিকৃতমুখে বলিলেন,—'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! কেন? রাত্তিরে ঘুমোস্ না?'

কান্তিলাল চোখ টিপিয়া টিপ্পনি কাটিল,—

'রাত্তিরে ঘুম হবে কোত্থেকে শেঠ? রাত্তিরে বোধ হয় নাগর আসে।'

কান্তিলালের সহচরেরা এই রসিকতায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে প্রতাপ সবই শুনিতে পাইতেছিল, অসহায়-ক্রোধে তাহার চক্ষু জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

গোকুলদাস মুখের কাছে গণ্ডূষ করিয়া জল পান করিলেন, তারপর মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—

'ঠিক বলেছিস কান্তিলাল, ছুঁড়ি রাত্তিরে ঘরে নাগর আনে। রাজপুতের মেয়ে আর কত ভাল হবে?'

রাজপুতের প্রতি বিদ্বেষ প্রতাপ ঘটিত ব্যাপারের পর হইতে গোকুলদাসের মনে শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার এই নীচ অপমানে চিন্তার মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল, কিন্তু সে অধর দংশন করিয়া নীরব রহিল। প্রভুর অনুমোদন পাইয়া কান্তিলাল সোৎসাহে বলিল,—

'শুধু রাত্তিরে কেন শেঠ, দিনের বেলাও আনে। এখন হয়তো ঘরের মধ্যে নাগর লুকিয়ে আছে।—উঁকি মেরে দেখে আসব?'

ঘরের মধ্যে প্রতাপের সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া উঠিল, সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কোমর হইতে পিস্তল বাহির করিল। যদি ধরা পড়িতেই হয়, ঐ নরপশুটাকে সে আগে শেষ করিবে।

শেঠ কিন্তু আর কালক্ষয় করিলেন না, বলিলেন,—

'না থাক। রাজপুতনী দশটা নাগর ঘরে আনুক না, আমার তাতে কি? নে—ডুলি তোল্, বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছুতে হবে।'

বাহকেরা ডুলি তুলিয়া চড়াইয়ের পথে যাত্রা করিল। কান্তিলাল চিন্তার পাশ দিয়া যাইবার সময় খাটো গলায় বলিয়া গেল,—

'আমিও এবার একদিন রাত্তিরে আসব—'

চিন্তা অপমান-লাঞ্ছিত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

ঘরের মধ্যে প্রতাপ জালবদ্ধ শ্বাপদের মত ছট্ফট্ করিতেছিল, চিন্তা ফিরিয়া আসিতেই তাহার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া আগুনভরা চোখে চাহিল—

'চিন্তা! এই সব অপমান তোমাকে সহ্য করতে হয়?'

চিন্তা একটা দীর্ঘ কম্পিত নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণেকের জন্য মুখ নীচু করিল। তারপর পাণ্ডুর হাসিয়া আবার মুখ তুলিল—

* পগার—মাসিক বেতন।

'ও কিছু নয়। কিন্তু তুমি আর দিনের বেলা এস না। আর একটু হলেই আজ—'

চিন্তা এতক্ষণ কোনও ক্রমে আত্মসংবরণ করিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না, হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া সে প্রতাপের বুকের উপর মুখ ঢাকিল। ভয়, অপমান ও সর্বশেষে বিপন্মুক্তির আকস্মিক অব্যাহতি মিলিয়া তাহার স্নায়ুমণ্ডলে যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই দুর্নিবার অশ্রুধারায় বিগলিত হইয়া পড়িল।

বিস্তীর্ণ গিরিকান্তারের একটি দৃশ্য। পাহাড়ের ভাগই বেশী। নিরাবরণ পাথরের বিশৃঙ্খল স্তূপ যেন কেহ অবহেলাভরে চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তাহার ফাঁকে ফাঁকে নিম্নভূমিতে গৈরিক বনানীর নিষ্প্রাণ হরিদাভা।

এই দুর্গম স্থানটিকে দুর্গপ্রাকারের মত ঘিরিয়া রাখিয়াছে একটি গিরিচক্র। এই গিরিচক্রের গা বাহিয়া উপরে ওঠা মানুষের দুঃসাধ্য; কিন্তু একস্থানে এই নৈসর্গিক প্রাকারের গায়ে একটি ফাটল আছে। ফাটলটি অতিশয় সংকীর্ণ, কোনও ক্রমে একজন ঘোড়সওয়ার ইহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে পারে। কোনও অজ্ঞ আগন্তুক কিন্তু রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া এমন কিছু দেখিতে পাইবে না যাহাতে তাহার সন্দেহ হইতে পারে যে এই প্রস্তর-বিকীর্ণ জনহীন স্থান প্রতাপ সিং ও তাহার দস্যুদলের আস্তানা। কেবল প্রতাপ ও তাহার মুষ্টিমেয় পার্শ্বচরেরাই ইহার সন্ধান জানে। দেশ জুড়িয়া প্রতাপের শত শত অনুচর আছে, ডাক পাইলেই তাহারা প্রতাপের সঙ্গে যোগ দিবে; কিন্তু তাহারা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহী, প্রতাপের গুপ্ত আস্তানার ঠিকানা জানে না। যাহারা নামকাটা বিদ্রোহী—রাজদণ্ডের ভয়ে যাহাদের লোকসমাজ ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছে—তাহারাই প্রতাপের নিত্য সঙ্গী, গোপন ঘাঁটির সন্ধানও কেবল তাহারাই জানে।

সূর্য পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে কিন্তু অস্ত যায় নাই। দিবাবসানের প্রাক্‌কালে এই নিভৃত স্থানে একটি কৌতুককর অভিনয় চলিতেছিল।

তিলু ঝরনায় জল ভরিতে আসিয়াছিল। স্থানটি চারিদিক হইতে বেশ আড়াল করা; যেখানে ঝরনার জল ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার চারিপাশে শ্যামল শষ্পের সজীবতা। তিলু কলসে জল ভরিয়া ফিরিবার পথে দেখিল, ভীমভাই একটি প্রস্তরখণ্ডে পিঠ দিয়া দীর্ঘ পদযুগল দ্বারা তিলুর পথ আগুলিয়া বসিয়া আছে। তাহার হাতে একটি বাঁশের এড়ো বাঁশী। ভীমভাইয়ের চাতুরী বুঝিতে তিলুর বাকি রহিল না; সে মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল,—

'বাঃ, পা ছড়িয়ে বসে আছ? আমাকে জল নিয়ে যেতে হবে না? রাত্তিরের রান্না এখনও বাকি।'

ভীমভাই কপট কোপে চক্ষু পাকাইয়া বলিল,—

'পাশে বস।'

তিলুও মনে মনে তাই চায়; এই নবদম্পতি নিভৃতে পরস্পর সঙ্গলাভের বড় একটা সুযোগ পায় না। কিন্তু আজ বিশেষ কোনও কাজ নাই, প্রতাপও বাহিরে গিয়াছে, এই অবকাশে ভীমভাই দলের আর সকলকে এড়াইয়া ঝরনাতলার নির্জনে তিলুকে একলা পাইয়াছে। তিলু ভরা-ঘট নামাইয়া ভীমভাইয়ের পাশে পাথরে ঠেস দিয়া বসিল, পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—

'আমার দায়-দোষ নেই। প্রতাপভাই যদি জিজ্ঞেস করেন—'

ভীমভাই তিলুর মাথাটা ধরিয়া নিজের কাঁধের উপর রাখিয়া দিল; তারপর বাঁশী অধরে তুলিযা তাহাতে ফুঁ দিল। তিলু মুকুলিত-নেত্রে স্বামীর কাঁধে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

নৃত্য-চপল গ্রাম্য সুর, কিন্তু ভীমভাইয়ের ফুঁ বড় মিঠা। শুনিতে শুনিতে তিলুর পা দুটি বাঁশীর তালে তালে নাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার কণ্ঠ হইতে নিদ্রালু পাখির

মৃদু-কূজনের মত গানের কথাগুলি বাহির হইয়া আসিল—

পায়েলা মোর চপল হল
তব বাঁশীর সুরে—

ঝরনা হইতে বেশ খানিকটা দূরে একটি গুহার মুখ। গুহার ভিতরে অন্ধকার, সম্মুখে একটি বৃহৎ গাছের গুঁড়ি অঙ্গারস্তূপে পরিণত হইয়া স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে। এই অগ্নি ঘিরিয়া তিনটি পুরুষ প্রস্তরখণ্ডের আসনে বসিয়া আছে।

প্রথম, নানাভাই—বেঁটে গজস্কন্ধ মহাবলবান; সে একটা বর্শার প্রান্তে ভুট্টা গাঁথিয়া তাহাই পোড়াইয়া খাইতেছে। দ্বিতীয়, প্রভু—মধ্যবয়স্ক কিন্তু বলিষ্ঠ পুরুষ; সে কর-লগ্নকপোলে বসিয়া গম্ভীরচক্ষে আগুনের পানে চাহিয়া আছে। তৃতীয়, পুরন্দর—শ্যাম-কান্তি যুবা, কর্মঠ, বালকস্বভাব; সে চামড়ার কয়েকটা লম্বা ফালি লইয়া ক্ষিপ্র নিপুণ-হস্তে ঘোড়ার লাগাম বুনিতেছে। ইহারাই প্রতাপের দল।

প্রভু দিবাস্বপ্ন ভাঙিয়া একবার সহচরদিগের উপর চক্ষু বুলাইল।—

'ভীমকে দেখছি না।'

বাকি দুইজন চারিদিকে চাহিল; তারপর পুরন্দর গিয়া গুহার মধ্যে উঁকি মারিয়া আসিল।

'তিলুবেনও নেই, বোধ হয় জল আনতে গেছে।'

'হুঁ। কিন্তু ভীম কোথায়?'

এই সময়, যেন প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে দূর হইতে বাঁশীর নিঃস্বন ভাসিয়া আসিল। কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না ভীমভাই কোথায়। নানা ভুট্টায় কামড় মারিতে গিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। প্রভুর গম্ভীর মুখেও একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। পুরন্দর লাগাম বুনিতে বুনিতে স্মিতমুখে মাথাটি নাড়িতে লাগিল।

পুরন্দর বলিল,—'চোরের মন বোঁচকার দিকে। কিন্তু যাই বল, ভীমভাই খাসা বাঁশী বাজায়; দূর থেকে শুনে সুখ হয় না—' বলিয়া মিটিমিটি বাকি দুইজনের পানে তাকাইতে লাগিল।

ওদিকে ভীমভাই পূর্ববৎ বাঁশী বাজাইতেছে; তিলুর পায়েলিয়া তাহার সহিত সঙ্গত করিয়া চলিয়াছে। তিলু গাহিতেছে—

পায়েলা মোর চপল হল
তব বাঁশীর সুরে!
শ্যামলিয়া ওগো শ্যামলিয়া
তুমি কত দূরে—
বুকের কাছে—তবু কত দূরে!

ভীমভাই আড়চোখে তিলুর পায়ের দিকে দেখিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতেই তাহাকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিল। কনুইয়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, তিলু উঠিয়া ঘাগ্‌রির ওড়্‌নি সংবরণ-পূর্বক গানের তালে তালে নাচিতে আরম্ভ করিল। কাথিয়াবাড় গুজরাতের সব মেয়েরাই নাচিতে জানে, ছেলেবেলা হইতে তাহারা গরবা নাচিতে অভ্যস্ত। এ বিষয়ে তাহাদের কোনও সঙ্কোচ নাই।

তিলু নৃত্যের তালে তালে গাহিল—

যে পথে যাই খুঁজে না পাই ঘন কুঞ্জবনে,
সোহাগ ভরে বাঁশী ডাকে অলি গুঞ্জরণে—
ওগো প্রিয়া, তুমি কত দূরে
বুকের মাঝে তবু কত দূরে।

পাহাড়ের যে রন্ধ্রটি দিয়া এই উপত্যকার একমাত্র প্রবেশপথ, সেই পথে প্রতাপ

মোতির পৃষ্ঠে প্রবেশ করিল। প্রতাপের কোলের কাছে খাদ্যবস্তুর ঝুলিটা বিরাজ করিতেছে। প্রতাপ মোতিকে দাঁড় করাইয়া একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল, ক্ষীণ বাঁশীর আওয়াজ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে ঈষৎ বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিল, তারপর আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া মোতিকে চালিত করিল।

ঝরনার ধারে ভীমভাইয়ের বাঁশী সমে আসিয়া থামিল। তিলুর নাচও একটি ঘূর্ণিপাকে সমাপ্তি লাভ করিল। সে ভীমের কাছে ফিরিয়া আসিয়া আবার তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া বসিল। দুজনের মনেই তৃপ্তির পরিপূর্ণতা।

তিলু বলিল,—'কেমন মজা হল। কেউ জানতে পারল না যে তোমার সঙ্গে আমার চুপি চুপি দেখা হয়েছে।'

শূন্য হইতে একটি আওয়াজ আসিল—

'নাঃ, কেউ জানতে পারল না।'

চমকিয়া তিলু ও ভীমভাই দেখিল অনতিদূরে একখণ্ড পাথরের উপর কনুই রাখিয়া প্রভু করলগ্নকপোলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কিছু দূরে বল্গা-বয়নরত পুরন্দর দাঁড়াইয়া তখনও গানের তালে তালে মাথাটি নাড়িয়া চলিয়াছে। আর সর্বশেষে নানাভাই বেদীর মত উচ্চ প্রস্তরের উপর পদ্মাসনে বসিয়া শাঁকালু ভক্ষণরত ভাল্লুকের মত দন্ত বিকশিত করিয়া আছে এবং ভুট্টা খাইতেছে।

ধরা পড়ার লজ্জায় তিলু দুহাতে মুখ ঢাকিল।

এই সময় প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইতেই সকলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। ভীমভাই বলিল,—'সর্দার, বলতে নেই ঝুলিতে কি একটা মহাজন পুরে নিয়ে এলে?'

প্রতাপ হাসিয়া বলিল,—'না, চিন্তা তোমাদের জন্যে খাবার পাঠিয়েছে।'

মুহূর্তমধ্যে ঝুলি লইয়া সকলে বসিয়া গেল। প্রতাপ মোতিকে ঘাসের উপর ছাড়িয়া দিয়া অদূরে একটা পাথরের উপর বসিয়া তাহাদের আহার দেখিতে লাগিল; তিলু তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া পিছনে দাঁড়াইল। প্রভু খাইতে খাইতে একখণ্ড ধোক্‌ড়া প্রতাপকে দান করিলে প্রতাপ তাহা নিজে না খাইয়া কাঁধের উপর দিয়া তিলুকে বাড়াইয়া দিল।

তিলু বলিল,—'তুমি নিজে খাও না প্রতাপভাই!'

প্রতাপ বলিল—'চিন্তা আমাকে অনেক খাইয়েছে। তুমি খাও।'

তিলু ধোক্‌ড়াতে একটু কামড় দিয়া বলিল,—

'চিন্তা বেনকে সেই একবারই দেখেছি। তাকে এখানে নিয়ে আস না কেন প্রতাপভাই? আমরা দুজনে কেমন একসঙ্গে থাকব—'

প্রতাপ চক্ষু তুলিয়া আকাশের পানে চাহিল। বলিল,—'আমারই কি ইচ্ছা করে না! কিন্তু—'

হঠাৎ থামিয়া গিয়া প্রতাপ শ্যেনদৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তিলুও তাহার দেখাদেখি আকাশের পানে চাহিল; ক্রমে সকলের দৃষ্টিও ঊর্ধ্বগামী হইল।

আকাশে একটি সঞ্চরমান কৃষ্ণবিন্দু দেখা দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বিন্দুটি একটি পাখিতে পরিণত হইল। প্রতাপ সঙ্কুচিত চক্ষে দেখিতে দেখিতে অস্ফুটস্বরে বলিল,—

'চিন্তার পায়রা! এরি মধ্যে কি খবর পাঠাল চিন্তা?'

পারাবত একবার তাহাদের মাথার উপর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতাপের কাঁধের উপর আসিয়া বসিল। তাহার পায়ে একটি কাগজ জড়ানো রহিয়াছে। প্রতাপ পা হইতে চিঠি খুলিয়া লইয়া পায়রাটিকে তিলুর হাতে দিল, তারপর চিঠি খুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

আর সকলে প্রতাপকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রভু প্রশ্ন করিল,—

'কী খবর?'

পড়িতে পড়িতে প্রতাপের মুখ গম্ভীর হইয়াছিল, সে চিঠি পড়িয়া শুনাইল,—

'তুমি চলে যাবার পরই একটা খবর পেলুম—তোমাকে ধরবার জন্য একদল সৈন্য রওনা

হয়েছে। তাদের সর্দার—তেজ সিং!'

প্রভুর ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল; সে মুখের উপর দিয়া একটা হাত চালাইয়া ভাবহীন কণ্ঠে বলিল,—

'তেজ সিংকে আমি জানি—একটা মানুষের মত মানুষ।'

প্রতাপ চিঠিখানি মুড়িতে মুড়িতে ভ্রূবদ্ধ-ললাটে আবার আকাশের পানে চাহিল। পশ্চিমদিগন্তে গিরি-মালার অন্তরালে তখন দিবাদীপ্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

চার

রাজধানীর প্রশস্ত রাজপথ দিয়া একদল পদাতিক সৈন্য চলিয়াছে। চারিজন করিয়া সারি, সৈনিকদের কাঁধে বন্দুক, কোমরে কিরিচ। তাহাদের আগে আগে অশ্বপৃষ্ঠে সর্দার তেজ সিং চলিয়াছেন। বলিষ্ঠ উন্নত দেহ, বুদ্ধি-দীপ্ত গম্ভীর মুখ, মাথায় পাগড়ির আকারে বাঁধা টুপি. সর্দার তেজ সিংকে দেখিলে মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদয় হয়। ইনি রাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ সেনানায়ক এবং সম্ভবত রাজসরকারে একমাত্র কর্তব্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ লোক। তাঁহার বয়স ত্রিশের কিছু অধিক।

রাস্তার দুই পাশে লোক জমিয়াছিল. কিন্তু সকলেই নীরব, সকলের মুখেই অপ্রসন্নতার অন্ধকার। প্রতাপকে সৈন্যদল ধরিতে যাইতেছে ইহাতে রাজ্যের আপামর সাধারণ কেহই সুখী নয়। কিন্তু রাজা ও রাজপরিষৎ মহাজনদের মুঠার মধ্যে, তাই রাজ্যের দন্ডনীতিও প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইয়া সমাজের কল্যাণকামীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছে।

পথপার্শ্বের জনতার মধ্যে প্রভু দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার মাথার উপর প্রকান্ড একটা পাগড়ি তাহার মুখখানাকে একটু আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। সৈন্যগণ মশ্‌মশ্‌ শব্দে চলিয়া গেল; জনতাও ছত্রভঙ্গ হইয়া আপন আপন পথে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কেবল প্রভু বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটি ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ ভিক্ষুক প্রভুর পাশে আসিয়া হাত পাতিল—

'ভিক্ষে দাও বাবা—'

প্রভু ভিক্ষুকের দিকে ফিরিতেই ভিক্ষুক চোখ টিপিল।

প্রভু নিম্নকণ্ঠে বলিল,—'লছমন?'

লছমন বলিল,—'হ্যাঁ বাবা, যা আছে তাই ভিক্ষে দাও বাবা—গরীবের পেটে অন্ন নেই, ঘরে ঘরে কাঙালী—'

প্রভু কোমর হইতে কয়েকটি মোহর বাহির করিয়া লছমনের হাতে দিল, লছমন মোহরগুলি মুঠিতে লইয়া বস্ত্রের মধ্যে লুকাইল।

'বেঁচে থেকো বাবা—রাজা হও—'

ছদ্মবেশী লছমন আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

রাত্রিকাল। শহরের উপকণ্ঠে একটি কুটিরের অভ্যন্তর। ঘরের কোণে ম্লান তৈল-দীপ জ্বলিতেছে। একটি অকাল-বৃদ্ধা অনাহারজীর্ণা রমণী মেঝেয় বসিয়া ছিন্ন কাঁথা সেলাই করিতেছে।

একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ ঘরে প্রবেশ করিতেই রমণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। পুরুষের চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, জঠর মেরুদণ্ড-সংলগ্ন, সে টলিতে টলিতে আসিয়া ঘরের কোণে চারপাইয়ের উপর বসিয়া পড়িয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল। রমণী তাহার কাছে গিয়া উদ্বেগ-স্খলিত কণ্ঠে বলিল,—

'এ কি! তুমি একলা ফিরে এলে যে! রমণিক কোথায়?'

পুরুষ হাত হইতে মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে চাহিয়া রহিল—

'রমণিক! না, সে ফিরে আসে নি—'

রমণী ব্যাকুলভাবে পুরুষের কাঁধ নাড়া দিতে দিতে বলিল,—

'ওগো, ঐটুকু ছেলেকে কোথায় ফেলে এলে? শহরে গিয়েছিলে শাক-ভাজী বিক্রি করতে, ছেলেকে কোথায় রেখে এলে?'

পুরুষ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—'তাকে—তাকে মহাজনের লোকেরা টেনে নিয়ে গেল—'

'অ্যাঁ—'

রমণী সেইখানেই বসিয়া পড়িল, পুরুষ উদ্‌ভ্রান্তবৎ আপন মনে বলিতে লাগিল,—

'শাক-ভাজীর ঝুড়ি নিয়ে বাজারে বেচতে বসেছিলাম এমন সময় মহাজনের পেয়াদা এল—ঝুড়ি নিয়ে গেল। সেই সঙ্গে রমণিককেও হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। বলে গেল, 'যতদিন না শেঠের সুদ চুকিয়ে দিতে পারবি ততদিন তোর ছেলে আটক থাকবে—শুধু জল খাইয়ে রাখব, তাড়াতাড়ি টাকা শোধ করতে না পারিস তোর ছেলে না খেয়ে মরবে—।"

রমণী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া উপুড় হইয়া পড়িল, পুরুষ তেমনি বিহ্বলভাবে বলিয়া চলিল,—

'কি করব? কোথায় টাকা পাব? কত লোকের কাছে টাকা চাইলাম, কেউ দিলে না। অ্যাঁ—ওকি! ওকি!'

রমণী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পুরুষের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, ঘরের ক্ষুদ্র জানালা দিয়া একটা হাত প্রবেশ করিয়া জানালার উপর কিছু রাখিয়া দিয়া আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল। রমণী ব্যাকুলত্রাসে পুরুষের পানে চাহিল।

রমণী ত্রাসবিকৃত স্বরে বলিল—'ওগো, ও কে? কার হাত?'

পুরুষ মাথা নাড়িল, তারপর উঠিয়া সঙ্কোচ-জড়িত পদে জানালার দিকে গেল। জানালার উপর দুইটি মোহর রাখা রহিয়াছে, দীপের আলোকে যেন চিক্‌মিক্‌ করিয়া হাসিতেছে।

রমণী পুরুষের পিছু পিছু আসিয়াছিল, দু'জনে কিছুক্ষণ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত মোহরের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর রমণী হাত বাড়াইয়া মোহর দুটি তুলিয়া লইল—

'ওগো, এ যে সোনার টাকা—মোহর! কে দিলে? কোথা থেকে এল?'

পুরুষ যখন কথা কহিল তখন তাহার কণ্ঠস্বর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—

'বুঝেছি—এ প্রতাপ! আমাদের বন্ধু—গরীবের বন্ধু প্রতাপ।'

রাত্রিকাল; আর একটি জীর্ণ কক্ষ। একটি পাকা ঘর; কিন্তু দেয়ালের চুন-বালি খসিয়া গিয়াছে। একটি ভাঙা তক্তপোশের উপর পাঁচ বছরের একটি শিশু শুইয়া আছে, মাথার শিয়রে কালিপড়া লণ্ঠনের আলোতে তাহার অস্থিসার দেহ দেখা যাইতেছে। তাহার মা—একটি শীর্ণকায়া যুবতী—পাশে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। রুগ্ন শিশু বায়না ধরিয়াছে—

'মা, দুধ খাব—খিদে পেয়েছে—'

মা বলিতেছে,—'ছি বাবা, তোমার অসুখ করেছে—এখন ওষুধ খেতে হয়—'

শিশু বলিল,—'না, ওষুধ খাব না—দুধ খাব—'

'এই দ্যাখো না, তোমার বাপু এখনি তোমার জন্যে কত মুসম্বি আর ওষুধ নিয়ে আসবে—ঘুমিয়ে পড় বাবা—'

মা শিশুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, শিশু ঝিমাইয়া পড়িল। শিশুর কঙ্কাল-সার দেহের দিকে চাহিয়া যুবতীর চোখ দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে অর্ধোচ্চারিত ভগ্নস্বরে বলিল,—

'ভগবান, অন্ন দাও—আমার ছেলে না খেয়ে মরে যাচ্ছে, তাকে অন্ন দাও—'

ঠুং করিয়া শব্দ হইল। গলদশ্রুনেত্রা যুবতী চুপ করিয়া শুনিল—কিসের শব্দ! আবার ঠুং করিয়া শব্দ হইল। যুবতী তখন পাশের দিকে চক্ষু নামাইয়া দেখিল, মেঝের ওপর চকচকে গোলাকার দুটি ধাতুখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। অবশভাবে যুবতী সে দুটি হাতে তুলিয়া লইল, একাগ্রদৃষ্টিতে ক্ষণেক তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মোহর দুটি বুকে চাপিয়া ধরিল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

'এ তো আর কেউ নয়—প্রতাপ। প্রতাপ! গরীবের তুমিই ভগবান!'

পূর্বে বলা হইয়াছে, চিন্তার জলসত্রের পিছনে কিছুদূরে একটি ঝরনা আছে; পাহাড় গলিয়া এই প্রস্রবণের জল একটি ক্ষুদ্র অথচ গভীর জলাশয়ে সঞ্চিত হইয়াছিল। চারিদিকের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে স্বচ্ছ সবুজ সরোবরের দৃশ্যটি বড় নয়নাভিরাম।

প্রাতঃকালে চিন্তা কলস লইয়া জল ভরিতে যাইতেছিল। নির্জন উপল-বিপর্যস্ত পথ দিয়া যাইতে যাইতে সে আপন মনে গাহিতেছিল—

মনে কে লুকিয়ে আছে—মন জানে
মরমের কোন্ গহনে—কোন্‌খানে—
মন জানে।

মনের মানুষ মনের মাঝে রয়
মনে তাই মলয় বায়ু বয়
চাঁদ ওঠে ফুল ফোটে বন্ধুর সন্ধানে
সেকথা কেউ জানে না—মন জানে।

সরোবরের কিনারায় কয়েকটি শিলাপট্ট ঘাটের পৈঠার মত জলে নামিয়া গিয়াছে। চিন্তা কলস রাখিয়া একটি শিলাপট্টে নতজানু হইয়া নিজের চোখে মুখে জল দিল, তারপর কলস ভরিয়া কাঁখে তুলিবার উপক্রম করিল।

সহসা অদূরে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চিন্তা কলস না তুলিয়া সচকিতে পিছু ফিরিয়া চাহিল। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়া দুইজন মানুষ কথা কহিতে কহিতে আসিতেছে; তাহাদের কাঁধে বাঁক, বাঁকের দুই প্রান্ত হইতে বড় বড় তামার ঘড়া ঝুলিতেছে।

মানুষ দুটি স্থূলকায়; মুখে বুদ্ধির নামগন্ধ নাই। তাহারা হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে হঠাৎ চিন্তাকে জলের ধারে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তারপর শঙ্কা-বর্তুল চোখ মেলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

চিন্তা ইতিপূর্বে এই নির্জন অঞ্চলে কখনও মানুষ দেখে নাই, তাই অবাক্ হইয়া গিয়াছিল; কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর সে প্রশ্ন করিল,—

'কে তোমরা?'

মানুষ দু'জন দৃষ্টি বিনিময় করিল, নিজ নিজ ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া পরস্পর সতর্ক করিয়া দিল, তাহারা সন্তর্পণে চিন্তার দিকে অগ্রসর হইল। কিছুদূর আসিয়া তারপর আবার দাঁড়াইল, আবার দৃষ্টি বিনিময় করিয়া ঠোঁটে আঙুল রাখিল, তারপর একজন জিজ্ঞাসা করিল,—

'তুমি কে?'

চিন্তা বলিল,—'কাছেই পরপ আছে, আমি পানিহারিন্।'

দুইজন তখন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁক নামাইল।

প্রথম মানুষ বলিল,—'ও—পানিহারিন্! আমরা ভেবেছিলাম—'

দ্বিতীয় মানুষ বলিল,—'আমরা ভেবেছিলাম, তুমি পাহাড়ের উপদেবতা—'

চিন্তা একটু হাসিল, লোক দুটিকে বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

সে বলিল,—'কিন্তু তোমরা কোথা থেকে এলে? এখানে কাছে-পিঠে কেউ তো থাকে না।'

প্রথম মানুষ বলিল,—'আমরা ভিস্তি—আমরা—'

সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ভিস্তি তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিল,—'স্ স্ স্।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ভিস্তি ঠোঁটে আঙুল রাখিয়া শীৎকার করিয়া উঠিল,—'স্ স্ স্—'

প্রথম ভিস্তি তাহার প্রতিধ্বনি করিল,—'স্ স্ স্—আমরা এখানে নতুন এসেছি—'

চিন্তার মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

'ও—তা কাজে এসেছ বুঝি?'

প্রথম ভিস্তি বলিল,—'কাজ? হুঁ—আমরা এসেছি—'

দ্বিতীয় ভিস্তি বলিল,—'স্ স্ স্—কি কাজে এসেছি তা বলা বারণ। আমরা ফৌজি-ভিস্তি কিনা—একদল সিপাহীর সঙ্গে এসেছি।'

প্রথম ভিস্তি বলিল,—'স্ স্ স্—'

দ্বিতীয় ভিস্তি বলিল,—'স্ স্ স্—'

চিন্তা আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল—

'সিপাহী? কোথায় সিপাহী?'

প্রথম ভিস্তি বলিল,—'স্ স্ স্—এখান থেকে আধক্রোশ দূরে পাহাড়ের মধ্যে তাঁবু ফেলেছে—সর্দার তেজ সিং—'

দ্বিতীয় ভিস্তি বলিল,—'স্ স্ স্—বেন, তুমি জানতে চেয়ো না, এসব ভারি গোপনীয় কথা—'

চিন্তা বলিল,—'আমি জানতে চাই না, জেনেই বা আমার লাভ কি? আমি শুধু ভাবছি এই পাহাড়ের মধ্যে এত সিপাহীর কি কাজ?'

প্রথম ভিস্তি গম্ভীর মুখে বলিল,—'কাজ আছে বেন, ভারি জবর কাজ! সর্দার তেজ সিং পঞ্চাশজন সিপাহী নিয়ে এসেছে—'

দ্বিতীয় ভিস্তি বলিল,—'স্ স্ স্—এসব গোপনীয় কথা—'

চিন্তা বলিল,—'না,তাহলে বোলো না—আমি যাই। আমার কলসী তুলে দেবে?'

প্রথম ভিস্তি তাড়াতাড়ি বলিল,—'দেব বৈ কি বেন—এই যে—'

কলসী চিন্তার কাঁখে তুলিয়া দিতে দিতে প্রথম ভিস্তি খাটো গলায় বলিল,—

'ভারি গোপনীয় কথা বেন, কেউ জানে না—আমরা প্রতাপ বারবটিয়াকে ধরতে বেরিয়েছি —স্ স্ স্—'

আর অধিক সংবাদের প্রয়োজন ছিল না। চিন্তা পাংশু অধরে হাসি টানিয়া ঠোঁটে আঙুল রাখিল, বলিল,—

'স্ স্ স্—'

উভয় ভিস্তি একসঙ্গে বলিল,—'স্ স্ স্—'

চিন্তা আর দাঁড়াইল না, কলস কাঁখে ফিরিয়া চলিল।

গিরিচক্রের মাঝখানে একটি ছোট্ট প্রচ্ছন্ন উপত্যকা। তেজ সিং এইখানে শিবির ফেলিয়াছেন। সিপাহীরা ময়দানের মত সমতল স্থান ঘিরিয়া তাঁবু তুলিয়াছে; সর্দার তেজ সিং ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের কাজ তদারক করিতেছেন। চারিদিকে কর্মব্যস্ততা, কিন্তু চেঁচামেচি নাই।

সিপাহীদের বন্দুকগুলি একস্থানে মন্দিরের আকারে জড়ো করা রহিয়াছে; যেন উহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই বস্ত্রনগরী গড়িয়া উঠিয়াছে।

চিন্তার পরপের পাশে বংশদণ্ডের মাথায় ছত্রের উপর বসিয়া কপোত দুটি রোদ পোহাইতেছে—পুরুষ কপোতটি থাকিয়া থাকিয়া গলা ফুলাইয়া গুমরিয়া উঠিতেছে।

চিন্তা পরপের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতে একটুকরা কাগজ। সে বারান্দার নীচে নামিয়া ঊর্ধ্বমুখে ডাকিল,—

'আয়—চুনি—আয়—'

পুরুষ কপোতটি তৎক্ষণাৎ উড়িয়া আসিয়া তাহার কাঁধে বসিল। চিন্তা তাহাকে ধরিয়া তাহার পায়ে কাগজটি জড়াইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হ্রস্বকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—

'চুনি—দেরি ক'রো না—শিগ্‌গির যেয়ো—তোমার ওপর জীবন-মরণ নির্ভর করছে—'

চিন্তা দূত-কপোতকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিল। কপোত শূন্যে একটা পাক খাইয়া পক্ষবাণ তীরের মত বিশেষ একটা দিক লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিল। যতক্ষণ দেখা গেল, উৎকণ্ঠিতা চিন্তা সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

অপরাহ্ণে প্রতাপের গুহা-ভবনের সম্মুখে ভস্মাচ্ছাদিত আগুন জ্বলিতেছিল। অগ্নি-হোত্রীর যজ্ঞকুণ্ডের মত এ আগুন কখনও নেভে না, অতি যত্নে ইহাকে জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। কারণ, এই লোকালয়বর্জিত স্থানে একবার আগুন নিভিলে আবার আগুন সংগ্রহ করা বড় কঠিন কাজ।

অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া প্রতাপ প্রমুখ পাঁচজন বসিয়া ছিল। সকলেই চিন্তায় মগ্ন। প্রতাপ ললাট কুঞ্চিত করিয়া তরবারির অগ্রভাগ দিয়া মাটিতে খোঁচা দিতেছিল; প্রভু গালে হাত দিয়া আগুনের দিকে চাহিয়া ছিল; নানাভাই থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক গাছের ডাল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছিল; পুরন্দর কিছুই করিতেছিল না, কেবল নিজের আঙুলগুলিকে পরস্পর জড়াইয়া বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করিতেছিল। সর্বশেষে ভীমভাই একটু স্বতন্ত্র বসিয়া একটা খড়ের অগ্রভাগ নিজের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এই সকল বিবিধ কার্যকলাপ সত্ত্বেও তাহারা যে নিজ নিজ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া আছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড হাঁচির শব্দে সকলের চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। সকলের ভর্ৎসনা-পূর্ণ দৃষ্টি ভীমের দিকে ফিরিল, ভীম কিন্তু নির্বিকার চিত্তে আবার নাকে কাঠি দিবার উপক্রম করিল।

প্রভু বলিল,—'ভীম, তোমার আর অন্য কাজ নেই?'

ভীমভাই একটা হাত তুলিয়া সকলকে আশ্বাস দিল—

'থামো। মাথায় একটা মতলব আস্‌ব আস্‌ব করছে। যদি সাতবার হাঁচতে পারি তাহলেই মাথাটা সাফ্‌ হয়ে যাবে—'

নানাভাই বলিল,—'খবরদার। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি উঁকি ঝুঁকি মারছিল, তোমার হাঁচির ধমকে ভড়কে পালিয়ে গেল।'

ভীমভাই বলিল,—'কিন্তু বলতে নেই মাথাটা কিঞ্চিৎ সাফ্‌ হওয়া যে দরকার।'

প্রতাপ হাসিয়া বলিল,—'দরকার বুঝলে তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথা সাফ্‌ করে দিতে পারব—তোমাকে আর হাঁচতে হবে না।'

ভীমভাই বিমর্ষভাবে বলিল,—'বেশ, তবে বলতে নেই হাঁচব না।'

খড় ফেলিয়া দিয়া ভীম নির্লিপ্তভাবে বসিল। প্রভু প্রতাপের দিকে ফিরিল—

'কিছু মাথায় আসছে না। কী করা যায়?'

প্রতাপ কহিল,—'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, তেজ সিং কোথায় আছে জানতে না পারলে কিছুই করা যায় না।'

প্রভু বলিল,—'সেই তো। আশ্চর্য ধড়িবাজ লোক। সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম শহরের ভিতর দিয়ে কুচকাওয়াজ করে গেল। তারপর রাতারাতি সারা পল্টন কোথায় লোপাট হয়ে

গেল, আর পাত্তাই নেই!'

পুরন্দর বলিল,—'কোথায় আস্তানা গেড়েছে জানতে পারলে—'

নানাভাই বলিল,—'জানতে পারলে রাতারাতি কচুকাটা করে দেওয়া যেত—লোকজন জড়ো করে দুপুর রাত্রে রে রে রে করে হানা দিতাম, ব্যস্! ঘুম ভাঙবার আগেই কেল্লা ফতে।'

প্রতাপ একটু হাসিয়া মাথা নাড়িল—

'নানাভাই, ব্যাপার অত সহজ নয়। রাজার সিপাহীরা তো আমাদের শত্রু নয়, তারা রাজার নিমক খায় তাই কর্তব্যের অনুরোধে আমাদের ধরতে এসেছে। তারা আমাদের জাতভাই, আমাদের দেশের লোক—তাদের প্রাণে মারা আমাদের উচিত নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কৌশলে তাদের পরাস্ত করা, যাতে তাদের ক্ষতি না হয় অথচ আমাদের কার্যসিদ্ধি হয়।'

ভীমভাই বলিল,—'কিন্তু বলতে নেই সেটা কি করে সম্ভব?'

প্রতাপ বলিল,—'সেই কথাই তো ভাবছি। যদি জানতে পারতাম তেজ সিং তার পল্টন নিয়ে কোথায় লুকিয়ে আছে—'

এই সময় তিলু গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বলিল,—'ঢের ভাবনা-চিন্তে হয়েছে, এবার সব খাবে চল। পেটে রুটি পড়লেই মাথায় বুদ্ধি গজাবে।'

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নানাভাই বলিল,—'খাঁটি কথা বলেছ তিলুবেন।—পেট খালি তাই মাথা খালি।'

নানাভাই পরম আরামে দুই হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙিতে গিয়া সেই অবস্থায় রহিয়া গেল, তাহার চক্ষু আকাশে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

'আরে, চিন্তাবেনের পায়রা মনে হচ্ছে—'

দেখিতে দেখিতে চুনি আসিয়া প্রতাপের স্কন্ধে অবতরণ করিল। ত্বরিতহস্তে চিঠি খুলিয়া প্রতাপ পড়িল, তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—

'চিন্তা লিখেছে—পঞ্চাশজন সিপাহী নিয়ে তেজ সিং পরপ থেকে আধ ক্রোশ দূরে তাঁবু ফেলেছে।'

সকলে অবরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

প্রভু বলিল,—'যাক, তেজ সিংয়ের হদিস পাওয়া গেছে! এবার তোমার মতলবটা শুনি প্রতাপভাই।'

প্রতাপ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে কাছে আহ্বান করিল,—'কাছে সরে এস, বলছি।'

সকলে প্রতাপকে ঘিরিয়া ধরিল, প্রতাপ একদিকে ভীমভাইয়ের এবং অন্যদিকে তিলুর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—

'আমি যে মতলব করেছি, ভীমভাই আর তিলু হবে তার নায়ক নায়িকা—'

তাহার কণ্ঠস্বর গোপনতার প্রয়োজনে ক্রমে গাঢ় ও হ্রস্ব হইয়া আসিল। সকলে নিভৃত হইয়া শুনিতে লাগিল।

পাঁচ

প্রাতঃকাল। তেজ সিংয়ের ছাউনিতে প্রাত্যহিক কর্মসূচনা আরম্ভ হইয়াছে, সিপাহীরা কুচকাওয়াজ করিতেছে। তেজ সিং তাহাদের পরিচালনা করিতেছেন।

কুচকাওয়াজ শেষ হইলে সিপাহীরা তাহাদের বন্দুকগুলি একস্থানে মন্দিরের আকারে দাঁড় করাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তেজ সিং নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে শিবিরচক্রের বাহিরে বাঁশীর শব্দ শোনা গেল। সিপাহীদের মধ্যে কেহ কেহ

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তারপর কৌতূহল পরবশ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভিস্তিযুগল কাঁধে বাঁক লইয়া ঝরনা হইতে জল ভরিয়া ফিরিতেছে, তাদের পিছনে অপরূপ দুটি মূর্তি।

মূর্তি দুটি ভীমভাই ও তিলু, কিন্তু অভিনব সাজ-পোষাকের ভিতর হইতে তাহাদের চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। ভীমের পোষাক কতকটা কাবুলী ধরনের, থুতনির কাছে একটু দাড়ি গজাইয়াছে, মাথায় জরীর তাজ। তিলুর রঙচঙা ঘাগরা ও ওড়নির কোমরবন্ধ দেখিয়া তাহাকে বেদেনী বলিয়া মনে হয়; তার পায়ে ঘুঙুর, হাতে ঘণ্টিদার করতাল, মাথায় একখণ্ড লাল কাপড় জড়ানো।

ভিস্তিদ্বয় এই অবাঞ্ছিত সঙ্গীদের লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ঝরনাতলায় এই দুটি জীব বসিয়াছিল, তাহাদের সহিত কথা কহিতে গিয়া ভিস্তিরা দেখিল, তাহাদের ভাষা একেবারেই অবোধ্য। ভিস্তিরা প্রথমে খুবই আমোদ অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা যখন জল লইয়া ফিরিয়া চলিল তখন দেখিল ইহারাও পিছু লইয়াছে। তারপর সারাটা পথ তাহারা এই নাছোড়বান্দা অনুচর দুটিকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই, ভীমভাই বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে এবং তিলু নৃত্যভঙ্গিমায় ঘুঙুর ঝংকৃত করিতে করিতে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে।

শিবির সন্নিধানে পৌঁছিয়া ভিস্তিদ্বয় বাঁক নামাইয়া অত্যন্ত বিরক্তভাবে ভীম ও তিলুর দিকে ফিরিল।

প্রথম ভিস্তি হাত নাড়িয়া বলিল,—'এই—যাঃ—পালাঃ—আর এগুবি কি ঠ্যাং ভেঙে দেব!'

দ্বিতীয় ভিস্তি বলিল,—'দেখছিস না এটা সিপাহীদের ছাউনি—এখানে এলে সিপাহীরা ধরে ঘাড় মটকে দেবে—'

যেন বড়ই সমাদরসূচক কথা, তিলু উজ্জ্বল মধুর হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, বলিল,—

'সি সি—পিণ্টু কালা থিলি—সী।'

এই সময় দুইজন সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রথম সিপাহী বলিল,—'কি হয়েছে? এরা কারা?'

প্রথম ভিস্তি হতাশভাবে বলিল,—'আর কও কেন। ঝরনাতলা থেকে আমাদের পিছু নিয়েছে—এত তাড়াবার চেষ্টা করছি কিছুতেই যাচ্ছে না।'

দ্বিতীয় সিপাহী বলিল,—'বেদে বেদেনী মনে হচ্ছে।'

ভীমভাই সম্মুখে আসিয়া নিজের বুকে হাত রাখিল। বলিল,—

'মি গুরুগুট—থালা থালা মাণ্ডি। (তিলুকে দেখাইয়া) হাড্ডি মাসোমা চিল্লু—সী।'

তিলু হাস্যোদ্ভাসিত মুখে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে করতাল ঊর্ধ্বে তুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। ভীমভাই অমনি বাঁশীতে সুর ধরিল।

সিপাহীরা ইহাদের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকজন সিপাহী আসিয়া জুটিল, সকলে মিলিয়া এই বিচিত্র জীব-দুটিকে ঘিরিয়া ধরিল। তিলু তখন উৎসাহ পাইয়া নাচের সহিত গান ধরিল,—

চিচিন্ থুলা পিচিন্ থুলা পিণ্টি থুলা রি
আণ্ডি গালা ভাণ্ডি বালা হাল্লাহালা সী—
গিজিং ঘিয়া গিজিং ঘিয়া—

ক্রমে গীতবাদ্যের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ছাউনিতে যে যেখানে ছিল আসিয়া জুটিল। চক্রায়িত দর্শক-মণ্ডলীর হাসি মস্করার মধ্যে তিলুর কটাক্ষ-বিভ্রম-বিলোল নৃত্যগীত চলিতে লাগিল।

সর্দার তেজ সিং নিজ শিবিরে গিয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে এই অনভ্যস্ত আওয়াজ কানে যাইতে তিনি ভ্রূকুটি করিয়া উঠিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিলেন।

শিবিরবৃত্তের অপর প্রান্তে সিপাহীদের দল জমা হইয়াছে দেখিয়া তাহার ভ্রূকুটি আরও গভীর হইল। তিনি সেই দিকে চলিলেন।

সিপাহীদের মজলিশ তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তিলু নাচিতে নাচিতে কখনও একটি সিপাহীর চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিতেছে, কখনও অন্য একটির বুকে করতালের টোকা মারিয়া দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা ছুটিতেছে। তেজ সিং আসিতেই সিপাহীদের হল্লা কিঞ্চিৎ শান্ত হইল, তাহারা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু তিলুর চপলতা কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না, তেজ সিংকে দেখিয়া তাহার রঙ্গ-ভঙ্গিমা যেন আরও বাড়িয়া গেল। সে প্রথমে তাঁহাকে ঘিরিয়া একপাক নাচিয়া লইল, তারপর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তরলকণ্ঠে গাহিল,—

আওলা দুলা সি যাওলা থুলা রি
গিজিং ঘিয়া গিজিং ঘিয়া—

তেজ সিং প্রথমটা একটু সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। তিনি অনুমান করিলেন, ইহারা যাযাবর বেদে; ইহাদের অগম্য স্থান নাই—যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ানো এবং নাচিয়া গাহিয়া পয়সা কুড়ানোই ইহাদের পেশা। তেজ সিং মনে মনে স্থির করিলেন, নাচ শেষ হইলে ইহাদের শিবিরে লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিবেন, হয়তো ইহারা বারবটিয়াদের সন্ধান জানিতে পারে।

নাচ গান চলিতে লাগিল, তেজ সিং স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে এই মুগ্ধ-জনতার পশ্চাতে এক বিচিত্র ছায়া-বাজির অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। শিবিরগুলির ব্যবধান পথে চারিটি মানুষ নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত বন্দুকগুলি সরাইয়া ফেলিতেছিল, হাতে হাতে বন্দুকগুলি শিবির-চক্রের অপর পারে অদৃশ্য হইতেছিল। মানুষগুলি আর কেহ নয়, প্রতাপ নানাভাই প্রভু ও পুরন্দর।

শিবিরের পশ্চাদ্ভাগে মোতি ও আরও সাতটি ঘোড়া দাঁড়াইয়া ছিল, বন্দুকগুলি তাহাদেরই একটির পিঠে লাদাই হইতেছিল। অবশেষে সমস্ত বন্দুক ঘোড়ার পিঠে লাদাই হইল, কেবল চারিজন শিকারীর হাতে চারিটি বন্দুক রহিয়া গেল। প্রতাপ বাকি তিনজনকে ইশারা করিল, তারপর সকলে নিঃশব্দে অগ্রসর হইল।

ওদিকে নাচগানও শেষ হইয়াছিল. ভীমভাই ও তিলু নত হইয়া তস্‌লিম করিতেই তেজ সিং বলিলেন,—

'তোমরা আমার সঙ্গে এস—বক্‌শিশ পাবে।'

তিলু এবার বিশুদ্ধ সহজবোধ্য ভাষায় কথা কহিল,—

'মাফ করবেন সর্দারজী, আপনিই আজ আমাদের সঙ্গে যাবেন।'

সকলে চমকিয়া দেখিল, ভীমভাই ও তিলুর হাতে দুটি পিস্তল—বাঁশী ও করতাল কখন প্রাণঘাতী-অস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

ভীমভাই সিপাহীদের বলিল,—'তোমরা কেউ গণ্ডগোল ক'রো না। বলতে নেই গণ্ডগোল করলেই বিপদ ঘটবে।'

ক্রোধে মুখ রক্তবর্ণ করিয়া তেজ সিং বলিলেন,—

'একি! কে তোমরা?'

তিলু বলিল,—'পিছন ফিরে চেয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

সকলে পিছন দিকে ফিরিয়া যাহা দেখিল তাহাতে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। চারিটি বন্দুক তাহাদের দিকে স্থির লক্ষ্য করিয়া আছে। তেজ সিং ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলেন। এই ফাঁকে ভীম ও তিলু সিপাহীদের দল হইতে বাহির হইয়া দস্যুদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপ বন্দুক হইতে চোখ তুলিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল,—

'সিপাহীদের বলছি. তোমরা ছাউনি ছেড়ে চলে যাও—নইলে বন্দুক ছুঁড়ব। প্রথমেই সর্দার তেজ সিং জখম হবেন।'

সিপাহীরা পিছু হটিল। অস্ত্রহীন সিপাহীর মত অসহায় প্রাণী আর নাই। তেজ সিং

কিন্তু বাঘের মত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া গর্জন করিলেন,—

'খবরদার! কেউ পালিয়ো না। ওরা পাঁচজন, আমরা পঞ্চাশজন। এস, সবাই একসঙ্গে ওদের ওপর লাফিয়ে পড়ি—'

সিপাহীরা দ্বিধাভরে ফিরিল। প্রতাপ বলিল,—

'সাবধান, কেউ এদিকে এগিয়েছ কি আগে সর্দারকে মারব! যদি সর্দারের প্রাণ বাঁচাতে চাও, সব ছাউনির বাইরে যাও।'

সিপাহীরা তথাপি ইতস্তত করিতেছিল, ভীমভাই হঠাৎ পিস্তল তুলিয়া শূন্যে আওয়াজ করিল। আর কেহ দাঁড়াইল না, মুহূর্তমধ্যে ছাউনির বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল তেজ সিং ক্রুদ্ধ হতাশায় চক্ষু আরক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রতাপ বন্দুক নামাইয়া তেজ সিংয়ের সম্মুখীন হইল। বলিল,—

'সর্দার তেজ সিং, আপনি আমাদের বন্দী, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

তেজ সিং প্রজ্বলিত চক্ষে প্রতাপের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। বলিলেন,—

'তুমি প্রতাপ সিং? (প্রতাপ মাথা ঝুঁকাইল) রাজপুত হয়ে তুমি এমন শঠতা করবে ভাবি নি—ভেবেছিলাম যুদ্ধ করবে।'

প্রতাপ বলিল,—'আপনি যোদ্ধা, আপনিই বলুন, পঞ্চাশজনের সঙ্গে পাঁচজনের যুদ্ধ কি সম্ভব? না—ন্যায়সঙ্গত? কিন্তু ও আলোচনা পরে হবে।—নানাভাই, সর্দারের চোখ বাঁধো। কিছু মনে করবেন না, তলোয়ারটি দিতে হবে।—পুরন্দর, ঘোড়া নিয়ে এস।'

সর্দার তলোয়ার ফেলিয়া দিলেন। পুরন্দর ঘোড়া আনিতে গেল। নানাভাই তিলুর মাথা হইতে লাল বস্ত্রখণ্ডটি তুলিয়া লইয়া সর্দারের চোখ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। সর্দার বাধা দিলেন না, সগর্ব নিষ্ক্রিয়তায় বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভীম ও তিলু পরস্পরের পানে চাহিয়া বিগলিতহাস্য বিনিময় করিল।

তিলু চুপিচুপি বলিল,—'বাপ্‌পো নাগিনা—গিজিং ঘিয়া।'

ভীম মুরুব্বীয়ানা দেখাইয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিল। বলিল,—

'থালা থালা মাণ্ডি—গুরুগুট্‌।'

দস্যুদের গুহা-ভবনের সম্মুখ।

সারি সারি আটটি ঘোড়া আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে অবতরণ করিল; তেজ সিংকে নামাইয়া তাঁহার চোখ খুলিয়া দেওয়া হইল।

প্রতাপ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'সর্দারজী, এই আমাদের আস্তানা। আমরা পরের ধন লুট করি বটে কিন্তু নিজেরা ভোগ করি না তা বোধ হয় বুঝতে পারছেন।'

তেজ সিং উত্তর দিলেন না, গর্বিত ঘৃণায় চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া কর্কশস্বরে বলিলেন,—

'এইখানে আমাকে বন্দী থাকতে হবে?'

প্রতাপ বলিল,—'হ্যাঁ। তবে যদি আপনি কথা দেন যে পালাবার চেষ্টা করবেন না তাহলে আপনাকে বন্দী করে রাখবার দরকার হবে না।'

তেজ সিং বলিলেন,—'তোমরা কাপুরুষ বেইমান, তোমাদের আমি কোনও কথা দেব না।'

প্রতাপের মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ধীর স্বরেই উত্তর দিল,—

'সর্দার তেজ সিং, আমরা অপমানে অভ্যস্ত নই। কেন যুদ্ধ না করে কৌশল অবলম্বন করেছিলাম সে কথা আগে বলছি। নিরপরাধ সিপাহীদের হত্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যে নির্গুণ রাজশক্তি দুষ্টের দমন না করে দুষ্টের পালনে আত্মনিয়োগ করেছে তার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।'

তেজ সিং বলিলেন,—'কাপুরুষের মুখে নীতির কথা শোভা পায় না। যদি যুদ্ধে

হারিয়ে আমাকে বন্দী করতে পারতে তাহলে বুঝতাম।'

প্রতাপের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, সে কিছুক্ষণ প্রখর দৃষ্টিতে তেজ সিংয়ের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—

'আপনি আমার সঙ্গে অসিযুদ্ধে রাজি আছেন?'

তেজ সিং বলিলেন,—'আছি। একটা তলোয়ার—'

প্রতাপ বলিল,—'ভীম, সর্দারকে তলোয়ার দাও।'

ভীম তেজ সিংকে তলোয়ার দিল, প্রতাপ নিজের কোমর হইতে অসি কোষমুক্ত করিল।

প্রতাপ বলিল,—'আমি শপথ করছি যদি আপনি আমাকে পরাস্ত করতে পারেন তাহলে বিনা শর্তে মুক্তি পাবেন, আমার সঙ্গীরা কেউ আপনাকে ধরে রাখবে না। আর আপনি শপথ করুন—যদি পরাস্ত হন তাহলে পালাবার চেষ্টা করবেন না।'

তেজ সিং বলিলেন,—'শপথ করছি।'

অতঃপর অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় যোদ্ধা প্রায় সমকক্ষ, তেজ সিংয়ের অসি-বিদ্যায় পটুত্ব বেশী, প্রতাপের বয়স কম। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল; ক্রমে তেজ সিং ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। নিজের আসন্ন অবসন্নতা অনুভব করিয়া তিনি অন্ধবেগে আক্রমণ করিলেন। প্রতাপ তখন সহজেই তাঁহাকে পরাভূত করিয়া ধরাশায়ী করিল।

প্রতাপ হাত ধরিয়া তেজ সিংকে ভূমি হইতে তুলিল; কিছুক্ষণ দুইজনে নিষ্পলক দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তেজ সিংয়ের দৃষ্টিতে পরাভবের তিক্ততার সহিত সম্ভ্রম মিশিল। তিনি বলিলেন,—

'প্রতাপ সিং, তোমার কাছে পরাস্ত হয়েছি। আমার শপথ মনে রাখব।'

ছয়

দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে চারিদিক মুহ্যমান। পাহাড়ের অঙ্গ হইতে উত্তাপ প্রতিফলিত হইতেছে। ছায়া বিবরসন্ধী সর্পের মত পাথরের খাঁজে খাঁজে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় নির্জন পার্বত্যপথ দিয়া এক পথিক চলিয়াছিল। পথিক অন্ধ, যষ্টি ধরিয়া ধীরপদে চলিতেছিল। তাহার দেহ দীর্ঘ ও ঋজু, কিন্তু বয়স ও দারিদ্র্যের প্রকোপে কঙ্কাল-মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ভিক্ষুক বলিয়া মনে হয়।

অন্ধ ভিক্ষুক থাকিয়া থাকিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিতেছিল,—

'প্রতাপ বারবটিয়া—প্রতাপ বারবটিয়া—তুমি কোথায়?'

জনহীন আবেষ্টনীর মধ্য হইতে জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর আসিতেছিল না; কিন্তু ভিক্ষুক সমভাবে হাঁকিয়া চলিয়াছে—

'প্রতাপ বারবটিয়া! তুমি কোথায়?'

বিসর্পিল পথে ভিক্ষুক এইভাবে অনেকদূর চলিল।

পথের পাশে একস্থানে কয়েকটি বড় বড় পাথরের চাঁই একত্র হইয়া আপন ক্রোড়দেশে একটু ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই ছায়ার কোটরে বসিয়া পুরন্দর আপন মনে আঙুলে আঙুল জড়াইয়া খেলা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না তাহার কোনও কাজ আছে; গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের অফুরন্ত অবকাশ এমনি হেলা-ফেলায় কাটাইয়া দেওয়াই যেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই অলস নৈষ্কর্ম্যের মধ্যেও তাহার চক্ষুকর্ণ যে সজাগ হইয়া আছে তাহা সহজে লক্ষ্য করা যায় না।

দূর হইতে কঠিন পথের উপর লাঠির ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ কানে যাইতেই পুরন্দর সোজা হইয়া বসিল; পরক্ষণেই সে ভিক্ষুকের উচ্চ চীৎকার শুনিতে পাইল—

'প্রতাপ বারবটিয়া, তুমি কোথায়?'

পুরন্দর একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল কিন্তু উঠিল না, যেমন বসিয়াছিল তেমনি

বসিয়া রহিল। ক্রমে ভিক্ষুক লাঠির শব্দ করিতে করিতে তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। পুরন্দর তথাপি নড়িল না, কেবল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভিক্ষুককে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

ভিক্ষুক তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার পর পুরন্দর নিঃশব্দে উঠিল, পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া পিছন হইতে তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল।

ভিক্ষুক দাঁড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিল,—

'কে তুমি? প্রতাপ বারবটিয়া?'

পুরন্দর সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষুকের মুখ এবং মণিহীন অক্ষিকোটর ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। বলিল,—

'তুমি অন্ধ?'

ভিক্ষুক বলিল,—'হ্যাঁ, তুমি কে?'

পুরন্দর বলিল,—'আমি যেই হই, প্রতাপ বারবটিয়ার সঙ্গে তোমার কি দরকার?'

ভিক্ষুক বলিল,—'দরকার আছে—বড় জরুরী দরকার।'

পুরন্দর প্রশ্ন করিল,—'কী দরকার আমায় বলবে না?'

ভিক্ষুক বলিল,—'তুমি যদি প্রতাপ বারবটিয়া হও তোমাকে বলতে পারি।'

পুরন্দর বলিল,—'আমি প্রতাপ নই কিন্তু তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি। যাবে?'

ভিক্ষুক বলিল,—'যাব। তার কাছে যাব বলেই তো বেরিয়েছি। কিন্তু আমি অন্ধ—'

পুরন্দর বলিল,—'বেশ, আমার সঙ্গে এস।'

পুরন্দর ভিক্ষুকের যষ্টির অন্য প্রান্ত তুলিয়া নিজমুষ্টিতে ধরিয়া আগে আগে চলিল, ভিক্ষুক তাহার পশ্চাৎবর্তী হইল।

•

গুহার সম্মুখে একখণ্ড প্রস্তরের উপর প্রতাপ ও তেজ সিং পাশাপাশি বসিয়া আছেন। তাঁহাদের পিছনে তিলু, ভীম, নানাভাই ও প্রভু দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে কিছু দূরে অন্ধ ভিক্ষুক ঋজু দেহে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—

'প্রতাপ বারবটিয়া, তোমার দেশের লোক যদি না খেয়ে মরে যায় তাহলে তুমি কেন রাজদ্রোহী হয়েছ? অন্ন যদি চাষীর পেটে না গিয়ে মহাজনের গুদামে জমা হয়, তবে কিসের জন্য তুমি দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছ?'

প্রতাপ প্রশ্ন করিল,—'তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?'

ভিক্ষুক বলিল,—'আমি মিঠাপুর গ্রামের লোক। মিঠাপুর এখান থেকে দশ ক্রোশ উত্তরে। গ্রামের যিনি জমিদার তিনিই মহাজন। এবার ফসল ভাল হয় নি তাই জমিদার খাজনার বাবদ প্রজার সমস্ত ফসল বাজেয়াপ্ত করে নিজের আড়তে তুলেছেন, আর চতুর্গুণ মূল্যে তাই প্রজাদের বিক্রি করছেন। প্রজাদের যতদিন ক্ষমতা ছিল, গাই-বলদ কাস্তে-লাঙল বিক্রি করে নিজের তৈরি শস্য মহাজনের কাছ থেকে কিনে খেয়েছে। কিন্তু এখন আর তাদের কিছু নেই—তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। মহাজনও তাদের শস্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে শহরে মাল চালান দিচ্ছেন; অসহায় দুর্বল চাষীরা অনাহারে মরছে। প্রতাপ বারবটিয়া, তাই আমি তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি—আমি জানতে চাই এর প্রতিকার কি তুমি করবে না?'

শুনিতে শুনিতে প্রতাপের মুখ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। সে তেজ সিংয়ের দিকে ফিরিল, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নম্র করিয়া বলিল,—

'সর্দারজী, আপনি রাজকর্মচারী, এর প্রতিকার আপনিই করুন। এই লোকটির চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছেন ওদের কি অবস্থা হয়েছে। দেশে রাজা আছে, আইন আছে, আদালত আছে—এই ক্ষুধার্তদের প্রাণ বাঁচাবার ন্যায়সঙ্গত রাস্তা আপনি বলে দিন।'

তেজ সিং মাথা হেঁট করিলেন,—

'আইনের কোনও হাত নেই।'

প্রতাপ বলিল,—'তাহলে এতগুলো মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য আপনারা কিছুই করতে পারেন না?'

তেজ সিং হেঁট মুখে রহিলেন, উত্তর দিলেন না। প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—

'বেশ, তাহলে আমরাই ওদের প্রাণরক্ষা করব। রাজশক্তি যখন পঙ্গু তখন রাজদ্রোহী-রাই রাজার কর্তব্য পালন করবে। ভীম, তৈরি হও তোমরা।'

ভীম, নানা, প্রভু ও পুরন্দর যাত্রার আয়োজন করিতে চলিয়া গেল। তেজ সিং মুখ তুলিলেন, বলিলেন,—

'কি করতে চান আপনারা?'

প্রতাপ বলিল—'ক্ষুধার্তের অন্ন ক্ষুধার্তকে ফিরিয়ে দেব। কাজটা আইনসঙ্গত হবে না। কিন্তু আইনের চেয়ে মানুষের জীবনের মূল্য আমাদের কাছে বেশী। আপনি আসবেন আমাদের সঙ্গে? ভয় নেই, আপনাকে ডাকাতি করতে হবে না; শুধু দর্শক হিসাবে যাবেন। আমরা কি ভাবে ডাকাতি করি স্বচক্ষে দেখলে হয়তো আমাদের খুব বেশী অধম মনে করতে পারবেন না।'

তেজ সিং উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

'বেশ. যাব আপনাদের সঙ্গে।'

প্রতাপ তিলুর দিকে ফিরিয়া ইঙ্গিত করিল।

'তিলু—'

'এই যে প্রতাপভাই—'

তিলু দ্রুতপদে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রতাপ তখন দূরে দণ্ডায়মান ভিক্ষুকের কাছে গিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিল। বলিল,—

'ভাই, আমরা যাচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি তুমি এইখানেই থাকো। তুমি ক্ষুধার্ত. তিলুবেন তোমাকে খেতে দেবেন।'

অন্ধের অক্ষিকোটর হইতে জল গড়াইয়া পড়িল. সে কম্পিত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—

'জয় হোক—তোমাদের জয় হোক?'

মিঠাপুর গ্রামের জমিদার-মহাজনের কোঠাবাড়ির সম্মুখভাগ। খর্বাকৃতি পুষ্টোদর শেঠজী বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন. তিনটি গরুর গাড়িতে শস্যের বস্তা লাদাই হইতেছে। কুলি মজুর ছাড়াও দশ-বারো জন লাঠিয়াল সশস্ত্রভাবে দাঁড়াইয়া এই লাদাই-কার্য তদারক করিতেছে।

গ্রাম্যপথের অপর পাশে মাঠের উপর একদল গ্রামবাসী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের শীর্ণ শরীরে বস্ত্রের বাহুল্য নাই. চোখে হতাশ বিদ্রোহের ধিকিধিকি আগুন। জীবনধারণের একমাত্র উপকরণ চোখের সম্মুখে স্থানান্তরিত হইতেছে অথচ তাহাদের বাধা দিবার ক্ষমতা নাই।

গরুর গাড়িতে বস্তা চাপানো সম্পূর্ণ হইলে শেঠ হাত নাড়িয়া ইশারা করিলেন; তখন বৃহৎ শৃঙ্গধর বলদের দ্বারা বাহিত শকটগুলি চলিতে আরম্ভ করিল। লাঠিয়ালেরা গাড়িগুলির দুই পাশে সারি দিয়া চলিল।

এই সময় গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন আর স্থির থাকিতে পারিল না. ছুটিয়া আসিয়া প্রথম গাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার কোটরপ্রবিষ্ট চোখে উন্মাদেব দৃষ্টি; হস্ত আস্ফালন করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—

'না—যেতে দেবো না—আমাদের ফসল নিয়ে যেত দেবো না। আমরা খাবো কী? আমাদের ছেলে বৌ খাবে কি?'

বারান্দার উপর শেঠ শুনিতে পাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে হুকুম দিলেন,—

'মার্ মার্—হতভাগাকে মেরে তাড়িয়ে দে—'

একজন লাঠিয়াল আগাইয়া আসিয়া লাঠির গুঁতা দিয়া হতভাগ্যকে পথের পাশে ফেলিয়া দিল।

সহসা বন্দুকের গুড়ুম শব্দ হইল। লাঠিয়ালটা পায়ে আহত হইয়া 'বাপরে' বলিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

ছয়জন অশ্বারোহী আসিয়া গরুর গাড়ির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। ছয়জনের মধ্যে চারজনের হাতে বন্দুক, প্রতাপের কোমরে পিস্তল, তেজ সিং নিরস্ত্র। প্রতাপ সঙ্গীদের বলিল,—

'তোমরা এদের আটক রাখো—আমরা মহাজনের সঙ্গে কথা কয়ে আসি। আসুন সর্দারজী।'

প্রতাপ ও তেজ সিং ঘোড়া হইতে নামিয়া বাড়ির বারান্দার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শেঠ বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া ভয় পাইয়াছিলেন, মাত্র দুই জন নিরস্ত্র লোক দেখিয়া তাহার সাহস কতকটা ফিরিয়া আসিল। তাঁহার অনেক লোকলস্কর লাঠিয়াল আছে দুইজন লোককে তাঁহার ভয় কি? তিনি রুক্ষদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিলেন। প্রতাপ কাছে আসিয়া নম্রকণ্ঠে বলিল,—

'আপনিই কি গ্রামের শেঠ?'

শেঠ বলিলেন,—'হ্যাঁ। তোমরা কে?'

প্রতাপ উত্তর না দিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল,—

'এই যে ফসল চালান দিচ্ছেন এ কি আপনার ফসল?'

'সে খবরে তোমার দরকার কি? কে তুমি?'

প্রতাপ সবিনয়ে বলিল,—'আমি প্রতাপ বারবটিয়া।'

ঝাঁটার প্রহারে মাকড়সা যেমন কুঁকড়াইয়া যায়, নাম শুনিয়া শেঠও তেমনি কুঁচকাইয়া গেলেন, প্রতাপের পিস্তলটার প্রতি হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল।

প্রতাপ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিল,—'প্রজারা খেতে পাচ্ছে না, এ সময় ফসল চালান দেওয়া কি আপনার উচিত হচ্ছে?'

শেঠ ঢোক গিলিতে গিলিতে বলিলেন,—'আমি—আমার—এঁ—প্রজারা দাম দিতে পারে না—তাই—'

প্রতাপ একটু হাসিল; তাহার একটা হাত অবহেলা ভরে পিস্তলের মুঠের উপর পড়িল। সে বলিল,—

'হুঁ। আপনি প্রজাদের ফসল বাজেয়াপ্ত করে সেই ফসল দশগুণ দরে তাদেরই বিক্রি করছেন। এখন তারা নিঃস্ব। তাই তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আপনি বাইরে মাল চালান দিচ্ছেন—'

ভয়ে শেঠের নাভি পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সামান্য গ্রাম্য মহাজন, চাষীদের উপর যতই দাপট হোক, প্রতাপ বারবটিয়ার সহিত বাক্-যুদ্ধ করিবার সাহস তাঁহার নাই। তিনি একেবারে কেঁচো হইয়া গিয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বলিলেন,—

'আমার দোষ হয়েছে—কসুর হয়েছে, এবারটি আমায় মাফ্ করুন। আপনি আমায় যা বলবেন তাই করব।'

প্রতাপ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ক্ষণেক বিবেচনা করিল।—

'আপনি প্রজাদের কাছ থেকে যে লাভ করেছেন তাতে আপনার বকেয়া খাজনা শোধ হয়ে গেছে? সত্যি কথা বলুন।'

শেঠ বলিল,—'অ্যাঁ—হ্যাঁ, শোধ হয়ে গেছে।'

প্রতাপ বলিল,—'তাহলে এখন আপনার ঘরে যা ফসল আছে তা উপরি। কত ফসল আছে?'

'তা—তা—'

'সত্যি কথা বলুন। নইলে ফসল তো যাবেই, আপনার ঘরবাড়িও আস্ত থাকবে না।'

'পাঁচশো মণ আছে—পাঁচশো মণ।'

'বেশ, এই পাঁচশো মণ ফসল ন্যায্য অধিকারীদের ফিরিয়ে দিতে হবে।'

শেঠ ক্রন্দনোন্মুখ হইয়া বলিলেন,—'সবই যদি ফিরিয়ে দিই তবে সারা বছর আমি খাব কি?'

প্রতাপ বলিল,—'পাঁচজনের মত আপনিও কিনে খাবেন। এখন আসুন আমার সঙ্গে।'

ওদিকে গরুর গাড়িগুলি এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, লাঠিয়ালেরা সম্মুখে বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, আহত লাঠিয়ালটা আহত গ্রামবাসীর পাশে বসিয়া মৃদু-মৃদু কুন্থন করিতেছিল। এখন শেঠ মহাশয় প্রতাপ ও তেজ সিংয়ের মধ্যবর্তী হইয়া পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রতাপ বলিল,—'আপনার লাঠিয়ালদের সরে যেতে বলুন।'

শেঠ হাত নাড়িয়া বলিলেন,—'ওরে তোরা সব সরে যা।'

লাঠিয়ালেরা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সরিয়া গেল। আহত লাঠিয়ালটা হামাগুড়ি দিয়া তাহাদের অনুগামী হইল।

প্রতাপ বলিল,—'এবার বলুন—প্রজাদের দিকে ফিরে বলুন—'

প্রতাপ নিম্নস্বরে বলিতে লাগিল, শেঠ মন্ত্র পড়ার মত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

'ভাই সব—তোমাদের পাঁচশো মণ ফসল আমার কাছে গচ্ছিত আছে—তোমাদের যখন ইচ্ছে তোমরা সে ফসল নিয়ে যেয়ো (ঢোক গিলিয়া)—দাম দিতে হবে না। উপস্থিত এই তিন গরুরগাড়ি মাল তোমরা নিয়ে যাও—

প্রজারা ক্ষণকালের জন্য নিশ্চল হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, তারপর চীৎকার শব্দে গগন বিদীর্ণ করিয়া গরুর গাড়ি তিনটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রতাপ তেজ সিংয়ের পানে চাহিয়া পরিতৃপ্তির হাসি হাসিল। তেজ সিং মাথা হেঁট করিলেন।

সাত

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

চিন্তার পরপে সূর্যাস্ত হইতে বিলম্ব নাই। বারান্দার কিনারায় দাঁড়াইয়া চিন্তা একজন পথিকের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে জল ঢালিয়া দিতেছে। সন্ধ্যার পর পরপে আর কেহ আসে না, এই লোকটি বোধ হয় শেষ রাহী।

জল পান শেষ করিয়া পথিক যখন মুখ তুলিল তখন দেখা গেল, সে কান্তিলাল। কান্তিলাল আজ সুযোগ পাইয়া একাকী পরপে আসিয়াছে।

মুখ মুছিতে মুছিতে সে চিন্তার দিকে চোখ বাঁকাইয়া বেশ একটু ভঙ্গিমা সহকারে হাসিল, বলিল,—

'কি পানিহারিন্, পুরোনো রাহীকে চিন্‌তেই পারছ না নাকি?'

চিন্তা কান্তিলালকে বিলক্ষণ চিনিয়াছিল, সে গম্ভীর বিরক্তমুখে বলিল,—

'জল খেলে, এবার নিজের কাজে যাও।'

কান্তিলাল বারান্দার কিনারায় বসিল—

'সূয্যি ডুবতে চলল, এখন আর আমার কাজ কি? কথায় বলে, দিনের চাকর রাতের নাগর। এস না দু'দণ্ড বসে কথা কই—'

চিন্তা বলিল,—'আমি সরকারের চাকর, যতক্ষণ সূর্য আকাশে থাকবে ততক্ষণ রাহীদের জল দিয়ে সেবা করা আমার কাজ। কিন্তু এখন আর আমি কারুর চাকর নই—'

কান্তিলাল বলিল,—'আহা সেই কথাই তো বলছি পানিহারিন্! এখন তোমারও কাজ

ফুরিয়েছে আমারও কাজ ফুরিয়েছে—একটু আমোদ করার এই তো সময়। নাও, বোসো এসে—আজ আর এপথে কেউ আসছে না।'

কান্তিলাল পদম্বয় বারান্দার উপর তুলিয়া আরও জুত করিয়া বসিল।

চিন্তা কঠিন স্বরে বলিল,—'যাও বলছি—নইলে—'

কান্তিলাল এতক্ষণ নরম সুরে কথা বলিতেছিল, কিন্তু যখন দেখিল মিষ্টি কথায় চিঁড়া ভিজিবে না তখন সে মনের জঘন্যতা উদ্ঘাটিত করিয়া হাসিল। বলিল,—

'অত ছলাকলায় দরকার কি পানিহারিন্! তুমিও জানো আমি কি চাই আর আমিও জানি তুমি কি চাও—'

চিন্তা বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল,—

'যাও—ভাল চাও তো এখনও যাও—'

কান্তিলাল বলিল,—'আর যদি না যাই? কি করবে? জোর করে তাড়িয়ে দিতে পারবে? বেশ—চলে এস—দেখি তোমার গায়ে কত জোর—' বলিয়া কান্তিলাল কৌতুকভরে বাহ্বাস্ফোট করিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার হাস্য দীর্ঘস্থায়ী হইল না; এই সময় একটি বলিষ্ঠ হস্ত আসিয়া তাহার কর্ণধারণপূর্বক এমন সজোরে নাড়া দিল যে কান্তিলালের হাসি মুদারাগ্রাম ছাড়িয়া কাতরোক্তির তারাগ্রামে গিয়া উঠিল।

'কে রে তুই? ছাড়্ ছাড়্—'

কর্ণধারণ করিয়াছিল নানাভাই। নানাভাইয়ের সাজ-পোষাক সাধারণ পথিকের মতই, উত্তরীয়ের একপ্রান্তে একটি মধ্যমাকৃতি পুঁটুলি পিঠের উপর ঝুলিতেছে। নানাভাই চিন্তার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—

'পানিহারিন্, লোকটা কি তোমাকে বিরক্ত করছে?'

চিন্তা নীরবে ঘাড় নাড়িল। কান্তিলালের কান তখনও নানার আঙুলের জাঁতিকলে ধরা ছিল, সে উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে তর্জন করিল,—

'কে তুই? এতবড় আস্পর্ধা—'

নানাভাই কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কান্তিলালকে কান ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইল। বলিল,—

'আমিও তোর মত একজন রাহী কিন্তু তোর মত ছোটলোক নই। যা, আর এখানে দাঁড়ালে বেইজ্জত হয়ে যাবি।'

'বেইজ্জত!'

'হ্যাঁ, তোর নাক কান কেটে নেব।–যা!'

নানাভাই কান ছাড়িয়া দিল। কান্তিলাল দেখিল আততায়ীর চেহারা যেমন নিরেট, চোখের দৃষ্টিও তেমনি কড়া। সে আর বাগ্-বিতণ্ডায় সময় নষ্ট করিল না, পদাহত কুক্কুরের মত পলায়ন করিল। যাইবার সময় চিন্তার পানে একটা বিষাক্ত অপাঙ্গ-দৃষ্টি হানিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া গেল,—

'আচ্ছা—'

কান্তিলাল অদৃশ্য হইয়া গেলে নানাভাই পুঁটুলি নামাইয়া বারান্দার ধারে বসিল। বলিল,—

'চিন্তাবেন, দেশে পাজি লোকের অভাব নেই, তুমি সাবধানে থাকো তো?'

চিন্তা বলিল,—'ভয় নেই, দরকার হলে আমার কাটারি আছে। কিন্তু তোমার পুঁটুলিতে ও কী নানাভাই?'

নানাভাই বলিল,—'আর বল কেন? তিলুবেনের কুড়মুড়া খাবার ইচ্ছা হয়েছিল তাই অনেক সন্ধান করে নিয়ে যাচ্ছি।'

চিন্তা হাসিয়া বলিল,—'আহা বেচারা!—নানাভাই, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। আজ সকালে ঝরনায় জল ভরতে গিয়ে—। কিন্তু আগে তোমায় জলপান দিই, তারপর বলব—'

রাত্রিকাল। দস্যুদের গুহার অভ্যন্তর। কয়লার গন্‌গনে আগুনের সম্মুখে বসিয়া তিলু মোটা মোটা বাজরির রুটি সেঁকিতেছে। নানাভাই ছাড়া আর সকলে আগুন ঘিরিয়া বসিয়াছে; দিনের বেলা যতই গরম হোক, রাত্রে এই পাহাড়ের অধিত্যকায় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। হাতে কোন কাজ নাই, তাই সকলে মিলিয়া তিলুকে খেপাইতেছিল; এমন কি তেজ সিংও গম্ভীর মুখে এই কৌতুকে যোগ দিয়াছিলেন।

পুরন্দর উদ্বিগ্নমুখে বলিল,—'নানাভাই এখনও ফিরল না—'

প্রভু বলিল,—'হুঁ—রাত কম হয় নি।'

ভীমভাই একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। বলিল,—

'বলতে নেই হয়তো ধরা পড়ে গেছে—'

তিলু দুই হাতে রুটি গড়িতে গড়িতে ক্রুদ্ধ চোখে তাহার পানে চাহিল। বলিল,—

'যা তা বোলো না। নানাভাই এখনি ফিরে আসবেন। তিনি বলে গেছেন তাঁর ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।'

তেজ সিং বলিলেন,—'কাজটা ভাল হয় নি তিলুবেন। নানাভাইয়ের মত একজন দুর্দান্ত ডাকাতকে মুড়ি আনতে পাঠানো—' তিনি দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িলেন।

প্রতাপ উদাসকণ্ঠে বলিল,—'হয়তো সেই লজ্জাতেই নানাভাই দল ছেড়ে চলে গেছে। হাজার হোক বীরপুরুষ তো। তাকে মুড়ি আনতে বলা—' প্রতাপও মাথা নাড়িল।

সকলে দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িল। তিলুর মুখ কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিল, সে হাতের রুটি রাখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল,—

'আমি বলি নি—আমি বলি নি নানাভাইকে মুড়ি আনতে। আমি খালি বলেছিলাম—'

পুরন্দর বলিল,—'তুমি যা বলেছিলে সে তো আমরা সবাই শুনেছি। সেকথা শোনবার পর নানাভাইয়ের মত একজন কোমলপ্রাণ ডাকাত কি আর স্থির থাকতে পারে! সে না গেলে আমি যেতাম—'

ভীমভাই বলিল,—'কেউ না গেলে শেষ পর্যন্ত আমাকেই যেতে হয়। বলতে নেই—'

তিলু ব্যাকুলনেত্রে সকলের মুখের পানে চাহিতে চাহিতে তেজ সিংয়ের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারিল সকলে তাহাকে লইয়া তামাশা করিতেছে। তিলুর সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল ভীমভাইয়ের উপর। একদলা বাজরির নেচি তুলিয়া লইয়া সে ভীমভাইকে ছুঁড়িয়া মারিল।

এই সময় গুহামুখে মানুষের গলার আওয়াজ হইল; আওয়াজ গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভয়ঙ্কর শুনাইল—

'হুঁশিয়ার!'

সকলে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ভয়ের কারণ ছিল না; পরক্ষণেই নানাভাই আলোকচক্রের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের চক্ষু কাপড় দিয়া বাঁধা।

নানাভাই বলিল,—'প্রতাপ বারবটিয়া, একজন স্ত্রীলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়—' বলিয়া চোখের কাপড় খুলিয়া দিল। সকলে চমৎকৃত হইয়া দেখিল—চিন্তা।

প্রতাপ হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল,—'চিন্তা!'

তিলু একঝাঁক ছাতারে পাখির মত আনন্দকূজন করিতে করিতে ছুটিয়া গিয়া চিন্তাকে জড়াইয়া ধরিল।

অতঃপর চিন্তার প্রথম গুহায় আগমনের আনন্দ-সংবর্ধনা কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে সকলে আবার আগুন ঘিরিয়া বসিয়াছে এবং পরম তৃপ্তির সহিত মুড়ি চিবাইতেছে। চিন্তার একপাশে প্রতাপ, অন্যপাশে তিলু তাহার একটা বাহু দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে, যেন ছাড়িয়া দিলেই সে পায়রার মত উড়িয়া যাইতে পারে।

চিন্তা চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া সকলকে দেখিতেছে; তাহার মুখে অসূয়া-বিদ্ধ হাসি—

'তোমাদের দেখলে আমার হিংসে হয়। আমিও যদি এখানে এসে থাকতে পারতাম!'

সকলে অপ্রতিভভাবে নীরব রহিল; ভীমভাই এক খাবলা মুড়ি মুখে ফেলিয়া অর্ধ-মুদিত নেত্রে চিবাইতে চিবাইতে বলিল,—

'আমাদেরই কি সাধ হয় না চিন্তাবেন। তুমি এলে, বলতে নেই, তিলুর রান্না থেকে মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ মুখ-বদল হত।'

সকলের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিলুও হাসিল। চিন্তা নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,—

'যা হবার নয় তা ভেবে আর কি হবে? আমাকে কিন্তু রাত পোহাবার আগেই ফিরতে হবে। কে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?'

পুরন্দর বলিল,—'সে জন্য ভেবো না বেন। আমরা সবাই মিছিল করে তোমাকে পেণছে দিয়ে আসব।'

প্রতাপ বলিল,—'তার এখনও অনেক দেরি আছে। মিছিল করবার দরকার নেই, আমি আর মোতি চিন্তাকে খুব শিগ্গির পেণছে দিতে পারব। আকাশে চাঁদ আছে—'

ভীম আস্তেব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—

'হুঁ হুঁ—আকাশে চাঁদ আছে। বলতে নেই কথাটা এতক্ষণ খেয়ালই হয় নি। দীর্ঘ বিরহের পর তরুণ তরুণীর যখন মিলন হয় তখন তারা কিঞ্চিৎ নিরিবিলি খোঁজে। চল, আমরা বাইরে গিয়ে বসি।'

প্রতাপ বলিল,—'ভীম, পাগলামি ক'রো না—বসো। চিন্তা, কোনও খবর আছে নাকি?'

চিন্তা বলিল,—'খবর দিতেই তো এলাম। চিঠিতে অত কথা লেখা যায় না; নানাভাই বললেন মুখে সব কথা না বললে হবে না—তাই—'

প্রতাপ বলিল—'কি কথা?'

চিন্তা একটু নীরব থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—

'আজ সকালে একটা ব্যাপার ঘটেছে। আমি রোজ যেমন জল ভরতে যাই তেমনি ঝরনায় গিয়ে দেখি—'

ভোরের আলোয় ঝরনার সঞ্চিত জলাশয় ঝিল্‌মিল্ করিতেছে। চিন্তা কলস কাঁখে জল ভরিতে আসিতেছে; প্রায় জলের কিনারা পর্যন্ত পেণছিয়া চিন্তা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখা যায়, একটা অর্ধনিমজ্জিত পাথরের আড়ালে প্রায় এক কোমর জলে দুটি যুবক-যুবতী দাঁড়াইয়া আছে—যুবকের বাঁ হাত যুবতীর ডান হাতের সহিত শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা। তাহারা চিন্তাকে দেখিতে পায় নাই, তীরের দিকে পিছন ফিরিয়া ধীরে ধীরে গভীর জলের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

চিন্তার কটি হইতে কলস পড়িয়া গেল; সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া ছুটিতে ছুটিতে জলের কিনারায় গিয়া দাঁড়াইল। ইহারা দুইজন যে মৃত্যুপণে আবদ্ধ হইয়া হাতে হাত বাঁধিয়া জলে নামিতেছে তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

জলের মধ্যে দুইজন শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। চিন্তাকে দেখিয়া তাহাদের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল; তাহারা যেন মনের মধ্যে মৃত্যুর পরপারে চলিয়া গিয়াছিল, এখন বাধা পাইয়া আবার জীবন্ত-লোকে ফিরিয়া আসিল।

চিন্তা দুই হাত নাড়িয়া তাহাদের ডাকিল।

যুবক-যুবতী কাতরনেত্রে পরস্পরের পানে চাহিল। কি করিবে এখন তাহারা; এক-ব্যক্তি দাঁড়াইয়া দেখিতেছে এ অবস্থায় আত্মহত্যা করা যায় না। তাহারা কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া ধীরে ধীরে তীরের পানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

যুবক-যুবতী তীরে আসিয়া একটি পাথরের উপর বসিল। যুবক লজ্জিতমুখে হাতের

বন্ধন খুলিয়া ফেলিল। তাহাদের যুবক-যুবতী না বলিয়া কিশোর-কিশোরী বলিলেই ভাল হয়; ছেলেটির বয়স কুড়ির বেশী নয়, মেয়েটির পনেরো-ষোলো। দু'জনেই সুশ্রী, মুখে বয়সোচিত সরলতা মাখানো।

চিন্তা দূরে আর একটি পাথরের উপর বসিয়া করলগ্নকপোলে দেখিতে দেখিতে বলিল,—

'তোমাদের বাড়ি কোথায়?'

ছেলেটি কুণ্ঠা-লাঞ্ছিত মুখ তুলিল, বলিল,—

'দাহিসার গ্রামে—এখান থেকে প্রায় দু' ক্রোশ দূরে—'

চিন্তা বলিল,—'তোমরা একাজ করতে যাচ্ছিলে কেন?'

ছেলেটি কাতর স্বরে বলিল,—'আমাদের আর উপায় ছিল না বেন। আমি প্রভাকে বিয়ে করতে চাই—প্রভাও আমাকে—'

প্রভা কুমারী-সুলভ গর্বে একটু ঘাড় বাঁকাইল।

চিন্তা বলিল,—'তারপর?'

ছেলেটি বলিল,—'প্রভার বাপু পাশের গাঁয়ের মহাজনের কাছে অনেক টাকা ধার করেছেন, শোধ দেবার ক্ষমতা নেই। বুড়ো মহাজন বলেছে তার সঙ্গে প্রভার বিয়ে দিতে হবে, নইলে সে প্রভার বাপুর জমিজমা ঘরবাড়ি সব দখল করে নেবে।'

চিন্তা বলিল,—'প্রভার বাপু রাজী হয়েছেন?'

'হুঁ—কাল বিয়ে!'

'তাই তোমরা আত্মহত্যা করতে এসেছ—'

চিন্তা উঠিয়া গিয়া তাহাদের মাঝখানে বসিল, দু'হাতে দু'জনের স্কন্ধ জড়াইয়া লইয়া বলিল,—

'শোনো, তোমরা আত্মহত্যা ক'রো না—গ্রামে ফিরে যাও—'

দু'জনে অবাক্ হইয়া চিন্তার মুখের পানে চাহিল।

চিন্তা বলিল,—'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। মহাজনের সঙ্গে বিয়ে আমি রদ করবার চেষ্টা করব। যদি না পারি, বিয়ের পর তোমরা যা ইচ্ছে ক'রো—'

গুহামধ্যে চিন্তা গল্প বলা শেষ করিয়া কহিল,—

'আমি তাদের আশ্বাস দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছি। এখন তাদের জীবন-মরণ তোমাদের হাতে।'

প্রতাপ আগুনের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—

'কাল বিয়ে?'

চিন্তা বলিল,—'হ্যাঁ, আজ রাত পোহালে কাল বিয়ে।'

প্রতাপ তেজ সিংয়ের দিকে ফিরিল।

'সর্দারজী, আপনি কি বলেন? মহাজনের সঙ্গে বিয়ে হতে দেওয়া উচিত?'

তেজ সিং অপ্রতিভভাবে ক্ষণেক ইতস্তত করিলেন। শেষে বলিলেন,—'না।'

প্রতাপ বলিল,—'কিন্তু আইনে এর কোন দাবাই আছে কি?'

তেজ সিং বলিলেন,—'না।'

প্রতাপ বলিল,—'তাহলে জোর করে এ বিয়ে ভেঙে দিই?'

তেজ সিং বলিলেন,—'হ্যাঁ।'

সকলের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। ভীমভাই নানাভাইয়ের পেটে গোপনে কনুইয়ের একটি গুঁতা মারিয়া চোখ টিপিল।

পরদিন সন্ধ্যা। দহিসার গ্রামে প্রভার পিতৃ-ভবনে সানাই বাজিতেছে। প্রভার পিতা মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ। তাঁহার বাড়ির উন্মুক্ত অংগনে বিবাহমণ্ডপ রচিত হইয়াছে—গ্রাম্য-রীতিতে যতদূর সম্ভব সুসজ্জিত হইয়াছে। গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা একে একে আসিয়া আসরে বসিতেছেন। বরের আসন এখনও শূন্য রহিয়াছে।

বাড়ির অন্দরে একটি ঘরে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বধূ-বেশিনী প্রভাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। সকলে মাংগলিক-গীতি গাহিতেছে, কেহ বা বধূকে সাজাইয়া দিতেছে, কিন্তু কাহারও মুখে হাসি নাই। প্রভা চুপটি করিয়া বসিয়া আছে, মাঝে মাঝে চকিতা হরিণীর মত সশংক-চোখে সকলের মুখের পানে তাকাইতেছে। সে মনে মনে বড় ভয় পাইয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। কাল যখন ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল তখন তাহার মুখে এমন ভয়ের ছাপ পড়ে নাই।

বাড়ির সদরে বারান্দার এক কোণে একটি ঘরের মধ্যে বর ও বরযাত্রীদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বরের সহিত নাপিত পুরোহিত এবং গুটিকয়েক প্রৌঢ় বরযাত্রী আসিয়াছে। বর রূপচন্দ মহাজনের চেহারাটি পাকানো বংশ-যষ্টির মত, গোঁফ অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে, গালের শুষ্ক চর্ম কুঞ্চিত হইয়া ভিতর দিকে চুপ্সাইয়া গিয়াছে. বেশ-ভূষা সমাপ্ত করিয়া এখন মুখের প্রসাধনে মন দিয়াছেন। কিন্তু মুখখানা কিছুতেই মনের মত হইতেছে না। নাপিত তাঁহার মুখের সম্মুখে একটি ছোট আয়না ধরিয়া রাখিয়াছে, তিনি তাহাতে মুখ দেখিতেছেন এবং নানা ভংগী করিয়া, কী উপায়ে মুখখানাকে উন্নত করা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেছেন।

একটা থালার উপর অনেকগুলি পান রাখা ছিল, বর মহাশয় তাহাই এক থাবা তুলিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া দিলেন, তবু যদি গাল দুটি পরিপুষ্ট দেখায়! অতঃপর চুলের কি করা যায়? মাথায় না হয় পাগড়ি থাকিবে কিন্তু গোঁফের অম্লান পরিপক্কতা ঢাকা পড়িবে কি রূপে? বিভ্রান্তভাবে গোঁফের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে শেঠ নাপিতকে শুধাইলেন,—

'কি করি বল্ না রে! গোঁফজোড়া যে বড্ড সাদা দেখাচ্ছে। কামিয়ে দিবি?'

হঠাৎ দ্বারের নিকট হইতে অট্টহাস্যে প্রশ্নের জবাব আসিল। শেঠ চমকিয়া দেখিলেন, একজন পাহাড়ী ঝোলা কাঁধে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখে কাজল, চুলে ধনেশ পাখির পালক। পাহাড়ী হাসিতে হাসিতে বলিল,—

'বল কি শেঠ? এ কি বাপের শ্রাদ্ধ করতে এসেছ যে গোঁফ কামিয়ে ফেলবে? আরে ছি ছি ছি! তোমার নতুন বৌ দেখলে বলবে কি?'

শেঠ রূপচন্দ নবজাগ্রত কৌতূহলের সহিত আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিলেন।—

'পাহাড়ী মনে হচ্ছে! জড়ি-বুটি কিছু জানো নাকি?'

পাহাড়ী ঘরে প্রবেশ করিল। বলিল,—

'তা জানি বৈ কি। আমার এই ঝোলার মধ্যে এমন চীজ আছে, তোমাকে পঁচিশ বছরের ছোকরা বানিয়ে দিতে পারি শেঠ—পঁচিশ বছরের ছোকরা।'

রূপচন্দ উৎফুল্ল হইলেন.—'অ্যাঁ—তা বোসো বোসো। পণ্ডিতজী, লগনের এখনও দেরি আছে তো?'

পুরোহিত বলিলেন,—'এখনও দু'ঘড়ি দেরি আছে।'

পাহাড়ী বলিল.—'আমি এক ঘড়ির মধ্যে তোমার ভোল বদলে দেব শেঠ। কিন্তু তোমার সংগীদের বাইরে যেতে বল. এসব যন্তর-মন্তর একটু আড়ালে করতে হয়—'

রূপচন্দ বলিলেন.—'বেশ তো—বেশ তো। তোমরা সব আসরে গিয়ে বসো, পান তামাক খাও। লগন হলে আমাকে খবর দিও।'

সংগীরা সকলে বাহির হইয়া গেল। পাহাড়ী ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শেঠের সম্মুখে আসিয়া বসিল। শেঠের মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে সে ঝোলার মধ্যে হাত পুরিয়া একটি ভীষণদর্শন ছোরা বাহির করিয়া সহসা শেঠের বুকের উপর

ধরিল। বলিল,—

'চুপটি করে থাকো শেঠ। নইলে তোমার চেহারা এমন বদ্‌লে যাবে যে কিছুতেই মেরামত হবে না।'

পাহাড়ী স্বয়ং প্রতাপ।

রাত্রি হইয়াছে, বিবাহমণ্ডপে আলো জ্বলিতেছে। বরযাত্রী কন্যাযাত্রীর সমাগমে আসর ভরিয়া গিয়াছে। বরযাত্রী কয়জন একস্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বসিয়াছেন এবং পান বিড়ি সেবন করিতেছেন।

কন্যার বাপ অবগুণ্ঠিতা কন্যাকে অন্দর হইতে আনিয়া আসরে পিঁড়ির উপর বসাইয়া দিলেন। পুরোহিত কিছু মন্ত্র পড়িলেন, তারপর হাঁকিলেন,—

'এবার বরকে নিয়ে এস।'

বরযাত্রীরা উঠি উঠি করিতেছেন এমন সময় বর নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরের পাগড়ি হইতে মুখের উপর শোলার ঝালর ঝুলিতেছে। সকলে সরিয়া গিয়া বরের পথ ছাড়িয়া দিল—বর গিয়া কন্যার সম্মুখে পিঁড়ির উপর বসিলেন।

বরের মুখ যদিও কেহই দেখিতে পাইল না, তবু তাঁহার যুবজনোচিত অঙ্গসঞ্চালন দেখিয়া সকলেই একটু বিস্মিত হইল। একজন বরযাত্রী অন্য একটি বরযাত্রীর কানে কানে বলিল,—

'পাহাড়ী ভেল্‌কি দেখিয়ে দিয়েছে—একেবারে ঠাট বদলে দিয়েছে—অ্যাঁ!'

অতঃপর বিবাহবিধি আরম্ভ হইল, পুরোহিত আড়ম্বর সহকারে অতি দ্রুত মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

মণ্ডপের আনাচে-কানাচে পাঁচটি লোক উপস্থিত ছিল, কিন্তু কেহ তাহাদের ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই। তাহারা গ্রামের লোক নয়, কিন্তু অপরিচিত লোক দেখিয়া কেহ কিছু সন্দেহ করে নাই; বরযাত্রীরা ভাবিয়াছিল, তাহারা কন্যাপক্ষীয় লোক এবং কন্যা-পক্ষীয়েরা ভাবিয়াছিল, বরযাত্রী ছাড়া আর কে হইতে পারে। বিবাহ বাসরে এরূপ ভ্রান্তি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

নানাভাই, প্রভু, ভীমভাই, পুরন্দর ও তেজ সিং একটি একটি খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া বিবাহক্রিয়া দেখিতেছিলেন; প্রতাপ বর-কন্যার আসনের কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার আর পাহাড়ী-বেশ নাই, ঝোলা অন্তর্হিত হইয়াছে; কেবল কোমর হইতে একটি মধ্যমাকৃতি থলি ঝুলিতেছে।

পুরোহিত বর-বধূর হস্ত সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহার উপর একটি নারিকেল রাখিয়া প্রবল বেগে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

অর্ধঘণ্টা মধ্যে বিবাহক্রিয়া সমাপ্ত হইল।

পুরোহিত ও কন্যার পিতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পুরোহিত সভার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

'বিবাহবিধিঃ সমাপ্তা। সজ্জনগণ, নবদম্পতীকে আশীর্বাদ করুন।'

সভা হইতে মৃদু হর্ষধ্বনি উঠিল কিন্তু পরক্ষণেই তাহা নীরব হইল। সকলে দেখিল, একজন অপরিচিত ব্যক্তি বর-বধূর নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; ঈষৎ হাসিয়া সে বর ও বধূর মুখ হইতে আবরণ সরাইয়া ছিল।

অপরিচিত ব্যক্তির এই স্পর্ধায় সকলেই অসন্তুষ্ট হইত কিন্তু বরের মুখ দেখিয়া তাহা ভুলিয়া গেল। এ তো বৃদ্ধ মহাজন রূপচন্দ নয়; পাহাড়ীর ভেল্‌কিবাজিও শুষ্ক মহা-জনকে কুড়ি বছরের কমকান্তি যুবকে পরিণত করিতে পারে না। তাছাড়া যুবকটি গ্রামের সকলেরই পরিচিত। প্রথম বিমূঢ়তার চটকা ভাঙিলে সভা হইতে একজন বলিয়া উঠিল,—

'আরে এ যে চন্দু—আমাদের পাড়ার চন্দু!'

প্রতাপ নত হইয়া প্রভার কানে প্রশ্ন করিল,—

'বেন, চোখ তুলে দেখ। বর পছন্দ হয়েছে?'

প্রভা একবার শঙ্কা-নিবিড় চোখ দুটি তুলিল, ক্ষণেকের জন্য বিস্ময়ানন্দে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল, তারপর সে চক্ষু নত করিল।

বরযাত্রিগণ এতক্ষণে সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন এবং নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে বরাসনে যে-ব্যক্তি বসিয়া আছে সে আর যে হোক রূপচন্দ মহাজন নয়। তাঁহারা একজোটে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একজন সক্রোধে প্রশ্ন করিলেন,—

'এ কি—এ সব কী! আমাদের বর কোথায়?'

প্রতাপের মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মণ্ডপের প্রবেশপথের দিকে দেখাইল।

ছিন্নবাস আলুথালু বেশে শেঠ প্রবেশ করিতেছেন। এখনও তাঁহার হাত হইতে দড়ি ঝুলিতেছে। প্রতাপ তাঁহার মুখ বাঁধিয়া হাত-পা বাঁধিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই অবস্থা হইতে তিনি বহুকষ্টে মুক্ত হইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছেন। কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি বরাসনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বর-বধূর দিকে জ্বলন্ত অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি শেষে কন্যার পিতার পানে ফিরিলেন—

'দাগাবাজ জোচ্চোর! আমাকে এই অপমান! তোর সর্বনাশ করব আমি। তোর ভিটে-মাটি চাটি করব—'

প্রতাপ শান্ত কণ্ঠে কহিল,—

'রাগ ক'রো না শেঠ, যা হয়েছে ভালই হয়েছে।'

শীর্ণ দেহ ধনুকের মত বাঁকাইয়া শেঠ প্রতাপের পানে ফিরিলেন।

'তুই কে রে—তুই কে? অ্যাঁ পাহাড়ী।'

প্রতাপের মুখ গম্ভীর হইল, সে গলা চড়াইয়া সকলকে শুনাইয়া বলিল,—

'পাহাড়ী নই—আমি প্রতাপ বারবটিয়া।—শেঠ, আমি একলা আসিনি—আমার সঙ্গীরা এই সভাতেই আছে, সুতরাং কেউ গোলমাল করবার চেষ্টা ক'রো না।—এই ঘাটের মড়ার সঙ্গে প্রভাবেনের বিয়ে দিলে শুধু প্রভার বাপের নয়, গাঁসুদ্ধ লোকের অধর্ম হত। আমরা সেই অধর্ম থেকে তোমাদের রক্ষা করেছি। কিন্তু এমন কাজ ভবিষ্যতে আর ক'রো না।—মহাজন, তোমার টাকা তুমি ফেরত পাবে, এখন বাড়ি ফিরে যাও। মনে থাকে যেন, প্রভার বাপের ওপর যদি কোনও জুলুম হয় আবার আমরা ফিরে আসব।—প্রভাবেন, এই নাও তোমার বিয়ের যৌতুক, এই দিয়ে তোমার বাপুর ঋণ শোধ ক'রো।'

প্রতাপ কোমর হইতে থলি লইয়া প্রভার কোলের উপর একরাশ মোহর ঢালিয়া দিল। সভাসুদ্ধ লোক হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

চাঁদনী রাত্রি। সুদূরপ্রসারী আবছায়া প্রান্তরের উপর দিয়া প্রতাপের দল ফিরিয়া চলিয়াছে, ছয়টি ঘোড়া পাশাপাশি ছুটিতেছে। তাহাদের সম্মুখে নবোদিত পূর্ণচন্দ্র পূর্ব-গগনে স্থির হইয়া আছে।

ছুটিতে ছুটিতে একটি ঘোড়া দল হইতে পৃথক হইয়া গেল—সে মোতি। প্রতাপ তাহার পৃষ্ঠ হইতে হাত নাড়িয়া বলিল,—

'তোমরা ফিরে যাও—আমি কাল সকালে ফিরব।'

প্রতাপ ক্রমে দল হইতে দূরে সরিয়া গেল। দলের পাঁচটি ঘোড়া পাশাপাশি চলিয়াছে—মাঝখানে তেজ সিং। নানাভাই তাঁহার পানে চাহিয়া একটু হাসিল। বলিল,—

'তৃষ্ণার্ত বিরহী জলের সন্ধানে চল্‌ল।'

ভীমভাই বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল,—

'বলতে নেই পরের বিয়ে দেখলে মনটা কিঞ্চিৎ খারাপ হয়ে যায়। আমারও তিলুর

জন্যে—'

ভীমের ঘোড়া সকলকে ছাড়াইয়া আগে বাড়িল।

চন্দ্র আকাশে হাসিতেছে।

চিন্তার পরপের সম্মুখ দিয়া পথের যে অংশ গিয়াছে, একজন অশ্বারোহী সেই চড়াই-পথে পরপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চাঁদের আলোয় দূর হইতে দেখিলে মনে হয় বুঝি প্রতাপ, কিন্তু কাছে আসিলে দেখা যায়—কান্তিলাল। খবাকৃতি ঘোড়ার পশ্চাদ্ভাগে খেজুর-ছড়ি দিয়া তাড়না করিতে করিতে কান্তিলাল অভিসারে চলিয়াছে।

পরপের দৃষ্টিসীমার মধ্যে পৌঁছিয়া সে ঘোড়া হইতে নামিল, ঘোড়ার রাস ধরিয়া রাস্তা হইতে কিছু দূরে একটি শুষ্ক বৃক্ষের শাখায় তাহাকে বাঁধিল; তারপর আপন মনে দন্ত বিকীর্ণ করিয়া হাসিতে হাসিতে লঘুপদে পরপের দিকে চলিল।

পরপের বারান্দার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ঘরের দ্বার রুদ্ধ। কান্তিলাল পা টিপিয়া টিপিয়া বারান্দায় উঠিতে যাইবে এমন সময় দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ক্ষুরধ্বনি পরপের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কান্তিলাল ক্ষণেক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, তারপর দ্রুত ফিরিয়া গিয়া একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপকে মোতির পৃষ্ঠে আসিতে দেখা গেল। কান্তিলাল ঝোপের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া প্রতাপকে দেখিল, কিন্তু আবছায়া-আলোতে ঠিক চিনিতে পারিল না। প্রতাপ মোতির পৃষ্ঠ হইতে বারান্দায় নামিয়া মোতিকে ছাড়িয়া দিল, তারপর দ্বারে গিয়া টোকা মারিল।

'চিন্তা, দোর খোলো—আমি প্রতাপ।'

ঝোপের আড়ালে কান্তিলালের চোখদুটা ধক্ করিয়া উঠিল। প্রতাপ! প্রতাপ বারবটিয়া! সে আবার ঝোপের ফাঁক দিয়া দেখিল, সম্মুখেই মোতি দাঁড়াইয়া আছে। হ্যাঁ, প্রতাপের ঘোড়াই তো বটে। কান্তিলালের সমস্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় শক্ত হইয়া উঠিল।

ওদিকে চিন্তা দ্বার খুলিয়াছিল; প্রতাপ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কান্তিলাল উত্তেজনা-প্রজ্বলিত চোখে শুষ্ক অধর লেহন করিল।

ঘরের ভিতরটি প্রদীপের মৃদু-আলোকে স্নিগ্ধ হইয়া আছে। প্রতাপ ও চিন্তা বাহুতে বাহু জড়াইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে। প্রতাপের মুখে একটু করুণ হাসি, চিন্তার সদ্য ঘুমভাঙা চোখে বিস্ময়ানন্দের কিরণ। প্রতাপ যে আজই আবার আসিবে তাহা সে আশা করিতে পারে নাই।

'কী হল—প্রভার বিয়ে?'

প্রতাপ বলিল,—'হয়ে গেল—(চিন্তার সপ্রশ্নদৃষ্টির উত্তরে) হ্যাঁ, ঠিক লোকের সঙ্গেই। কিন্তু—'

চিন্তা বলিল,—'কিন্তু কি?'

প্রতাপ বলিল,—'কিন্তু নয়, সবই ঠিক হয়েছে। কিন্তু ফিরে আসবার পথে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল—তাই তোমার কাছে চলে এলাম চিন্তা। আজ আবার নতুন করে মনে হল—আমার জীবন কোন্ পথে চলেছে—কোথায় চলেছি আমরা—'

প্রতাপের মন কোনও কারণে—কিংবা অকারণেই—বিক্ষুব্ধ হইয়াছে বুঝিয়া চিন্তা নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। যাহারা দুর্গম পথে একেলা চলে তাহাদের মনে এইরূপ সংশয় মাঝে মাঝে উদয় হয়, চিন্তা জানিত। তাহার নিজের মনেও কতবার কত বিক্ষোভ জাগিয়াছে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক; প্রিয়জনের কাছে হৃদয়ভার লাঘব করিতে পারিলেই তাহা কাটিয়া যায়।

বাহিরে কান্তিলাল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, প্রতাপ বাহিরে আসিল না তখন সে পা টিপিয়া টিপিয়া ঝোপ হইতে বাহির হইল, সিধা বারান্দার দিকে না গিয়া একটু

ঘুরিয়া পরপের পিছন দিকে চলিল।

ঘরের পিছনের দেয়ালে সমচতুষ্কোণ ক্ষুদ্র গবাক্ষ; নিম্নে চারিদিকে শুষ্কপত্র ছড়ানো রহিয়াছে; কান্তিলাল অতি সাবধানে গুঁড়ি মারিয়া জানালার নীচে উপস্থিত হইল। ভিতর হইতে কথাবার্তার আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। কান্তিলাল কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর প্রতাপ ও চিন্তা ঝুলোর উপর বসিয়াছে। প্রতাপ বলিয়া চলিয়াছে—

'যেদিন প্রথম এ পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেদিন জানতাম না কোথায় এ-পথ শেষ হবে—তারপর কতদিন কেটে গেল—আজও জানি না এ পথের শেষ কোথায়। তুমি জানো চিন্তা?'

চিন্তা বলিল,—'ঠিক জানি না! কিন্তু পথে চলাই কি একটা লক্ষ্য নয়?'

প্রতাপ বলিল,—'হয়তো তাই—হয়তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পথেই চলতে হবে। নিজের জন্য ভাবি না, কিন্তু তোমার কথা ভেবে বড় দুঃখ হয় চিন্তা! তোমার জীবনটা আমি নষ্ট করে দিলাম। আমি যদি তোমার জীবনে না আসতাম, তুমি হয়তো কোন গৃহস্থকে বিয়ে করে স্বামী-সংসার নিয়ে সুখী হতে—'

চিন্তা শান্তস্বরে বলিল,—'আমার জীবনকে তোমার জীবন থেকে আলাদা করে দেখছো কেন? তুমি কি আমাকে মনের মধ্যে নিজের করে নাও নি?'

প্রতাপ বাহু ধরিয়া চিন্তাকে কাছে টানিয়া লইয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল,—

'আমায় মাপ কর চিন্তা। আমারই ভুল—আমারই ভুল।'

জানালার নীচে কান্তিলাল পূর্ববৎ শুনিতেছিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় এরূপ ধরনের কথাবার্তা সে মোটেই প্রত্যাশা করে নাই; দুইজন যুবক-যুবতীর মধ্যে নির্জন গভীররাত্রে যে এরূপ আলোচনা চলিতে পারে ইন্দ্রিয়সর্বস্ব কান্তিলালের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও দুরূহ।

ঘরের মধ্যে প্রতাপ আবার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—

'তোমার আমার কথা ছেড়ে দিলেও আর একটা কথা আছে চিন্তা। সারা পৃথিবী জুড়ে নির্ধনের ওপর ধনীর এই উৎপীড়ন চলছে, আমরা মুষ্টিমেয় ক'জন তার কতটুকু প্রতিকার করতে পারি? বুকের রক্ত দিতে পারি, জীবন আহুতি দিতে পারি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কতটুকু ফল হবে? মরুভূমিতে একবিন্দু জলের মত আমাদের এই প্রাণপণ চেষ্টা নিমেষে শুকিয়ে যাবে।'

চিন্তা ক্ষণেক নীরব রহিল। শেষে বলিল,—

'তবে কি এর কোনও উপায় নেই?'

প্রতাপ বলিল,—'আমি অনেক ভেবেছি, কোনও কুল-কিনারা পাই নি চিন্তা, আমাদের রোগ যেখানে ওষুধও সেখানে। মানুষের সমাজে যতদিন অবস্থার প্রভেদ আছে ততদিন ধনী দরিদ্রকে নির্যাতন করবে, শক্তিমান দুর্বলকে পীড়ন করবে।'

'তবে?'

'যদি কখনও এমন দিন আসে যখন মানুষে মানুষে অবস্থার ভেদ থাকবে না, সকলে আপন আপন শক্তি অনুযায়ী কাজ করবে আর সমান বৃত্তি পাবে—সেইদিন মানুষের দুঃখের যুগ শেষ হবে। সেদিন কবে আসবে জানি না—হয়তো কোনদিনই আসবে না।'

'আসবে। কিন্তু যতদিন না আসে?'

প্রতাপ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'ততদিন আমরা লড়াই করে যাব। তুমি এই পরপ থেকে আমার কাছে পায়রার দূত পাঠাবে, আর আমি রাত্রে চোরের মত এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।'

ঘরের মধ্যে যখন এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছিল কান্তিলাল ধীরে ধীরে উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। অনবধানে একটি শুষ্কপত্রের উপর পা পড়িতেই মচ্ করিয়া শব্দ হইল। কান্তিলাল আর দাঁড়াইল না, ক্ষিপ্রপদে পলায়ন

করিল।

ঘরের ভিতর প্রতাপ ও চিন্তা আওয়াজ শুনতে পাইয়াছিল। প্রতাপ লাফাইয়া আসিয়া জানালার বাহিরে গলা বাড়াইল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কান্তিলাল তখন দ্রুতগতিতে নিজের ঘোড়ার কাছে পৌঁছিয়াছে।

চিন্তা প্রতাপের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতাপ ফিরিয়া বলিল,—

'কেউ নেই। কিন্তু ঠিক মনে হল—'

চিন্তা বলিল,—'কোনও জন্তু-জানোয়ার হবে।'

ওদিকে কান্তিলাল তখন নিজের ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। তাহার মুখে বিজয়ীর হাসি। খেজুর ছড়ি দিয়া ঘোড়াটাকে পিটাইতে পিটাইতে সে নিজমনেই বলিতেছে,—

'চল্ চল্, ছুটে চল্। আর যাবে কোথায় বারবটিয়া—আর যাবে কোথায় পানিহারিন্!'

পরপের কক্ষে প্রতাপ চিন্তার কাছে বিদায় লইতেছিল—

'এবার যাই চিন্তা। রাত শেষ হয়ে এল, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।'

চিন্তা একটু হাসিল। প্রতাপ দ্বারের দিকে ফিরিতেছিল, চিন্তা বলিল,—'একটা খবর দিতে ভুলে গেছি।'

প্রতাপ ফিরিয়া প্রশ্ন করিল,—'কী খবর?'

চিন্তা বলিল,—'সর্দার তেজ সিংয়ের স্ত্রী মর-মর। স্বামী নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে তিনি অন্নজল ত্যাগ করেছিলেন, এখন একেবারে শয্যা নিয়েছেন। দু'চার দিনের মধ্যে তিনি যদি স্বামীকে ফিরে না পান তাহলে তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না।'

প্রতাপ কিছুক্ষণ চিন্তা-তন্ময় চোখে চিন্তার পানে চাহিয়া রহিল। তারপর অস্ফুট-স্বরে আপনমনেই বলিল,—

'বাঁচানো যাবে না—'

পরদিন প্রভাত।

দস্যুদের গুহামুখে প্রতাপ ও তেজ সিং মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছেন। প্রতাপ একহাতে তেজ সিংয়ের তরবারি, অন্যহাতে সে একটি সজ্জিত অশ্বের বল্গা ধরিয়া আছে। কিছু দূরে তিলু ভীম প্রমুখ আর সকলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

প্রতাপ বলিল,—' এই নিন আপনার তলোয়ার—এখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে সটান বাড়ি যাবেন।'

তেজ সিং বলিলেন,—'তুমি আমাকে বিনা শর্তে মুক্তি দিচ্ছ?'

প্রতাপ বলিল,—'একটি মাত্র শর্ত আছে—আপনি পথে কোথাও দাঁড়াবেন না, সিধা বাড়ি যাবেন।'

তেজ সিং তরবারি কোমরে বাঁধিলেন।

তেজ সিং বলিলেন,—'কেন আমাকে হঠাৎ মুক্তি দিচ্ছ জানি না, কিন্তু এ অনুগ্রহ আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

প্রতাপ বলিল,—'আশা করি আমাদের খুব মন্দ ভাববেন না।'

তেজ সিং বলিলেন,—'আমি যা চোখে দেখেছি তারপরও যদি তোমাদের মন্দ ভাবি তাহলে ভগবানের চোখে অপরাধী হব। চললাম তিলুবেন, চললাম ভাইসব—তোমাদের কোনোদিন ভুলব না।'

তেজ সিং লাফাইয়া ঘোড়ার পিঠে উঠিলেন। তিলুর চোখ দুটি একটু ছলছল করিল।

তিলু বলিল,—'আমার বাবা রতিলাল শেঠ মামুদপুরে থাকেন, তাঁর সঙ্গে যদি দেখা হয় বলবেন আমি ভাল আছি।'

ভীমভাই বলিল,—'আর বলতে নেই যদি সম্ভব হয় তিলুর জন্যে কিছু কুড়মুড়া

পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।'

বিদায়ের বিষণ্ণতার উপর হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল।

তেজ সিং বলিলেন,—'বেশ, চিন্তাবেনের কাছে পাঠিয়ে দেব। চললাম, আমাকে ভুলো না। যদি কখনও দরকার হয় স্মরণ ক'রো।'

তেজ সিং বিদায়-সম্ভাষণে দুই করতল যুক্ত করিলেন। তাঁহার ঘোড়া চলিতে আরম্ভ করিল।

দিবা তৃতীয় প্রহর।

চিন্তার পরপের সম্মুখে দুইটি ডুলি আসিয়া থামিল। একটিতে শেঠ গোকুলদাস বিরাজ করিতেছেন, অপরটি শূন্য। ডুলি ঘিরিয়া কান্তিলাল প্রমুখ ছয়জন বন্দুকধারী অশ্বারোহী তো আছেই, উপরন্তু আরও দশ-বারো জন সশস্ত্র পদাতি।

গোকুলদাস কান্তিলালের দিকে চোখের ইশারা করিয়া বলিলেন,—

'দ্যাখ ঘরে আছে কি না।'

কান্তিলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া পরপের দিকে অগ্রসর হইল।

ঘরের মধ্যে চিন্তা পায়রা দুটিকে শস্য দিতেছিল, তাহারা খুঁটিয়া খাইতেছিল। বাহিরে বহু জনসমাগণের শব্দে সে গলা বাড়াইয়া দেখিল গোকুলদাসের দল, কান্তিলাল ঘরের দিকে আসিতেছে।

কান্তিলাল বারান্দার নিকট আসিয়া দাঁত বাহির করিয়া দাঁড়াইল। চিন্তার মুখ অপ্রসন্ন হইল, কিন্তু সে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জলের ঘটি হস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গোকুলদাসের অভিমুখে অগ্রসর হইল। কান্তিলাল তাহার অনুসরণ করিল না, ঐখানে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

চিন্তা গোকুলদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি জলপানের কোনও চেষ্টা না করিয়া নির্নিমেষ সর্প-চক্ষু দিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। চিন্তা নীরসস্বরে বলিল,—

'জল নাও—'

গোকুলদাস পূর্ববৎ অজগরের সম্মোহন-চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন, তারপর সহসা বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করিলেন,—

'তুই প্রতাপ বারবটিয়ার গোয়েন্দা!'

চিন্তার হাত হইতে ঘটি পড়িয়া গেল। সে সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পদাতি লোকগুলি তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে; পলাইবার পথ নাই।

গোকুলদাস ডুলি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অনুচরদের হুকুম দিলেন,—

'এর হাত চেপে ধর।'

দুইজন পদাতি চিন্তার দুই হাত চাপিয়া ধরিল; তখন গোকুলদাস তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া কর্কশস্বরে বলিলেন,—

'শয়তান ছুঁড়ি, তোর সব কেচ্ছা জানি। প্রতাপ বারবটিয়া তোর নাগর—রাত্রে লুকিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসে! আর তুই পায়রা উড়িয়ে তাকে খবর পাঠাস্! অ্যাঁ!'

চিন্তা রুদ্ধস্বরে বলিল,—'আমি কিছু জানি না।'

গোকুলদাস বলিলেন,—'জানি না?—দে তো ওর হাতে মোচড়, কেমন জানে না দেখি।'

পদাতিদ্বয় চিন্তার হাতে মোচড় দিল, চিন্তা যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

গোকুলদাস বলিলেন,—'এখনি হয়েছে কি, তোর অনেক দুর্গতি করব। তুই সরকারের নিমক খাস আর বারবটিয়ার গোয়েন্দাগিরি করিস! ভাল চাস্ তো বল, প্রতাপ বারবটিয়া কোথায় থাকে—তাহলে তোকে ছেড়ে দেব। বলবি?'

চিন্তা বলিল,—'আমি কিছু জানি না।'

গোকুলদাস পদাতিদের ইশারা করিলেন, তাহারা আবার চিন্তার হাতে মোচড় দিল।

এবার চিন্তা চীৎকার করিল না, অধর দংশন করিয়া নীরব রহিল।

গোকুলদাস বলিলেন,—'বল্‌বি?'

চিন্তা পাংশু মুখে বলিল,—'আমি কিছু জানি না।'

গোকুলদাস হাসিলেন; তিনি ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। বলিলেন,—'ওর মুখ বেঁধে ডুলিতে তোল্‌।'

পদাতিরা চিন্তার মুখ বাঁধিয়া দ্বিতীয় ডুলির মধ্যে ফেলিল।

গোকুলদাস বলিলেন,—'তুই ভেবেছিস, তুই না বললে তোর নাগরকে ধরতে পারব না? তোকে যখন ধরেছি তখন সে যাবে কোথায়! —কান্তিলাল, একটা পায়রা ধরে আন।'

কান্তিলাল বলিল,—'এই যে শেঠ, এনেছি।'

সে ইতিমধ্যে চিন্তার ঘরে প্রবেশ করিয়া দুইটি পায়রার মধ্যে একটিকে ধরিয়াছিল, পোষা পায়রা ধরিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই।

গোকুলদাস কুর্তার পকেট হইতে এক চিল্‌তা কাগজ বাহির করিলেন। কাগজে লেখা ছিল—

প্রতাপ বারবটিয়া,

তোমার প্রণয়িনী পরপওয়ালীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। যদি তার প্রাণ ও ধর্ম রক্ষা করতে চাও, তবে কাল সূর্যোদয়ের আগে আমার দেউড়িতে এসে ধরা দাও। যদি ধরা না দাও, সূর্যোদয়ের পর তোমার প্রণয়িনীকে আমার ভৃত্য কান্তিলালের হাতে সমর্পণ করা হবে।

—গোকুলদাস শেঠ

চিঠি কপোতের পায়ে বাঁধিয়া তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর গোকুলদাস নিজ ডুলিতে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন,—

'নে, জলদি ফিরে চল্‌। দেখি এবার বারবটিয়া কোথায় যায়!'

দুইটি ডুলি লইয়া দলবল আবার নিম্নাভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

শৈলরেখাবন্ধুর পশ্চিমদিগন্তে অস্তরাগ লাগিয়াছে। গুহামুখে দাঁড়াইয়া প্রতাপ কপোতের পা হইতে চিঠি খুলিতেছে। আর সকলে তাহার চারিপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

কপোতটিকে তিলুর হাতে দিয়া প্রতাপ সাগ্রহে চিঠি খুলিল। চিঠির সম্বোধন পড়িয়াই তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। চিঠি পড়া যখন শেষ হইল তখন তাহার মুখের সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখ মৃতের মত পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে।

সকলেই তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল; নানাভাই বলিয়া উঠিল,—

'কী হল প্রতাপভাই?'

প্রতাপের অবশ হস্ত হইতে চিঠিখানা মাটিতে খসিয়া পড়িল। সে উত্তর দিতে পারিল না, একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িয়া দু'-হাতে মুখ ঢাকিল।

নানাভাই ভূপতিত চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, আর সকলে উদ্বিগ্নমুখে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

দিবালোক প্রায় নিভিয়া গিয়াছে। রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে, কৃষ্ণা প্রতিপদের চাঁদ এখনও উঠে নাই।

গুহার সম্মুখে মোতির রাস ধরিয়া দাঁড়াইয়া প্রতাপ। তাহার কোমরে দুটি পিস্তল, আর কোনও অস্ত্র নাই। সে সঙ্গীদের সম্বোধন করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিতেছে,—

'আমি ধরা দিতে চললাম। আর বোধহয় আমাদের দেখা হবে না। তোমাদের উপদেশ দেবার মত কোনও কথাই এখন খুঁজে পাচ্ছি না—তোমরা পরামর্শ করে যা ভাল বোঝ, ক'রো। আর আমার শেষ অনুরোধ, আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে বৃথা রক্তপাত ক'রো না। বিদায়!'

প্রতাপ একে একে সকলকে আলিঙ্গন করিল, তিলুর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিল, তারপর মোতির পৃষ্ঠে চড়িয়া অবলীয়মান আলোর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

গোকুলদাসের প্রাসাদের নিম্নতলে একটি প্রকোষ্ঠে চিন্তা বন্দিনী রহিয়াছে। তাহার দুই হাত শৃঙ্খলিত, সে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া শুষ্কচোখে শূন্যে চাহিয়া আছে। তাহার মাথার উপর প্রায় ছাদের কাছে একটি ক্ষুদ্র গরাদহীন গবাক্ষ; গবাক্ষপথে চাঁদের আলো ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রকোষ্ঠের দৃঢ় লৌহদ্বারের বাহিরে কান্তিলাল ও আর একজন প্রহরী পাহারা দিতেছে। কান্তিলালের সর্বাঙ্গে জ্বরজনিত উত্তাপের অস্থিরতা। যেন খাঁচায় ইঁদুর ধরা পড়িয়াছে, আর ক্ষুধিত বিড়াল খাঁচার চারিপাশে পাক খাইতেছে।

উপল-কঠিন প্রান্তরের উপর দিয়া প্রতাপ মোতির পৃষ্ঠে ছুটিয়া চলিয়াছে; পাথরের উপর মোতির ক্ষুরধ্বনি নাকাড়ার মত দ্রুতচ্ছন্দে বাজিতেছে। চাঁদের কিরণে দৃশ্যটি স্বপ্নময়। মোতির পিছনে দীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে।

গুহার মধ্যে চারিটি পুরুষ ও একটি নারী আগুন ঘিরিয়া নীরবে বসিয়া আছে। আজ রন্ধনের আয়োজন নাই, চটুল হাস্য পরিহাস নাই। তিলু একপ্রান্তে বসিয়া আছে, তাহার গণ্ড বহিয়া নিঃশব্দে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

পুরুষদের মধ্যে ভীমভাইয়ের অবস্থা সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়। অন্য সকলে হতাশ গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে কিন্তু ভীম যেন এই প্রচণ্ড আঘাতে একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। সে দুই জানু বাহুবন্ধ করিয়া আগুনের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে; তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয চিন্তা করিবার শক্তিও তাহার অবশ হইয়া গিয়াছে।

সহসা পুরন্দর মুখ তুলিল,—

'এখানে থেকে আর লাভ কি?'

প্রভু মাথা নাড়িল।

'কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে—'

নানাভাই বলিল,—'তার চেয়ে প্রতাপ যেখানে ধরা দিতে গেছে সেই শহরে—'

পুরন্দর বলিল,—'কিন্তু প্রতাপভাই মানা করে গেছেন।'

প্রভু বলিল,—'রক্তপাত আমরা করব না। কিন্তু রক্তপাত না করেও ওদের উদ্ধারের চেষ্টা করা যেতে পারে।'

নানা ও পুরন্দর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। প্রভু ভীমের দিকে ফিরিয়া দেখিল তাহাদের কথা ভীমের কানে যায় নাই। প্রভু বলিল,—

'ভীম, তুমি কি বল?'

ভীম চমকিয়া উঠিল,—

'অ্যাঁ! কী?'

প্রভু বলিল,—'আমরা শহরে যেতে চাই; প্রতাপের কাছাকাছি থাকলেও হয়তো তাকে সাহায্য করতে পারব। —তিলুবেন, তুমি কি বল?'

তিলু কথা বলিল না, কেবল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। ভীমের মুখভাব কিন্তু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

'শহরে! কিন্তু—যদি কেউ আমাদের চিনতে পারে?'

তিলু ও আর সকলে একটু অবাক্ হইয়া ভীমের পানে তাকাইল। প্রভু বলিল,—

'প্রতাপের শহরে আমাদের কে চিনবে? আমরা কেউ ও শহরের লোক নই। তা ছাড়া আমরা গা-ঢাকা দিয়ে থাকব; সেখানে লছমন আছে, সে আমাদের লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা

করবে।'

ভীম যেন এখনও নিঃসংশয় হইতে পারে নাই, এমনিভাবে স্খলিতস্বরে বলিল,-

'তা—তা—এখানেও তো আর নিরাপদ নয়—শহরে যদি—'

সম্মুখদিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া প্রতাপ মোতির পৃষ্ঠে বসিয়া আছে; মোতি গিরিকান্তার পার হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার মুখে ফেনা, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে।

চন্দ্র মধ্যাকাশে। মোতির ছায়া তাহার পেটের নীচে পড়িয়াছে। প্রতাপ মোতির গ্রীবার উপর হাত রাখিয়া মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বলিতেছে,—

'মোতি, আরও জোরে চল্ বেটা—এখনও অর্ধেক পথ বাকি।'

চিন্তার কারাকক্ষের দ্বারমুখে কান্তিলাল পায়চারি করিতে করিতে পাহারা দিতেছে, অন্য প্রহরীটা দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। দূরে কোতোয়ালীর ঘড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজিল।

গোকুলদাসের চোখে নিদ্রা ছিল না, তিনি আসিয়া দেখা দিলেন। কান্তিলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'কি রে, আছে তো ছুঁড়ি?'

কান্তিলাল নৃশংস-হাস্যে দন্ত বাহির করিল।

'যাবে কোথায় শেঠ? চাবি দাও, খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

গোকুলদাস কোমর হইতে চাবি দিলেন, কান্তিলাল তালা খুলিয়া দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিল। ফাঁক দিয়া উভয়ে দেখিলেন, চিন্তা দেয়ালে ঠেস্ দিয়া পূর্ববৎ বসিয়া আছে, একটু নড়েও নাই।

দ্বারে তালা লাগাইয়া গোকুলদাস আবার চাবি কোমরে ঝুলাইলেন।

'বারবটিয়া যদি সূর্যোদয়ের আগে ধরা না দেয়—'

কান্তিলালের চক্ষু লোভে জ্বলিয়া উঠিল, সে সৃক্কণী লেহন করিল।

মোতি চলিয়াছে। ফেনায় ঘর্মে তাহার সর্বাঙ্গ আপ্লুত।

সম্মুখে পাহাড়ের একটা চড়াই। মোতি একটা নালা লাফাইয়া পার হইয়া গেল, তারপর চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিল। ছায়া এখন তাহার সম্মুখে; সে যেন নিজের ছায়াকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছে।

প্রতাপ অস্ফুটস্বরে বলিল,—

'আর একটু, আর একটু মোতি! এই পাহাড়টা পার হলেই—'

পূর্বাকাশে একটুখানি আলোর ঝিলিক দেখা দিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে এখনও তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে নাই। পশ্চিম গগনে চন্দ্র প্রভাহীন।

মোতি এখন সমতল বালুময় ভূমি দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছিতে আর দেরি নাই।

কিন্তু সমস্ত রাত্রি অবিশ্রাম ছুটিবার পর মোতির বিপুল প্রাণশক্তিও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। এতক্ষণ সে যন্ত্রবৎ ছুটিয়াছে, উচ্চনীচ উদ্‌ঘাত কিছুই তাহার গতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। কিন্তু এখন সহসা তাহার গতিবেগ প্রশমিত হইল, তাহার তীরের ন্যায় ঋজু-গতি এলোমেলো হইয়া গেল। তারপর ক্লান্ত পা'গুলি দুমড়াইয়া মোতি মাটির উপর পড়িয়া গেল।

প্রতাপ ছিট্‌কাইয়া দূরে পড়িল। বালুর উপর তাহার আঘাত লাগিল না, সে দ্রুত উঠিয়া মোতির কাছে আসিয়া বুকভাঙা স্বরে ডাকিল,—

'মোতি!'

মোতি আর উঠিল না। তাহার হৃৎস্পন্দন থামিয়া আসিতেছিল, সে বিকৃত নাসারন্ধ্র হইতে কয়েকটি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর তাহার দেহ স্থির হইল।

প্রতাপ মোতির গ্রীবার উপর লুটাইয়া পড়িল,—

'মোতি—বেটা!'

পূর্বাকাশ সিন্দুরবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, সূর্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই। পাখি ডাকিতেছে।

গোকুলদাসের প্রাসাদভূমিতে বহু সেপাই সান্ত্রী; প্রতাপ বারবটিয়াকে ধরিবে বলিয়া সকলের সশস্ত্র ও সতর্কভাবে রাত কাটিয়াছে। ইহারা সকলেই গোকুলদাসের বেতনভুক্। হয়তো ইহাদের মধ্যে প্রতাপের দলভুক্ত দুই চারিটি লোক গুপ্তভাবে আছে, কিন্তু কাহারও আচরণ দেখিয়া তাহা সন্দেহ হয় না। তাহারা অন্য সকলের সহিত পাহারা দিয়াছে, হয়তো চিন্তাকে উদ্ধার করিবার উপায় খুঁজিয়াছে, কিন্তু আদেশদাতা নেতার অভাবে কিছুই করিতে পারে নাই।

চিন্তার অবরোধ-কক্ষের সম্মুখের অলিন্দে দাঁড়াইয়া গোকুলদাস বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার ললাটে নিষ্ফল ক্রোধের ভ্রূকুটি।

চক্রবাল-রেখায় ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হইল।

গোকুলদাস মনে মনে গর্জন করিলেন—বারবটিয়া আসিল না। শয়তান ধরা দিল না। আচ্ছা, তবে রাজপুতনীটাই তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

কান্তিলাল ও অন্য প্রহরীটা গোকুলদাসের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি ফিরিয়া বলিলেন,—

'কাহ্ন, তুই কোতোয়ালীতে যা—কোতোয়ালকে ডেকে নিয়ে আয়! বল্‌বি যে আমি প্রতাপ বারবটিয়ার দলের একটা মেয়েকে ধরেছি—শিগ্‌গির এসে তাকে গ্রেপ্তার করুক।'

'যো হুকুম।'

কাহ্ন চলিয়া গেলে কান্তিলাল ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল,—

'শেঠ, আমার বক্‌শিশ।'

গোকুলদাস বিকৃতমুখে হাসিয়া চাবি তাহার হাতে দিলেন,—

'এই নে তোর বক্‌শিশ।'

অধৈর্য-স্খলিতহস্তে কান্তিলাল দ্বারের তালা খুলিল। দুহাতে দ্বার ঠেলিয়া যেই সে প্রবেশ করিতে যাইবে অমনি ভিতর হইতে পিস্তলের আওয়াজ হইল। কান্তিলালকে প্রবেশ করিতে হইল না, সে চৌকাঠের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল। গোকুলদাস চীৎকার করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

আওয়াজ শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল, কিন্তু তাহারাও দরজার সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কারাকক্ষের মধ্যে প্রতাপ ও চিন্তা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে; প্রতাপের দুই হাতে দুটি পিস্তল।

প্রতাপ বলিল,—'আমরা তোমাদের হাতে ধরা দেব না। কোতোয়ালের হাতে আমরা ধরা দেব। তফাত থাকো—এগিয়েছ কি মরেছ।'

সমবেত সান্ত্রীরা প্রতাপের উগ্রমূর্তি দেখিল, তাহার হাতের পিস্তল দেখিল, কান্তি-লালের মৃতদেহ দেখিল, তারপর পিছু হটিল।

এই সময় সদলবলে কোতোয়াল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি দ্বারের সম্মুখস্থ হইতেই প্রতাপ পিস্তল দুটি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল,—

'আমি প্রতাপ বারবটিয়া, ইনি আমার স্ত্রী চিন্তাবাঈ। আমাদের বন্দী করুন।'

আট

দুই দিন গত হইয়াছে।

বেলা দ্বিপ্রহর। শহরের পথে লোকারণ্য। সকলেই যেন একটা কিছুর প্রতীক্ষা করিতেছে। এই জনতার মধ্যে একস্থানে নানাভাইকে দেখা গেল, বহিরাগত গ্রাম্য-দর্শকের মত সে কৌতূহলভরে এদিক-ওদিক তাকাইতেছে। অন্যত্র একটি পানের দোকানের পাশে ভীমভাই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখে দুঃস্বপ্ন দেখার বিভীষিকা। ইহাদের দেখিয়া অনুমান হয়, প্রতাপের দল শহরে আসিয়া পেঁছিয়াছে।

সহসা জনতার চাঞ্চল্য স্তব্ধ হইল। সকলে দেখিল, একদল সিপাহী কুচকাওয়াজ করিয়া আসিতেছে; তাহাদের পিছনে একটি অশ্ববাহিত শকট। শকটের পিছনে আবার একদল সিপাহী।

শকটের আকৃতি বাঘের খাঁচার মত, উপরের ছাদ ও চারিদিক মোটা মোটা লোহার গরাদ দিয়া ঘেরা। এই শকটের মধ্যে চিন্তা ও প্রতাপ দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের বাহু পরস্পর শৃঙ্খল দিয়া বন্ধ।

জনসঙ্ঘ ক্ষুব্ধমুখে বিদ্রোহভরা চোখে দেখিতে লাগিল। সেনা-রক্ষিত কারাগারের শকট বন্দীদের লইয়া চলিয়া গেল।

নানাভাই গ্রামিক-সুলভ সরলতায় পাশের একটি নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিল,—

'বাবুজী, ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

নাগরিক তিক্তস্বরে বলিল,—

'আদালতে। সাহুকারেরা আইন ভঙ্গ করবে না, রীতিমত বিচার করে ওদের ফাঁসি দেবে।'

বিচারভবনের সম্মুখের বিস্তৃত মাঠে বিপুল জনতা সমবেত হইয়াছে। কোতোয়ালীর অগণ্য সিপাহী বিচারগৃহ রক্ষা করিতেছে। মাঝে মাঝে জনতরঙ্গ বিচারগৃহের দিকে ঝুঁকিতেছে আবার সিপাহীদের দ্বারা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। ইহারা বিদ্রোহী নয়, উত্তেজিত নাগরিক জনমণ্ডলী; ইহারা কেবল দেখিতে চায় শুনিতে চায় কী ভাবে প্রতাপ বারবটিয়ার বিচার হইতেছে।

বিচারগৃহের মধ্যেও তিল ফেলিবার ঠাঁই নাই। গোকুলদাস প্রমুখ মহাজনগণ আগে হইতেই বিচারকক্ষ জুড়িয়া বসিয়াছেন। বিচারকের আসন যিনি অলংকৃত করিয়াছেন তিনি একটি শীর্ণকায় তির্যকচক্ষু বৃদ্ধ, শেঠগণের দিকে একচক্ষু রাখিয়া তিনি বিচারের অভিনয় করিতেছেন। তিনি জানেন, আসামীদের ফাঁসির হুকুম তাঁহাকে দিতেই হইবে; অথচ দেশের বিপুল জনমত কাহার প্রতি সহানুভূতিশীল তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত নহে। তাই বিচারাসনে বসিয়া তাঁহার ক্ষীণ-দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

আসামীর কাঠগড়ায় প্রতাপ ও চিন্তা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। বিচারের অভিনয় দেখিয়া প্রতাপের মুখে মাঝে মাঝে চকিতে বিদ্রূপের হাসি খেলিয়া যাইতেছে।

শহরের দরিদ্র-অঞ্চলে একটি জীর্ণ কুটির। ইহা লছমনের বাসস্থান; সম্প্রতি প্রতাপের দস্যুদল এই গৃহেই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

কুটিরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ; কিন্তু পাশের একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ জানালায় দাঁড়াইয়া তিলু উৎকণ্ঠিতভাবে বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে।

এই সময় বৃদ্ধ লছমনকে আসিতে দেখা গেল। তিলু তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল।

'কী খবর লছমনভাই?'

লছমনের ক্লান্ত দেহ-যষ্টি নুইয়া পড়িতেছিল; সে দরজা ভেজাইয়া দিয়া ঘরের মধ্যস্থলে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। ঘরের এককোণে কেবল ভীম জানু বাহুবন্ধ করিয়া বসিয়াছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিল।

তিলু লছমনের সম্মুখে বসিয়া ব্যগ্রস্বরে আবার প্রশ্ন করিল,—

'লছমনভাই, কিছু খবর পেলে?'

লছমন বলিল,—'কী আর খবর পাব বেন? আমি বুড়োমানুষ, ভিড়ের মধ্যে তো ঢুকতে পারি নি, বাইরে থেকে যেটুকু খবর পেলাম—'

'কী খবর পেলে?'

'শয়তানেরা শুধু প্রতাপ আর চিন্তাকে ধরেই সন্তুষ্ট নয়, দলের আর সবাইকে ধরতে চায়।'

ভীমভাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

তিলু সংহতকণ্ঠে বলিল,—'তারপর?'

লছমন বলিল,—'প্রতাপকে হাকিম হুকুম করেছিল—তোমাদের দলে কে কে লোক আছে তাদের নাম কর। প্রতাপ তার মুখের মত জবাব দিয়েছে, বলেছে—কত নাম করব, দেশের সমস্ত লোক আমার দলে। বাইরে জনসমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছ না? ওরা সব আমার দলে। আজ শুধু ওদের গর্জন শুনছ, একদিন ওরাই বন্যা হয়ে তোমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'

বলিতে বলিতে লছমনের নিষ্প্রভ চক্ষু চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল, তিলু রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। ভীমভাইয়ের মুখে কিন্তু কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, সে যেন কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই. এমনিভাবে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

•

ওদিকে আদালতের সম্মুখে অসংখ্য নরমুণ্ড পূর্ববৎ ভিড় করিয়া আছে।

বিচারকক্ষের অলিন্দে একজন তক্‌মা-পরা রাজপুরুষ দেখা দিল। সে হাত তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল,—

'প্রতাপ বারবটিয়ার বিচার আজ মুলতুবি রইল। কাল আবার বিচার হবে এবং রায় বেরুবে।'

জনতা সংক্ষুব্ধ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কুটিরের কক্ষে তিলু ভীমভাইয়ের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধে নাড়া দিতেছিল আর বলিতেছিল—

'কী হয়েছে তোমার? সবাই বাইরে গেছেন আর তুমি ঘরে বসে আছ? প্রতাপভাইয়ের এই বিপদে তোমার কি কিছুই করবার নেই?'

ভীমভাই বলিল,—'কি করব?'

তিলু বলিল,—'কি করবে তা কি আমি মেয়েমানুষ তোমাকে বলে দেব? মরদ হয়ে তুমি এমন ভেঙে পড়েছ—ছি ছি ছি—'

'বিরক্ত ক'রো না—আমাকে আর বিরক্ত ক'রো না।' বলিয়া ভীমভাই জানুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

এই সময়ে নানাভাই, প্রভু ও পুরন্দর ফিরিয়া আসিল। সকলেরই মুখ গম্ভীর বিষণ্ণ। নানাভাই লছমনের কাছে বসিয়া সনিশ্বাসে বলিল,—

'ওদের ছাড়বে না সাহুকারেরা—ফাঁসি দেবে।'

প্রভু বলিল,—'আজ মোকদ্দমা মুলতুবি রাখবার কারণ কি জানো? ওদের ভয় হয়েছে. ফাঁসির হুকুম দেবার পর বেশী দিন দেরি করলে দেশের লোক ক্ষেপে গিয়ে প্রতাপকে জোর করে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। তাই কাল ফাঁসির রায় দেবে আর

সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি দেবে। আজ রাত্রেই ওরা ফাঁসির আয়োজন ঠিক করে রাখবে, তারপর শহরের লোক তৈরি হবার আগেই কাজ শেষ করে ফেল্‌বে।'

ভীমভাই তড়িৎপৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার দুইচোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

'কাল ফাঁসি দেবে? কাল?'

পুরন্দর বলিল,—'আমারও তাই মনে হয়। ফেরবার সময় দেখলাম, গরুর গাড়ি বোঝাই করা বড় বড় তক্তা আর শালের খুঁটি নিয়ে গিয়ে আদালতের সামনে মাঠে ফেল্‌ছে—বোধ হয় ঐখানেই ফাঁসির মঞ্চ খাড়া করবে।'

ভীমভাইয়ের কণ্ঠ হইতে একটা অবরুদ্ধ শব্দ বাহির হইল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তিলু চেঁচাইয়া উঠিল,—

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'এখানে আর নয়—বাইরে।—শহরের বাইরে—' বলিতে বলিতে ভীম দ্বারের বাহিরে অদৃশ্য হইল। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রতাপ-চিন্তা ধরা পড়িবার পর হইতে ভীমভাইয়ের অদ্ভুত আচরণে সকলের মনেই খটকা লাগিয়াছিল, তবু ভীমভাইকে প্রাণভয়ে ভীত কাপুরুষ মনে করিতে সকলেরই মনে সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। কিন্তু এখন আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সকলে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। তিলু মুখে আঁচল ঢাকা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—

'ছি ছি ছি—আমার অদৃষ্টে এই ছিল! কাপুরুষ—আমার স্বামী কাপুরুষ—'

আদালতের সম্মুখস্থ ময়দানে ছুতারমিস্ত্রিরা কাজ করিতেছে; তক্তা ও খুঁটির সাহায্যে একটি চতুষ্কোণ-মঞ্চ গড়িয়া উঠিতেছে। মঞ্চটি দুই হাত উচ্চ, লম্বায়-চৌড়ায় প্রায় দশহাত। মঞ্চের মধ্যস্থলে দুইটি মজবুত খুঁটি খাড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ছুতারদের হাতুড়ির ঠকাঠক্‌ আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত সঞ্চারিত হইতেছে।

ময়দানের প্রান্তে দাঁড়াইয়া একটি গাছের আড়াল হইতে ভীমভাই এই দৃশ্য দেখিল, তারপর পিছু ফিরিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যা হয় হয়। শহরের উপকণ্ঠে রাজপথের পাশে একটি অর্ধশুষ্ক পল্বল। একদল ধোপা এই পল্বলে কাপড় কাচিতেছে। পথিপার্শ্বস্থ তরুমূলে তাহাদের গর্দভগুলি একটি বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে।

শহরের দিক হইতে ভীমভাইকে আসিতে দেখা গেল। সে এখনও দৌড়াইতেছে, কিন্তু তাহার গতি তেমন দ্রুত নয়।

গর্দভদের নিকটবর্তী হইয়া ভীমভাই থামিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল রজকেরা আপন-মনে কাপড় কাচিতেছে। সে তখন পথ হইতে একটি কঞ্চি তুলিয়া লইয়া সন্তর্পণে একটি গাধার নিকটবর্তী হইল।

নিদ্রালু গাধাটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। ভীমভাই বিনা আয়াসে তাহার পিঠে উঠিয়া বসিল। গাধা আপত্তি করিল না। ভীমভাই তাহার পশ্চাদ্দেশে কঞ্চির আঘাত করিতেই গাধা দুল্‌কি চালে চলিতে আরম্ভ করিল।

ধোপারা কিছুই লক্ষ্য করিল না।

পরদিন মধ্যাহ্ন। বিচারগৃহের সম্মুখে তেমনি বিপুল জনসমাগম হইয়াছে। আজ সরকারী প্রহরীর সংখ্যা অনেক বেশী; ফৌজী কুর্তাপরা বন্দুকধারী সান্ত্রীর দল বিচার-

গৃহটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

যে মঞ্চটি কাল প্রস্তুত হইতে দেখা গিয়াছিল তাহা যে সত্যই ফাঁসির মঞ্চ তাহাতে সন্দেহ নাই। মঞ্চের উপর যুগল খুঁটির শীর্ষে আড়া লাগিয়াছে, আড়া হইতে পাশাপাশি দুইটি দড়ি ঝুলিতেছে। একজন যমদূতাকৃতি ঘাতক মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া দড়ি দুটিকে টানিয়া-টানিয়া তাহাদের ভারসহন ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে।

কিন্তু পরিহাস এই যে বিচার এখনও শেষ হয় নাই। বিচারকক্ষে হাকিম মহোদয় রায় দিবার পূর্বে বিলক্ষণ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। কখনও নথিপত্র উল্টাইয়া দেখিতেছেন, কখনও কলম লইয়া কাগজে কিছু লিখিতেছেন। মামলার সমস্ত কার্য শেষ হইয়াছে, এখন কেবল দণ্ডাদেশ দেওয়া বাকি। ঘরসুদ্ধ লোক রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আসামীর কাঠগড়ায় প্রতাপ ও চিন্তা নির্লিপ্ত মুখে দাঁড়াইয়া। হাকিমের আদেশ কি হইবে তাহা তাহারা জানে, তাই সে বিষয়ে তাহাদের কোনও ঔৎসুক্য নাই।

অবশেষে বিচারক মহাশয় প্রতাপ ও চিন্তার প্রতি তির্যক্-দৃষ্টিপাত করিয়া গলা-খাঁকারি দিলেন,—

'প্রতাপ বারবটিয়া, চিন্তা পানিহারিন্, গুরুতর অভিযোগে তোমাদের বিচার হয়েছে —তোমরা রাজদ্রোহিতা এবং নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত। বিচারে তোমাদের অপরাধ সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। আমি তাই ধর্মাসনে বসে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করছি—তোমাদের শাস্তি প্রাণদণ্ড।'

নগরের উপকণ্ঠে একদল অশ্বারোহী-সৈনিক অতিদ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারা কে, লক্ষ্য করিবার পূর্বেই ক্ষুরোদ্ধৃত ধূলিতে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

বিচারালয়ের সম্মুখে মঞ্চ ঘিরিয়া জনসমুদ্র আবর্তিত হইতেছে। এই জনাবর্তে নানা-ভাই আছে, প্রভু, পুরন্দর আছে, লছমন ও তিলু আছে; তাহারা ঘূর্ণিচক্রের উপর খড়-কুটার মত মঞ্চের আশপাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তিন সারি সিপাহী মঞ্চকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ঘূর্ণমান জনতাকে মঞ্চ হইতে পৃথক রাখিয়াছে।

কোতোয়ালের অধীনে একদল বন্দুক-কিরিচধারী সান্ত্রী বিচারকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল; তাহাদের মধ্যস্থলে চিন্তা ও প্রতাপ। তাহারা সদলবলে জনতাকে বিভিন্ন করিয়া মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইল। কোতোয়াল প্রতাপ ও চিন্তাকে লইয়া মঞ্চের উপর উঠিলেন—আর সকলে নীচে রহিল।

আবর্তনশীল জনতা সহসা নিশ্চল ঊর্ধ্বমুখে মঞ্চের পানে চাহিয়া রহিল। সমস্ত জনসঙ্ঘের মিলিত নিশ্বাসে একটা মর্মরধ্বনি উঠিল।

তিলু মঞ্চের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল; প্রতাপ ও চিন্তাকে ফাঁসির মঞ্চের উপর দেখিয়া তাহার আত্মগোপনের প্রবৃত্তি আর রহিল না, সে কাঁদিয়া ডাকিল,—

'প্রতাপভাই! চিন্তাবেন!'

তিলুকে দেখিয়া প্রতাপ ও চিন্তার মুখে কোমল স্নেহার্দ্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; তাহারা অন্যান্য সঙ্গীদের দেখিবার আশায় জনতার মধ্যে চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল। নানা, প্রভু, লছমন ও পুরন্দরের সঙ্গে চোখোচোখি হইল। চোখের ইশারায় সকলে বিদায় লইল।

ইতিমধ্যে জনতা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সজ্ঞান কোনও চেষ্টা না থাকিলেও জোয়ারের তরঙ্গের মত জনতার উচ্ছ্বাস মঞ্চের প্রান্ত পর্যন্ত আসিয়া পড়িতেছিল, আবার প্রহরীদের বাধা পাইয়া পিছু হটিতেছিল। দেখিয়া কোতোয়াল মহাশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। বিলম্ব করিলে অনর্থ ঘটিতে পারে। তিনি জল্লাদকে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রতাপ ও চিন্তার গলায় জল্লাদ দাঁড়ির ফাঁস পরাইল। জনারণ্য নিশ্বাস লইতে ভুলিয়া গেল, কেবল সহস্রচক্ষু হইয়া চাহিয়া রহিল।

সহসা বিশাল জনসঙ্ঘের রুদ্ধশ্বাস নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ঘোর তূর্যধ্বনি হইল। সকলে চমকিয়া দেখিল, একদল অশ্বারোহী সিপাহী জনব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের অগ্রে সর্দার তেজ সিং ও ভীমভাই।

তেজ সিং ও ভীম ঘোড়া হইতে লাফাইয়া মঞ্চের উপর উঠিলেন। ভীম কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ছুটিয়া গিয়া প্রতাপকে জড়াইয়া ধরিল।

ওদিকে তিলু মঞ্চের নিম্নে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মঞ্চের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, তেজ সিং চিনিতে পারিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইলেন। তিলু দরবিগলিত নেত্রে গিয়া চিন্তার কণ্ঠলগ্না হইল।

তেজ সিংয়ের হাতে একখণ্ড কাগজ ছিল; সেই কাগজ ঊর্ধ্বে আন্দোলিত করিয়া তিনি জনতাকে সম্বোধন করিলেন,—

'আমি সর্দার তেজ সিং—রাজার পরোয়ানা এনেছি। আমাদের মহানুভব রাজা চিন্তা-বাঈ এবং প্রতাপ সিংয়ের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাদের মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই পরোয়ানার দ্বারা মহামহিম রাজা সর্দার প্রতাপ সিংকে তাঁর রাজ্যের প্রধান কোতোয়াল নিযুক্ত করেছেন। আজ থেকে এ রাজ্যের রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তির মিলন হল। যিনি প্রজার পরম বন্ধু ছিলেন, তিনি রাজার প্রতিভূ হলেন; যিনি এতদিন গোপনে-গোপনে অসহায়কে সাহায্য করেছেন, দরিদ্রকে ধনীর উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করেছেন, তিনি আজ প্রকাশ্যে রাজার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হয়ে সেই মহাকর্তব্য পালন করবেন। আজ থেকে আমাদের নবজীবনের আরম্ভ হল। জয় হোক—সর্দার প্রতাপ সিংয়ের জয় হোক।'

বিরাট জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। প্রতাপ ও চিন্তা তেজ সিংয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যুক্তকরে গণদেবতাকে অভিবাদন করিল।

উপসংহারে দেখা গেল, তিলু ও ভীমভাই ফাঁসির রজ্জুদুটির প্রান্ত একত্র করিয়া গ্রন্থি দিয়া উহাকে ঝুলায় পরিণত করিয়াছে এবং তাহার উপর বসিয়া পরমানন্দে দোল খাইতেছে।

দাদার কীর্ত্তি

'না, দাদা, তোমার বিয়েটা না হলেই নয়।'

অভ্রভেদী গাম্ভীর্য রক্ষা করিবার জন্য দাদা টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া চেয়ারের উপর আড় হইয়া বসিলেন। চক্ষু অর্ধমুদ্রিত করিয়া বলিলেন, 'হুঁঃ, নিজের চরকায় তেল দে।'

আমি বলিলাম, 'তেল আর পাব কোথায়! তেলগুদোমের চাবি যে মশায় হস্তগত করে রাখলেন! তুমি না পার হলে আমার যে কোন ভরসাই নেই!'

দাদার এত যত্নে রক্ষিত গাম্ভীর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। তাঁহার দশনপংক্তি আর আত্মগোপন করিতে পারিল না। তথাপি আনন্দ যথাসাধ্য সংযত করিয়া দাদা বলিলেন, 'তোর তো বৌ অনেকদিন থেকেই ঠিক হয়ে আছে। তুই কেন আগেই বে করে নে না? আর সব তাতেই তো আমাকে এগিয়ে আছিস, বিয়ের বেলাই বা পেছিয়ে থাকবি কেন?' দাদার শেষ কথাগুলিতে একটু গোপন অভিমানের জ্বালা ছিল।

আমার এই দাদাটির একটু পরিচয় আবশ্যক। ইনি—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—আমার খুড়তুত ভাই। বয়সে আমার অপেক্ষা প্রায় আড়াই বৎসরের বড়; বি. এ. পড়েন। উপর্যুপরি কয়েকবার ফেল হইয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছি।

এইখানেই বলিয়া রাখা উচিত যে পশ্চিমের কোন শহরে আমাদের বাস। পরিচয় গোপনার্থে শহরের নাম বলিলাম না। বাবা এখানে জেলা কোর্টে ওকালতি করেন। আমি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র—এখনো ছাত্রজীবন শেষ করি নাই—কিন্তু প্রায় তোরণদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বলা বাহুল্য, যে কলেজে পড়ি তাহা স্থানীয়।

কাকাবাবু সুদূর মাইশোরে চাকরি লইয়া পড়িয়া আছেন। দাদা এতকাল কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়াশুনা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনবার পরীক্ষা দিবার পরও যখন সংবাদপত্রের পাসের তালিকায় তাঁহার নাম পাওয়া গেল না তখন কাকাবাবু তাঁহাকে কলিকাতার দূষিত জলহাওয়া হইতে দূরে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু মাইশোরে লইয়া যাওয়া তাঁহার ইচ্ছা নয়; তাই বাবার তত্ত্বাবধানে দাদাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সেই অবধি—অর্থাৎ প্রায় দেড় বৎসর কাল দাদা এখানে থাকিয়া পাঠকার্য নির্বাহ করিতেছেন।

আমাদের দুইজনের মধ্যে সম্বন্ধটা ঠিক যে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত নয় তাহা বোধহয় পাঠক বুঝিয়াছেন। নির্দোষ হাস্য-কৌতুক আমাদের মধ্যে নিয়তই হইয়া থাকে। উপস্থিত দাদার পড়িবার ঘরে বসিয়া আমাদের উল্লিখিত কথাবার্তা হইতেছিল।

আমি বলিলাম, 'উঁহু, সেটি হচ্ছে না।

তুমি চল্‌বে খুঁড়িয়ে, আমায় নিয়ে যাবে
উড়িয়ে।
ইচ্ছে হবে প্রজাপতির মাথাটা দি গুঁড়িয়ে।

আমার বিয়ে যখন পুরোনো হয়ে যাবে তখন তুমি নতুন বিয়ে করবে—তা হবে না। জানতো, দাম্পত্য জীবনে উড়ে চলার চেয়ে খুঁড়িয়ে চলা ঢের বেশী লাভজনক।'

দাদা নিরাশকণ্ঠে বলিলেন, 'কিন্তু ভাই. বাবা যে বলেছেন পাস না করতে পারলে—'

বাধা দিয়া বলিলাম. 'কাকাবাবুর ওই এক কথা। পাস করাটাই কি জীবনের একমাত্র পরমার্থ নাকি? মনে কর, তুমি ইহজন্মে যদি পাস নাই করতে পার—তাহলে তোমার বিয়ে হবে না। যিনি তোমার জন্য আজন্ম শিবপুজো করছেন তাঁর সমস্ত ফুল বিল্বপত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে!'

দাদা পূর্ববৎ বিমর্ষভাবে বলিলেন, 'কি করব ভাই. উপায় নেই!'

আমি বলিলাম, 'উপায় নেই? আলবৎ আছে।'

দাদা চেয়ার হইতে পা নামাইয়া আমার প্রতি গাঢ় দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন. 'দ্যাখ

সন্তোষ, চিরকালই আমি তোর বুদ্ধির পক্ষপাতী। একথা স্বীকার করতেই হবে যে সাধারণের চেয়ে তোর বুদ্ধি ঢের বেশী।'

বিরসকণ্ঠে আমি বলিলাম, 'আমারও তাই মনে হয় বটে।'

দাদা আগ্রহাতিশয্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'কিন্তু কি করবি বল্‌তো—' বলিতে বলিতে আমার অধরপ্রান্তে একটু হাসি দেখিয়া সহসা হতাশ হইয়া বলিলেন, 'কিন্তু তুই সত্যি বলছিস তো? না শুধু ঠাট্টা হচ্ছে?'

আমি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলাম, 'আমি কখনো তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করি!'

আশ্বস্ত হইয়া দাদা পুনরায় আরম্ভ করিলেন, 'আচ্ছা কি করা যায় বল্‌তো? জেঠাই-মাকে গিয়ে বল্। নাঃ, ঠিক হয়েছে! মাকে এই বলে চিঠি লিখি যে আমার এ পৃথিবীতে আর থাক্‌বার ইচ্ছে নেই—আমি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব যদি—'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'দূর! পাগল বল্‌বে যে। আমি উপায় করতে পারি যদি একটা কথা তুমি আমায় বল!'

সাগ্রহে দাদা বলিলেন, 'কি কথা!'

'না, সে তুমি বল্‌বে না।'

'বল্‌ব বল্‌ব। তুই বলনা কি কথা!'

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, 'আমি উপায় করতে পারি যদি তুমি বল কাকে বিয়ে করবার জন্যে তোমার এত আগ্রহ।'

'দূর শুয়োর—' বলিয়া সলজ্জ আনন্দ অব্যক্ত রাখিবার জন্য দাদা অধর কামড়াইতে কামড়াইতে অধোমুখে রহিলেন। শুয়োর—ছুঁচো—র‍্যাসকেল প্রভৃতি আখ্যাগুলি দাদা খুব প্রীতির তিরস্কারের সময় ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না।

ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলাম গতিক ভাল নয়। দাদা একটু সৌখীন প্রকৃতির লোক—হঠাৎ সৌখীন রকম একটা প্রেমে পড়িয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

আমি বলিলাম, 'তাহলে আর কি করা হবে! তুমি এই তুচ্ছ কথাটা বলে আমায় বিশ্বাস করতে পার না, আর আমি তোমার জন্য উপায় করব! আমার কি বয়ে গেছে!' কৃত্রিম কোপে আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

দাদার উভয়-সঙ্কট। তাঁহার মুখের বিচিত্র ভাববিকাশ দেখিয়া আমার পেটে হাসি যতই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, আমি বাহিরে ততই গম্ভীর হইতেছিলাম।

মাছ টোপ গিলিল। মাছ টোপ গিলিবার জন্য ছটফট করিতেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দাদা বলিলেন, 'তুই যদি কাউকে না বলিস—'

'বল্‌ব না।'

'না তুই বলে ফেল্‌বি।'

আমি বলিলাম, 'না গো না। এইমাত্র তো তুমি স্বীকার করলে যে তোমাদের চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশী। তোমার কম বুদ্ধির চাপ ঠেলে যখন কথাটা প্রকাশ হয়নি তখন আমার বেশী বুদ্ধির বস্তার তলায় পড়ে ওটা অচিরাৎ সমাধিস্থ হবে জেনো।'

তথাপি দাদা ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'না ভাই, তুমি কিন্তু রাগ করবে।'

আমি বলিলাম, 'দেখ, রাগ জিনিসটা ভগবান আমায় কম দিয়েছেন—সেজন্য আমি দুঃখিত। আমি শপথ করে বল্‌ছি রাগ করব না, এমন কি তুমি যদি আমার ভবিতব্যা শ্রীমতী বীণাপাণিকে উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ করতে চাও তাহলেও না।'

দাদা বোধহয় সম্বন্ধের পূর্ব হইতেই আমার ভবিষ্যৎ গৃহিণীকে ভাদ্রবধূ জ্ঞান করিতেন। তিনি আমার দিকে মুষ্টি তুলিয়া বলিলেন, 'সে কেন, ছুঁচো কোথাকার! তাঁর বড় এক বোন আছে জানিস তো?'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলাম, 'অ্যাঁ, সরস্বতী! রগ ঘেঁসে আন্দাজ করেছি তাহলে? আরে হাঃ হাঃ হাঃ—'

দাদা বিষম অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, 'আমি বললুম তুই রাগ করবি।'

আমি বলিলাম, 'রাগ করলে বুঝি লোক হাসে? বেশ যাহোক! কিন্তু তোমার এই রোমহর্ষণ প্রেমের সূত্রপাত হল কি করে শুনি! সরস্বতীর মত একগুঁয়ে মেয়ে শহরে আর দুটি নেই।'

শুনিয়া দাদা নয়ন অর্ধনিমীলিত করিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন,—

'I know not I ask not
If guilt is in that heart.
I know that I love thee
Whatever thou art!'

[আমি জানি না, জানতে চাই না তোমার হৃদয়ে কোন দোষ আছে কিনা। আমি জানি, আমি তোমায় ভালবাসি—তুমি যাই হও।]

আমি তো স্তম্ভিত! বুঝিলাম দাদার অবস্থা ঘোর সংকটাপন্ন। কবিতাই প্রেমের চরম নিদর্শন। দাদার প্রেম যে জমিয়া হিমাদ্রি শিখরের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে তাহাতে আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না।

আমি বলিলাম, 'তুমি যে রকম কবিতা আওড়াচ্ছ, তোমাকে আমাদের কোটেশন ক্লাবের (Quotation Club) মেম্বার না করলে আর চল্‌ছে না। কিন্তু উপস্থিত আমার প্রশ্নের জবাব দাও। তোমার এই প্রেমের সূত্রপাত কি করে হল বল।'

দাদা বলিলেন, 'না, আগে উপায় কি বল!'

আমি বলিলাম, 'খুব সোজা! আমি বৌদিকে দিয়ে মাকে জানাব যে আমার বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে। এতদিন অমত করে এসেছি—মা নিশ্চয় খুব তাড়াতাড়ি করবেন। অথচ তোমার বিয়ে না হলে আমার কিন্তু বিয়ে হতে পারে না।'

মন্ত্রণা শুনিয়া দাদা চমৎকৃত হইয়া গেলেন। লাফাইয়া আসিয়া আমার সঙ্গে সজোরে শেকহ্যান্ড করিয়া বলিলেন, 'সত্যি সন্তোষ, তোকে আর কি বল্‌ব। কিন্তু ভাই, তার সঙ্গেই যে হবে—'

আমি বলিলাম, 'কিছু ভেবো না দাদা। আমাদের বৌদি থাকতে কিসের ভাবনা। তাঁকে বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দাদার মুখে-চোখে কি এক অনির্বচনীয় প্রীতি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ না হইয়া যদি জ্যেষ্ঠ হইতাম তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমায় গড় হইয়া প্রণাম করিতেন সন্দেহ নাই।

আমি বলিলাম, 'এবার তোমার প্রেমের কাহিনী বল।'

দাদা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। কেশারণ্যের মধ্যে বীথির ন্যায় সিঁথির ভিতর দিয়া সন্তর্পণে অঙ্গুলি চালনা করিয়া আরম্ভ করিলেন, 'আমি একদিন কলেজ যাচ্ছি—'

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'নিশ্চয় সেদিন খুব গরম ছিল আর ছাতাটাও বোধ করি নিতে ভুলে গিয়েছিলে?'

দাদা বলিলেন, 'না, গরম তত ছিল না। কেন?'

আমি বলিলাম, 'তারপর—'

'তারপর আমি ওঁদের বাড়ির সুমুখ দিয়ে যাচ্ছি—দেখি উনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে (দাদার কণ্ঠস্বর সম্ভ্রমে গাঢ় হইয়া আসিল) ফেরিওয়ালার কাছে জিনিস কিনছেন। তিনি বাঁ হাতে নাকের নোলকটি ধরে নাড়ছিলেন। আর এমন একটি কমনীয় শ্রী তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে ফুটে বার হচ্ছিল যে সে বর্ণনা করা যায় না। তোমায় আর কি বল্‌ব। কবি মানুষ, মানস চক্ষে কল্পনা করে নাও।'

আমি বলিলাম, 'হুঁ, ফেরিওয়ালার সঙ্গে দরদস্তুর করতে করতে তাঁর অঙ্গে কমনীয় শ্রীর আবির্ভাব হয়েছিল। তুমি ঠিক জান তিনি ফেরিওয়ালার প্রেমে পড়েন নি?'

দাদা রাগিয়া বলিলেন, 'দূর র‍্যাসকেল, সে একটা বুড়ো—'

'আচ্ছা আচ্ছা, তবে ভরসা আছে—তারপর? তিনি কি করছিলেন?'

দাদা বলিলেন, 'একখানা আরসি কিনছিলেন। বোধহয় পছন্দ হয়নি তাই সেখানা ফেরৎ দিচ্ছিলেন। তাঁর মুখের রক্তিম আভা—'

আমি। আরসি ফেরৎ দিচ্ছিলেন—মুখে রক্তিম আভা? বুঝেছি। তা সত্যি কথা বলেছিল বলে আরসিখানার উপর রাগ করা অন্যায়। শাস্ত্রে আছে হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।

দাদা স্মিতমুখে বলিলেন, 'তিনি যে সুন্দরী একথা তুমি অস্বীকার করতে পার না।'

আমি। বেশ বেশ, পারি না। তারপর কি হল বল।

দাদা। পকেটে হাত দিয়ে দেখি এক ফুটোর সাহায্যে আমার পেনসিলটি কখন রাস্তায় বিদায় গ্রহণ করেছে। কি করা যায়! কলেজে রাশি রাশি নোট লিখতে হবে। মনিব্যাগ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে তৎক্ষণাৎ ফেরিওয়ালা বেটার সম্মুখে হাজির।

আমি। অ্যাঁ, বল কি।

দাদা। যা বলছি। তিনি ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—

আমি। ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন?

দাদা। নিমেষের জন্য। আমাকে তিনি নিশ্চয় আগে দেখে থাকবেন তাই হঠাৎ চিনতে পেরে চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়েছিলেন। পরক্ষণেই আরক্তিম মুখে চকিতের তরে একবার চেয়েই দ্রুতপদে সেখান থেকে চলে গেলেন।

আমি সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলাম, 'দাদা, তুমি গোড়াতেই ব্যাপারটাকে যে রকম করে ফাঁসিয়ে দিয়েছ তাতে তোমার বিশেষ ভরসা আছে বলে বোধ হচ্ছে না। সরস্বতী এমন মেয়েই নয়—কারুর এতটুকু ত্রুটি সে কখনো সহ্য করতে পারে না। সত্যিই তোমার জন্যে ভারী সহানুভূতি হচ্ছে।'

॥ ২ ॥

একটি ক্ষুদ্র একতলা বাড়িতে আমাদের ক্লাব। চারিটি ঘর এবং দুইটি বারান্দা বেষ্টন করিয়া ছোট কম্পাউন্ড। তাহাতে ব্যাডমিণ্টন খেলিবার ব্যবস্থা আছে। আমরা প্রায় আট-নয়জন বাঙ্গালী এই ক্লাবের মেম্বার। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার নাম রাখিয়াছি কোটেশন ক্লাব (Quotation Club)। আমরা এখানে যথাসম্ভব কোটেশনে কথা কহিয়া থাকি, স্ব স্ব রচনা আপনাদের মধ্যে পড়িয়া শুনাই, সাময়িক সাহিত্য, দৈনিক সংবাদপত্রের সমালোচনা করি, গান গাহি এবং যথেচ্ছা গল্প করি। কিন্তু আমাদের সভার উদ্দেশ্য উল্লিখিত বিষয়গুলি অপেক্ষাও মহৎ। আমরা প্রয়োজন এবং সাধ্য হিসাবে পরোপকারও করিয়া থাকি। স্কুলের কোনও ছাত্র শিক্ষকাভাবে পড়িতে না পাইলে আমরা তাহাদের বিদ্যাদান করি এবং লোকাভাবে মড়া স্থানান্তরিত না হইলে সে ভারও নিজ স্কন্ধে বহন করি।

ক্লাব সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। আমরা সকল মেম্বারই উদ্যোগী। আমাদের কাহারও কাহারও নাম এখন না হোক অন্যত্র পাঠক-পাঠিকার প্রয়োজন হইতে পারে, এই জন্য উদ্ধৃত করিলাম। যথা—সন্তোষ (সভাপতি), অমূল্য (সম্পাদক), অনাদি, চুনী, প্রভাত, বরদা, হৃষী ও পৃথ্বী। ভবিষ্যতে আরও একনিষ্ঠ মেম্বারের প্রত্যাশা রাখি।

সন্ধ্যার সময় আমাদের ক্লাব বসিত। সেদিন যথাসময় উপস্থিত হইয়া দেখি বাহিরের অন্ধকারে কে একজন চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছে। আরও অনেকের কণ্ঠস্বর ঘরের ভিতর হইতে আসিতেছিল। বাহিরে যে বসিয়াছিল তাহার উদ্দেশ্যে বলিলাম, 'কে? Who's there?'

উত্তর। Nay answer me. Stand and unfold thyself.

আমি। God save the Quotation Club.

উত্তর। সন্তোষ?

আমি। He.

অমূল্য কহিল, 'কিহে, আজ যে গেট পার হতে না হতেই কোটেশনের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলে।'

আমি একটা চেয়ার বাহিরে আনিয়া তাহার পাশে বসিয়া বলিলাম, 'কি ভাবিছ মনে মনে?'

অমূল্য। ভাবছি আমি কবিতা লিখলে কেমন মানায়।

আমি। লিখেছ নাকি?

অমূল্য। এক stanza.

আমি। কি শুনি।

অমূল্য। শোন,

জনম অবধি কার তোমা'পরে অধিকার
'প্রিয়' বলে ডাকিবার দিয়াছেন বিধি,
জানি না গো আমি তাহা তবু ভাবি যদি আহা
পাইতাম তোমা হেন অলকার নিধি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি বিষয়?'

অমূল্য বলিল, 'সেইটে এখনো ঠিক করতে পারিনি। যাক গে, এখন তোমার সংবাদ?'

আমি। মন্দ নয়। কিন্তু আমার কেদারদাদার সংবাদ বড়ই আশঙ্কাজনক। ওঁর সম্বন্ধে

I could a tale unfold
Whose lightest word would—

অমূল্য। খুলে বল, খুলে বল!

আমি। অকস্মাৎ দাদা প্রেমে পড়ে গেছে।

অমূল্য উৎসুক হইয়া বলিল, 'কার সঙ্গে?'

আমি আদ্যোপান্ত বিস্তারিত বর্ণনা করিলাম। দিনান্তে অমূল্যর কাছে মনের সমস্ত কথা না বলিলে আমার চলিত না। তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য।

সে শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, 'একটা কাজ করলে হয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি কাজ?'

ভাবিতে ভাবিতে অমূল্য বলিল, 'বল্‌ব?'

আমি অধীর হইয়া বলিলাম, 'বল না।'

অমূল্য তখন তাহার মতলব প্রকাশ করিয়া বলিল। উপসংহারে কহিল, 'তোমার দাদা যে রকম বেকুব, বুঝতেও পারবে না যে এর মধ্যে কোনও কারচুপি আছে। তার ওপর দেখ কোটেশন ক্লাবের উদ্দেশ্য শুধু পঞ্চমুখ হয়ে কথা কওয়া নয়। আমাদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'। তোমার কেদারদাদা যদি এ সময় প্রেম-চর্চায় মনোনিবেশ করে তাহলে নিশ্চয় জেনো এবার সে পরীক্ষায় কার্যতঃ স্থিতিশীলতার পরিচয় দেবে। আমাদের উচিত হচ্ছে তাকে ফিরিয়ে আনা।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু ভাই, বিয়ে তো একদিন সকলকেই করতে হবে।'

অমূল্য বলিল, 'আমি কি তাতে না বল্‌ছি! বিয়ে করে স্ত্রীর সঙ্গে অনর্গল প্রেম কর—যা লোকে আবহমান কাল করে এসেছে। কিন্তু এ কি? বিয়ের আগেই প্রেম! সত্যি কথা বল্‌ব ভাই, এরকম সাহেবিয়ানা আমার সহ্য হয় না। যে লোক বিয়ে করবার আগেই কোনও মেয়েকে ভালবাসে অথবা মনে করে ভালবাসি, আমি বলি তার হৃদয় দুর্বল। নিজের মনের ওপর তার শাসন নেই। শক্তি আছে তার হৃদয়ে যে নিজের স্ত্রীকে মনের মত করে নিয়ে ভালবাসতে পারে। কিন্তু কেদারের মত লোকের পক্ষে—যে গোঁফ উঠে

অন্ধ প্রেমের নেশায় বিভোর হয়ে আছে—পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে করা অত্যন্ত ক্ষতিকর।—তারপর, মনে কর, তোমরা ক্ষিতীনবাবুর কাছে প্রস্তাবটা উপস্থিত করলে। তিনি যদি বলে বসেন, 'আমি ওই তিন-বছর-ফেল-করা ছেলেকে মেয়ে দেব না!' কি দেখেই বা দেবেন! ক্ষিতীনবাবুর মত বুদ্ধিমান লোক টাকা দেখে কখনই মেয়েকে জলে ফেলে দেবেন না। আর চেহারার কথা যদি বল, ওইটেই তোমার দাদার আছে—চেহারায় পেট ভরে না। বিংশ শতাব্দীতেও পুরুষের রূপ অর্থকরী নয়। এই যে তোমার সঙ্গে উনি এক মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছেন সে কেবল তোমার রূপ দেখে নয়। তোমার মত বিদ্বান, মেধাবী, সুবোধ পাত্র—'

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'থাক, থাক, আর প্রশংসায় কাজ নেই। সুবোধই বটে! মারামারি গুণ্ডামি এবং ফুটবলে যে সুনাম কিনে রেখেছি!'

অমূল্য উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'সেই কি কম নাকি! ক'জন লোকের গুণ্ডামি মারামারি করবার সাহস আছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর? করুক না দেখি কেদার! কিন্তু যাক ওসব বাজে কথা। তুমি যদি উপস্থিত কেদারের প্রেমের প্রতিকার করতে রাজী না হও—আমি একাই করব।'

আমি বলিলাম, 'না আমি রাজী আছি। কিন্তু দেখো কথাটা জানাজানি না হয়।'

পরদিনই আমরা দুই বন্ধুতে কাগজ কলম লইয়া নিভৃতে বসিয়া গেলাম। অনেক তর্ক অনেক কাটাকুটির বাধা ভেদ করিয়া আমাদের কবিতা প্রবাহ চলিল—

জনম অবধি কার তোমা'পরে অধিকার
'প্রিয়' বলে ডাকিবার দিয়াছেন বিধি,
জানি না গো আমি তাহা তবু ভাবি যদি আহা
পাইতাম তোমা হেন অলকার নিধি!

তোমার বিহনে শুধু প্রাণ মোর করে ধু ধু
যেন গো সিকতাময় নিদারুণ মরু—

আমি বলিলাম, 'এইবার 'মরু'র সঙ্গে কি মেলানো যায়!'

অমূল্য ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'গরু—মরু—'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'থাক হয়েছে—

সুনিবিড় ছায়াদানে জুড়াও কাতর প্রাণে
তুমি এ সাহারা মাঝে সুশীতল তরু!'

অমূল্য আপত্তি করিয়া বলিল. 'যাই বল, এর চেয়ে 'তুমি এ সাহারা মাঝে একমাত্র গরু' ঢের ভাল শোনাত।'

আমি। মানে হত কই?

অমূল্য। মানে হত না? এর মানে এই হত যে—আমার প্রাণ সাহারার মত শুকনো, তাতে যে ক'গাছি ঘাস জন্মায় সে কেবল তোমারি জন্য, অন্য কোন গরু সে ঘাস খেতে পায় না।

এইরূপে অনতিক্ষুদ্র কবিতা শেষ হইল। তারপর একখানি এসেন্সের গন্ধে ভরপুর গোলাপী চিঠির কাগজে লাল কালি দিয়া লিখিত হইল।

লিপি লিখন শেষ হইলে আমি বলিলাম, 'অমূল্য. একবার ফিলিং দিয়ে পড়তো, দেখি কেমন শোনায়।'

অমূল্য হরবোলা, সে ললনাকণ্ঠে চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল—

জনম অবধি কার তোমা'পরে অধিকার
'প্রিয়' বলে ডাকিবার দিয়াছেন বিধি,
জানি না গো আমি তাহা তবু ভাবি যদি আহা
পাইতাম তোমা হেন অলকার নিধি।

তোমার বিহনে শুধু প্রাণ মোর করে ধু ধু
যেন গো সিকতাময় নিদারুণ মরু,
সুনিবিড় ছায়াদানে জুড়াও কাতর প্রাণে
তুমি এ সাহারা মাঝে সুশীতল তরু।

প্রাণের গোপন কথা প্রকাশিছে ব্যাকুলতা
বাহির হইতে মায়া মোহ পরিহরি,
লেখনী সে বাধ-বাধ কথা কহে আধ-আধ
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে সরম প্রহরী।

ভাঙ্গি সরমের বাঁধ মনের আকুল সাধ
গিরিজা তটিনী সম ধায় তব পানে,
তুমি মম হে সাগর, তুমি মম হে নাগর
হতাশা দিও না ঢেলে প্রোষিত পরাণে।

করিবারে দাসীপনা ভেবেছিনু বাসিব না
বিপুল এ ধরা মাঝে কাহারেও ভাল,
আঁধারে একটি দীপ আকাশে চাঁদের টীপ
সম তুমি এ হৃদয় করিয়াছ আলো।

তাই আজ যেচে এসে পড়েছি চরণ দেশে
জেনো মোরে এ জগতে বড় অভাগিনী.
নয়নে কিসের জ্বালা হৃদয়ে বিষের জ্বালা
কানে বাজে সকরুণ হতাশ রাগিণী।

প্রভাত আলোক মিশে বায়ু ধায় দিশে দিশে
কত কুসুমিকা তারে দিয়ে ফেলে প্রাণ,
পবন তো জানে না তা' ফুল বোঝে নিজ ব্যথা
জানে সেই বুকে যার বিঁধে আছে বাণ!

তাই এই বাচালতা চপল চটুল কথা
আনমনে কতশত বাতুল প্রলাপ,
এই বলে ক্ষমা কর একটি কঠিন শর
ত্যজিয়াছে মোরে চাহি মদনের চাপ।

—একবার আসিও। তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব, মনের কথা বলিব। কাল রাত্রি ন'টার সময়; আমাদের বাড়ির পিছনে তেঁতুল গাছের নীচে।

ইতি—
তোমারি আকাঙ্ক্ষণী
যাহাকে ফেরিওয়ালার সঙ্গে দেখিয়াছিলে।

পাঠ শেষ করিয়া অমূল্য বলিল, 'তুমি থাকবে গাছের ওপর, আমি কিছু দূরে আড়ালে লুকিয়ে থাকবো। তুমি জোরে শিস্ দিলেই আমি এসে রক্তাক্ত হস্তে আসামী গ্রেপ্তার করব।'

তখনি দাদার নামে চিঠি পোস্ট করা হইল।

॥ ৩ ॥

শহরের যে পাড়াটায় আমাদের বাস তাহা শহর-বাজার হইতে বেশ একটু দূরে বলিয়া সকল সময়েই বেশ নির্জন এবং কোলাহলশূন্য। আমাদের কয়েকটি বাঙ্গালী ভদ্রপরিবার লইয়া এই ক্ষুদ্র নিভৃত পাড়াটি গঠিত। স্থানটিও খুব মনোরম। পাড়ার গৃহগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দীর্ঘ ঋজু পথ চলিয়া গিয়াছে। পথের দুইধারে বড় বড় পুরাতন নবাবী আমলের গাছ পথটিকে ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বাড়িগুলির পিছনেও বিস্তর পতিত জমির উপর ঐরূপ গাছ সুনিবিড় কাননের সৃষ্টি করিয়াছে।

ছেলেবেলায় এই তরুবীথিকার মাথার উপর কত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে কত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশিতে কোকিল বারবার কুহরিয়া উঠিয়াছে শুনিয়াছি। কত অন্ধকার রাত্রে বাড়ির পিছনকার বনের দিকে তাকাইতে ভয় করিয়াছে। এখন সেই সব কথা মনে পড়ে। বৃদ্ধ লম্বিতজট বটগাছগুলাকে পথের পাশে সারি সারি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মনটা শতবর্ষ পূর্বেকার কত অসংলগ্ন স্বপ্নে বিজড়িত হইয়া যায়।

বাড়ির পিছনে ফাঁকা জমি পড়িয়া থাকায় আর কিছু না হোক, বাড়ির মেয়েদের খুব সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সকল সময় খিড়কি দিয়া এবাড়ি ওবাড়ি যাতায়াত করিতে পারিতেন।

এবার আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একটি পরিবারের পরিচয় দিব। ক্ষিতীন্দ্রবাবু পূর্বে সাবজজ ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি কার্যে অবসর গ্রহণ করিয়া আজ সাত বৎসর এখানে ঘরবাড়ি করিয়া বাস করিতেছেন। আমাদের বাড়ির কয়েকখানা বাড়ি পরেই তাঁহার গৃহ।

ক্ষিতীন্দ্রবাবুর এক পুত্র অনিল, সেই জ্যেষ্ঠ। তাহার পরে দুই কন্যা—সরস্বতী ও বীণা। ক্ষিতীনবাবু যদিও সাত বৎসর কার্যে অবসর লইয়াছেন তথাপি তাঁহার স্বাস্থ্য খুব ভালই আছে। চুল এখনো অর্ধেক পাকে নাই। তাহার প্রধান কারণ বোধহয় এই যে তিনি এ-কয় বৎসর সাংসারিক সকল আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বেদান্ত চর্চা করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অসামান্য।

ক্ষিতীনবাবু যখন প্রথম এখানে আসেন তখন সরস্বতীর বয়স আট বৎসর এবং বীণার পাঁচ। প্রথম হইতেই আমাদের সঙ্গে ক্ষিতীনবাবুর পরিবারবর্গের খুব মাখামাখি হইয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই মা ঠিক করিয়া ফেলিলেন যে বীণাকে তাঁহার বধূ করিবেন। মা'র বিশ্বাস তাঁহার ফুটফুটে ছেলের পাশে এই টুকটুকে মেয়েটি দিব্য মানাইবে। অতএব সকলেই আমাকে বীণার ভবিষ্যৎ বর বলিয়া জানিত। এবং এ পর্যন্ত কোনদিক হইতেই এবিষয়ে কোন ওজর-আপত্তি উঠে নাই। সরস্বতী বেচারীর এ পর্যন্ত বর লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। কেন জানি না। মেয়েটি বেশ—সময় সময় মনে হয় আমারটির মতই যেন সে ভাল। বলা বাহুল্য, ইহাকে দেখিয়াই আমার দাদাটি পুষ্পধন্বার কোপে পড়িয়াছেন।

আন্দাজ পৌনে আটটার সময় গিয়া সরস্বতীদের বাড়ির পিছনকার তেঁতুল গাছে উঠিলাম। গাছটা বড় নয়—অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি। গাছে উঠিয়া জমি হইতে প্রায় দশ ফুট উর্ধ্বে একটা মজবুত ডালের দুইদিকে পা ঝুলাইয়া বসিলাম। তারপর পিঠে আর একটা ডাল হেলান দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট টানিতে লাগিলাম। দাদা চিঠি পাইয়াছেন দেখিয়াছি—অতএব নিশ্চয় আসিবেন। পাছে অস্থিরতা হেতু কিছু আগে আসিয়া পড়েন এই ভয়ে সকাল সকাল পাহারা আরম্ভ করিলাম। দাদাকে দেখিবামাত্র কিরূপে তাঁহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িব তাহা ঠিক করিয়া রাখিলাম। অমূল্য নিশ্চয় নিকটেই কোনখানে লুকাইয়া উৎকর্ণভাবে আমার শিসের প্রতীক্ষা করিতেছে। ফাঁদ প্রস্তুত, এখন শিকার আসিলেই হয়।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ অন্ধকারে বসিয়া মশা তাড়াইতেছি এমন সময় পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। দেখি দুইজন লোক আসিয়া গাছের তলায় কয়েকটা চেয়ার রাখিয়া গেল।

কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই ক্ষিতীনবাবু তাঁহার পুত্রকন্যা ও পত্নীর সহিত আসিয়া চেয়ারগুলি অধিকার করিয়া বসিলেন। আমি প্রমাদ গণিতে লাগিলাম। কি ভয়ানক! কে জানিত যে ইঁহারা এই সময় এই গাছের তলায় আসিয়া বসেন। যদি এই সময় ইঁহারা থাকিতে থাকিতে আমার বুদ্ধিমান দাদাটি আসিয়া দর্শন দেন তাহা হইলে কি হইবে ভাবিয়া আমি ঘামিয়া উঠিলাম। আমি যদি এই গাছের উপর ধরা পড়ি তাহা হইলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে মনে করিয়া আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল। অসংখ্য মশা অবাধে আমাকে কামড়াইতে লাগিল, আমি হাত নাড়িয়া তাহাদের তাড়াইতে পারিলাম না। কি জানি, যদি শব্দ হয়। আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম—ভয়ে তালু পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া. গেল। নিজের দুরবস্থা দেখিয়া নিজেরই কান্না আসিতে লাগিল।

গৃহিণী বিস্তর গল্প করিতে লাগিলেন। সংসারের কথা, বাহিরের কথা, মেয়েদের বিবাহের কথাও দু'একবার তুলিলেন। অনিল মাঝে মাঝে মা'র কথায় যোগ দিতে লাগিল।

রাত্রি যখন পৌনে নয়টা তখন ক্ষিতীনবাবু শেষ এক হাই তুলিয়া উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় অনিলকে বলিয়া গেলেন, 'অনিল, তুমি এখন থেকে একটু করে বেদান্ত পড়।'

ক্ষিতীনবাবুর সঙ্গে গৃহিণী এবং অনিলও উঠিয়া গেল। আমি মনে মনে কতকটা আশ্বস্ত হইলাম।

আর সকলে চলিয়া গেলে বীণা সরস্বতীর পাশের চেয়ারে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'দিদি, তুমি আজকাল কবিতা লেখ। আমায় দেখাও না তো!'

সরস্বতী। দেখাই না?

গভীর অভিমানের সুরে বীণা বলিল, 'কই দেখাও।'

সরস্বতী অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল। দিদি দোষ স্বীকার করিল দেখিয়া বীণার আর রাগ রহিল না। সে হাসিয়া বলিল, 'বুঝেছি, বরের কথা লেখা হয় কিনা!' ভালবাসার কথা যে বর ছাড়া আর কারও বিষয় হইতে পারে না তাহা বীণা বিলক্ষণ জানিত।

সরস্বতী বলিল, 'মাথা নেই মাথাব্যথা। বলিস তো তোর বরের কথা লিখে দিতে পারি।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বীণা বলিল, 'হুঁঃ, কি লিখবে?' তাহার কণ্ঠস্বরে লজ্জার সহিত কৌতূহলের যে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল গাছের উপর থাকিয়াও আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম।

সরস্বতী বলিল, 'প্রথমেই তাঁর রূপ-বর্ণনা করা যাবে। তার খানিকটা উদাহরণ শোন—

মুণ্ডখানি কেশমাত্র হীন রে
ইন্দ্রলুপ্ত অতীব মসৃণ রে
ব্যোমবৎ দিগন্তে বিলীন রে!
টিকিটি বিশাল বৈজয়ন্তী রে
বর্ণ জিনি আসামের দন্তী রে
রাতকানা এমনি কিম্বদন্তী রে।'

প্রকৃতপক্ষে আমার দিগন্তব্যাপী টাকও নাই, টিকিও নাই, আসামের হাতির মত বর্ণও নয় এবং রাতকানার কিম্বদন্তীটা নিতান্তই ভিত্তিহীন। সরস্বতীর বর্ণনাটা যে আগাগোড়াই একটা মস্ত ভুল তাহা বোধকরি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কারণ যেখানে 'মুণ্ডখানি কেশমাত্রহীন', সেখানে বিশাল বৈজয়ন্তীর মত টিকির স্থান কোথায়! টাক কিছু টিকির জন্য সংস্থান রাখিয়া পড়ে না।

বীণা বরের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া চটিয়া গেল। কাহারই বা সহ্য হয়! বলিল. 'ওই রকম বুঝি? ভারি তো জান তুমি!'

সরস্বতী বলিল, 'না সবই তুই জানিস! তোর বর বলে শুধু তুই দেখিস আমরা তো দেখতে পাই না।—আচ্ছা বীণা, তাকে তো সেই কবে দেখেছিস. আজকাল তো বাড়ির ভেতরে আসেও না। কি করে জানলি যে সে ওইরকম হয়ে যায় নি।'

বীণা বলিল. 'বাঃ, রোজ বাড়ির সুমুখ দিয়ে কলেজ যায়।'

সরস্বতী। আর তুমি বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে তার মুখখানির ওপর দৃষ্টি দাও? দাঁড়াও না, কালই আমি তাকে সাবধান করে দিচ্ছি যেন এ রাস্তা দিয়ে আর কলেজ না যায়।

ধরা পড়িয়া গিয়া বীণা দিদির গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, 'না ভাই দিদি!' তাহার বোধহয় বিশ্বাস যে সরস্বতী সত্যসত্যই আমাকে ও-পথ দিয়া কলেজ যাইতে বারণ করিবে। করিলেও সে বারণ কতদূর গ্রাহ্য হইত বলা নিষ্প্রয়োজন।

সরস্বতী বলিল, 'বেশ ভাই দিদি, বরং তাকে বলে দেব যেন রবিবারেও কলেজ যায়।'

রবিবারে কলেজ না থাকা যে কতদূর ক্ষতিকর তাহা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম।

সরস্বতী বলিল, 'আচ্ছা বীণা, তুই যে এখন ভারি বর বর করে লাফাচ্ছিস (সরস্বতীর সস্নেহ কৌতুকের স্বর আরও স্নেহ-কোমল হইয়া আসিল) তুই যখন বিয়ে হয়ে বরের কাছে চলে যাবি, আমার জন্যে মন কেমন করবে না?'

ঠোঁটফুলানো সুরে উত্তর হইল, 'করবে না বুঝি?' মুহূর্তপূর্বের হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু যে জলে টলটল করিতেছে রাত্রির অন্ধকারেও তাহা আমার কাছে গোপন করিতে পারিল না।

সরস্বতী ছোটবোনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া একটি চুম্বন করিল। তারপর সেই ভাবে উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদের মনের মধ্যে যে গভীর ভালবাসার স্রোত বহিতেছিল কথা কহিয়া কেহ তাহাতে বাধা দিল না।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে থাকিয়া বীণা হঠাৎ সজোরে বলিয়া উঠিল, 'দিদি, একটা কাজ করলে হয় না।' কথাটা এরূপভাবে বলিয়া ফেলিয়াই আবার লজ্জায় চুপ করিয়া গেল।

সরস্বতী বলিল, 'কি কাজ?'

কোনরূপে লজ্জা দমন করিয়া বীণা থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল, 'তুমি যদি ওর দাদাকে—ঐ যিনি নতুন এসেছেন তাঁকে বিয়ে কর—তাহলে কিন্তু—'

সরস্বতী হাসিল, বলিল, 'তাহলে কিন্তু তোমার মুণ্ডু। তুই ভারি বোকা বীণা।'

এরূপ অপবাদেও বীণা দমিয়া গেল না, বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বলিল, 'কেন দিদি, দেখতে তো মন্দ নয়।'

সরস্বতী বলিল, 'তোর বরের চেয়ে ভাল!'

কথাটা বীণা স্বীকার করিল কিনা জানি না, কিন্তু বলিল, 'তবে কেন বিয়ে কর না!'

সরস্বতী দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, 'আমাদের সুর্যুয়া চাকরও তো তোর বরের চেয়ে দেখতে ভাল, তবে তাকেই বিয়ে করি না কেন?'

তুলনা শুনিয়া বীণা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। যতই তাহার সুর্যুয়া চাকরের সমতল নাসা, সম্মার্জনীর ন্যায় গুম্ফ এবং আলুচেরা চোখ মনে পড়িতে লাগিল ততই তাহার হাসির উৎস উছলিয়া উঠিতে লাগিল। শেষে অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া একটু স্থির হইয়া বলিল, 'না দিদি, তোমায় ওঁকে বিয়ে করতেই হবে। তাহলে কেমন আমরা একসঙ্গে থাকবো।'

আমার কিন্তু ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল গাছ হইতে নামিয়া গিয়া বলি, 'মহাশয়াম্বয়, আপনাদের সৎপরামর্শ আমি শুনিয়া ফেলিয়াছি। এখন শীঘ্র এ স্থান হইতে পলায়ন করুন নহিলে আসন্ন বিপদ।'

সরস্বতী বীণার কথার উত্তরে হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে এখন। মা ডাক-ছেন শুনতে পাচ্ছিস?'

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি যাবে না?'

সরস্বতী বলিল, 'তুই যা, আমি যাচ্ছি।'

বীণা চলিয়া গেল। ঘাসের উপর তাহার পদশব্দ মিলাইয়া গেলে পর সরস্বতী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর সেই তৃণাবৃত ভূমির উপর নতজানু হইয়া বসিয়া যুক্ত-করে গাঢ়স্বরে ডাকিল, 'ভগবান, বীণার আমার মঙ্গল কর। ছোট বোনটি যেন তার স্বামীকে

পেয়ে সুখে থাকে।'

গাছের উপর আমি স্তম্ভিত। আর একটু হইলেই পদস্খলন হইয়া পড়িয়া যাইতাম।

এমন সময় পদশব্দ। অনর্থ সম্ভাবনায় আমি শিহরিয়া উঠিলাম। অতি সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া কে ঠিক গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। বুঝিতে বাকি রহিল না যে দাদা আসিয়াছেন। তাঁহার গায়ে কালো কোট, পায়ে বার্ণিস পাম্পসু। পরিধানে কালাপেড়ে ধুতি —আগাগোড়া অভিসারের সাজ।

সরস্বতী চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কে?'

দাদা একবার কাশিয়া গলা সাফ করিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'আমি।'

তীব্রকণ্ঠে সরস্বতী বলিল, 'কে তুমি?'

দাদা সশংকে উত্তর করিলেন, 'আমি—কেদার।'

সাশ্চর্যে সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এখানে—এত রাত্রে!' বিস্ময় তাহার স্বাভাবিক লজ্জাকে পর্যন্ত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

দাদা দ্বিধাকম্পিত স্বরে বলিলেন, 'কেন, তুমি—আপনি আমায় ডাকেননি?'

সরস্বতী শুধু বলিল, 'আমি? আপনাকে?'

দাদা ভীত হইলেন, বলিলেন, 'তবে এ চিঠি কার?'

'চিঠি? দেখি!' বলিয়া সরস্বতী অগ্রসর হইয়া দাদার হাত হইতে চিঠিখানা লইল। একটু দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তারপর চিঠি লইয়া ধীরপদে চলিয়া গেল। দাদা দাঁড়াইয়া রহিলেন, 'নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখেব'।

আমার অবস্থা দাদার অপেক্ষাও শোচনীয় যেহেতু আমি গাছের উপর! শিথিল হস্ত হইতে গাছের ডাল ছাড়িয়া গেল। আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ মনে হইল পড়াটা ভাল দেখায় না। তাই পতনকে লম্ফনে পরিণত করিয়া দাদার ঘাড়ের উপর পড়িলাম। দাদা সবেগে আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ছুটিলেন। কিন্তু তখনি চেয়ারে লাগিয়া আছাড় খাইলেন। গড়াইতে গড়াইতে উঠিয়া আবার ছুটিলেন। এবার ভাগ্যের পরিহাস আরও নির্মম। একটা প্রাচীর তুলিবার জন্য খানিকটা কাদা তৈয়ারি করা ছিল। দাদা সেই কাদায় পড়িয়া গড়াগড়ি খাইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পলায়নস্পৃহা কমিল না। কর্দমমুক্ত হইয়া প্লুতগতিতে পলায়ন করিলেন।

অমূল্য শব্দ শুনিয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে দু' কথায় ঘটনাগুলি বুঝাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া দেখি দাদা আঙ্গুল হইতে নাকের ডগা পর্যন্ত কাদা মাখিয়া বসিয়া আছেন। এক পাটি জুতা ফিরিয়াছে—তাহাও ছিন্নভিন্ন। বড় বৌদিদি জল দিয়া কাদা ধুইয়া দিতেছেন, কিন্তু যত না কাজ করিতেছেন তাহার চতুর্গুণ হাসিতেছেন।

দাদা রাগিয়া বলিতেছেন, 'তুমি তো হাসবেই বৌদি।

কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে!

আমার মত অবস্থা' হলে বুঝতে পারতে।'

এমন সময় আমি গিয়া উপস্থিত, বলিলাম, 'একি দাদা, তোমার এ মূর্তি হল কি করে?'

বৌদিদি কষ্টে হাসি থামাইয়া বলিলেন, 'ষাঁড়ে তাড়া করেছিল!' বলিয়াই আবার অপরিমিত হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, 'ষাঁড়ে তাড়া? বল কি? আমাদের পাড়ার সেই কালো ষাঁড়টা বুঝি? ওটা যখন ভাল থাকে তখন বেশ থাকে। কিন্তু রাগলে আর রক্ষে নেই। আচ্ছা দাদা, ষাঁড়ে তাড়া করেছিল তো একটু আস্তে দৌড়লে না কেন? Shakespeare বলেছেন, They stumble that run fast!'

দাদা দেখিলেন রাগ করা বৃথা। ক্রোধের শিখাকে যতই তিনি প্রদীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আমাদের হাসির উচ্ছ্বাসে ততই তাহা নিভিয়া যাইতেছিল। নিরুপায় হইয়া

দাদা ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। বলিলেন, 'He laughs at scar that never felt a wound. তোমাকে ষাঁড়ে তাড়া করলে দেখ্‌ব কেমন Shakespeare-এর উপদেশ মনে থাকে।'

আমি বলিলাম, 'দুঃখের বিষয় আমায় কখনো ষাঁড়ে তাড়া করবে কিনা তা কেউ জানে না। যদিই বা করে তুমি হয়তো তখন উপস্থিত থাকবে না। যাক্‌, কিন্তু তুমি তখন কেন একটা গাছের ওপর উঠে পড়লে না?'

দাদা একে আমাদের বিদ্রূপবাণে একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর মনের মধ্যে ঘোরতর একটা উত্তেজনা ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, 'গাছ থেকেই তো ষাঁড়টা—' বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন।

আমি বলিলাম, 'কি রকম, গাছ থেকে ষাঁড় নামল? আজকাল কি ষাঁড়গুলো গাছে উঠতে আরম্ভ করেছে নাকি?'

বৌদিদি কিন্তু এতক্ষণ হাসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছিলেন।

দাদা বেফাঁস কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে ঘোর অস্বস্তির লক্ষণসকল স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তোয়ালে দিয়া গা মুছিতে মুছিতে বৌদিদির উদ্দেশ্যে বলিলেন,—

"তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলকুল কল নদীর স্রোতের মত।'

শুধু হাসতেই জান।

'কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে—

কেবল চালাকি করতেই পার। বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা তো আর কিছুই হল না।' বলিতে বলিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন।

॥ ৪ ॥

রাত্রে বিছানায় শুইয়া যখন ঘটনাটি আগাগোড়া আলোচনা করিয়া দেখিলাম তখন ব্যাপার বড় কৌতুকপ্রদ বলিয়া বোধ হইল না। একজনকে জব্দ করিতে গিয়া ঘটনাচক্রে আমরাই জব্দ হইয়া গেলাম। এখন ঘোর সংকট। সরস্বতী সেই কাল্পনিক প্রেম-কবিতা পড়িয়া যদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে যে ইহা আমার কাজ তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবে। দাদা এ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইলেও পাইতে পারেন, কিন্তু আমার নিষ্কৃতি নাই। দুশ্চিন্তায় আমার মাথার ভিতরটা আগুন হইয়া উঠিল। কিন্তু আত্মরক্ষার কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না। ছি ছি, করিয়াছি কি? একটি কুমারী মেয়ের সর্বনাশ করিতে বসিয়াছি? এখন যদি এই কথা কোনক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়ে, লোকে কি মনে করিবে? মুখে কিছু বলুক বা না বলুক মনে মনে নিশ্চয় ভাবিবে যে সরস্বতী সত্যই দাদাকে চিঠি লিখিয়াছিল। এখন দুর্নামের ভয়ে স্বীকার করিতেছে না। অথচ সে বেচারী নিষ্পাপ। আমি এই অপরাধের জন্য নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিলাম না। নিজের নির্বুদ্ধিতার উপর সহস্র সহস্র অশনিসম্পাত কামনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি আমার ঘুম হইল না।

পরদিন বেলা প্রায় আটটার সময় দাদা যখন পাঠে মনোনিবেশ করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও কৃতকার্য হইতেছিলেন না, তখন আমি গিয়া বলিলাম, 'দাদা, কাল কোন্‌ জায়গাটায় তোমায় ষাঁড়ে তাড়া করেছিল?'

দাদা শুষ্কমুখে উত্তর করিলেন, 'ওই পূব দিকের মোড়ের ওপর।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পাম্পসুও সেইখানেই হারিয়েছ, না?'

উত্তরে দাদা শুধু ঘাড় নাড়িলেন।

তখন আমি কর্দমপরিপুষ্ট জুতার পাটিটা বাহির করিয়া বলিলাম, 'তাহলে এখানা

ক্ষিতীনবাবুর বাড়ির পিছনে কি করে গেল?'

দাদার মুখ শুকাইয়া গেল। দু'বার ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'তাইতো—কি করে গেল!'

জুতাটা এককোণে ফেলিয়া দিয়া আমি তাঁহার সম্মুখে একটা চেয়ারে বসিয়া বলিলাম, 'মিথ্যে কেন আমার কাছে লুকোচ্ছ দাদা! তার চেয়ে আমার কাছে সব কথা খুলে বল না আমি যদি কিছু করতে পারি। আমি কাউকে বলব না।'

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর ভগ্নস্বরে বলিলেন, 'কাউকে বলিস না।'

তারপর তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এইঃ সরস্বতী তাঁহাকে এসেন্স মাখানো কাগজে কবিতায় চিঠি দিয়াছিল; সেই চিঠির নির্দেশ অনুসারে তিনি কাল রাত্রে সরস্বতীর বাড়ির পিছনে গিয়াছিলেন। সরস্বতীও সেখানে ছিল। কিন্তু চিঠির কথা শুনিয়া সে আকাশ হইতে পড়িল। তারপর চিঠিখানা লইয়া চলিয়া গেল। এমন সময় গাছ হইতে ইত্যাদি।

বিবরণ শেষ হইলে দাদা একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'Frailty, thy name is woman!'

যতদূর বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক ততদূর বিস্মিত হইয়া গল্প শুনিতেছিলাম; এখন দাদার দুঃখে বাস্তবিক দুঃখিত হইয়া বলিলাম, 'কেমন, প্রেমের নেশা ছুটেছে তো?'

এইবার দাদা ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সোজা হইয়া বসিয়া প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'তুমি ভুল করছ সন্তোষ! তুমি মনে করছ আমি একটা অন্ধ মোহ বা আর কিছুর বশবর্তী হয়ে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছি। কিন্তু তোমার মত ভুল বোধহয় কেউ কখনো করেনি। তুমি কি মনে কর কাল তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছেন বলেই আমার সমস্ত প্রেম লুপ্ত হয়ে গেছে? না; বরং তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেছে। তাঁর এই শিক্ষা আমি জীবনে ভুলব না। তিনি শিখিয়েছেন যে ভালবেসে প্রতিদান চাইতে নেই। আমরা লেখাপড়া শিখেছি, বড় বড় আইডিয়া মনের মধ্যে ধারণা করতে চেষ্টা করি, কিন্তু একথাটা পূর্বে কখনো ভাবতে পারিনি। তার কারণ কি জান? কারণ—মানুষের মন বড় প্রবল—বড় স্বার্থপর! তাই একগুণ দিয়ে দশগুণ পেতে চায়। আর স্বার্থের মোহে সহজবুদ্ধিটুকুরও গলা টিপে ধরে।' বলিতে বলিতে দাদার স্বর যেন নিভিয়া আসিল।

আমার অত্যন্ত অনুশোচনা হইল। ইচ্ছা হইল সব কথা বলিয়া ফেলি। কিন্তু তাহাতে আরও বিপদ। সরস্বতী চিঠি লেখে নাই জানিতে পারিলে দাদার যন্ত্রণা যে কতদূর বাড়িয়া যাইবে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। একটা মন লইয়া বারবার কৌতুক করিতে ইচ্ছা হইল না। কারণ নিজের মনও খুব সুস্থ ছিল না।

ঠিক সেই সময় বৌদিদি প্রবেশ করিয়া একটু যেন হাসি-হাসি সুরে বলিলেন, 'কি হচ্ছে তোমাদের ঠাকুরপো?'

কথাগুলা দাদাকেই সম্বোধন করা হইয়াছিল। তিনি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, 'ও কিছু নয় বৌদি—'

বৌদিদি হাস্যচঞ্চল চোখে ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন, 'তবু শুনিই না!'

বৌদিদির ধরন দেখিয়া বোধ হইল হয়তো দাদার উত্তেজিত বক্তৃতা শুনিয়াছেন। কিন্তু সহসা ধরা দেওয়া হইবে না। অথচ মেয়েমানুষের কাছে ঢিলা হইলেই ধরা পড়িবার ভয়। তাই একটু তীব্রকণ্ঠে বলিলাম, 'বল্‌লে কি বুঝতে পারবে বৌদি! এসব ফিলজফির কথা!'

বৌদিদি এবার গম্ভীর হইলেন, বলিলেন, 'তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে আমার ভালবাসা একটুও কমে যায়নি, ভালবেসে প্রতিদান চাইতে নেই,—এইসব বুঝি তোমাদের ফিলজফির কথা!'

দাদা বুকে ঘাড় গুঁজিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমিও মনে ভারি অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু তথাপি ছাড়িবার পাত্র নয়। বলিলাম, 'নিশ্চয়! মনের বৃত্তিগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার শাস্ত্রই তো—'

বৌদিদি মুখ আরও গম্ভীর করিয়া বলিলেন, 'তবে ঠাকুরপো, তোমাদের ও শাস্ত্র পড়ে কাজ নেই। তোমরা ছেলেমানুষ, শেষে মাথা বিগড়ে যাবে!'

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, 'দেখ, বৌদি, তোমার সবরকম ভণ্ডামি সইতে পারি কিন্তু ওই গম্ভীর মুখ সইতে পারি না। গাম্ভীর্য তোমার মুখে একটুও মানায় না।'

বৌদিদিও হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, 'বেশ মানি। কিন্তু মিথ্যে কথাও তোমাদের মুখে একটুও মানায় না—বল্‌তে গেলেই ধরা পড়ে যাও। মেজ ঠাকুরপো যে জোরে বাগ্মিতা করছিলেন, বাইরের ঘর থেকে বাবাও বোধহয় দু'এক কথা শুনে থাকবেন।'

দাদা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি ইঙ্গিতে তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিলাম। কারণ বাবা যে কিছু শুনিতে পান নাই ইহা নিশ্চিত! একবার মক্কেল-পরিবৃত হইয়া বসিলে বজ্রনাদও তাঁহার কানে যাইত না।

বৌদিদি বলিলেন, 'এখন লক্ষ্মী ছেলের মত বলে ফেল তো ব্যাপারটা কি। আমার যতদূর সন্দেহ হয় কাল রাত্তিরের ঘটনার সঙ্গে এর কোন সংস্রব আছে।'

দাদা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কোনক্রমে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম, 'দাদা, মা ভৈঃ, বৌদিকে সব কথা বলে ফেলা যাক। তারপর যা হয় হবে। আর না বলেই বা কঃ পন্থা!'

দাদা অগত্যা রাজী হইলেন। তখন আমি বৌদিদিকে টানিয়া আর একটা ঘরে লইয়া গিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। নিজের দুষ্কৃতির কথা কিছুমাত্র গোপন করিলাম না। সমস্ত শুনিয়া বৌদিদি গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরপো, কাজটা ভাল হয়নি। সরস্বতী বড় চালাক মেয়ে, সে এ বিষয় নিয়ে গোলমাল করবে না। কিন্তু এ যে তোমার কাজ তা সে কবিতা দেখেই বুঝবে। সেটা কিন্তু ভাল হবে না ভাই। তার চেয়ে তুমি গিয়ে তার কাছে নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে এস। তাহলে সে সহজে তোমায় ক্ষমা করতে পারবে। আর তোমার দাদার কথা—সে আমি আরো ভেবে দেখবো।'

ভাবিয়া চিন্তিয়া বৌদিদির কথামতই কাজ করা সমীচীন বোধ করিলাম। আরও মনে মনে স্থির করিলাম নিজের জন্য মার্জনা তো চাহিবই, সেই সঙ্গে দাদার মার্জনাটাও স্বীকার করাইয়া লইব।

বৈকালে আন্দাজ পাঁচটার সময় দাদাকে লইয়া বাহির হইলাম। বলিলাম, 'চল দাদা, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।'

দাদা উদাসভাবে বলিলেন, 'কোথায় যাবে?'

আমি বলিলাম, 'চলই না। একটু নির্মল বায়ু সেবন করে আসবে।'

দাদা আর আপত্তি করিলেন না। সময় সময় মানুষের মনের এমন অবস্থা হয় যখন কাহারও তুচ্ছ কথাটিরও প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। অতএব আমরা দুজনে বাহির হইলাম।

যখন ক্ষিতীনবাবুর ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন দাদা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম, 'ওকি, দাঁড়ালে কেন, চলে এস না।'

দাদার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'এই বুঝি নির্মল বায়ু সেবনের জায়গা?'

আমি কোনরকমে দাদাকে টানিয়া বাগান পার হইয়া বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাড়িতে ঢুকিতেই বৈঠকখানা সম্মুখে পড়ে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ক্ষিতীনবাবু বাড়িতেই আছেন। পুরাতন বেয়ারা ভোলা একটু হাসিয়া বলিল, 'ভেতরে চলে যান না বাবু, আপনারি তো বাড়ি।'

ছেলেবেলা কতবার বাড়ির ভিতর গিয়াছি। কিন্তু আজ অনেকদিন পরে কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। উপরন্তু দাদাকে লইয়া ভিতরে যাওয়া সঙ্গত নয়। অথচ তাঁহাকে বাহিরে একলা বসাইয়া রাখিয়া নিজে ভিতরে যাওয়াটাও কেমন লজ্জাকর বোধ হইতে লাগিল। আমি

ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া ভোলা বলিল, 'বাবু এই পাশের ঘরেই আছেন—আপনারা ভেতরে যান।'

আমরা ধীরে ধীরে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি খুব বড় নয়; তাহাতে সরঞ্জামের মধ্যে একটি খাট, একটি চেয়ার, একটি টেবিল এবং দেয়ালে কতকগুলি বিলাতী ছবি। প্রকৃতপক্ষে ঘরখানি ক্ষিতীনবাবুর দিবানিদ্রার জন্য; তবে অতিথি বন্ধুবান্ধব আসিলে সচরাচর এই ঘরখানি তাঁহাদের নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ক্ষিতীনবাবু বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া আছেন। মাথার কাছে একটি পকেট ঘড়ি কুণ্ডলিত চেনের মধ্যে থাকিয়া টিক টিক শব্দ করিতেছে। বিছানার উপরেই কতকগুলি ইংরাজী ও সংস্কৃত বই ইতস্ততঃ ছড়ানো। একটি বই খোলা অবস্থায় তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া আছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সেটির নাম বেদান্তবারিধিকর্ণধার। ঘরে অন্য কোন জনপ্রাণী ছিল না; কেবল একটা মাছি ক্ষিতীনবাবুর উরুর উপর বসিয়া কোন এক অনাগত শত্রুর উদ্দেশ্যে তাল ঠুকিয়া আস্ফালন করিতেছিল।

হঠাৎ তাঁহার বৈদান্তিক অনুশীলনে বাধা দিয়া হঠকারিতা করিলাম কিনা ভাবিতেছি এমন সময় ক্ষিতীনবাবু কড়িকাঠ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া আমাদের দিকে চাহিলেন। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'সন্তোষ না? এস, এস; ইনি কে?'

দাদাকে তিনি পূর্বে অন্ততঃ একশতবার দেখিয়া থাকিবেন। তথাপি এরূপ প্রশ্ন করায় দাদা অত্যন্ত মুষড়িয়া গেলেন। দার্শনিকের স্মৃতির উপর বিশেষ আস্থা না থাকায় ক্ষিতীনবাবু যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন এজন্য মনে মনে আশ্বস্ত হইলাম।

বলিলাম, 'ইনি আমার খুড়তুত দাদা—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। কেন এঁকে তো আপনি অনেকবার দেখেছেন।'

ক্ষিতীনবাবু স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় চক্ষু দাদার পানে ফিরাইয়া বলিলেন, 'তা হবে।'

তারপর অনেকক্ষণ কোনও কথা হইল না। আমার বোধ হইল ক্ষিতীনবাবু অলক্ষ্যে আবার বেদান্তবারিধিতে ডুবিয়া গিয়াছেন। আমরা দুইটি প্রাণী যে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছি তাহা স্বচ্ছন্দে ভুলিয়া যাইতে একটুও দ্বিধা করেন নাই।

আমি একটু জোরে কাশিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, 'আমি একবার সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ক্ষিতীনবাবু বলিলেন, 'সরস্বতী বাড়ির মধ্যে আছে।'

সরস্বতীর বাড়ির মধ্যে থাকা সম্বন্ধে আমারও কোন সন্দেহ ছিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম আমার উদ্দেশ্য জানিয়া ক্ষিতীনবাবু আমার ভিতরে যাইবার একটা করিয়া দিবেন। কিন্তু সেরূপ কোন লক্ষণই না দেখিয়া অগত্যা একাই উঠিলাম। সহিত দেখা করিব শুনিয়া দাদা অত্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, 'একটু বস। আমি এখনি আসছি।'

বাড়ির ভিতর পা দিয়াই দেখি সম্মুখে সরস্বতী। সে আমাকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, 'একি সন্তোষদা! কতদিন পরে। ভাল আছ তো?'

আমি ঢোক গিলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, 'তোমাকে দেখতে এলুম।'

সরস্বতী পূর্বের মত সুন্দর হাসিয়া বলিল, 'আর কাউকে নয় তো?'

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চল—কথা আছে।'

সরস্বতী 'চল' বলিয়া আমাকে তাহার ঘরে লইয়া গেল। তারপর ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল, 'কি কথা?'

আমি অপরাধীর মত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অবশেষে বলিলাম, 'সরস্বতি, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

সরস্বতী পূর্ববৎ রহস্যমুখর কণ্ঠে বলিল, 'কেন বল তো? আজকাল বড় বেশী কবিতা লিখছ সেই জন্যে?' কবিতা লেখার কথা লইয়া আমাদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা চলিত। কিন্তু

আজ আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না। নতমুখে বলিলাম, 'ঠাট্টা নয় সরস্বতি, আমি সত্যিই ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

এবার সরস্বতী হাসিল না, শুধু জিজ্ঞাসা করিল, 'কি জন্যে?'

আমি চকিতের জন্য মুখ তুলিয়া আবার তৎক্ষণাৎ নামাইয়া লইয়া বলিলাম, 'কি জন্যে তুমি জান না?' বলিয়া ভয়ে ভয়ে আবার চোখ তুলিয়া দেখি, তাহার মুখের ভাব একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার চক্ষু হঠাৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কপাল উত্তপ্ত লোহার মত রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সে তীব্র কণ্ঠে বলিল, 'জানি। কিন্তু তোমরাও জান কি, যে অপমান আমায় করেছ তা মার্জনার কতদূর অযোগ্য?'

আমি বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। সরস্বতী তাহার প্রদীপ্ত চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া আবার বলিতে লাগিল। তাহার চক্ষুর ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুৎ ছুটা-ছুটি করিতেছিল। আমি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম।

সে বলিল, 'বুঝি না কি হীন তোমাদের প্রবৃত্তি। যখন কবিতায় চিঠি লিখতে বসেছিলে তখন মনে হয়নি যে একজন কুমারীর ইহকাল নষ্ট করবার পথ পরিষ্কার করছ। এই রকম প্রবৃত্তি নিয়ে তোমরা মনুষ্যত্বের দাবী করতে লজ্জা বোধ কর না। ছি ছি, তোমরা মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাও নি কেন?' এই পর্যন্ত এক নিশ্বাসে বলিয়া গিয়া থামিল। তারপর নিশ্বাস টানিয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল, 'বাহাদুরী তোমাদের প্রবৃত্তিকে আর বাহাদুরী তোমাদের অনুতাপকে। চিঠি লেখবার সময় এ জ্ঞান হয়নি? তাহলে তো ক্ষমা চাইবার জন্যে এত দূর আসতে হত না। ক্ষমা—ক্ষমা কি মুখের কথা নাকি।'

আমার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সরস্বতীর বোধহয় দয়া হইল; তাই সে চুপ করিল। আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলাম, 'সরস্বতি, আমি না বুঝে দোষ করেছি। আমাকে ক্ষমা কর ভাই।'

গর্বিতভাবে গ্রীবা বাঁকাইয়া সে একটা অত্যন্ত কঠিন উত্তর দিতে যাইতেছিল। তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আমি সভয়ে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিলাম। ঠিক যেমন আসন্নঅনলবর্ষী আগ্নেয়গিরির চূড়ার দিকে চলচ্ছক্তিহীন মানুষ ভয়ব্যাকুলচক্ষে তাকাইয়া থাকে—সেইরূপ। কিন্তু হঠাৎ সরস্বতী থামিয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে আমার মুখের উপর হইতে তাহার রূঢ় উদ্ধত দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

ঠান্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে উষ্ণ বাষ্প যেমন গলিয়া জল হইয়া যায়, সরস্বতীর মুখখানা দেখিতে দেখিতে সেইরূপ শান্ত হইয়া গেল। সে নতমুখে বসিয়া রহিল, তাহার কপালে গণ্ডে ছোট ছোট স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে সরস্বতী মুখ তুলিল। মুখখানা ঈষৎ রঞ্জিত হইয়াছিল। সে একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'সন্তোষদা, তুমি এসেছিলে আমার কাছে একটা দৈবাৎকৃত ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইতে। আমি কি চমৎকার ব্যবহারই তোমার সঙ্গে করলুম। এখন কে কাকে ক্ষমা করবে বলতো?'

আমি সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, 'কাউকে কারুর কাছে ক্ষমা চেয়ে কাজ নেই সরস্বতি, ওটা কাটাকাটি হয়ে যাক।'

সরস্বতী একটু মলিন হাসিয়া বলিল, 'সেই ভাল।'

এমন সময় চাকরানি আসিয়া দ্বারের নিকট হইতে মৃদুস্বরে ডাকিল, 'দিদিমণি, মা তো এখনো ফিরে আসেননি। উনুনে আগুন দেব কি?'

সরস্বতী বলিল, 'মোক্ষদা, ভেতরে আয় না। মা'র বোধহয় ফিরতে দেরি হবে—বীণাকে নিয়ে সেই ওপাড়ায় বেড়াতে গেছেন।—তুই এক কাজ কর না মোক্ষদা। উনুন জ্বেলে জল চড়িয়ে দে, তোর দাদাবাবুকে এক পেয়ালা চা তৈরি করে দি।'

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, 'না না, অত হাঙ্গামে কাজ নেই—'

মোক্ষদা পুরাতন দাসী, সরস্বতী বীণাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, 'হাঙ্গামা কিসের? এই যে এখুনি করে দিচ্ছি

দাদাবাবু।' বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি বুঝিলাম সরস্বতী বাহ্য কাজের আড়ম্বরে আমাদের ভিতরকার লজ্জাটুকু চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, 'কিন্তু আর একজন নিরীহ প্রাণী যে তোমার মার্জনার আশায় বাইরে বসে আছেন।'

কথাটা শুনিবামাত্র সরস্বতী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চকিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম, 'দাদা।'

সরস্বতীর মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তারপর নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া বলিল, 'যিনি আমাকে এত ছোট মনে করেন তিনি আবার ক্ষমা চাইতে এসেছেন কেন?'

'তোমাকে ছোট মনে করেন?'

সরস্বতী মাথা নীচু করিয়াই বলিল, 'তা নাহলে ও চিঠি আমার লেখা বলে মনে করলেন কেন?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ভাবিলাম বলি—'সরস্বতি, তুমি জান না যারা ভালবাসে তাদের মাঝে মাঝে কী প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়। যদি জানতে এমন কথা বলতে না।' কিন্তু কথাটা মনের মধ্যেই রহিল, বলা হইল না।

সরস্বতী হঠাৎ বলিল, 'যাই দেখিগে, মোক্ষদা কি করলে।' বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

আমি বলিলাম, 'না না সরস্বতি, আমি এখন চা খাব না। কিন্তু তুমি বল, আমাকে যেমন ক্ষমা করেছ দাদাকেও তেমনি করলে!'

সরস্বতী কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আমি নিরুপায় হইয়া বলিলাম, 'আর চিঠিখানা—সেখানা অন্ততঃ দিয়ে যাও। তাও কি দেবে না?'

সরস্বতী চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'না, সে চিঠি তোমরা পাবে না।' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া দাদার মুখখানা একটু প্রফুল্ল দেখিলাম। ফটকের বাহির হইলে তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হল?'

আমি নীরসভাবে বলিলাম, 'কিসের?'

দাদা চুপ করিয়া গেলেন। আমি কিজন্য সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না। তবু বোধ করি প্রণয়ীর মনে একটা অনিশ্চিত আশা জাগিয়াছিল।

আমি তখন বলিলাম, 'নির্মল বায়ু সেবনে তোমার একটু উপকার হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।'

'কি উপকার?'

'মুখের রং একটু ফরসা হয়েছে মনে হচ্ছে।'

দাদা বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের পানে চাহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ক্ষিতীনবাবুর সঙ্গে কি কথা হল?'

দাদা সজাগ হইয়া বলিলেন, 'অনেক কথা। ওঁর কথা শুনে মনে হয় উনি বেদান্ত নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি বেদান্ত সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেছেন? আমি বললুম—কিছুদিন আগে একটু করেছিলুম কিন্তু বেশী কিছু বুঝতে পারিনি। তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন—একবারেই কি বুঝতে পারা যায়। আর একটু চর্চা করে দেখুন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।—তারপরেই আমাদের কথাবার্তা জমে গেল।'

আমি বলিলাম, 'ক্ষিতীনবাবু কেমন লোক বোধ হল?'

দাদা বলিলেন, 'আগে তো কখনো ওঁর সঙ্গে আলাপ করিনি। তবে একবারে যত দূর বোঝা যায় খুব সরল প্রকৃতির লোক। আমার তো খুব চমৎকার লোক বলেই মনে হল।'

আমি বলিলাম, 'তবে দোষের মধ্যে উনি বেদান্তকেই সমস্ত চিন্তার এবং কাজের কেন্দ্র

করে ফেলেছেন।'

দাদা আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'সেটাকে দোষ বলতে পারি না। সকলেরই জীবনের একটা কেন্দ্র থাকা দরকার—তা নাহলে জীবনের বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয় না।'

আমি বলিলাম, 'বৃত্তটা খুব বেশী সম্পূর্ণ হলেও একটা বড় অসুবিধা আছে—কেবল বৃত্তপথেই ঘুরে বেড়াতে হয়—তার বাইরে কিছু আছে কিনা দেখবার ফুরসৎ হয় না।'

দাদা বলিলেন, 'বাইরে দেখবার দরকার?'

আমি বলিলাম, 'দেখ, নিরবচ্ছিন্ন সব জিনিসই একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়। বৈকুণ্ঠে থেকে থেকে ভগবানের জীবন যখন নিতান্ত অসহ্য হয়ে ওঠে তখন তিনিও মর্ত্যে লীলা করতে আসেন।'

দাদা বলিলেন, 'তবে তোমার মতে মানুষের জীবনের একটা কেন্দ্র থাকা উচিত নয়!'

আমি তাঁহার প্রশ্ন এড়াইয়া বলিলাম, 'আচ্ছা, যে মুখে চিরকাল মিষ্টি কথা শুনে এসেছ সে মুখের কড়া কথা মাঝে মাঝে ভাল লাগে নাকি?'

বেদান্তর হাওয়া তখনো দাদার মস্তিষ্কের কন্দরে কন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তিনি জোর দিয়া বলিলেন, 'তা হলেও সত্যের কাছে কিছুই নয়।'

আমি বলিলাম, 'দেখ, এটা তোমার বাড়াবাড়ি। আমি তোমার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা করছি না। আমি বলছি মনের ছোট ছোট বৃত্তিগুলির কথা—যার হাত থেকে কেউ কখনো নিস্তার পানিনি। প্রমাণ চাও? রবিবাবুর 'রাজা ও রাণী' পড়। 'হে ব্রাহ্মণ, মিথ্যা করে বল; অতি ক্ষুদ্র সকরুণ দুটি মিথ্যা কথা!"

তবু দাদা আমার কথা স্বীকার করিলেন না দেখিয়া আমি তাহার প্রাণের সবচেয়ে নরম স্থানে হাত দিলাম। বলিলাম, 'আচ্ছা একটা উদাহরণ ধর। মনে কর, একথা যদি সত্যি হয় যে সরস্বতী আদৌ তোমায় চিঠি লেখেনি, আর কেউ ঠাট্টা করে লিখেছে, তাহলে এই সত্যটা তোমার বেশী ভাল লাগে, না, সরস্বতী চিঠি লিখেছে এই কল্পিত মিথ্যাটা বেশী ভাল লাগে। শুধু মনে কর—আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না।'

দাদার মুখ শুকাইয়া গেল। স্পষ্ট বুঝিলাম বৈদান্তিক গবেষণায় পরাজিত হইবার ভয়ে মুখ শুকায় নাই। তারপর দারুণ নৈরাশ্যপূর্ণ সুরে বলিলেন, 'তবে কি ও চিঠি সরস্বতীর নয়?'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আহাহা—শুধু মনে কর না ছাই। আমি কি তোমায় বিশ্বাস করতে বলছি?'

দাদা একটু শান্ত হইয়া চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তিনি অর্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'তা কেমন করে হবে। নিশ্চয় সে লিখেছে। নইলে সে আসবে কেন?'

আমি বলিলাম, 'কেমন, মানলে তো যে মিথ্যা মাঝে মাঝে সত্যের চেয়ে বেশী বাঞ্ছনীয়।'

দাদা বলিলেন, 'কই মানলুম!'

আমি বলিলাম, 'বাঃ, মানলে না? এখনি তো সরস্বতী চিঠি লেখেনি এই মনে-করা সত্যটা মিথ্যা বলে মানবার জন্যে প্রাণ আকুলি বিকুলি করছিল।'

দাদা সলজ্জে চুপ করিয়া রহিলেন।

॥ ৫ ॥

কিছুদিন পরে একদিন দুপুরবেলা বৌদিদি সরস্বতীদের বাড়ি গিয়া সম্মুখে বীণাকে পাইয়া বলিলেন, 'কোথায় রে বীণা, তোর দিদি?'

বৌদিদিকে দেখিয়া বীণা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'চল না ভাই বৌদি, আমার পুতুলের বাক্সটা গুছিয়ে দেবে।'

বৌদিদি বলিলেন, 'সে হবে এখন। দিদি কোথায় তোর!'

বীণা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, 'নিজের ঘরে আছে।' সকল সময়েই যে তাহার অপেক্ষা দিদির কাছেই বৌদিদির প্রয়োজন বেশী ইহাতে তাহার অভিমান হইল।

ঘরে ঢুকিয়া বৌদিদি দেখিলেন সরস্বতী একলাটি চুপ করিয়া খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। একজন ঘরে ঢুকিল দেখিয়া সে অন্যমনস্কভাবে মুখ তুলিয়া একটু ভ্রূকুটি করিল। তারপর চমক ভাঙিয়া যাইতেই অপ্রতিভ ও লজ্জিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'এই যে বৌদি—' বলিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

বৌদিদি তাহার পাশে গিয়া বসিয়া কানে কানে বলিলেন, 'কার রূপ ধ্যান হচ্ছিল?'

সরস্বতী চমকিয়া উঠিল। একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'বৌদি, আগে তো তুমি আমাকে এসব কথা বলে ঠাট্টা করতে না?'

বৌদিদিও মনে মনে একটু লজ্জিত হইলেন। বীণা অভিমান সত্ত্বেও তাঁহার পিছন পিছন আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, 'তোর পুতুলের বাক্স নিয়ে আয় বীণা।'

বীণা পুতুলের বাক্স আনিতে ছুটিল এবং অচিরাৎ তাহা লইয়া উপস্থিত হইল। তখন বৌদিদি তাহাকে বলিলেন, 'এখন তুই যা।'

বীণা আপত্তি করিয়া বলিল, 'বা রে—আমার পুতুল পড়ে রইল এখানে—'

বৌদিদি বলিলেন, 'বড় জা'র হুকুম। শিগ্‌গির পালা বলছি।'

বীণা আর দ্বিরুক্তি করিল না, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

তখন বৌদিদি একটা পুতুলের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া পরাইতে পরাইতে নতনেত্রে বলিলেন, 'সরস্বতি, আমি সব জানি!'

সরস্বতী গলার স্বর সংযত করিতে করিতে বলিল, 'কিসের?'

বৌদিদি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'তুই যা ভাবছিলি।'

সরস্বতী একটা ঢোক গিলিল, তারপর সহজভাবেই বলিল, 'কি ভাবছিলুম?'

বৌদিদি পুতুলটা বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সহাস্যনেত্রে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তুই যত বড়ই পণ্ডিত হোস না কেন আমাকে ফাঁকি দিতে পারবি না। সত্যি বলতো তুই তার কথা ভাবছিলি না?'

সরস্বতী স্বাভাবিক সুরে বলিল, 'কার কথা?'

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, 'ওলো, আমার গুণধর মেজ দেওরটির কথা।'

সরস্বতী গম্ভীর হইয়া বলিল, 'না বৌদি, তুমি ভুল বুঝেছ। আমি ওকথা ভাবছিলাম না।'

বৌদিদি ম্লান হইয়া গেলেন; একটু পরে বলিলেন, 'তবে কি ভাবছিলে?'

সরস্বতী বলিল, 'যা ভাবছিলুম তা অনেকটা ওই রকমই। ভাবছিলুম কি প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে।'

বৌদিদি প্রজাপতি ঠাকুরের হাতেগড়া শিষ্যা। তিনি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'এর প্রায়শ্চিত্ত যে ভারি সহজ! আ পোড়াকপাল, তাও বুঝি জানিস না?'

সরস্বতী বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তখন বৌদিদি তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া কানে কানে যাহা বলিলেন তাহার উত্তরে সরস্বতীর মুখখানা আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, 'আঃ বৌদি, কি যে বল তার ঠিক নেই—ছিঃ।'

তাহার শেষ কথাটায় সত্যসত্যই একটু তিরস্কারের আভাস ছিল। সে নিজেকে বৌদিদির বাহুমুক্ত করিয়া লইয়া হেঁটমুখে বলিল, 'বৌদি, তুমি যা করতে চাও তা হবে না।'

বৌদিদি তাহার দৃঢ়তায় আহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন হবে না শুনি?'

সরস্বতী কণ্ঠ স্থির করিয়া বলিল, 'এতে কেন নেই। আমি বলছি হবে না।' বলিতে বলিতে তাহার গলাটা কাঁপিয়া গেল।

বৌদিদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা দেখিস আমার কথা। আমিও বলছি হবে। এই বলে গেলুম সরস্বতি, যদি অক্ষরে অক্ষরে না মিলে যায় তো বলিস তখন।'

বাড়ি ফিরিয়া আসিলে বৌদিদির মুখখানা বড় বিষণ্ণ দেখিলাম। বলিলাম, 'কি হল?'

বৌদিদি একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'সরস্বতী বড় শক্ত মেয়ে। সে যেটা অন্যায় মনে করে তাতে কোনও প্রশ্রয় দেবে না।'

আমি। তা তো জানিই। জানি বলেই তো তোমার মত লোককে পাঠিয়েছিলুম। এখন হল কি? পরাজয় নয় তো!'

বৌদিদি। আর ভাই, প্রায় তাই বইকি।

আমি। অ্যাঁ! এ কিন্তু বৌদি, সরস্বতীর ভারি অন্যায়। একটা সামান্য অপরাধকে এমন বড় করে তোলা—এ কি তার উচিত হচ্ছে? বৌদি, তোমরা মেয়েমানুষ জাতটা ক্ষমা করতে জান না। তোমাদের দণ্ড আমাদের অপরাধের চেয়ে এত বেশী হয়ে পড়ে যে অসহ্য বোধ হয়।

বৌদিদি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, 'অবশ্য এ কিছু মেমসাহেবের ব্যাপার নয় যে মেয়ের মত না হলে বিয়ে হতে পারে না। অনিলের মা মেজ ঠাকুরপোর মত জামাই পেলে খুশীই হবেন। কিন্তু সরস্বতী যেরকম মেয়ে ও যদি একবার বেঁকে বসে—'

আমি বলিলাম, 'না বৌদি, সে কাজ নেই। গৌরীদান তো নয় যে মেয়ের মত বলে কোনও জিনিসের সৃষ্টিই হয়নি। সরস্বতীর মন যদি দাদার প্রতি বিমুখ হয় তাহলে— বুঝলে না?'

বৌদিদি ঘাড় নাড়িলেন, শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'সত্যি বলছি ঠাকুরপো, তোমার দাদার মুখের দিকে চাইতে আমার কষ্ট হয়। খাওয়া-দাওয়া একেবারে কমে গেছে। সর্বদা মনমরা হয়ে বেড়াচ্ছেন।'

আমি বলিয়া ফেলিলাম, 'সত্যি বৌদি, এই ক'দিন আমি দাদাকে লক্ষ্য করছি। উনি যেন কি রকম হয়ে গেছেন। ওঁর অমন স্বচ্ছ উজ্জ্বল প্রাণের ওপর যেন একপুরু কালি পড়ে গেছে। মুখে যাই বলি, যখন মনে হয় যে আমিই ওঁর ঘাড়ে এই অপরাধের ভার চাপিয়েছি, তখন কি বলব বৌদি, আমার চোখ ফেটে জল আসে।'

বৌদিদির কোমল হৃদয়টি যে কত শীঘ্র গলিয়া যায় তাহা আমি জানিতাম। আমার কথা শুনিয়া তাঁহার চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বুঝিলাম জল আসিয়াছে। কিন্তু তিনি রোদনের আভাসজড়িত মুখখানি হাসিতে ভরিয়া দিয়া বলিলেন, 'এই নাও ঠাকুরপো, আমি বাজি রাখলুম। আমি সরস্বতীর মন জানি, সে মুখে যাই বলুক না কেন। তাকে রাজী করাতে না পারি তো আমি তোমাদের শালী।' এই বলিয়া বৌদিদি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

॥ ৬ ॥

বিকালবেলা দেখিলাম দাদা একখানা বই হাতে করিয়া বাহির
করিলাম, 'কি বই ওখানা?'

দাদা পুস্তকের মলাট দেখাইলেন—উত্তর-মীমাংসা, ইংরাজীতে। অতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হবে উত্তর-মীমাংসা?'

'দরকার আছে' বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় ক্লাবে যাইতেছি, ক্ষিতীনবাবুর বৈঠকখানায় গৃহস্বামী ও দাদার স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখি, ঘোর তর্ক বাধিয়া গিয়াছে। তর্কের উত্তেজনায় দাদা একটা চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে কিয়দ্দূরে ক্ষিতীনবাবু উপবিষ্ট। তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহার তর্জমা বাহির হইতেছে। বাতির অভাবে ঘর প্রায় অন্ধকার। কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। অন্ধকারে বসিয়া দুজনে

মহোৎসাহে তর্ক করিতেছেন।

আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম কিন্তু কেহই ফিরিয়া দেখিলেন না। অহার কারণ আমি যে প্রবেশ করিয়াছি তাহা দুজনের একজনও জানিতে পারেন নাই। আমি তো দূরের কথা—সে সময় ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা যদি হ্রেষাধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ করিত তাহা হইলেও তাঁহাদের চেতনা হইত কিনা সন্দেহ। ইঁহারা আমার কোনো সংবর্ধনাই করিলেন না তখন 'সতাং মানে ম্লানে মরণমথবা দূরগমনং' এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া সেখানে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলাম না—ক্লাব অভিমুখে ধাবিত হইলাম।

ক্লাবে পেঁাছিবামাত্র যে গুরুতর সংবাদটা অমূল্য পরম উৎসাহের সহিত আমাকে শুনাইয়া দিল তাহাতে সদ্যলক্ষিত দৃশ্যটা মনে করিয়া মন করুণায় ভরিয়া গেল। যেটা মুহূর্তপূর্বে খুব আশাপ্রদ বোধ হইয়াছিল এখন সেইটাই নিরাশার কালিমালিপ্ত হইয়া গেল।

অমূল্য যাহা বলিল তাহা এই—সরস্বতীর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, ভাবী বর মেয়ে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আজই প্রাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

সরস্বতীর বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়া গেল অথচ আমরা কিছু জানিতে পারিলাম না, ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। ভাবিলাম অমূল্য যতটা বলিতেছে ততটা কিছু নয়—বোধহয় সংকল্পিত বর কার্যগতিকে এদিকে আসিয়া পড়িয়া থাকিবে। তাই এই সুযোগে মেয়ে দেখিয়া যাইতেছে। সে যাহাই হোক, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লোকটি কে কিছু জান?'

অমূল্য বলিল, 'অনিলের মা নাকি তাকে আবিষ্কার করেছেন। শুনছি তিনি ক্ষিতীন-বাবুর শালার শালা।'

এই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটার উপর মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি করে সে?'

অমূল্য বলিল, 'এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরিয়েছে। নাম শরৎচন্দ্র ঘোষাল। এখানে তার এক দূরসম্পর্কের মাসী আছেন।'

প্রশ্ন করিলাম, 'কেমন দেখতে শুনতে?' একটা খুঁত ধরিতে পারিলে বোধহয় আমার মনটা খুশী হইয়া উঠিত। কিন্তু অমূল্য বলিল, 'ভারি সুন্দর হে। আমি তাকে নিজে দেখেছি—বুদ্ধিমানের মত চেহারা। এখন দেখছ—তোমার দাদার কোন দিকেই আশা নেই। None but the brave deserve the fair.'

বিকল অন্তঃকরণ লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন সকালবেলা দাদাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমাদের এখানে একজন নতুন লোক এসেছে জান?"

'কে?'

'শরৎ ঘোষাল বলে একজন—কালই এসেছে।'

'কালই এক অদ্ভুত উপায়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে।'

আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না; বলিলাম, 'কি রকম?'

'কাল প্রায় রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমি এই ক্ষিতীনবাবুর বাড়ি থেকে ফিরছিলুম। রাস্তা ঘোর অন্ধকার—হঠাৎ একজনের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। এরকম বেপরোয়া ভাবে যে নিজের মাথাটা অপরের মাথার সঙ্গে লড়িয়ে দেয় তার ওপর রাগ হবারই কথা। বললুম—কে হে তুমি, কোন হ্যায়? লোকটি কাতর স্বরে বললে—মশায়, দোষ নেবেন না—আমি এখানে নতুন লোক। আর মাথাটাও আমার তেমন শক্ত নয়। আমি দেখলুম গলা অপরিচিত। জিজ্ঞাসা করলুম—কে আপনি? তারপরই পরিচয় হয়ে গেল।'

'অন্ধকারে পরিচয়?'

'হ্যাঁ। কিন্তু লোকটি বেশ ভাল বলেই বোধ হল। তবে যেন একটু বেশী স্মার্ট।'

'কি করতে এসেছে জান?'

'ঠিক বলতে পারিনে। হাওয়া বদলাতে বোধ হয়।'

হায় অজ্ঞ! দাদার জন্য প্রাণটা আনচান করিয়া উঠিল। কিন্তু তবু কি মুখ ফুটিয়া বলা যায়!

দিন দুই-তিন পরে বৌদিদি বলিলেন যে সরস্বতীকে দেখিতে আসিয়াছে—আজই কনে দেখা হইবে। বলিলাম, 'তবে সব শেষ!'

বৌদিদি ম্লানমুখে উত্তর করিলেন, 'এখনো বলতে পারি না। তবে যতদূর বুঝতে পাচ্ছি—বোধ হয় শেষ।'

'দাদা কিছু জানেন?'

'না। এখনো জানেন না। জানাব?'

'খবরদার না। কাজটা চুপি চুপি শেষ হয়ে যাক—তারপর তো জানতেই পারবেন।'

বৌদিদি আর কিছু বলিলেন না।

বিকালবেলা দাদাকে একটু বিশেষ সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় যাচ্ছ?'

দাদা বলিলেন, 'শরৎ ডেকেছে—কোথায় নাকি যেতে হবে।' এই কয়দিনে শরতের সহিত দাদার আলাপ বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

আমি একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিলাম। নিয়তি এত কঠিন পরিহাসও করিতে পারে!

সন্ধ্যার সময় ক্ষিতীনবাবুর বাড়ি উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তাঁহার দিবানিদ্রার ঘর হইতে খাট ইত্যাদি অদৃশ্য হইয়াছে। তৎপরিবর্তে মেঝের উপর শুভ্র ফরাস পাতা। তাহার উপর কয়েকটা তাকিয়া ছড়ানো রহিয়াছে। পাড়ার দু' চারিজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসিয়া গল্প করিতেছেন; বরের পার্টি তখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। আমাকে আজ ক্ষিতীন-বাবু দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, বলিলেন, 'এই যে সন্তোষ, বাড়ির ভেতর যাও। দেখগে যোগাড়-যন্ত্র হল কিনা।'

আমি বড় দ্বিধায় পড়িলাম। সরস্বতীর সম্মুখে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। শরতের সহিত যদি তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে বিবাহের পূর্বে তাহার মনে কতকগুলা অপ্রীতিকর স্মৃতি জাগাইয়া লাভ কি?

তবু যাইতে হইল। সসংকোচে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া দেখি দালানে বসিয়া অনিলের মা থালে থালে সন্দেশ সাজাইতেছেন এবং বীণা সন্দেশগুলাতে গোলাপের পাপড়ি বসাইতেছে। তাহার কোলে এক রাশি পাপড়ি।

আমি আবির্ভাব হইয়াই আবার তিরোভাবের চেষ্টা করিতেছি এমন সময় বীণা হঠাৎ মুখ তুলিয়া আমাকে দেখিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে গোলাপের পাপড়িগুলি মাটিতে ছড়াইয়া ফেলিয়া সে দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল।

মাতা চাহিয়া আমাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন, 'সন্তোষ, এসেছ বাবা। আজ তোমাদেরই দেখবার শোনবার দিন। তোমরা না করলে কে করবে? ওই ঘরে একবার যাও।'

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বৌদিদি রহিয়াছেন। সরস্বতীকে সাজানো হইতেছে। সে নির্লিপ্তভাবে বসিয়া আছে, যেন তাহাকে সাজানো হইতেছে না। শুধু মাঝে মাঝে কিরকম ভাবে বৌদিদির মুখের পানে তাকাইতেছিল। বৌদিদি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি কথাও না বলিয়া তিনি তাহাকে পরিপাটি করিয়া সাজাইতে লাগিলেন।

আমাকে দেখিয়া সরস্বতীর পাংশু মুখখানা হঠাৎ একবার লাল হইয়া উঠিয়াই আবার সাদা হইয়া গেল। সে জড়ের মত বসিয়া রহিল, নড়িল না। বৌদিদিও আমাকে দেখিয়া কোন কথা বলিলেন না।

বাহির হইতে সংবাদ আসিল বরের পার্টি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুনিবামাত্র সরস্বতী

উঠিয়া দাঁড়াইল; বৌদিদির মুখের দিকে একবার চাহিল। বৌদিদি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সরস্বতী আমার দিকে চাহিল, তারপর দৃঢ়স্বরে বলিল, 'আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে!'

আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিলাম, 'আমি ওদের অভ্যর্থনা করিগে। অনিলকে ডেকে দিচ্ছি।'

বাহিরে গিয়া দেখিলাম বরপক্ষীয়গণ দ্বারের নিকটে সমাগত হইয়াছেন। তাঁহারা সংখ্যায় গুটি চার-পাঁচ। স্বয়ং বর, বরের কাকা এবং দুই-তিনজন বন্ধু। বরের কাকা আজই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; তিনি এ পর্যন্ত আসিতে পারেন নাই বলিয়া কনে দেখা হয় নাই। বরের দুটি বন্ধুও কাকার সঙ্গে আসিয়াছেন।

আপাদমস্তক শুভ্রবেশ পরিহিত বর এবং তৎপক্ষীয়দের অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে আনিলাম। বরের চোখে পাঁশ-নে চশমা। বরের পশ্চাতে যে বন্ধুটি ছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি ভাবিয়াছিলাম, আসল উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে নিশ্চয় দাদা শরতের সঙ্গে আসিবেন না। কিন্তু দাদা পাংশুমুখে একটুখানি মলিন হাসি লইয়া ঠিক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বরপক্ষীয়েরা আসন গ্রহণ করিলেন। দাদা চুপি চুপি সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া একটি কোণে গিয়া বসিলেন।

বরের কাকা প্রবীণ ব্যক্তি—তিনি ক্ষিতীনবাবুর সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। বর ঘন ঘন স্খলিত চশমা নাসিকার উপর পুনঃস্থাপিত করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে বরের চেহারার যে প্রশংসাগুঞ্জন উঠিতেছিল, সম্পূর্ণ অবিচলিত হইলেও বরটি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হইল না।

সাদর সম্ভাষণ শেষ হইলে কন্যা আনিবার প্রস্তাব হইল। ক্ষিতীনবাবু স্বয়ং বাড়ির মধ্যে গেলেন এবং অল্পকাল পরে সুসজ্জিতা সরস্বতীকে বাহু ধরিয়া লইয়া আসিলেন। সরস্বতী আসিয়া একটি টিপাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি তাহার মুখের দিকে আড়-চোখে একবার তাকাইলাম—কিছু বুঝা যায় না। শুধু তাহার ঠোঁটদুটি যেন ঈষৎ চাপা। একবার কোণের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিলাম না। দাদার মুখ শুষ্ক—চোখ নামাইয়া বসিয়া আছেন। আমি চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বরের দিকে চাহিলাম। সে চশমার ভিতর দিয়া অনেকটা কুমীরের মত স্থির নেত্রে সরস্বতীর পানে তাকাইয়া আছে।

দেখা শেষ হইলে সকলে কন্যাকে ভিতরে লইয়া যাইতে বলিলেন। সরস্বতী তাহার আনত নেত্র একবার তুলিতেই হঠাৎ যেন কিসে লাগিয়া সজোরে প্রতিহত হইয়া গেল। তখনি সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিল। অনিল তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল।

বরকর্তা সভাস্থলেই স্বীকার করিলেন যে কন্যা রূপসী। এবং তাঁহার যে খুবই পছন্দ হইয়াছে তাহাও বারম্বার প্রচার করিতে লাগিলেন। তারপর হাস্যমুখে বলিলেন, 'মা-লক্ষ্মীকে তো দেখা হল। এখন বাবাজীকে একটু পরীক্ষা করে নিন্।'

ক্ষিতীনবাবু সাদরে বরের পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন, 'বাবাজীর আর পরীক্ষা কি? সব পরীক্ষাই তো উনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।—আচ্ছা বাবাজী, তুমি উত্তর-মীমাংসা পড়েছ?'

বর চশমার কাচ রেশমী রুমালে ঘষিতে ঘষিতে বলিল, 'উত্তর-মীমাংসা? আজ্ঞে না, উত্তর-মীমাংসা আমার পড়া নেই। তবে পশ্চিম—'

বরের কাকা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, 'কি জানেন, ওরা তো আর্টস স্টুডেণ্ট নয়, চিরকাল সায়েন্সই পড়ে এসেছে; তাই—'

ক্ষিতীনবাবু ভাবী জামাতার পৃষ্ঠ হইতে হাতটি ধীরে ধীরে নামাইয়া লইলেন।

তারপরই বরপক্ষীয়গণ প্রভৃত জলখাবারের ধ্বংস সাধন করিয়া হৃষ্টমনে বাড়ি ফিরিলেন। বরের কাকা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে আশীর্বাদ তখনি সম্পন্ন হউক। কিন্তু সকলে বলিলেন যে ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ বাবাজীর কন্যা পছন্দ হইল কিনা এ বিষয়ে সম্যক না জানিয়া কার্য করা উচিত হয় না। অতএব স্থির হইল

যে বাবাজীর সম্মতি লইয়া আশীর্বাদ শীঘ্রই সম্পাদিত হইবে।

॥ ৭ ॥

একখানা বই মুখের সম্মুখে ধরিয়া দাদা কাৎ হইয়া বিছানায় শুইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন ঠিক বইয়ের পাতার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। খোলা জানালা দিয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল।

আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, 'দাদা, রাতদিন পড়া কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল? চল একটু বেড়িয়ে আসি।'

দাদা উদাসভাবে বলিলেন, 'কই আর পড়া হচ্ছে—এক্‌জামিন তো এসে পড়ল।'

আমি বলিলাম, 'তা হোক, চল একটু ঘুরে আসি!'

দাদা কপালের উপর দিয়া দক্ষিণ করতল দু'বার চালনা করিয়া বলিলেন, 'না ভাই, আজ থাক। শরীরটা তেমন ভাল নেই।'

'সেইজন্যেই তো আরও যাওয়া উচিত। এই ক'দিনে শরীরটাকে কি করে ফেলেছ, বল দেখি।'

দাদা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; নিজের বাহুর ম্লান পেশীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'ভয়ের কোন কারণ নেই। এখনো বেশ শক্ত আছি।'

একটা কামিজ গলাইয়া লইয়া দাদা আমার সঙ্গে বাহির হইলেন।

কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না—অনতিপূর্বেই আমাদের গতিরোধ হইল।

স্বভাবের নিয়মে বিষম বিপর্যয় ঘটাইয়া, কি জানি কেন, আজ ক্ষিতীনবাবু স্বীয় কক্ষ বর্জনপূর্বক বাগানে বেড়াইতেছিলেন। দাদাকে তিনি দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং আমাকে আদৌ দেখিতে পাইলেন না। দাদাকে বলিলেন, 'কি হে, কোথায় যাচ্ছ?'

দাদা সবিস্ময়ে বলিলেন, 'আজ্ঞে একটু বেড়াতে যাচ্ছি।'

ক্ষিতীনবাবু আমার যৎপরোনাস্তি বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বলিলেন, 'এ ক'দিন তোমায় দেখিনি যে? অসুখ করেছিল নাকি?

দাদা বলিলেন, 'আজ্ঞে না, বেশ আছি।'

তখন ক্ষিতীনবাবু বলিলেন, 'তুমি সেদিন শঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে যে বইখানা আমায় দিয়ে গিয়েছিলে আমি তার কয়েক জায়গায়- দাগ দিয়ে রেখেছি। সেই দাগ দেওয়া জায়গাগুলো পড়লেই আমি যা বলেছিলুম সব বুঝতে পারবে।'

দাদা 'যে আজ্ঞে' বলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় ক্ষিতীনবাবু বলিলেন, 'বইখানা ইংরাজীতে হলেও চমৎকার লেখা। তোমার ওখানা আগাগোড়াই পড়া উচিত। লেখকের ইনট্রোডাকশন পড়েছ? পড়নি? এসো দেখিয়ে দিইগে। কি সুন্দর! আমি বোধহয় নিজের মত অত চমৎকার করে বলতে পারতুম না।' বলিতে বলিতে তিনি বাড়ির দিকে ফিরিয়া চলিলেন।

দাদা আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি দাদার মুখের দিকে চাহিলাম। ক্ষীণ হাসি দাদার ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল। আমি ধীরে ধীরে তাঁহাকে ক্ষিতীনবাবুর দিকে ঠেলিয়া দিলাম।

দাদা নীরবে তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন। আমি ক্লাবে গেলাম।

সেদিন রাত্রি আটটা বাজিয়া গেলে দাদা চলিয়া আসিবার পর ক্ষিতীনবাবু অনেকক্ষণ বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে আস্তে আস্তে দ্বার ঠেলিয়া সরস্বতী সেই ঘরে ঢুকিল। ক্ষিতীনবাবু একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। সরস্বতী দরজা

ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া প্রথমে ঘরের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর একটা কোণে গিয়া টিপায়ের উপর কতকগুলো খেলনা নাড়িতে নাড়িতে বেশ স্পষ্ট স্বরে বলিল, 'বাবা, তারা নাকি কাল আসবে?'

ক্ষিতীনবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, 'কারা?'

সরস্বতী জবাব দিল না; কিছুক্ষণ পরে বলিল, 'এ তো কিছুতেই হতে পারে না বাবা।'

এতক্ষণে পিতার কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইল। তিনি ঈষৎ সজাগ হইয়া বলিলেন, 'কি হতে পারে না মা?'

সরস্বতী লাল হইয়া উঠিয়া কোন রকমে বলিল, 'এ বিয়ে হতে পারে না বাবা।'

ক্ষিতীনবাবু সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'কেন?'

সরস্বতী বুকে ঘাড় গুঁজিয়া বলিল, 'না বাবা, এ কিছুতেই হতে পারে না।'

ক্ষিতীনবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'এই দেখ পাগলামী। আচ্ছা তোর এসব কথায় থাকবার দরকার কি? তুই কি নিজে গিয়ে বিয়ে কচ্ছিস, না—'

সরস্বতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'বাবা, আমার এসব কথায় থাকবার দরকার হয়েছে। এই দেখ।' বলিয়া পিতার সম্মুখে একখানা লেফাফা ফেলিয়া দিল।

ক্ষিতীনবাবু খাম খুলিয়া যাহা বাহির করিলেন তাহা একটি ফটোগ্রাফ। সরস্বতীর ভবিষ্যৎ স্বামীর আবক্ষ প্রতিকৃতি, নিম্নে দুই-ছত্র কবিতা—যতদিন দেহে প্রাণ রহিবে আমি তোমারি তুমি আমারি। ক্ষিতীনবাবু স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। সরস্বতী বলিল, 'নিজে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

কিছুক্ষণ দেখিয়া ক্ষিতীনবাবু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'তা বেশ তো। এতে আর দোষ কি মা?'

সরস্বতী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, 'দোষ কি বাবা? একটা দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে তুমি আমার—; এরকম করে যে নিজের ছবি পাঠাতে পারে তার সঙ্গে—বাবা, আমি বিয়ে করবো না—কক্খনো করবো না। তুমি আমায় মেরে ফেল।' বলিয়া সরস্বতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সরস্বতী এতক্ষণ একটু একটু করিয়া খাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ক্ষিতীনবাবু তাহাকে টানিয়া নিজের কোলের কাছে বসাইলেন। পিঠে হাত দিয়া স্নেহ-কোমল স্বরে বলিলেন, 'কি হয়েছে মা বল্ তো।' তাঁহার মত অন্ধ ব্যক্তিও যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই অকিঞ্চিৎকর ফটোটাই শুধু তাঁহার কন্যার সুতীব্র মনস্তাপের হেতু নয়।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। সরস্বতীর বুকের মধ্যে কেন যে আজ হু হু করিয়া রোদনের অদম্য বেগ ছুটিয়া আসে সে নিজেই বুঝিতে পারে না। ক্ষিতীনবাবুও কন্যার এই নিদারুণ ব্যথার কারণ ঠিক জানিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্যি সত্যি কি হয়েছে বল্‌বি না মা?'

মা'র কিন্তু মুখে কথা নাই। পিতা যতই কোমল প্রশ্ন করেন, মেয়ের বুকের মধ্যে কান্না ততই গুমরিয়া উঠে। অনেক চেষ্টা করিয়াও ক্ষিতীনবাবু কিছুই জানিতে পারিলেন না। সরস্বতী তেমনি ঘাড় গুঁজিয়া রহিল। তখন তিনি বলিলেন, 'আমি কালই তাদের বলে পাঠাব যে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব না। তাহলে হবে তো?'

সরস্বতী আস্তে আস্তে পিতার উরুর উপর মাথা রাখিয়া বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখদুটা মুছিয়া ফেলিল।

ক্ষিতীনবাবু কতকটা নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, 'ছোকরা দেখতে শুনতে তো মন্দ নয়, পড়াশুনোতেও ভাল। কিন্তু তবু কি জানি কেন আমার মনের ভেতরটা খুঁত খুঁত করছিল।—এই ধরনা কেন কেদারনাথ—ঐ যে ছেলেটি সন্তোষের কিরকম ভাই হয়—লেখাপড়ায় তেমন ভাল না হলেও দিব্যি ছেলেটি—ঠিক আমার মনের মত—যেমন সরল, তেমনি বিনয়ী। এতটুকু বাবুয়ানী নেই। আর বিদ্যার প্রতি যথার্থ অনুরাগী। ওর মত একটি ছেলে পাওয়া যেত—তাহলে না হয় কি বলিস—'

হঠাৎ মেয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে তাহার মুখখানা আগাগোড়া সিঁদুরের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সে উঠিয়া 'আমি জানিনে বাবা' বলিয়া একরকম দৌড়িয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষিতীনবাবু কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর গড়গড়ার নলটা আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া শুধু বলিলেন, 'হুঁঃ—।'

রাত্রে শুইতে গিয়া গৃহিণী স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তুমিই মেয়েদের আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ। এমন কথাও শুনিনি কখনো। মা বাপে বিয়ে দেবে মেয়ে বলে বস্‌ল—ও বর বিয়ে করব না। তোর ওসব কথায় কাজ কি বাপু!'

ক্ষিতীনবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া রহিলেন। উত্তর না পাইয়া স্ত্রী আর একটু তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, 'আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, অমন বর তোমার মেয়ের পছন্দ হল না কেন? জামাই মন্দটা কি? বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুপুরুষ—অমন জামাই হাজারে একটা পাওয়া যায় না।'

ক্ষিতীনবাবু আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া বলিলেন, 'বেদান্ত না পড়লে আজকালকার ছেলেদের চরিত্র গঠন হয় না।'

গৃহিণী রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'পোড়াকপাল বেদান্তের! আমার মাথা খাও যদি ওই বইগুলো রাতদিন পড়।'

ক্ষিতীনবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই বলিলেন, 'কি করতে বল?'

গৃহিণী বলিলেন, 'এ সম্বন্ধ ছাড়তে পাবে না।'

ক্ষিতীনবাবু। ছাড়তেই হবে—উপায় নেই।

গৃহিণী। কেন?

ক্ষিতীনবাবু। ছেলেটির নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।

গৃহিণী মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, 'বেদান্ত পড়েনি বলে বুঝি?'

ক্ষিতীনবাবু জবাব দিলেন না। ভাবী জামাতার চরিত্র সম্বন্ধে একটা সন্দেহ আছে জানিয়া গৃহিণীরও মন হঠাৎ বিমুখ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'তা বেশ, যা হয় কর। কিন্তু তোমার মেয়েটি আর কচি খুকী নেই ভুলে যেও না যেন। আমি বলে দিচ্ছি, আর যা হয় কর কিন্তু ওই দিনে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চাই। যেখান থেকে পার জামাই যোগাড় কর।' এই বলিয়া কতক ক্ষুণ্ণ কতক বিষণ্ণ এবং কতক চিন্তান্বিত হইয়া গৃহিণী শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তন্দ্রায় তাঁহার চক্ষু দুটি মুদিয়া আসিতেছে, এমন সময় ক্ষিতীনবাবু ডাকিলেন, 'ওগো।'

গৃহিণী চোখ মেলিয়া বলিলেন, 'কি?'

ক্ষিতীনবাবু। ওবাড়ির সন্তোষের এক কিরকম ভাই আছে জান—কেদার বলে? সে জামাই হলে পছন্দ হয়?

গৃহিণীর ঘুম ভালরূপেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'কে, সন্তোষের দাদা?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো সন্তোষের চেয়ে নিচে পড়ে।'

'তাহলেই বা—ছেলেটি ভারি ভাল। আর তোমরা যা চাও, ঘরও চেনা টাকাকড়িও আছে।'

গৃহিণী ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, 'সন্তোষের ভাই বলেই দিতে ইচ্ছে করে। বীণাটার যদি তেমন কপাল হয়, দুজনেই এক জায়গায় পড়বে।'

ক্ষিতীনবাবু বলিলেন, 'তোমার মত আছে তো?'

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, হঠাৎ ঐ ছেলেটিকে তোমার পছন্দ হল কেন বলতো? বেদান্ত পড়ে বলে, না? কি ভাগ্যি, আমায় যখন বিয়ে করেছিলে তখন তোমার বেদান্ত ছিল না, নইলে আমাকে তো বিয়েই করতে না।'

য়ে ঘরে ক্ষিতীনবাবু শয়ন করিতেন তাহার দুখানা ঘর পরে বীণা ও সরস্বতী শুইত। আজ অনেক রাত পর্যন্ত তাহারা জাগিয়াছিল। খোলা জানালা দিয়া চাঁদের আলো অন্ধকার ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ঠিক সেই আলোর কিনারায় দুই বোনে দুটি চেয়ারে বসিয়া ছিল।

ঠং ঠং করিয়া ঘড়ি বাজিল। বীণার ঘুম আসিতেছিল, সে সুপ্তি অলস কণ্ঠে বলিল, 'দিদি, এগারটা বাজল।'

কথাটা দিদির কানে পেঁছিল না। বীণা আবার বলিল, 'দিদি, শোবে না?'

তখন দিদি বোনের তন্দ্রাজড়িত মুখের পানে চাহিল। তাহার চোখে সেই শান্ত জ্যোৎস্নালোকের মত এমন একটি মৃদু জ্যোতি ছিল যে তাহা নিদ্রালু বীণার চোখেও পড়িল।

সরস্বতী উঠিয়া বলিল, 'চল শুইগে।' বলিয়া বীণাকে টানিয়া চাঁদের আলোর নিচে আনিয়া দুই বাহুতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া একটি চুম্বন করিল। বীণা দিদির বুকে মাথা রাখিয়া চুপটি করিয়া রহিল—কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না।

সরস্বতী বীণার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া আর একবার বলিল, 'ঘুম পাচ্ছে, না বীণা? চল শুইগে।' বলিয়া তাহাকে বিছানার দিকে লইয়া গেল।

॥ ৮ ॥

সেদিন রবিবার। দুপুরবেলা একলাটি বসিয়া পড়িতেছি এমন সময় বৌদিদি প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরপো, কি দেবে দাও—বাজিমাত।' তাঁহার গণ্ড হাস্যরঞ্জিত।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলাম, 'অ্যাঁ, 'কি বলিলে বল দিদি শুনি গো আবার মধুর বচন'।'

বৌদিদি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, 'আর মধুর বচন! তোমার বৌদিদিকে প্রণাম কর! তোমার বড়দাদা যদি একশটা বিয়ে করতেন তাহলেও এমন বৌদিদি আর পেতে না বলে দিলুম।'

আমি সত্যসত্যই বৌদিদিকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'বেশ, তা না হয় প্রণাম করলুম। কথাটা খুলে বল। আমি যে ঠিক বুঝতে পারছিনে, 'কি কথা হায় ভেসে যায় ঐ চঞ্চল নয়নে'।'

বৌদিদি ঠানদিদিসুলভ গাম্ভীর্যের সহিত তাঁহার চম্পকাঙ্গুলি দ্বারা আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহা চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'বেঁচে থাক। কথাটা হচ্ছে মেয়েমানুষের প্রতিজ্ঞা জগৎ শেঠের প্রতিজ্ঞার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।—

'সাধিকে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন—'

আমি। ঐ তোমার ভারি দোষ বৌদি। তুমি একটা কথা সোজা করে কিছুতে বলতে পার না। ঐ জন্যেই তো দাদা তোমার ওপর অত রাগেন।

বৌদিদি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ওগো, এখন আর তিনি রাগবেন না—তা হাজার ঘুরিয়েই বলি না কেন।'

'বৌদি, এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে?'

'কি?'

'আমাকে এরকম সংশয়ের যন্ত্রণা দেয়া?'

বৌদিদি হাসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 'তবে শোন। আজ আমি বীণাদের বাড়ি গিয়েছিলুম। বীণার মা কি বললেন জান? কথায় কথায় হঠাৎ বললেন, 'শুনেছ বৌমা, সরস্বতীর যে সম্বন্ধ হয়েছিল উনি তা ভেঙে দিলেন।' আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সেকি মাসীমা?' তিনি বললেন, 'ছেলেটি ওঁর তেমন পছন্দ হল না।' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা

করলেন, 'হ্যাঁ বৌমা, তোমার দেওরটির সঙ্গে হয় না?' আমি বললুম, 'কোন্ দেওর?' তিনি বললেন, 'কেন গো, ঐ যে সন্তোষের খুড়তুত ভাই! ওঁর কিন্তু ঐ ছেলেটিকে ভারি পছন্দ।' আমি বললুম, 'মাসীমা, তা যদি হয় তাহলে আমরা আর কিছু চাই না।' তিনি বললেন, 'তবে একবার চেষ্টা করে দেখ না বৌমা।—আমরা তো বল্‌বই।'

সত্য বলিতে কি এই কথা শুনিয়া আমার এত আনন্দ হইতেছিল যে ইচ্ছা হইতেছিল আবার বৌদিদির পায়ের ধুলা লই। কিন্তু সে প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া বলিলাম, 'আর বৌদি, সরস্বতীর সঙ্গে দেখা হল না?'

বৌদিদি বলিলেন, 'হল না আবার?' ,

'কি বললে সে?'

বৌদিদি মুখখানি একটু রাঙ্গা করিয়া বলিলেন, 'সত্যি কথা বলব ঠাকুরপো, এই আমাদের মেয়েমানুষ জাতটা ভারি বাঁদর। সরস্বতীর কাছে গেলুম, মুখখানা এমন গোমড়া করে রইল যেন আমি কিছুই জানি না মনের মধ্যে কি হচ্ছে। আমি যখন গালটা টিপে দিয়ে বললুম, 'কি লো, মুখখানা অমন করে আছিস যে?' তখন কিন্তু হেসে ফেললে আবার কেঁদেও ফেললে।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে বৌদিদির চোখেও জল আসিয়া পড়িল।

আমি উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, 'তবে সব ঠিক! বাকি শুধু পুরুত ডাকা?'

বৌদিদি বলিলেন, 'তোমার দাদার কাছে কথাটা ভাঙ্গতে হবে আগে।'

আমি বলিলাম, 'তুমিই ভাঙ্গ।'

দাদার ঘরে ঢুকিয়াই বৌদিদি বলিলেন, 'ঠাকুরপো, তোমার একটা সম্বন্ধ এসেছে।'

দাদা চমকাইয়া উঠিলেন, তারপর বিরস স্বরে কহিলেন, 'চীনের রাজকন্যার সঙ্গে নাকি?'

বৌদিদি বলিলেন, 'অত দূরে কি বিয়ে করতে আছে?'

দাদা একটু হাসিয়া বলিলেন, 'তবে বুঝি মন্দোদরীর সহোদরার সঙ্গে?'

'না গো না, অত দূরে নয়।'

দাদা বলিলেন, 'তবে ভেঙ্গেই বল।'

বৌদিদি বলিলেন, 'খুব কাছে—ওঃ ভারি কাছে। আন্দাজ কর।'

দাদা। পারলুম না।

বৌদিদি। যদি বলি আমাদের পাড়ায় তাহলে পারবে তো?

দাদার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল, আবার তখনি অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি ব্যথিত স্বর গোপন করিতে করিতে বলিলেন, 'তাহলেও পারলুম না বৌদি।'

বৌদিদি আস্তে আস্তে বলিলেন, 'সরস্বতীর সঙ্গে।'

দাদার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কথাটা সহজে বিশ্বাস হইবার নয়। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর শরৎ?'

বৌদিদি বলিলেন, 'সরস্বতী তাকে বিয়ে করবে না, বলে দিয়েছে! সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে।'

দাদার রক্তহীন মুখখানা অত্যন্ত শুষ্ক দেখাইতেছিল। তিনি বলিলেন, 'ঠাট্টা করছ বৌদি—?'

'তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি ঠাট্টা নয়, ঠাকুরপো। এই নিয়ে ঠাট্টা করব!'

কিছুক্ষণ পরে দাদা ঘাড় তুলিলেন; আমি স্মিত মুখে বলিলাম,—

'যদি অবহেলা করি রুষিবে সম্বর-অরি
কে সম্বরে স্মরশরে এ তিন ভুবনে!'

এইবার দাদা সস্মিত ভর্ৎসনার চোখে আমার পানে চাহিলেন।

সেইদিন বিকালবেলা ঘটনাচক্রে শরতের সহিত দাদার দেখা হইয়া গেল। দেখা না

হইলেই ভাল হইত। দাদা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, 'শরৎ যে—ভাল তো?'

শরৎ তাঁহার দিকে না তাকাইয়াই ভ্রূকুটি করিল। তারপর ভ্রূ তুলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, 'কে? ওঃ ক্যাদারবাবু যে।' বলিয়া ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিল।

দাদা অপরাধীর মত বলিলেন, 'এ ক'দিন তোমার ওখানে যেতে পারিনি—'

শরৎ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, 'তাতে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। মিছিমিছি আপনাকে অ্যাপোলজি চাইতে হবে না।'

শরৎ দাদাকে আঘাত দিবার জন্যই কথাটা বলিয়াছিল। দাদা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে শরৎ মুখ তুলিল, তাহার ওষ্ঠে একটা ক্রূর হাসি খেলা করিতেছিল। সে বলিল, 'তারপর ক্যাদারবাবু, এবার পাসটাস হবেন তো? তা হতেও পারেন—আপনার ওপর সরস্বতীর কৃপা আছে। আর নেহাৎ যদি না হন—আমাকে একটা খবর দেবেন। আমি আপনার বন্ধু তো—একটা ঠিকেদারী জুটিয়ে দেব। ঠিকেদারী খাসা কাজ মশাই—দেদার ফুর্তি—'

এই পর্যন্ত বলিয়া তীব্র ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া শরৎ হঠাৎ চলিয়া গেল। দাদা বিস্ময়ে ক্ষোভে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।